ISSN 1813-0402

গবেষণা পত্রিকা

৩৪তম সংখ্যা ■ ডিসেম্বর ২০২২

কলা অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

A Research Journal

Faculty of Arts

University of Rajshahi

গবেষণা পত্রিকা ৩৪তম সংখ্যা ■ ডিসেম্বর ২০২২ কলা অনুষদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা পত্রিকা

৩৪তম সংখ্যা ❑ ডিসেম্বর ২০২২

A Research Journal
Faculty of Arts
Rajshahi University

A Research Journal
Faculty of Arts
Rajshahi University

Vol. 34
December 2022

Published by
Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Dean, Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

Cover Design
Rashed Sukhon

Printed by
Uttoran Offset Printing Press
Kadirgonj, Rajshahi - 6100

Price : Tk. 400.00 $ 6

Contact Address
Chief Editor, *A Research Journal* (Faculty of Arts)
Deans Complex
Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh

E-mail: dean.arts@ru.ac.bd
www.ru.ac.bd/arts

EDITORIAL BOARD

Chief Editor

Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Dean, Faculty of Arts
Rajshahi University

Members

Professor Dr. Nilufar Ahmed
Chairman
Department of Philosophy

Professor Dr. Mahmuda Khatun
Chairman
Department of History

Rubaida Akhter
Chairman
Department of English

Professor Dr. Shahid Iqbal
Chairman
Department of Bangla

Professor Dr. Mohammad Fayek Uzzaman
Chairman
Dept. of Islamic History & Culture

Professor Dr. Mohammad Sabirul Islam Hawlader
Chairman
Department of Arabic

Professor Dr. Md. Ashraf- Uz- Zaman
Chairman
Department of Islamic Studies

Shaila Tasmeen
Chairman
Department of Music

Professor Dr. SM Faruque Hossine
Chairman
Department of Theatre

Professor Dr. Md. Shafiullah
Chairman
Department of Persian Language & Literature

Professor Dr. Sheikh Md. Nuruzzaman
Chairman
Department of Sanskrit

Professor Dr. Md. Ataur Rahman
Chairman
Department of Urdu

Message from the Chief Editor

The 34th volume of *A Research Journal,* Faculty of Arts is being published with as many as 29 research articles contributed by the faculty members of Philosophy, Bengali, Arabic, Islamic Studies, Music, Theatre, Persian Language & Literature, Sanskrit and Urdu Departments. The articles are of diverse characters and will come to the use of the students and researchers of various disciplines, specially of the Faculty of Arts.

The publication of the journal is the result of collective efforts of all the scholar members of the editorial board. They have ungrudgingly helped me in its publication. I am grateful to them for their cooperation. I thank the concerned officers of the Faculty for their assistance and also the employees of the Uttoran Offset Printing Press for their support.

Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Chief Editor and Dean
Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

সূচিপত্র

ড. মো. একরাম হোসেন ও ড. মো. আরিফুল ইসলাম	সাইবার ক্রাইম ও বাংলাদেশ : একটি জরিপভিত্তিক নৈতিক সমীক্ষা	১
ড. মো. জাহিদুল ইসলাম	বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার দার্শনিক মূল্যায়ন	১৫
গৌতম দত্ত	বুদ্ধদেব বসুর শিল্পচেতনা: 'যে আঁধার আলোর অধিক'	৩৩
নীলিমা তাবাস্সুম	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা: রাজনীতি-ভাবনা	৪১
আব্দুল মমিন	আরবি কবিতায় ইসলামি ইতিহাস-ঐতিহ্য (৬৬২-৭৫৮ খৃ.)	৫৩
মুকাররম হুসাইন	শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীঃ সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান	৬৫
ড. আবু নোমান মুহাম্মদ মাসউদুর রহমান	আল-কুরআনে উল্লিখিত মস্তক ও মুখমণ্ডল সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহ: একটি পর্যালোচনা	৭৭
মো. মুনসুর আলম	ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সভ্যতা সুরক্ষায় শিশুর ভবিষ্যৎ : একটি পর্যালোচনা	৯৫
মো. মাহফুজুর রহমান	চৌর্য্যবৃত্তি প্রতিরোধে ইসলামী দণ্ডবিধির বিশ্লেষণ	১১১
মোহা. আহমাদুল্লাহ	আল কুরআনে বর্ণিত ফলজ উদ্ভিদ: পরিচিতি ও পর্যালোচনা	১২৫
গুলশান আকতার	Role of Bangabandhu Dissemination of Religion, Islamic Civilization & Culture	১৩৩
মো. আশরাফুল ইসলাম	ইসলামী শরীয়তে উশর-এর নিসাব: একটি পর্যালোচনা	১৫৩
ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও ড. মোহা. আশরাফ উজ্ জামান	কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে মসজিদের আদব: একটি পর্যালোচনা	১৬৯
ড. এফ এম এ এইচ তাকী	তাকদীর ও অদৃষ্টবাদ : একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা	১৮৯
ড. আবুল বাশার মোহাম্মদ সরোয়ার আলম	চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.)	১৯৭
হাবিবুল্লাহ	আল-কুরআনে বর্ণিত মহানবীর (সাঃ) প্রতি জিজ্ঞাসা: একটি পর্যালোচনা	২১১
ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী: জীবন ও রচনাবলী	২২১
আব্দুল্লাহ	মানবজীবনে তাওহীদের গুরুত্ব	২৩৯
শেখ মো. তৈয়বুর রহমান	ইমাম বুখারী (রহ.) জীবন ও রচনাবলী	২৪৭
ড. দীনবন্ধু পাল	কথক নৃত্যশৈলী ও উপশাস্ত্রীয় সংগীতের সাথে তবলা সংগতবাদন	২৬১
ড. এস. এম. ফারুক হোসাইন	ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাট্য মাদার পিরের পালা : বিষয় ও পরিবেশনরীতি	২৭৩
মো. আল আমিন মোল্লা	শেখ সাদির কাব্যের মৌলিক আদর্শ	২৮৩
ড. মো. কামাল উদ্দিন	হাফিজের কবিতায় মূল্যবোধ ও নান্দনিকতা	২৯৩
ড. মো. ওসমান গনী	শাহনামা মহাকাব্যের বিষয়-বৈচিত্র্য ও কাব্যিক-নৈপূণ্য	৩০১
ড. সেরিনা সুলতানা	নূতন ভাবনায় কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্	৩০৯
ড. বেবী বিশ্বাস	ভারবির কিরাতার্জুনীয়ম্ মহাকাব্যের বিষয়ভাবনা ও বিশিষ্টতা	৩২১
ড. হোসনে আরা আরজু	সংস্কৃত সাহিত্যে শিশুর স্বরূপ	৩৩১
মোহা. আমিনুল ইসলাম	উর্দু ভাষার উন্নয়নে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের অবদান	৩৪১
রুহুল আমীন	মুসলিম দর্শন ও ইকবাল	৩৫৩

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

সাইবার ক্রাইম ও বাংলাদেশ : একটি জরিপভিত্তিক নৈতিক সমীক্ষা
(Cybercrime and Bangladesh : A Survey Based Ethical Study)

ড. মো. একরাম হোসেন*
ড. মো. আরিফুল ইসলাম*

Abstract: In the current age of information and communication technology, most of the information is online based and is under the threat of cybercrime. Any crime that occurs through online process may be defined as cybercrime. At present, cybercrime is gradually increasing throughout the world and Bangladesh is not an exception in this case. There may be some evil motivation behind this crime or someone may be involved in it unknowingly or unconsciously. However, cyber criminals create a devastating effect on the society in the form of economic disruptions, mental disorders, and threats to national defense. In this article, an attempt will be made to investigate the type and nature of cybercrime from the perspective of Bangladesh. At the same time, an endeavor will also be made to examine the role of the moral values in controlling the cybercrime in Bangladesh. Data and information regarding cybercrime will be presented on the one hand and the possible way to overcome the situation will be recommended on the basis of those data and information on the other.

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে অপরাধের ধরন ও কৌশলের পরিবর্তন হয়েছে। এক্ষেত্রে অপরাধকর্মে অস্ত্রশক্তি ও পেশীশক্তির স্থানে যুক্ত হয়েছে কম্পিউটারসহ আধুনিক ডিভাইস ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা। এগুলোর মাধ্যমে সাইবার স্পেসে নতুন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। এই সাইবার প্রযুক্তি আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আইনি তথা নৈতিক জীবনে যে নানান প্রভাব ফেলে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করা এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনি ও নৈতিক আদর্শ বিধি স্থির করা সাইবার নীতিবিদ্যার (Cyber Ethics) কাজ, যাতে করে আমরা ব্যক্তি ও সমাজকে যথাযথ পথ দেখাতে পারি। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশে সাইবার ক্রাইমের স্বরূপ ও কারণ অনুসন্ধান করা হবে এবং উত্তরণের উপায় খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে এই অপরাধ নিয়ন্ত্রণে নৈতিক মূল্যবোধ কি কোন প্রভাব রাখতে পারে কিনা- তা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা হবে। এই গবেষণায় সামাজিক জরিপ গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

সাইবার ক্রাইম কী?

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধকে সাইবার ক্রাইম (cybercrime) বলে। এখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অনুমোদন ব্যতীত বা বৈধ কর্তৃত্ব ছাড়াই (unauthorized) সাইবার স্পেসকে তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন ব্যক্তির হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ডেটা ও নেটওয়ার্ক রিসোর্সসমূহ অনাদিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ব্যবহার করতে পারে; অথবা উপর্যুক্ত ক্ষেত্রগুলিতে প্রবেশ, পরিবর্তন এবং ক্ষতিসাধন করতে পারে; অনুমতি ব্যতিত তথ্য প্রকাশ ও সফটওয়্যার কপি করতে পারে; প্রকৃত ব্যবহারকারীকে তার নিজস্ব কম্পিউটার, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, উপাত্ত অথবা নেটওয়ার্ক রিসোর্সসমূহ ব্যবহার করতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে; অবৈধভাবে কোন কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে কম্পিউটার

---

* প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
* প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ও এর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে- এসবই হলো সাইবার অপরাধ বা সাইবার ক্রাইম। Michael Cross তাঁর *Scene of the Cybercrime* গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> Cybercrime is a broad and generic term that refers to crimes committed using computers and the Internet, and can generally be defined as a subcategory of computer crime. … Cybercrime refers to criminal offenses committed using the internet or another computer network as a component of the crime.[১]

আবার, ইউরোপীয় কমিশন যেভাবে সাইবার ক্রাইমের সংজ্ঞা প্রস্তাব করে তাহলো- প্রচলিত (traditional) ধরনের প্রতারণা বা জালিয়াতি (fraud or forgery) যখন ইলেকট্রোনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং তথ্যব্যবস্থার মাধ্যমে সংঘটিত হয়; ইলেকট্রোনিক মাধ্যমে অবৈধ বা অনুনোমদিত বিষয় (illegal content) যখন প্রকাশ করা হয় যেমন: (শিশু যৌন হয়রানি সংক্রান্ত বিষয় অথবা বর্ণবাদী ঘৃণা প্রকাশিত হয় এমন); ইলেকট্রোনিক নেটওয়ার্কের মধ্যে যে অপরাধ, যেমন তথ্য ব্যবস্থার বা তথ্য সেবার ওপর আক্রমণ বা হ্যাকিং প্রভৃতি সাইবার ক্রাইম হিসেবে চিহ্নিত।[২]

কম্পিউটার সম্পর্কিত অপরাধ বোঝাতে সাধারণত “cybercrime” অথবা “e-crime” অথবা “digital technology crime” এসব শব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে কম্পিউটার প্রযুক্তির বিকাশ একদিকে যেমন সারা বিশ্বকে সংযুক্ত করছে; সাথে সাথে সমকালে সাইবার অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুতই এবং সাইবার অপরাধের নতুন নতুন ধরন দেখা যাচ্ছে। প্রফেসর কুলভিন্ডার সিং সাইবার ক্রাইমকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেন: একটি হলো; এমন একটি অপরাধ যেখানে কম্পিউটারকে অপরাধমূলক কর্মকান্ডের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অন্যটি হলো; কম্পিউটারই যেখানে অপরাধমূলক কর্মকান্ডের লক্ষ্য এবং সম্ভবত অন্যকোন সংগঠনের তথ্য চুরি বা ধ্বংস করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, অবৈধভাবে অর্থ হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে আক্রমণ করা হয়, ক্রেডিট কার্ডের নম্বর চুরি করা হয় এবং এরূপ আরও অনেক ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়।[৩] আবার Mohamed Chawki এবং অন্যান্যরা সাইবার ক্রাইমের সম্ভাব্য সংজ্ঞা হিসেবে বলেন যে, সাইবার অপরাধ হলো এমন একটি বেআইনি কর্মকান্ড যেখানে কম্পিউটার হাতিয়ার অথবা লক্ষ্য অথবা উভয় হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।[৪] অর্থাৎ উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় সাইবার অপরাধের প্রধান হাতিয়ার হলো কম্পিউটারসহ আধুনিক প্রযুক্তি যা অপরাধপ্রবণ মানুষ বেআইনিভাবে অথবা অনুমোদনহীনভাবে ব্যবহার করে অন্যের ক্ষতি সাধন করে।

বাংলাদেশে সাইবার ক্রাইমের ধরন ও প্রকৃতি

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দিক থেকে এখনো বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। দেশে ১৯৯৩ সালে প্রথম অফ-লাইন ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরু হয়। সবার জন্য ইন্টারনেট উন্মুক্ত হয় ১৯৯৬ সালের ৬ জুন। ২০০৪ সালে জিপিআরএস টেকনোলজি দিয়ে মোবাইল ইন্টারনেট চালু হয়। ২০০৫ সালের শেষ দিকে সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্কে যুক্ত হয় বাংলাদেশ। গ্রামীনফোন ইডিজিই সার্ভিস চালু করে ২০০৬ সালে। এটি ছিল জিপিআরএসের তুলনায় অধিক গতিসম্পন্ন সার্ভিস। ক্রমবর্ধমান ইন্টারনেটের চাহিদা মেটাতে কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে বাংলাদেশ তৃতীয় সাবমেরিন কেবলে যুক্ত হয় ২০২০ সালে। প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের দেশে প্রযুক্তিগত অপরাধও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নে বাংলাদেশে প্রচলিত ও সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধ ও তার প্রকৃতি তুলে ধরা হলো।

স্প্যামিং; কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে অনবরত বিভিন্ন ই-মেইল অ্যাকাউন্টে ই-মেইল পাঠানোর পদ্ধতিকে বলা হয় স্প্যামিং (spamming)। স্প্যাম ই-মেইল হলো অপ্রয়োজনীয় ও বিরক্তিকর ই-মেইল। অনেক সময় স্প্যাম ই-মেইল; প্রতারণামূলক ও আপত্তিকর পণ্যের প্রচারমূলকও হয়ে থাকে। অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সাধারণত সার্ভারকে ব্যস্ত রাখার জন্য এরূপ ই-মেইল পাঠিয়ে থাকে। পিটার নর্টন এ ধরনের ই-মেইলকে জ্যাঙ্ক মেইল (junk mail) [৫] বলে উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের ই-মেইলের মাধ্যমে

মানুষ সাইবার জগতে নিরাপত্তার ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এভাবে সার্ভারকে ব্যস্ত রাখা বা সার্ভারের পারফরমেন্সকে নষ্ট করা বা মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা নৈতিকভাবে সমর্থনীয় নয়।

হ্যাকিং; কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ট্যাবলেটসহ ডিজিটাল ডিভাইসগুলির মাধ্যমে অনুমতি ব্যতিত অপরের ডিভাইসের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে অপরের তথ্য সংগ্রহ, চুরি বা ক্ষতিসাধন করাকে সাইবার জগতে হ্যাকিং (hacking) বলে। যারা হ্যাকিং করে তারা হ্যাকার বা ক্র্যাকার বলে পরিচিত। সাধারণত দুই ধরনের হ্যাকার লক্ষ করা যায়; বৈধ হ্যাকার ও অবৈধ হ্যাকার। অনুমতি ব্যতিরেকে ইন্টারনেট অথবা কোন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে যখন কোন হ্যাকার তথ্য চুরি বা আর্থিক ক্ষতি করে, তখন তাকে অবৈধ হ্যাকার বলে। এ হ্যাকাররা অনেক সময় দূরবর্তী বা রিমোর্ট কম্পিউটারে কোন প্রোগ্রাম রান করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে। তাদের সংগৃহীত তথ্য পরবর্তীতে ব্যবহার করে ক্ষতি সাধন করে। হ্যাকিং এর শিকার হয়ে অনেকেই সর্বস্ব হারিয়েছে। এরূপ কর্ম নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। অনেক সময় আবার কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের সিকিউরিটি সিস্টেমকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেও হ্যাকার বা ক্র্যাকার নিয়োগ দিয়ে থাকে। যাকে বৈধ হ্যাকার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

সাইবার চুরি; এটি দু'ধরনের হতে পারে। যথা; উপাত্ত চুরি (data theft) এবং ব্যক্তি পরিচয় চুরি (identity theft)। অনুমতি ব্যতিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপাত্ত ব্যবহার করাকে উপাত্ত চুরি বলে। যেমন; গোপনীয় পাসওয়ার্ড, ক্রেডিট কার্ড নম্বর, সিকিউরিটি নম্বর, ব্যাংক একাউন্ট নম্বর ও একাউন্ট পাসওয়ার্ড নম্বর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত বা তথ্য চুরি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে, ব্যক্তি পরিচয় চুরি হলো এমন একটি অপরাধ যেখানে একজন ব্যক্তি অপরের পরিচয় ব্যবহার করে কোন কিছু ক্রয় বা গ্রহণ করে এবং তার দায়ভার উক্ত ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয়। যেমন; সাইবার অপরাধীরা নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে উক্ত ব্যবহারকারীর নামে কোন ক্রেডিট একাউন্ট বা পে-সিস্টেম চালু করে নিজ স্বার্থে তা ব্যবহার করে। আবার যখন কোন ব্যক্তি তার আসল পরিচয় গোপন করে অন্যের পরিচয় ব্যবহার করে অপরাধ করে তা Identity Cloning and Concealment নামে পরিচিত; যার দৃষ্টান্ত হতে পারে এমন- একজন অবৈধ অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে চাকরির জন্য অন্য কোনও ব্যক্তির পরিচয় চুরি করে ব্যবহার করতে পারে। এছাড়াও ব্যক্তি পরিচয় চুরির দৃষ্টান্তের মধ্যে আরও রয়েছে criminal identity theft; যেখানে একজন ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক সনাক্তকরণ বা গেপ্তার এড়াতে বা মামলা মোকদ্দমা থেকে রক্ষা পেতে নিজেকে অন্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় দেয়।

টাইম এণ্ড রিসোর্স থেপ্ট্; অনুমতি ব্যতীত অপরের কম্পিউটার বা নেটওয়ার্ক বা রিসোর্সেস (হার্ডওয়্যার, সফ্টওয়্যার ইত্যাদি) ব্যবহার করাকে টাইম এণ্ড রিসোর্স থেপ্ট্ (time and resource theft) বলে, যেমন; নেটওয়ার্কে অবস্থান করে অন্যের হার্ডওয়্যার, প্রিন্টার, সিডিরম ইত্যাদি ব্যবহার করা বা ইন্টারনেট ব্রাউজিং, চ্যাটিং প্রভৃতি করা। উন্নত দেশগুলোতে এই অপরাধ নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য ও নিন্দনীয়।

সফ্টওয়্যার এণ্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি পাইরেসি; সফ্টওয়্যার এবং ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি হলো একটি মেধাভিত্তিক পণ্য। প্রস্তুতকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এতে যথেষ্ঠ মেধার স্বাক্ষর রাখে। উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি ব্যতিত ঐ সফটওয়্যার কপি করা বা নাম পরিবর্তন করে বিক্রয় করা কিংবা একাধিক কম্পিউটারে ইনস্টল করা হলো সফটওয়্যার এণ্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি পাইরেসি (software and intellectual property piracy)। এর ফলে প্রস্তুতকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে প্রায়ই সফ্টওয়্যার পাইরেসি সংঘটিত হচ্ছে। যেমন, সফ্ট লিফটিং (soft lifting); একটি লাইসেন্সকৃত সফ্টওয়্যার কোন কম্পিউটারের জন্য ক্রয় করে যদি অন্যান্য কম্পিউটারেও ইনস্টল করা হয়, তবে তা হবে সফ্ট লিফটিং। আপলোডিং এবং ডাউনলোডিং (uploading and downloading); প্রস্তুতকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি ব্যতিত কোন নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট ব্যবহার

করে কোন সফ্‌টওয়্যার সংগ্রহ বা বিতরণ করাকে আপলোডিং এবং ডাউনলোডিং বলে। সফ্‌টওয়্যার ভাড়া দেয়া (software renting); লাইসেন্সকৃত একটি সফ্‌টওয়্যার ক্রয় করে তা যদি অন্যের নিকট অস্থায়ীভাবে ভাড়া দিলে তা হবে সফ্‌টওয়্যার রেন্টিং।

প্লেজিয়ারিজম; অপরের প্রবন্ধ, গবেষণাকর্ম, গল্প, কবিতা, চিন্তা, ধারণা বা অভিব্যক্তি ইত্যাদি হুবহু নকল বা অংশবিশেষ পরিবর্তন করে তা নিজ নামে ব্যবহার বা প্রকাশ করাকে প্লেজিয়ারিজম (plagiarism) বলে। বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে এই অপরাধ বেশি লক্ষণীয়। এই অপরাধ অনলাইন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংঘটিত হলে তাকে সাইবার প্লেজিয়ারিজম বলে। শিক্ষা ও গবেষণায় এটি একটি গুরুতর নৈতিক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

ফেইসবুক প্রতারণা; সাধারণত ফেইক আইডি থেকে ফেইসবুকে বেশি প্রতারণা হয়ে থাকে। ফেইসবুকে অন্যের নাম বা ছবি সংযুক্ত করে অনেকে অ্যাকাউন্ট খুলে এবং ব্যবহার করে। এইসব একাউন্টে একাউন্টধারীর প্রকৃত তথ্য থাকে না। এগুলো ফেইক একাউন্ট হিসেবে পরিচিত। এসব একাউন্টের মাধ্যমে নানান ধরনের প্রতারণামূলক ও আপত্তিকর বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। আবার কখনও ব্যাংক, কখনও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার কর্মী, কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী- এমন নানা পরিচয় দিয়ে ফেইসবুকে প্রতারণার ফাঁদ পেতে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়।[৬] এভাবে প্রতারণা করে অন্যের ক্ষতি করা আইনের দৃষ্টিতে যেমন অপরাধ তেমনই নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়।

মোবাইল ফোন ব্যবহার করে প্রতারণা; একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাক- ‘হ্যালো! আমি গ্রামীণফোন কলসেন্টার থেকে সুমন আহমেদ রাকিব বলছি। আপনার ব্যবহৃত নম্বরটি লটারিতে পালসার মোটরসাইকেল পেয়েছে। আপনি মোটরসাইকেলের পরিবর্তে দুই লাখ ৬২ হাজার টাকা নিতে পারেন। তবে আজ বিকেল পাঁচটার মধ্যেই আপনাকে ট্যাক্সসহ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে। এই রকম একটি খবরে খুশি হয়ে পান্থপথের বাসিন্দা মো. শামস জুবায়ের বেশ কয়েক হাজার টাকা তাদের দেয়া মোবাইল নম্বরে দিয়েছিলেন।’[৭] শামস জুবায়েরের মতো অনেকেই এরূপ প্রতারণার ফাঁদে পড়ছেন। শাহীনা আক্তার নামক এক ব্যক্তি ঢাকার মগবাজার মধুবাগের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরে। প্রতারক চক্র জিনের বাদশা নামে রাতে মোবাইলে নানা ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে চার মাসে ২৫ লাখ টাকা বিভিন্ন মোবাইল ব্যাংকিং নম্বরের মাধ্যমে আদায় করে।[৮] আবার কখনও ওসি, এসপি, ডিসি বা কখনও বিভিন্ন দফতরের প্রভাবশালী সরকারী কর্মকর্তা পরিচয়ে মোবাইল নম্বর থেকে ফোন করে নানা অজুহাতে টাকা চাওয়া হয়। দেখানো হয় নানান ভয়ভীতি। এগুলো ওইসব কর্মকর্তার প্রকৃত ফোন নম্বর নয়। প্রতারক চক্র মোবাইল নম্বর স্পুফিং (spoofing) করে বিভিন্ন ধরনের লোকের সঙ্গে প্রতারণা করে। উল্লেখ্য যে, স্পুফিং হলো প্রকৃত নম্বর গোপন রেখে অন্য এক ব্যবহারকারীর নম্বর অথবা বিশেষ কোনো নম্বর দিয়ে ফোন করার প্রযুক্তি। এরূপ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অন্যের ক্ষতি করা বা অর্থ অনৈতিকভাবে উপার্জন করা অনুচিত।

কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত মিসড কল; কখনও কখনও মোবাইলে +২৪৩ বা +৮৮০২৪০০ বা +০৯০৪ ইত্যাদি নম্বর থেকে মিসডকল আসে। কল ব্যাক করলেই মোবাইল ফোনের অর্থ শেষ হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ফোনগুলো মূলত কম্পিউটারের মাধ্যমে ইন্টারনেট দিয়ে করা হয়। এরূপ পদ্ধতিকে সিম ক্লোনিং বলে। আবার কেউ কেউ বলছেন, বিশেষ ধরনের সফটওয়্যারের মাধ্যমে অন্যের তথ্য ও অর্থ হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। এভাবেও প্রতারিত হচ্ছে আমাদের দেশের অনেক মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীরা।

এটিএম বুথে জালিয়াতি; আমাদের দেশে ২০১৬ সালে তিনটি ব্যাংকের চার এটিএম বুথ থেকে তথ্য চুরি করে ক্লোন কার্ড তৈরি করে বিদেশীরা। উক্ত সময় ৪০টি কার্ড ক্লোন করে গ্রাহকের ২০ লাখ টাকা তুলে নেয়া হয়। ২০১৮ সালে রাজধানীর একটি সুপারমল থেকে গ্রাহকদের তথ্য চুরি হয়। ক্লোন কার্ড তৈরি করে ৪৯ গ্রাহকের হিসাব থেকে টাকা তুলে নেয়া হয়।[৯] এরূপ অনেক ঘটনা রয়েছে। আবার ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে হ্যাকাররা আক্রমন চালায়।[১০] এর আগেও অর্থাৎ ২০১৫ সালে সোনালী

ব্যাংক থেকে ২৫০,০০০ ডলার চুরি হয়। হ্যাকাররা ছুটির দিনকে টার্গেট করে বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের তথ্য ব্যবহার করে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউ ইয়র্ক- এ পেমেন্টের অর্ডার পাঠায় এবং এই রিকুয়েস্ট অনবরত আসতেই থাকে। ব্যাংকের কর্মকর্তারা বুঝে ওঠার আগেই কয়েকটি ট্রানসেকশান হয়ে যায়। যার ফলে ১০১ মিলিয়ন ডলার টাকা পেমেন্ট হয়ে যায় শ্রীলংকা এবং ফিলিপাইনে। গত ০১ জুন ২০১৯ তারিখ রাত সাড়ে ১১টার দিকে ডাচ বাংলা ব্যাংকের ঢাকা বাড্ডা এলাকার বুথে দুটি এটিএম বুথ থেকে দুই বিদেশি নাগরিক বিভিন্ন কার্ড ব্যবহার করে একাধিকবার টাকা উত্তোলন করেন।[১১] এই সময় বুথের নিরাপত্তাকর্মীও উপস্থিত ছিল। অভিনব এ নতুন কৌশলে টাকা উত্তোলনের ঘটনা আমাদের দেশের ব্যাংকগুলোকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। এর আগেও এটিএম বুথ থেকে টাকা চুরি হয়েছে। তাতে দেখে যায় গ্রাহকের কার্ডের ক্লোন কার্ড তৈরি করে অপরাধীরা এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করেছে। এতে গ্রাহকের টাকার পরিমাণ কমেছে এবং গ্রাহক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু এবার অপরাধীরা এটিএম বুথের নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং টাকা উত্তোলন করে। এতে কোন গ্রাহকের হিসাব থেকে টাকা কমেনি, কমে গেছে কয়েক লক্ষ টাকা বুথ থেকে। এই ঘটনায় কয়েকজন বিদেশী যুক্ত রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ উল্লেখ করে- তাদের কাছে যে কার্ডগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলো এটিএম বুথে ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাংকের কেন্দ্রীয় সার্ভারের সঙ্গে ওই বুথের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর তারা নিজেদের মতো টাকা তুলে নিয়ে যায়। আইটি বিশেষজ্ঞরা বলেন, জালিয়াতি চক্র 'টুপকিন' নামে একটি ম্যালওয়ার ব্যবহার করে বুথের পুরো নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে নিয়ে নেয়। টাকা উত্তোলনে এক্ষেত্রে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় সার্ভার থেকে যে নির্দেশনা আসার কথা সেই তথ্য চক্রের সদস্যরাই দিয়ে থাকে।

মিথ্যা প্রচারণা; ফেইসবুক, ইমেইল বা মোবাইল ফোনের মেসেজ ইত্যাদি আজকাল মিথ্যা প্রচারণার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফেইসবুক পোস্টে ইসলাম ধর্মের অবমাননা হয়েছে- এই হুজুগ তুলে সাম্প্রদায়িক হামলা শুরু হয় কক্সবাজারের রামুতে।[১২] ২০১২ সালে ওই সহিংসতার পর প্রায় প্রতিবছর একই কায়দায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হচ্ছে। কোথাও ভুয়া ফেইসবুক পরিচিতি (আইডি) থেকে, কোথাও লেখাপড়া না জানা অন্যের আইডি থেকে উস্ককানিমূলক পোস্ট দিয়ে ঘটনার সূত্রপাত হয়।[১৩] আবার ২০১৩ সালের ২ নভেম্বর ফেসবুকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে কটূক্তি করা হয়েছে- এই গুজব ছড়িয়ে পাবনার আতাইকুলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হয়।[১৪] এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এছাড়াও মিথ্যা আইডি ব্যবহার করে প্রতারকরা নানা ধরনের মিথ্যা পোস্ট দিয়ে অনেককেই বিভ্রান্ত করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এভাবে মিথ্যা প্রচারণা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। তাই এরূপ ক্রিয়াকলাপ ধর্মীয় বা নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়।

পর্নোগ্রাফি; যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কোন অশ্লীল সংলাপ, অভিনয়, অঙ্গভঙ্গি, নগ্ন-অর্ধনগ্ন নৃত্য যা চলচ্চিত্র, ভিডিও চিত্র, স্থির চিত্র, গ্রাফিক্স বা অন্য কোন উপায়ে ধারণকৃত ও প্রদর্শিত হয় তাকে পর্নোগ্রাফি বলে। এছাড়াও যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী অশ্লীল বই, সাময়িকী, ভাস্কর্য, কল্পমূর্তি, মূর্তি, কার্টুন বা লিফলেট এবং এই সকল কিছুর নেগেটিভ বা সফ্ট ভার্সনও পর্নোগ্রাফির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। পর্নোগ্রাফির শিকার হচ্ছে আমাদের দেশে শিশু ও নারীরাই বেশি। পর্নোগ্রাফি নারীর জন্য অবমাননাকর। অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা শপিংমল থেকে বিভিন্ন ছবির সাথে এডিটিং করে যুক্ত করে দেয় নগ্ন ছবি। অনেককে আবার প্রেমের ফাঁদ ফেলে ফেইসবুক বা ইউটিউবে ছড়িয়ে দিচ্ছে নানান আপত্তিকর ছবি। ভুয়া অধিকাংশ ফেইসবুক আইডিগুলো থেকে পর্নোগ্রাফি অনেক পেজ তৈরি করে আমাদের দেশের নারী ও শিশুদের প্রতারণা করা হচ্ছে। নৈতিকতা বিধ্বংসী পর্নোগ্রাফি মানবসভ্যতার একটি নঞর্থক উদ্ভাবন। এর কোনো শৈল্পিক মূল্য স্বীকৃত নয়। এটি হলো সেই নিকৃষ্ট বিষয় যা মানুষের গোপনীয় জীবনকে সহজলভ্য করে দেয়। যার কারণে একদিকে মানুষের জৈবিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ নষ্ট হয়, অন্যদিকে মস্তিষ্কে বাসা বাঁধে নানা বিকৃত চিন্তা ভাবনা।

ভাইরাস; কম্পিউটার ভাইরাস হলো মূলত একটি প্রোগ্রাম। এটি কম্পিউটারে অদৃশ্য থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্যান্য প্রোগ্রামের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে থাকে। VIRUS এর পূর্ণরূপ হলো Vital Information Resources Under Seize। কম্পিউটার ভাইরাস প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির ক্ষতি সাধন করে থাকে। অনেক সময় ভাইরাস সক্রিয় হয়ে উঠলে এর নিজস্ব সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে কম্পিউটারের ক্ষতি সাধন করতে পারে। অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে এটি কম্পিউটারের ফাইল বা ফোল্ডার নষ্ট, হার্ডডিস্কের ক্ষতি সাধন প্রভৃতি করতে পারে। Eugene H. Spafford তাঁর এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে কম্পিউটার ভাইরাস শব্দটি জৈবিক ভাইরাস (biological virus) থেকে আগত এবং জীবদেহে যেভাবে একটি ভাইরাস সংক্রমণ ঘটায় সেভাবে কম্পিউটারেও ভাইরাস ছড়ায়। তাঁর মতে, "a computer virus is a segment of machine code (typically 2004000 bytes) that will copy its code into one or more larger "host" programs when it is activated."[১৫]

এছাড়াও আমাদের দেশে সাইবার বুলিং, সফ্টওয়্যার পাইরেসি প্রভৃতি সাইবার ক্রাইম লক্ষ্য করা যায়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা সাইবার ক্রাইমে যুক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে চারটি প্রকৃতিতে বিভক্ত করতে পারি। যথা; প্রথমত, শিশু ও কিশোর; যারা সাধারণত কৌতুহল বশত: ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিষিদ্ধ বিষয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ছে এবং অজান্তেই সাইবার ক্রাইমে জড়িয়ে পড়ছে। দ্বিতীয়ত, হ্যাকার বা ক্র্যাকার; যারা দলগতভাবে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আক্রমণ চালিয়ে অর্থ হাসিল করার চেষ্টা করে বা বিভিন্ন ওয়েবসাইট নষ্ট করার চেষ্টা করে। তৃতীয়ত, পেশাগত হ্যাকার বা ক্র্যাকার নন, কিন্তু শখের বশে বিভিন্ন ওয়েব সাইটে অনুপ্রবেশ করে এবং সাইবার ক্রাইমে জড়িয়ে পড়ে। চতুর্থত, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইটে অনুপ্রবেশ করে এবং মিথ্যা প্রচারণা চালানোর চেষ্টা করে। একজন ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠীর সাইবার অপরাধের কারণ চিহ্নিত করতে না পারলে সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা প্রায়ই অসম্ভব হবে। এজন্য সাইবার ক্রাইমের কারণ অনুসন্ধান জরুরি।

সাইবার ক্রাইমের কারণ

সাধারণত ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস বা কম্পিউটারের দুর্বলতাকে সাইবার অপরাধের জন্য দায়ী করা হয়। কারণ ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস বা কম্পিউটারে -

প্রবেশ করা সহজ; অনাদিষ্ট ব্যক্তি বা হ্যাকাররা রিমোট কন্ট্রোল, অ্যাক্সেস কোড, উন্নত ভয়েস রেকর্ডার ইত্যাদি চুরি করতে পারে, যার সাহায্যে বায়োমেট্রিক সিস্টেমগুলোকে সহজেই বোকা বানিয়ে এবং ফায়ারওয়ালগুলি বাইপাস করে কম্পিউটারে খুব সহজেই অ্যাক্সেস করার ক্ষমতা পেয়ে যায়।

তুলনামূলকভাবে ছোট স্থানে ডেটা সংরক্ষণ; ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস বা কম্পিউটার অসংখ্য ডেটা ধারণ করতে পারে। অনেক ডেটাকে তুলনামূলকভাবে একটি ছোট স্থানেই সংরক্ষণ করে। যার কারণে হ্যাকাররা এটি অন্য যে কোন স্টোরেজ থেকে ডেটা চুরি করে এবং নানান সাইবার অপরাধে ব্যবহার করে।

জটিলতা; ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস বা কম্পিউটারগুলো অপারেটিং সিস্টেমগুলিতে চালিত হয়। একটি অপারেটিং সিস্টেম কয়েক লক্ষ কোডের প্রোগ্রামযুক্ত। অপারেটিং সিস্টেমের সিকিউরিটি কোডের দুর্বলতাই সাইবার অপরাধীদের সুযোগ করে দেয়। সাইবার অপরাধীরা যার কারণে ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস বা কম্পিউটারে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে যায়।

অবহেলা; মানব আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো অবহেলা। এই বৈশিষ্ট্যের দরুণ আমরা অনেক সময় ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস বা কম্পিউটার সিস্টেমের সুরক্ষাতেও অবহেলা করি। এই অবহেলাই সাইবার অপরাধীদের কম্পিউটার সিস্টেমে অ্যাক্সেস এবং নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা প্রদান করে।

সাক্ষ্য-প্রমাণ বিনষ্ট; যেকোন অপরাধের প্রমাণ পরবর্তী তদন্ত ও সিস্টেমকে আরো শক্তিশালী করতে সহযোগিতা করে। কিন্তু কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ডিভাইস সিস্টেমে অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য সহজেই প্রোগ্রাম দ্বারাই ধ্বংস করা যেতে পারে। হ্যাকারা এই বিষয়টিকে সহজেই ব্যবহার করে। কাজেই, বলা যায় প্রমাণ

হারিয়ে যাওয়া একটি খুব সাধারণ ও স্পষ্ট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি সাইবার অপরাধ তদন্তের পিছনের সিস্টেমকে পঙ্গু করে দেয়।

সাইবার ক্রাইমের উপরিউক্ত কারণগুলো ছাড়াও আর কি কি কারণ থাকতে পারে তা অনুসন্ধানের জন্য জরিপ পরিচালনা করা হয়। নিম্নে জরিপের ফলাফল উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হলো।

জরিপের ফলাফল উপস্থাপন ও পর্যালোচনা

সাইবার অপরাধের কারণ অনুসন্ধানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের (ঢাকা, বগুড়া, রাজশাহী) ৩০০ জন ব্যক্তির উপর জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপে 'সাইবার অপরাধের প্রকৃত কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?' এই প্রশ্নের ফলাফল নিম্নে টেবিলে ও স্তম্ভলেখে উপস্থাপন করা হলো:

সাইবার অপরাধের প্রকৃত কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?							
নিজের দক্ষতার অপব্যবহার	অপরাধপ্রবণ মন	রাজনৈতিক আক্রমনের উদ্দেশ্যে	বেকারত্বের কারণে	হতাশার কারণে	মানসিক বিকারগ্রস্থতার কারণে	কৌতুহল থেকে	প্রতিহিংসাপরায়ণতার কারণে
১৫.৫৯%	১৬.০০%	১৩.৯৩%	১১.৪৫%	৭.৪৫%	১০.৯০%	১১.৩১%	১৩.৩৮%

টেবিল: ০১

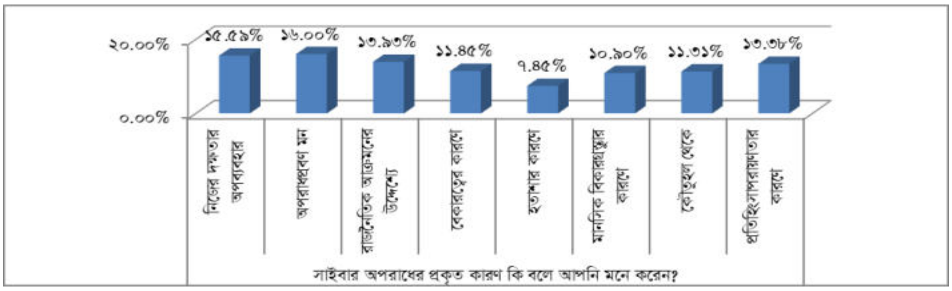

চিত্র: ১

উপরিউক্ত ফলাফল পর্যালোচনায় আমরা সাইবার অপরাধের পশ্চাদে যেসব কারণ দেখতে পাই তারমধ্যে অন্যতম হলো; অপরাধপ্রবণ মন (১৬% ব্যক্তি মনে করে), নিজ দক্ষতার অপব্যবহার (১৫.৫৯%), রাজনৈতিক আক্রমনের উদ্দেশ্যে (১৩.৯৩%), প্রতিহিংসাপরায়ণতা (১৩.৩৮%), বেকারত্ব (১১.৪৫%), কৌতুহল (১১.৩১%), মানসিক বিকারগ্রস্থতা (১০.৯০%), হতাশা (৭.৪৫%) প্রভৃতি। এরমধ্যে অপরাধপ্রবণ মন, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, কৌতুহল, মানসিক বিকারগ্রস্থতা, হতাশা এগুলো হলো মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। অর্থাৎ মোট ৫৯.০৪% ব্যক্তি মনে করছেন যে সাইবার অপরাধের পেছনে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক কারণ। আবার, সাইবার অপরাধের পশ্চাদে নৈতিক মূল্যবোধের অভাব কোনো ভূমিকা রাখে কি না এরকম একটি প্রশ্নের উত্তরে দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন ৩৫.৮৯% ব্যক্তি, একমত পোষণ করেন ৪০.৭৭% ব্যক্তি, দৃঢ়ভাবে অসম্মতি পোষণ করেন ৯.৭৬% ব্যক্তি। জরিপের ফলাফলটি নিম্নে টেবিল ২ এবং চিত্র ২ এ তুলে ধরা হলো।

আপনি কি মনে করেন উক্ত কারণগুলো ছাড়াও সাইবার অপরাধে নৈতিক মূল্যবোধের অভাব রয়েছে?				
দৃঢ়ভাবে একমত	একমত	দৃঢ়ভাবে অসম্মতি	অসম্মত	অন্যান্য-
৩৫.৮৯%	৪০.৭৭%	৯.৭৬%	৯.৭৬%	৩.৮৩%

টেবিল: ০২

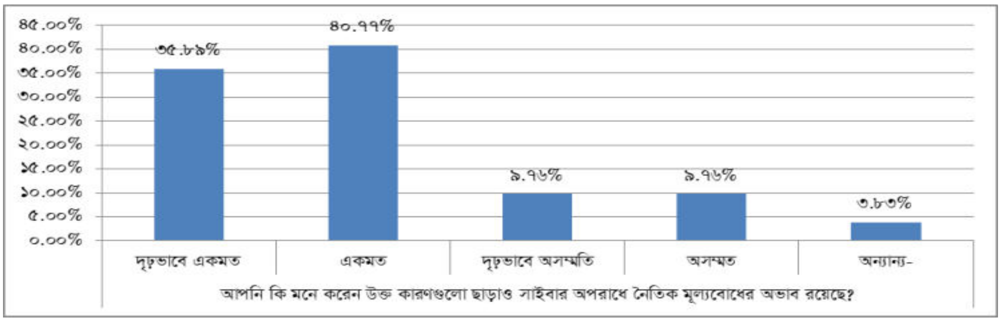

চিত্র: ২

উপর্যুক্ত তথ্য ও উপাত্ত পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে সাইবার অপরাধের পেছনে নিম্নোক্ত কারণগুলি রয়েছে;

১. ইলেক্ট্রোনিক ডিভাইস বা কম্পিউটারের দুর্বলতা;
২. ব্যবহারকারীর প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব;
৩. সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ;
৪. ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব এবং
৫. নৈতিক মূল্যবোধের অভাব।

এছাড়াও উপরের পর্যালোচনা থেকে আমরা বলতে পারি এই সাইবার ক্রাইমের ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উভয় ধরনেরই ক্ষতি হতে পারে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মানসিক বিপর্যয় ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে, সাম্প্রদায়িক সংকট তৈরি হতে পারে, এমন কি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধ একান্ত প্রয়োজন।

উত্তরণের উপায়

সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনটি উপায় বা ধাপের কথা উল্লেখ করা যায়; যেগুলির কোনোটিই এককভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেনা কিন্তু সমন্বিতভাবে কাজ করলে সাইবার অপরাধ কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

প্রথম ধাপ: ব্যবহারকারীর সর্তকতামূলক ব্যবহার

সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে প্রথম ধাপ হিসেবে প্রযুক্তি ব্যবহারকারীর সর্তকতাকে যুক্ত করতে পারি। ব্যবহারকারী নিজেই তার নিজস্ব নেটওয়ার্ক, নেটওয়ার্কের ব্যবহার ও কম্পিউটারসহ ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস সিস্টেমকে সুরক্ষা প্রদান করতে পারেন। পিটার নর্টন অনুসরণে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে; আপনি জানেন যে প্রতিদিন গাড়ি চুরি হয়, তাই গাড়ির সুরক্ষার জন্য আপনি কতকগুলো পদক্ষেপ নিতে পারেন, যেমন; গাড়ির দরজা বন্ধ করা, গ্যারেজে গাড়ি পার্কিং করা বা গাড়িতে অ্যালার্ম ব্যবহার করা। একইভাবে আপনার কম্পিউটার এবং ডেটার হুমকির বিষয়ে আপনার সচেতন হওয়া উচিত এবং সেগুলির সুরক্ষার জন্যও ব্যবস্থা নেয়া উচিত। কিছু সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে, আপনি কেবল আপনার

হার্ডওয়্যার, সফ্টওয়্যার এবং ডেটা নয়, নিজেকেও রক্ষা করতে পারেন।[১৬] সুরক্ষামূলক পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ-

শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার; নেটওয়ার্কে অবস্থিত কম্পিউটারসহ সকল ডিভাইসে আমরা (প্রযুক্তি ব্যবহারকারী) প্রতিটি অ্যাকাউন্টকে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড দ্বারা সুরক্ষা প্রদান করতে পারি। প্রয়োজনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য পৃথক পৃথক পাসওয়ার্ড এবং ব্যবহারকারীর নাম সংযুক্ত করতে পারি। তবে এই পাসওয়ার্ডগুলো কোথাও লিখে রাখার প্রবণতাকে পরিহার করা উচিত। সহজ পাসওয়ার্ড অনেক সময় হ্যাকাররা বিভিন্ন মনন পদ্ধতির মাধ্যমে আবিষ্কারও করতে পারে। শক্তিশালী পাসওয়ার্ড বলতে বর্ণ ছোট বা বড় হাতের অক্ষরে, সংখ্যা প্রভৃতির সংমিশ্রণ, যা ইচ্ছা করলেই হ্যাকাররা খুব সহজেই অনুমান করতে সক্ষম নাও হতে পারে।

সচেতন হওয়াঃ আমরা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে অ্যাকাউন্ট তৈরি করি। এক্ষেত্রে প্রোফাইলগুলির সেটিং খুব সতর্কতায় করা উচিত। এছাড়াও প্রোফাইলগুলির প্রাইভেসি ও সিকিউরিটির প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

ডিভাইসগুলো সুরক্ষিত করাঃ আমরা অনেকেই অবগত নই, আমাদের মোবাইল বা ল্যাপটপ বা কম্পিউটার ডিভাইসগুলোর ব্যবহারের সতর্কতায়। কম্পিউটার ভাইরাস বা হ্যাকারদের মতোই ঝুঁকিপূর্ণ, অনেক সফ্টওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন। আমরা আমাদের বিভিন্ন ডিভাইসের জন্যই সফ্টওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশনগুলো ডাউনলোড করি। অনেক সফ্টওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমাদের ডিভাইসগুলোর সকল স্থান ব্যবহার বা প্রবেশের অনুমতি নিয়ে নেয়। যার কারণে পরবর্তীতে আমাদের ডিভাইস থেকে অনেক তথ্য চুরি করার ক্ষমতা রাখে। কাজেই, কেবলমাত্র বিশ্বস্ত উৎস থেকে অ্যাপ্লিকেশনগুলি ডাউনলোড করা উচিত। এছাড়াও আমাদের অপারেটিং সিস্টেমকেও আপডেট রাখা জরুরি। ডিভাইসগুলোকে সুরক্ষা প্রদানে অ্যান্টি-ভাইরাস সফ্টওয়্যার ইনস্টল করা, ইউজার পাসওয়ার্ড বা লক স্ক্রিণ ব্যবহার করা ইত্যাদি। এমন অনেক হ্যাকারদের সফ্টওয়্যার আমাদের ডিভাইসগুলোতে ইনস্টল করতে পারলে আমাদের জিপিএসের মাধ্যমে প্রতিটি পদক্ষেপকে ট্র্যাক করতে পারে। কাজেই ডিভাইসগুলোকে সুরক্ষিত রাখা অবশ্যই প্রয়োজন।

অনলাইনে ব্যক্তিগত পরিচয় রক্ষা করাঃ অনলাইনে আমরা হরহামেশাই পরিচয় প্রদান করি। অনলাইনে আমাদের পরিচয় রক্ষার বিষয়টি খুব বেশি সতর্ক হওয়া উচিত। অনলাইনে আমরা যখন আমাদের নাম, ফোন নম্বর বা ইমেইল আইডি ইত্যাদি ব্যবহার করি তখন সতর্ক হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

সিকিউরিটি সফ্টওয়্যার দিয়ে ডিভাইসগুলো সুরক্ষা করাঃ অনলাইনে সুরক্ষার জন্য কয়েক ধরনের সুরক্ষা সফ্টওয়্যার প্রয়োজন। সিকিউরিটি সফ্টওয়্যারে প্রয়োজনীয় ফায়ারওয়াল এবং অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা। এই সফ্টওয়্যারগুলো অনাদিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আক্রমণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

উত্তরণের দ্বিতীয় ধাপঃ আইন ও বিধি

সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে বাংলাদেশে ২০০১ সালে টেলিকম্যুনিকেশন আইন পাস হয়। এরপর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬[১৭] পাস হয় ৮ অক্টোবর ২০০৬ সালে। এই আইনের ধারা ৫৪ -এ কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ইত্যাদির অনিষ্ট সাধনে অনধিক দশ বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ধারা ৫৫[১৮] -এ কম্পিউটার সোর্স কোড পরিবর্তন সংক্রান্ত অপরাধে অনধিক তিন বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ড, ধারা ৫৬ এ কম্পিউটার সিস্টেমের হ্যাকিং সংক্রান্ত অপরাধে অনধিক দশ বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে, ধারা ৫৭ এ ইলেক্ট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধে অনধিক দশ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ড উল্লেখ করা হয়েছে।

আবার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০০৯[১৯] নামে প্রণীত আইনটি ০৯ জুলাই, ২০০৯ তারিখে প্রকাশিত হয় এবং এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়তা লক্ষ করে ৯ অক্টোবর ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন (সংশোধন), ২০১৩[২০]। উল্লেখ করা হয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬, এর ধারা ৫৪ এর উপ-ধারা (২) এর 'অনধিক দশ বৎসর কারাদণ্ডে' পরিবর্তে 'অনধিক চৌদ্দ বৎসর এবং অন্যূন সাত বৎসর কারাদণ্ডে' প্রতিস্থাপন হয়। ধারা ৫৬ এর সংশোধন- উক্ত আইনের ধারা ৫৬ এর উপ-ধারা (২) এর 'অনধিক দশ বৎসর কারাদণ্ডে' পরিবর্তে 'অনধিক চৌদ্দ বৎসর এবং অন্যূন সাত বৎসর কারাদণ্ডে' প্রতিস্থাপন হয়। ধারা ৫৭ এর সংশোধন- উক্ত আইনের ধারা ৫৭ এর উপ-ধারা (২) এর 'অনধিক দশ বৎসর কারাদণ্ডে' পরিবর্তে 'অনধিক চৌদ্দ বৎসর এবং অন্যূন সাত বৎসর কারাদণ্ডে' প্রতিস্থাপন হয়। এভাবে ৬১, ৬৯, ৭৫, ৭৬, ৮০ বিভিন্ন ধারার সংশোধন হয়।

আবার, ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন, বিচার ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত হয় ২০১৮ সালের ৪৬ নং আইন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮[২১]। এখানে ধারা ১৮ (কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম, ইত্যাদিতে বে-আইনি প্রবেশ ও দণ্ড) এ বলা হয়েছে -(১) যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকতৃভাবে- (ক) কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে বে-আইনি প্রবেশ করেন বা প্রবেশ করতে সহায়তা করেন, বা (খ) অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে বে-আইনি প্রবেশ করেন বা প্রবেশ করতে সহায়তা করেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হবে একটি অপরাধ। (২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর- (ক) দফা (ক) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহলে তিনি অনধিক ৬(ছয়) মাস কারাদণ্ডে, বা অনধিক ২(দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন; (খ) দফা (খ) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহলে তিনি অনধিক ৩(তিন) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০(দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। (৩) যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন কতৃ অপরাধ কোনো সংরক্ষিত কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়, তাহলে তিনি অনধিক ৩(তিন) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০(দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। (৪) যদি কোনো ব্যক্তি এই ধারার অধীন কোনো অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহলে মূল অপরাধের জন্য যে দণ্ড নির্ধারিত রয়েছে তিনি তার দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ১৯ এ কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ইত্যাদির ক্ষতিসাধনে অনধিক ৭(সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে, আবার এরূপ অপরাধ দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করলে অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডের কথা উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও ধারা ২০ এ কম্পিউটার সোর্স কোড পরিবর্তন সংক্রান্ত অপরাধ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ অপরাধে অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডের কথা বলা হয়েছে। ধারা ২২ এ ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক জালিয়াতির বিষয়কে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ অপরাধে অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ড উল্লেখ রয়েছে। ধারা ২৩ এ ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক প্রতারণায় অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ড, ধারা ২৪ এ পরিচয় প্রতারণা বা ছদ্মবেশ ধারণে অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ড, ধারা ২৫ এ আক্রমণাত্মক, মিথ্যা বা ভীতি প্রদর্শক, তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ড, ধারা ২৬ এ অনুমতি ব্যতীত পরিচিতি তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ড, ধারা ২৭ এ সাইবার সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনের অপরাধে অনধিক ১৪

(চৌদ্দ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ড, ধারা ২৮ এ ওয়েবসাইট বা কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কোনো তথ্য প্রকাশ, সম্প্রচার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ড, ধারা ২৯ এ মানহানিকর তথ্য প্রকাশ, প্রচার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ড, ধারা ৩০ এ আইনানুগ কর্তৃত্ব বহির্ভূত ই-ট্রানজেকশন এর অপরাধে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ড, ধারা ৩১ এ আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো, ইত্যাদির অপরাধে অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ড, ধারা ৩২ এ সরকারি গোপনীয়তা ভঙ্গের অপরাধে অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ড, ধারা ৩৩ এ বে-আইনিভাবে তথ্য-উপাত্ত ধারণ, স্থানান্তর, ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ড, ধারা ৩৪ এ হ্যাকিং সংক্রান্ত অপরাধে অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ড এবং ধারা ৬১ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইনের সংশোধন ও হেফাজত) বলা হয়েছে- (১) এই আইন কার্যকর হবার সঙ্গে সঙ্গে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ও ৬৬ বিলুপ্ত, অতঃপর এই ধারা বিলুপ্ত ধারা বলে উল্লেখ রয়েছে।

এখন দেখা যেতে পারে আইন ও বিধির প্রয়োগ সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কি চূড়ান্তভাবে সফলতা পাচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের জন্য জরিপের একটি প্রশ্ন ছিল ‘আপনি কি মনে করেন সাইবার নিরাপত্তার আইনগুলি সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম?’ ফলাফলে দেখা যায়, সম্পূর্ণভাবে সক্ষম বলছেন ৩২.১৭% ব্যক্তি, কিছুটা সক্ষম মনে করছেন ৪৮.৯৫%, সক্ষম নয় বলে মনে করেন ১৫.৩৮% এবং ৩.১৫% ব্যক্তি কোন মন্তব্য করেননি। মতামতগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, কিছুটা সক্ষম, সক্ষম নয় ও মন্তব্য নাই এই তিনটিকে এক সাথে যুক্ত করে ৬৭.৮৩% ব্যক্তি মনে করেন না সাইবার নিরাপত্তার আইনগুলি সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে এককভাবে সম্পূর্ণরুপে সক্ষম। উক্ত বিষয়টি নিম্নের চিত্রে তুলে ধরা হলো।

আপনি কি মনে করেন সাইবার নিরাপত্তার আইনগুলি সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম?			
হ্যাঁ, সম্পূর্ণভাবে সক্ষম	হ্যাঁ, কিছুটা সক্ষম	না, সক্ষম নয়	অন্যান্য-
৩২.১৭%	৪৮.৯৫%	১৫.৩৮%	৩.১৫%

টেবিল : ০৩

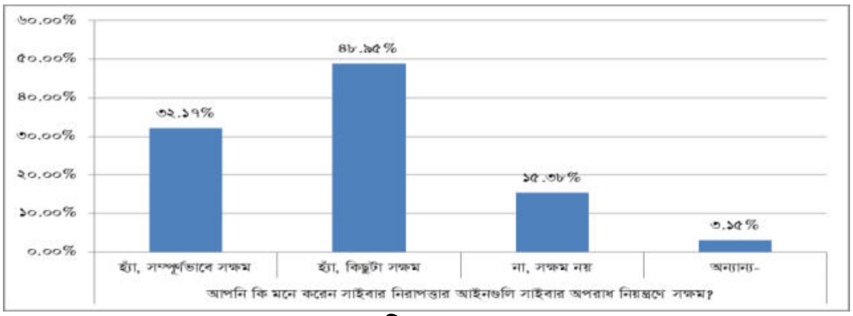

চিত্র: ০৩

জরিপের ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আইন ও বিধির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এখন দেখা যাক সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে নৈতিক মূল্যবোধ বা নৈতিক বিধি কতটুকু ও কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে।

উত্তরণের তৃতীয় ধাপ: নৈতিক বিধি

'আপনি কি মনে করেন সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে আইনের পাশাপাশি নৈতিক বিধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে?' এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখতে পাই ৫৬.৯৯% ব্যক্তি সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেছেন, ২৯.৭২% ব্যক্তি কিছুটা একমত পোষণ করেছেন, ৮.৭৪% ব্যক্তি প্রয়োগ সম্ভব নয় বলে মনে করেন এবং ৪.৫৫% ব্যক্তি কোনরূপ মন্তব্য প্রদান করেননি। অধিকাংশের মতামতটিই এক্ষেত্রে বিবেচ্য বলে আমরা মনে করছি। ফলাফল নিম্নরূপ-

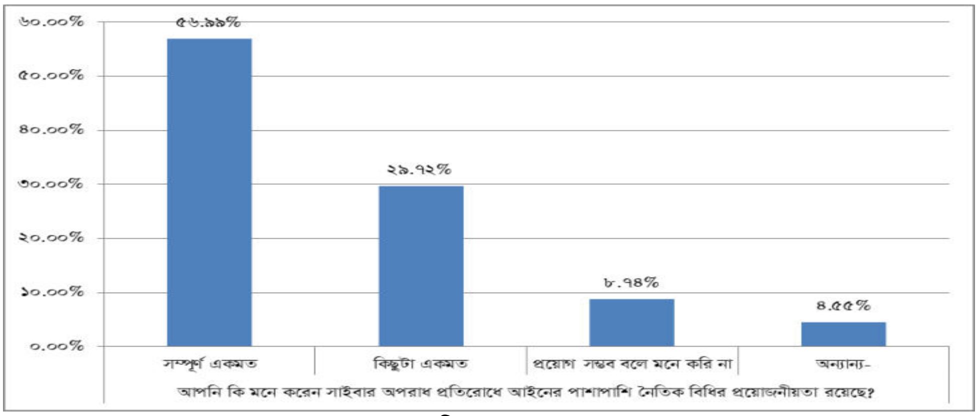

চিত্র: ০৪

আইন ও বিধির পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধই পারে সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতে। এই নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা পরিবার, সমাজ ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা শিখতে পারি। নতুবা প্রযুক্তিগত শিক্ষা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন কল্যাণে আসবে না। এছাড়াও সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আমরা নিম্নরূপ নৈতিক বিধি মেনে চলতে পারি। যেমন,

অন্যের ক্ষতি সাধনে ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার উচিত নয়; আমরা দৈনন্দিন কাজে কোন না কোন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করি। এই ডিভাইসগুলো অন্যের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার কাম্য নয়। সাধারণত অন্যের ক্ষতি করা কোন ধর্ম বা সমাজ বা রাষ্ট্র অনুমোদন করে না।

নিজ মালিকানা ব্যতীত কোন ডিভাইস বা ওয়েব সাইট হ্যাক করা অনুচিত; প্রত্যেকটি মানুষই তার কম্পিউটার, মোবাইলসহ বিভিন্ন ডিভাইসগুলো ব্যবহার করে প্রয়োজনেই। আবার ওয়েবসাইটগুলোতে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহার করে, আবার অনেকেই এর মাধ্যমে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে। এগুলো হ্যাক করলে বা চুরি করলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতির মধ্যে পড়ে। হ্যাকিং একটি মারাত্মক অনৈতিক ও অসামাজিক কাজ। এটি সমর্থনযোগ্য নয়। এরূপ কাজ যিনি করেন তাকে কোন বাধা প্রদান করা বা শাস্তি প্রদান করা অযৌক্তিক ও অন্যায় বলে গণ্য হবে না।

অন্যায়ভাবে আর্থিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে কোন ডিভাইস ব্যবহার উচিত নয়; অনেকে অন্যায়ভাবে আর্থিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে ডিভাইস ব্যবহার করে। এই ডিভাইস দিয়ে অন্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করে অর্থ চুরি করে। আবার কখনও কখনও ভাইরাস ফাইল তৈরি করে তথ্য চুরি করে এবং এই তথ্য ব্যবহার করে আর্থিক ক্ষতি করে। এরূপ কর্ম অন্যায়, কোন ধর্ম, সমাজ বা রাষ্ট্র তা অনুমোদন করে না। এর জন্য শাস্তি অযৌক্তিক নয়।

অন্যের সফটওয়্যার ডাউনলোড বা কপি বা পাইরেসি করা অনুচিত; যে কোন সফটওয়্যার হলো মেধাভিত্তিক পণ্য। ক্রয় বতিত যেকোন সফটওয়্যার ডাউনলোড বা কপি বা পাইরেসি করা উচিত নয়। এতে প্রস্তুতকারক ব্যক্তি বা কোম্পানি ক্ষতির মধ্যে পড়ে।

পর্নোগ্রাফি তৈরি ও প্রকাশ উচিত নয়; পর্নোগ্রাফি তৈরি ও প্রকাশ মানুষের অসুস্থ্য মানসিকতার পরিচায়ক। এগুলোর দ্বারা সমাজের বিশেষ করে অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ উভয়েই ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। সমগ্র সমাজের উপর একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। কাজেই, পর্নোগ্রাফি তৈরি ও প্রকাশ উচিত নয়।

মানুষ সাধারণত অপরাধ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এ কথা সাইবার অপরাধীদের জন্যও প্রযোজ্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো; স্বার্থবাদীতা কি নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? একটি গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারছি যে, যখন কোন ব্যক্তি কেবল স্বীয়স্বার্থের বিষয়টি সর্বোচ্চভাবে বিবেচনা করে কোন কাজ করে তখন অন্য সকলের ক্ষতি তো হয়ই, এমনকি সে নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই স্বার্থবাদী হওয়া উচিত নয়।[২২] আর স্বার্থবাদী না হলে মানুষ অন্যের ক্ষতি করার চিন্তাও করবে না। আবার ইমানুয়েল কান্টের নৈতিক বাধ্যবাধকতার (Moral Obligations) ধারণাটি সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণে নৈতিকবিধি প্রণয়নে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণীয় হতে পারে। যেখানে তিনি কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে কর্তব্যের ধারণাকে এনেছেন এবং কোন প্রত্যাশা না রেখে কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য পালনকে নৈতিক ভিত্তি বলেছেন। কান্টের নৈতিকতা আকারগত নীতিমূলক, নির্মোহ ও কর্তব্যবাদী। কান্টের নৈতিক চিন্তা জ্ঞানতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেখানে তিনি প্রজ্ঞাকে সকল ক্ষেত্রে পথনির্দেশক বলে মনে করেছে। এ কারণে কান্টের নীতিতত্ত্ব আবেগমূলক না হয়ে হয়েছে প্রজ্ঞামূলক।[২৩] কান্টের এই নৈতিক বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত ধারণাটি থেকে আমরা বলতে পারি প্রত্যেকটি মানুষের উচিত প্রজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত হওয়া ও নিজ কর্তব্য পালন করা এবং অন্যের ক্ষতিসাধন না করা।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, সম্পূর্ণভাবে সাইবার ক্রাইমমুক্ত সমাজ যদিও সম্ভব নয়, তবুও অপরাধকে নিয়ন্ত্রণে বা প্রতিরোধের জন্য উপর্যুক্ত তিনটি ধাপের ক্রমাগত চেষ্টা করা উচিত। বিশেষ করে যে সমাজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর অধিক নির্ভরশীল, সেখানে প্রযুক্তিগত অপরাধ বাড়তে বাধ্য এবং আইন প্রণেতাদেরও অনেক হিমশিম খেতে হয় নতুন নতুন আইন প্রণয়নে। এরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের প্রযুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো অনুধাবন ও সচেতনতার স্বার্থে প্রযুক্তিগত জ্ঞানার্জন আবশ্যক। তাই একদিকে যেমন রয়েছে ব্যবহারকারীর সচেতনতা এবং ইন্টারনেট বা নেটওয়ার্ক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার নিজ নিজ ভূমিকা পালন। তেমনি রয়েছে আইনী কর্তৃপক্ষের ভূমিকা পালন। তাছাড়া যেহেতু সাইবার অপরাধ কেবল আইনগত সমস্যা নয় বরং একটি মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক সমস্যা হিসেবে জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে আমরা পেয়েছি সেকারণে এই সমস্যার সমাধানে কেবল আইন যথেষ্ট নয়। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর মনস্তাত্ত্বিক সংকটগুলো চিহ্নিত করার জন্য আরো গবেষণা হওয়া উচিত। এবং নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য নৈতিক বিধির বাস্তবায়ন করা উচিত। জরিপে যেখানে ৫৬.৯৯% মতামত উঠে এসেছে আইনের পাশাপাশি নৈতিক বিধি প্রয়োগে সম্পূর্ণ একমত প্রকাশের এবং ২৯.৭২% নৈতিক বিধির প্রয়োজনীয়তার সাথে কিছুটা একমত হয়েছেন। কাজেই আমরা বলতে পারি ৮৬.৭১% মতামতই সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে আইনের পাশাপাশি নৈতিক বিধির প্রয়োজনীয়তার পক্ষে। নৈতিক বিধি প্রয়োগে পরিবার, সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়নের সুপারিশ এসেছে। কাজেই বলা যায়, সাইবার ক্রাইমকে টেকসইভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে প্রযুক্তিগত সুরক্ষা ও যথোপযুক্ত আইন এর পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধ বা নৈতিক বিধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

[1] Michael Cross, *Scene of the Cybercrime,* 2nd ed. (Burlington, USA: Syngress Publishing, Inc. 2008), p.2, ISBN 13:978-1-59749-276-8.

[2] https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-39498-0_12; date: 27.04.2020.
(1.Traditional forms of crime such as fraud or forgery, though committed over electronic communication networks and information systems; 2. The publication of illegal content over electronic media (e.g., child sexual abuse material or incitement to racial hatred; 3. Crimes unique to electronic networks, e.g., attacks against information systems, denial of service and hacking).

[3] Kulvinder Singh, 'Increment of Cyber Crimes against Our Securities', IJCEM International Journal of Computational Engineering & Management, Vol. 12, April 2011 ISSN (Online): 2230-7893, p.116. (1. Cyber-crimes in which computers are used as a tool to aid criminal activity such as producing false identifications, reproducing copyright materials, and many other things. 2. Cyber-crimes in which computers are used as a target, and probably a tool, to attack organizations in order to steal or damage information, attack banks to make unauthorized money transactions, steal credit card numbers, and many other activities.)

[4] Mohamed Chawki *et al*, *Cybercrime Digital Forensics and Jurisdiction* (Switzerland: Springer International Publishing, 2015), p.3.
(unlawful acts wherein the computer is either a tool or target or both.)

[5] Peter Norton, *Introduction to Computers,* 7th ed. (New Delhi: Tata McGraw-Hill education private ltd., 2012), pp.544-545.

[6] https://bangla.bdnews24.com/ctg/article1728518.bdnews; date: 21-03-2020.

[7] https://tunerpage.com/archives/311144; date: 12-06-19.

[8] https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1640070/, date:16-02-2020.

[9] http://web.dailyjanakantha.com/details/article/426526/, date: 14/06/2019.

[10] https://bn.m.wikipedia.org/wiki, date: 21.04.2020.

[11] https://www.prothomalo.com/economy/article/1597491/, date: 19-06-2019.

[12] https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1393541; date: 24-12-2017.

[13] *Ibid.*

[14] *Ibid.*

[15] Eugene H. Spafford, 'Computer Viruses--A Form of Artificial Life?', Department of Computer Science Technical Reports, 1990, Purdue University Press Journal, https://docs.lib.purdue.edu/cstech/837.

[16] Peter Norton, *Ibid*, p. 477.
(You are aware that cars are stolen every day, so you probably take measures such as locking the doors, parking in a garage, or using a car alarm. In the same way, you should be aware of the threats facing your computer and data, and take measures to protea them as well. By taking some precautionary steps, you can safeguard not only your hardware, software, and data, but yourself.)

[17] https://ictd.gov.bd/sites/default/files/files/ictd.portal.gov.bd/law/1257b936_b5c4_48be_834b_219487c3b1e7/ICT%20act-2006.pdf;date:18.02.2022.

[18] *Ibid.*

[19] https://ictd.gov.bd/sites/default/files/files/ictd.portal.gov.bd/law/4c430a79_b456_4e1b_9626_c060369e4aab/ICT%20act-2009.pdf; date: 18.02.2022.

[20] https://ictd.gov.bd/sites/default/files/files/ictd.portal.gov.bd/law/d5d28949_c63b_4d72_bee2_34db77becf44/ICT_Act_Amendment_2013.pdf; date: 18.02.2022.

[21] https://ictd.gov.bd/sites/default/files/files/ictd.portal.gov.bd/law/8bdd2ce4_e51f_4599_81cd_37d5175729de/Digital%20Security%20Act_2018.pdf; date: 20.02.2022.

[২২] মো. লুৎফর রহমান, "আমরা কেন আত্মবাদী হব না", অনুসন্ধিৎসা, হাসান আজিজুল হক (সম্পা.), দর্শন অ্যালামনই অ্যাসোসিয়েশন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ২০১৯, ৭৩-৮৬।

[23] Nabanita Deb Ghosh, "Kant's View on Moral Obligation" IRJMST, Vol 8, Issue 9, Year 2017, ISSN 2250-1959 (Online) 2348-9367).

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার দার্শনিক মূল্যায়ন
(A Philosophical Assessment of Higher Education in Bangladesh)

ড. মো. জাহিদুল ইসলাম*

Abstract: Education is the holder and bearer of past tradition. The history of higher education of Bangladesh is also based on tradition. In the context of time, higher education had come to this state after overcoming various obstacles. Especially from the British Period till now different commissions worked on higher education of Bangladesh. Many institutions have been developed for the students to acquire higher education and it's divided into several streams. There is an instruction for teaching method, curriculum and student's assessment for determining the goals of education. Higher education policy is so important to survive in global competition. The quality of higher education in Bangladesh has been fallen due to many difficulties. That is to say higher education is full of many crises. To analyse the role of philosophical thought is so needed to overcome those husdles. To analysing pragmatist educational thought may play an important role to solve this situation. Pragmatist say-education would be learners' ability oriented. There is no need to impose burden for talents to take part an ill competitions. Education would be effective when the learners may learn with their self activeness and there is an equal opportunity for all in that educational system. Freedom of learners is foremost for doing novel work. Emphasizing the above matters may resolve the crisis of higher education of Bangladesh.

ভূমিকা

মানুষ নিজের চিন্তা ও অভিজ্ঞতাকে অন্যের সাথে বিনিময় করতে চায়। সভ্যতার আদি থেকেই এই প্রক্রিয়া বিদ্যমান আছে এবং এর মাধ্যমে মানুষ শিখে থাকে। পর্যায়ক্রমে মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষালাভের আগ্রহীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। শুধু জীবনকে পরিচালনার জন্য নয় বরং নিজেকে সকল পরিস্থিতির সাথে অভিযোজন করার সক্ষমতা শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয়। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা দেশের উন্নয়নের জন্য খুবই জরুরী। আয়তনে বাংলাদেশ একটা ছোট দেশ হলেও এর ইতিহাস-ঐতিহ্য বেশ তাৎপর্যময়। দেশের ঐতিহ্যের সাথে সাথে বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসও নানা ঘটনা প্রবাহে আবর্তিত। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা বাংলাদেশের শিক্ষাকাঠামোর সর্বোচ্চ পর্যায়। শিক্ষার্থীরা যাতে সহজেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং সেগুলো বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত। এই ধারাগুলো নানা পরিবর্তন ও পরিমার্জন হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে উচ্চশিক্ষার প্রেক্ষাপটের সাথে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার সম্পর্ক আছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর উচ্চশিক্ষার প্রসারতা আরও বেড়ে যায়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কোনো কমিশনই নানা অসুবিধার কারণে তাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে শিক্ষার গুণগত মান বজায় থাকছে না। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীর আগ্রহের ঘাটতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর দুর্বলতা, পরিকল্পনাবিহীন শিক্ষণপদ্ধতি, মূল্যায়ন ও পরীক্ষণ পদ্ধতির ত্রুটি, জীবনের সাথে সম্পর্কবিহীন পাঠ্যক্রম, মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় অনীহা প্রভৃতি কারণে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে একটি দেশের অগ্রগতি সেই দেশের উচ্চশিক্ষার উপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিভিন্নভাবে

---

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার মূল্যায়ন নিয়ে পূর্বে গবেষণা হয়েছে তা আমার জানা নেই। কাজেই প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেই আজকে উপরিউক্ত শিরোনাম নির্বাচন করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে নিম্নোক্ত কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় যা উচ্চশিক্ষাকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সহজেই মূল্যায়ন করা যাবে। যেমন-

১. বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার প্রেক্ষাপট কী?
২. বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা বলতে কী বোঝায়?
৩. বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার বর্তমান কাঠামো কী?
৪. বাংলাদেশে বর্তমান উচ্চশিক্ষা কাঠামোতে কী কী সমস্যা / প্রতিবন্ধকতা আছে?
৫. বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার প্রতিবন্ধকতা নিরসনে দার্শনিক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

পৃথিবীর যে দেশ যত উন্নত সে দেশের উচ্চশিক্ষার হার তত বেশি। কারণ উচ্চশিক্ষায় গবেষণাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। গবেষণা মানেই নতুন জ্ঞানের অনুসন্ধান এবং পুরাতনকে আরও যুগোপযোগী করা। আলোচ্য প্রবন্ধের দার্শনিক মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তা যেমন-ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, জড়বাদ, অস্তিত্ববাদ ও প্রয়োগবাদের মধ্যে প্রায়োগিক চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হবে। কারণ তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার সাথে প্রায়োগিক শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা বেশি। বিশেষত; বিখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক জন ডিউঈ-এর শিক্ষাচিন্তার আলোকে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার প্রায়োগিকতা বিচার করার চেষ্টা করা হবে। তাঁর ভাষায়-শিক্ষা হবে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যকেন্দ্রিক। জোর করে পুস্তক-এর বোঝা চাপিয়ে দিয়ে অসুস্থ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের দরকার নেই। শিক্ষা তখনই সার্থক হবে যখন শিক্ষার্থী তার সক্রিয়তা দিয়ে কাজ করতে পারবে এবং শিক্ষাব্যবস্থায় সকলের জন্য সমান সুযোগ বিদ্যমান থাকবে। শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা শিক্ষার্থীকে নতুন কিছু করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিবে। বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে চাইলে উচ্চশিক্ষার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। সেদিক থেকে বাংলাদেশ ব্যতিক্রম নয়। এজন্য বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষাকে প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মধ্যেই গবেষণার সার্থকতা নিহিত।

উচ্চশিক্ষার প্রেক্ষাপট

একটি দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি ঐ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। বিশেষত; সুশিক্ষিত আত্মমর্যাদাশীল উন্নত জাতি গঠনে উচ্চশিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। এদিক থেকে বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নয়। আজকে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার গোড়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রাচীন ধ্যান-ধারনার সাথে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা বেদনির্ভর শিক্ষার ধারা খুঁজে পাওয়া যায়। ঋষিরা এই বেদনির্ভর শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব পালন করতেন।[১] এজন্য ঋষিদের আদি গুরু বলা হতো। ঐ সময় শিক্ষার্থীদের গুরুর নিকট সমর্পণ করা হতো। শিক্ষার্থীরা গুরুকে উপঢৌকন হিসাবে নানা জিনিস দিতো বলে তথ্য পাওয়া যায়। গুরুরা শিক্ষাদানকালে শিষ্যের জন্য আশীর্বাদ করতেন এভাবে-

> তুমি ব্রহ্মচারী, তুমি পরিশ্রমী হও, অধ্যবসায় তোমার জীবনে ব্রত হউক। দিবানিদ্রা যাইও না। গুরুর কাছে বেদ শিক্ষা কর। স্নান, আহার, নিদ্রা ও জাগরণে আধিক্য দেখাইওনা। পরনিন্দা, ঈর্ষা, লোভ, ভয়, দুঃখ পরিহার কর। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ কর এবং গাঢ় চিন্তায় নিজেকে নিযুক্ত রাখ। মদ্য, মাংস বা উত্তেজক দ্রব্য গ্রহণ করিও না।[২]

এরপর বর্ণপ্রথা শিক্ষার্থীদের শিক্ষণপ্রক্রিয়ায় বিভাজন সৃষ্টি করে। অন্যান্য বর্ণের চেয়ে ব্রাহ্মণরা বেশি সুযোগ-সুবিধা পেতো। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা শুধু ব্রাহ্মণরাই গ্রহণ করতে পারতো। পরবর্তীতে বৌদ্ধ রাজাদের সহযোগিতায় পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণসহ লানন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয় যেখানে বাংলাদেশীরাও শিক্ষাগ্রহণে আসতো। যেমন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে হিউয়েন সাঙ-এর অধ্যাপকদের মধ্যে বাঙালী পন্ডিত শীলভদ্রও ছিলেন যিনি কুমিল্লা থেকে এসেছিলেন।[৩] এসময় সংঘারাম বা বিহার ছিল শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। এরই প্রভাবে বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহারগুলিও শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে এগিয়ে

নিয়ে যায়। "তবে এখানে যে শুধু বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রই পাঠ করা হতো তা নয়, বরং ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, চতুর্বেদ, সাংখ্য, সংগীত ও চিত্রকলা, মহাযান শাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন দিকও বৌদ্ধ শ্রমণদের অধিতব্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল।"[৪] এই শিক্ষা প্রক্রিয়ায় গুরু-শিষ্যের ভক্তি-শ্রদ্ধাবোধ কাজ করতো। বিশেষ করে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁর পান্ডিত্যে গভীর আস্থা যেমন ছাত্রকে শিক্ষকের প্রতি আকৃষ্ট করতো, তেমনি শিক্ষকও নিজ অন্তরের স্নেহ মমতায় ছাত্রকে অভিষিক্ত করে কাছে টেনে নিতেন।[৫]

মুসলিম শাসনামলে ধর্মীয় আদর্শের আলোকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। যেমন মক্তব, মাদ্রাসা, টোল বা চতুস্পাঠী ও পাঠশালা। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ফারসি ভাষা আয়ত্ত করে, যেহেতু ফারসি রাষ্ট্রভাষা ছিল। সাহিত্য, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলিম শাসকদের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। যেমন মুসলিম শাসক আলাউদ্দীন হোসেন শাহ-এর শাসনামল স্বর্ণযুগ বলে খ্যাত। তাঁর সময়ে সকলের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যপীর নামে একটা কৃষ্টি প্রথা প্রচলন করেন যেখানে সবার অংশগ্রহণ ছিল উন্মুক্ত। এছাড়া তাঁর সময়ে রাজশাহীর বাঘা মসজিদ ও গৌড়ের (বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ) ছোট সোনা মসজিদ নির্মিত হয়। ইতিহাসে সম্রাট বাবর-এর অবদান অতুলনীয়। বিশেষত; বাবরের আত্মজীবনী অনবদ্য জীবন আলেখ্য। আকবরের রাজত্বকালে ধর্মীয় সহিষ্ণু পরিবেশ বিরাজমান ছিল। তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের জন্য একই প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করেন। দিন-ই-এলাহী প্রবর্তন করে বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেন। এরপর সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব প্রমুখের সহায়তায় শিক্ষা-দীক্ষার বহু ইতিবাচক নানা কর্মকাণ্ড মুসলিম শাসনামলের ভিত্তিকে মজবুত করে। এরপর ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশদের আগমন ঘটে এবং তাদের চিন্তাধারার শিক্ষা পরিক্রমা প্রসার লাভ করে।

ইংরেজরা ভারতীয় উপমহাদেশে বিচরণের সাথে সাথে দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে-কোনোভাবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে করায়ত্ত করা। এরই ধারাবাহিকতায় তাদের প্রয়োজন সিদ্ধ করবে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে থাকে। যেমন ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা ও জোনাথান ডানকান ১৭৯১ সালে বারাণসী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।[৬] তাছাড়া ইংরেজি শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়ায় ইংরেজি শেখার গুরুত্ব বেড়ে যায়। যেমন-"মিশনারিগণ ছাড়াও রাজা রামমোহন রায়-এর মতো কিছু জ্ঞানদীপ্ত ভারতীয় ছিলেন যাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতীয়দেরকে ইংরেজি শিক্ষা দিতেই হবে।"[৭] লর্ড মেকলে ইংরেজি মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার ধারক ও বাহক ছিলেন। তিনি এই শিক্ষার মাধ্যমে সুবিধাভোগী একটা শ্রেণির পক্ষ নিয়েছিলেন। শিক্ষা সম্পর্কে চুঁইয়ানামা নীতি নামে একটি মতবাদ প্রেরণ করেন যার উদ্দেশ্য থাকবে এদেশের স্বল্প সংখ্যক লোককে শিক্ষিত করে পরবর্তীতে তাদের দ্বারা ভারতবর্ষের সকল লোককে শিক্ষিত করা। কারণ একইসাথে সমগ্র ভারতবাসীকে শিক্ষিত করা সম্ভব নয়। বাস্তবিক অর্থে উডের ডেসপ্যাচ এদেশবাসীকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত করার পথ আবিষ্কার করে। এতে উচ্চশিক্ষার দ্বার আরও প্রসারিত হয়। এজন্য ঐতিহাসিক জেমস এই ডেসপ্যাচকে "ম্যাগনা কার্টা" বলে আখ্যায়িত করেছেন। পরবর্তীতে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে বেশ কিছু কমিশন ও আইন প্রণীত হয় যা শিক্ষার প্রসারতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তানের অংশীদার হয়। নানাক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করা হয়। ১৯৪৯ সালে আকরাম খানকে সভাপতি করে পূর্ববঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি আলোর মুখ না দেখায় পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন ১৯৫৭ গঠন করা হয়। এরপর ১৯৫৮ সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীর দাবীর মুখে সরকার ১৯৬৬ সালে ছাত্র সমস্যা ও কল্যাণ সম্পর্কীয় কমিশন গঠন করতে বাধ্য হয়। এরপর নয়া শিক্ষানীতি ১৯৬৯ গঠন করা হয় যা ১৯৭০ সালে চূড়ান্ত নয়া শিক্ষানীতিতে রূপ নেয়। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বাঙালী জাতিকে নানাক্ষেত্রে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এরমধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল অন্যতম। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধান রচিত হয়। এই সংবিধানের বেশ কিছু ধারায় দেশের জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে নানা নির্দেশনা পরিলক্ষিত হয়। যেমন ধারা ১৭ এর[৮]

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৮ এর ৩ ধারায় বলা হয়েছে[৯]

কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী প্রজন্মকে নৈতিক মূল্যবোধ, জাতীয় ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে 'কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন'[১০] গঠন করা হয়েছিল। বাংলাদেশের নতুন প্রণীত সংবিধানের[১১] মৌলিক বিষয় যাতে প্রতিফলিত হয় সেজন্য উক্ত কমিশন আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৪ বছরের সম্মান ডিগ্রি এবং ১ বছরের মাস্টার্স কোর্সের সুপারিশ করা হয়।[১২] কিন্তু কালের বিবর্তে বিভিন্ন সময়ের সরকার দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে নিজ নিজ দৃষ্টিকোন থেকে চিন্তাভাবনা করে ও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়।[১৩] ফলে কুদরাত-এ-খুদা প্রণীত শিক্ষানীতি আর বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তীতে জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরী-এর নেতৃত্বে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০'[১৪] প্রণয়ন করা হয় যেখানে শিক্ষার লক্ষ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে-

> মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির (যেমন : ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক-চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎজীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।[১৫]

বিশ্বায়নের এই যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন প্রত্যেক জেলার শিক্ষার্থীরা যাতে নিজ জেলা থেকেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য প্রত্যেক জেলাতেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে। সাধারণত দ্বাদশ শ্রেণির পরবর্তী শিক্ষাই হলো উচ্চশিক্ষা। দেশের অনুমোদিত যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন, নতুন ভাবনার উদয় ও দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সহায়ক হিসাবে কাজ করে। তবে উচ্চশিক্ষা শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ততার উপর নির্ভর করে। কারণ উচ্চশিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। উচ্চশিক্ষা হলো স্বাধীন মত প্রকাশের জায়গা যেখানে শিক্ষার্থীরা অধিকতর মনোনিবেশের মাধ্যমে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে পারে। এই পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের জায়গা তৈরি হয় যেখান থেকে নতুন উদ্ভাবনী ক্ষমতা জাগ্রত হয়। কারণ শিক্ষার লক্ষ্যে বলা হয়েছে-

> আধুনিক সমাজের অগ্রগতি উচ্চশিক্ষার প্রকৃতি ও মানের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কারণ উচ্চশিক্ষার ভূমিকা হচ্ছে ঃ (ক) বিভিন্ন উচ্চতর কাজের জন্য সুনিপুণ, জ্ঞানদক্ষ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তৈরি করা, (খ) এমন শিক্ষিত গোষ্ঠী সৃষ্টি করা যাঁদের কর্মানুরাগ, জ্ঞানস্পৃহা, চিন্তার স্বাধীনতা, ন্যায়বোধ ও মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়েছে (গ) গবেষণার

মাধ্যমে জ্ঞানের নবদিগন্ত উন্মোচন করা এবং (ঘ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ ও সমাধানের পন্থা নির্দেশ করা।[১৬]

উপরিউক্ত বিষয় ছাড়াও "জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক উদারনৈতিক মানবমুখী, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী নাগরিক সৃষ্টি করাই উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য।"[১৭]

শিক্ষণপদ্ধতি

শ্রেণিতে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাকে শিক্ষণপদ্ধতি বা কৌশল বলা হয়। শিক্ষার সার্থকতা শিক্ষণপদ্ধতির উপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের শিক্ষাকাঠামোয় বিভিন্ন শিক্ষণপদ্ধতির মধ্যে বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি বেশি অনুসরণ করা হয়। এখানে শিক্ষক তাঁর সমস্ত মেধা ও শ্রম দিয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনকে আনন্দদায়ক করে তোলেন। যে-কোনো বিষয় যাতে শিক্ষার্থীরা সহজভাবে উপলব্ধি করতে পারে তা বিবেচনা করা একজন শিক্ষকের দায়িত্ব। তিনি বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে যত সহজভাবে শিক্ষার্থীদের নিকট তা আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সেদিকে মনোযোগ দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে শিক্ষকের উপস্থাপিত বিষয়কে শিক্ষার্থীর মনোযোগের সাথে শেখার আগ্রহও থাকতে হয়। কেননা উভয়পক্ষের সহযোগিতায় নতুন জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আবার শেখানোর কৌশলের কারণেও অনেক জটিল বিষয় সহজতর মনে হয়। যেমন "আমরা এখনও অনেক শিক্ষকের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি ব্যক্তি মানুষটির জন্য নয়, পড়ানোর কৌশলের জন্য, যা আমাদের বিবেকবোধ, আবেগ, অনুভূতিতে ব্যাপক নাড়া দেয়।"[১৮] তাই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ শিক্ষণপদ্ধতির ক্ষেত্রে উল্লেখ আছে-শিশুর সৃজনশীল চিন্তা ও দক্ষতার প্রসারের জন্য সক্রিয় শিক্ষণ-পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীকে এককভাবে বা দলগতভাবে কার্য সম্পাদনের সুযোগ দেওয়া হবে। ফলপ্রসূ শিক্ষাদান পদ্ধতি উদ্ভাবন, পরীক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা উৎসাহিত করা হবে এবং সেজন্য সহায়তা দেওয়া হবে।[১৯]

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা কাঠামোতে বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যক্রম নির্ধারিত আছে। পাঠ্যক্রম অনবরত পরিবর্তনশীল। কারণ মানুষের জানার সীমা-পরিসীমা নেই। অনবরত নতুন জানার বিষয় আবির্ভূত হচ্ছে এবং সেগুলো পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুর উপরই শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন নির্ভর করে। একটি দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সে দেশের শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে প্রভাবিত করে। এজন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বলা হয়েছে-একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় তাই পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষাক্রমে এগুলোর প্রতিফলন সুনিশ্চিত করা হবে।[২০] বাস্তবিক অর্থে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু মুখস্থকরণের পরিবর্তে বিশ্লেষণ করার জন্য আগ্রহী করা হয়। কারণ উচ্চশিক্ষা হলো গবেষণাধর্মী শিক্ষা। এই শিক্ষায় শিক্ষার্থী যত নিজেকে বিকশিত করতে পারবে তত সে বিষয়ের প্রতি তার জ্ঞানের গভীরতা আরও বৃদ্ধি পাবে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞান যাতে সৃজনশীলতা ও মুক্তচিন্তা উৎসাহিত করে এবং নতুন নতুন গবেষণা কাজে উদ্বুদ্ধ করে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সাবলীলভাবে এগিয়ে যেতে পারে সেই লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করা হবে।[২১] আর এই পুনর্বিন্যাসের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক দরকার যারা হবেন উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। শিক্ষার উচ্চ পর্যায়েও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ-

> "সুশিক্ষা ও মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক। শিক্ষকের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য একদিকে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা, অন্যদিকে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক-শিক্ষা এবং চাহিদাভিত্তিক যুগপোযোগী পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন করা।"[২২]

শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন

প্রথমত মূল্যায়ন হলো একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষাব্যবস্থায় কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা নিরূপন করা। বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য শিক্ষার্থীরা কোন বিষয় বোঝার চেয়ে মুখস্থকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ফলে নামমাত্র ভালো ফল পেয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ উল্লেখ আছে,

> প্রচলিত পদ্ধতিতে মূলতঃ মুখস্থবিদ্যা মূল্যায়িত হয়। এটি প্রকৃত মূল্যায়ন হতে পারে না। আসলে মুখস্থবিদ্যা নয় বরং বিষয়বস্তুকে কতটুকু আত্মস্থ করা হয়েছে তার মূল্যায়ন করা গেলেই শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়ন করা হবে। বর্তমানে যে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে সেটি আত্মস্থ করা বিদ্যা মূল্যায়নের একটি প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগ নির্ভর করবে উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল রেখে যথাযথ পাঠ্যপুস্তক, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করা এবং প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের তা যথাযথভাবে বুঝতে পারার ওপর। কাজেই যথাযথ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, নিয়ম-কানুন নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সচেতনতা ও জ্ঞান সৃষ্টি করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।[২৩]

বাংলাদেশে প্রচলিত উচ্চশিক্ষা কাঠামো

বাংলাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক বা অনুমোদিত সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। বর্তমানে উচ্চশিক্ষা বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত হয়। যেমন-সাধারণ শিক্ষা, প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা। মূলত শিক্ষার্থীরা দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করে। এর একটি হলো বিশ্ববিদ্যালয় এবং অপরটি হলো কলেজ বা ইনস্টিটিউট। বিশ্ববিদ্যালয় হলো জ্ঞান অর্জন ও গবেষণার জন্য সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৮টি[২৪] সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যৌথ সহযোগিতায় নতুন নতুন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় যেখান থেকে দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই বলা হয়-

> এই প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিশ্বের জ্ঞানভান্ডার চর্চা ও লেনদেনের বিষয়, এর নাম বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের সীমার মধ্যেও আন্তর্জাতিক চরিত্রের। জ্ঞানের যেমন সীমানা নেই তেমনি সে অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রচলিত কোনো অর্থে সীমাবদ্ধ করা যায় না এবং মানুষের চিন্তাকে যেহেতু আটকানো যায় না, পাঁচিল দেওয়া যায় না, তাই এই স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজন।[২৫]

উপরিউক্ত ১৮টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪ টি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। একটি রাষ্ট্রের সফলতা অনেকখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাধর্মী জ্ঞানচর্চার উপর নির্ভর করে। এ প্রসঙ্গে হেনরি নিউম্যানের বক্তব্য গুরুত্বের দাবীদার। তাঁর ভাষায়,

> That it is a place of teaching universal knowledge. This implies that its object is, on the one hand, intellectual, not moral; and on the other, that it is the diffusion and extension of knowledge rather than the advancement. If its object were scientific and philosophical discovery, I do not see why a University should have student; if religious training, I do not see how it can be seat of literature and science. Such is a University in its essence, and independently of its relation to the Church.[26]

কৃষি শিক্ষা

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশের অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। এজন্য বাংলাদেশের শিক্ষাকাঠামোয় ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত কৃষি শিক্ষা পড়ানো হয়। উচ্চশিক্ষায় কৃষিকে প্রাধান্য দিয়ে ১০টি[২৭] কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অনেক সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়েও কৃষি বিষয়ে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান থেকেও কৃষি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। তাই ২০১০ এর জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে,

কৃষি উন্নয়ন বলতে বোঝায় দেশের শস্য, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও বনসম্পদের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা। উচ্চতর কৃষিশিক্ষা বলতে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, কৃষি, ভেটেরিনারি, পশুপালন, কৃষি প্রকৌশল, কৃষি অর্থনীতি ও মৎস্য বিজ্ঞানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডক্টরাল পর্যায়ে অধ্যয়ন ও উচ্চতর গবেষণা বোঝায়।[২৮]

প্রকৌশল শিক্ষা

প্রকৌশল শিক্ষা বর্তমান শিক্ষাধারায় অন্যতম শাখা। প্রকৌশল শাখায় জ্ঞান অর্জনের জন্য বুয়েটসহ ৫টি[২৯] বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। প্রতি বছর এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৌশলী বের হচ্ছে যারা দেশ বিদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। দেশের সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীরাই এখানে ভর্তি হয়। এছাড়া কিছু অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখান থেকে প্রকৌশল শিক্ষা লাভ করা যায়। এই শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা গুরুত্বপূর্ণ-সমাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন, বাস্তবধর্মী, দক্ষ প্রকৌশলী ও কারিগরি জনশক্তি গড়ে তোলা যাতে তারা দেশের উন্নয়নে, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে, দারিদ্র দূরীকরণে এবং সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে পারেন।[৩০]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা

বিশ্ব প্রতিযোগিতায় প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। এই দুর্বলতাকে হ্রাস করার জন্য এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জ্ঞানকে জনগণের মাঝে প্রসারিত করার জন্য ১৭টি[৩১] বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের যুগে দক্ষ ও মেধাবী জাতি গঠনে প্রযুক্তি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিকিৎসা শিক্ষা

চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন বর্তমান শিক্ষার আরেকটি ধারা। সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসা শিক্ষা লাভ করা যায়। ইদানিং মানুষ নতুন নতুন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং দেশের অধিক জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার জন্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে। গবেষণায় দেখা যায়-মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি করা দরকার এবং দেশে এখন ৫টি[৩২] মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করে যাচ্ছে।

বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাকাঠামোয় বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার জন্য ৩টি[৩৩] বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় (যেমন বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়) স্থাপিত হয়েছে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব কারিকুলামে শিক্ষা দিয়ে থাকে। এখানকার শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সহায়তা করছে।

কেন্দ্রীয়ভাবে সংযুক্ত বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে বর্তমান শিক্ষাকাঠামোয় কেন্দ্রীয়ভাবে সংযুক্ত বিশেষ ৩টি[৩৪] বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। যেমন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য খুব বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চশিক্ষা নেওয়ার সুযোগ ছিল। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।"[৩৫] অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সারা দেশের কলেজগুলোর মধ্যে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে। সারাদেশে কাজের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় প্রত্যেক বিভাগীয় শহরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা অফিস চালু আছে। জাতীয় বিশ্বদ্যিালয়ের অধিকাংশ কার্যক্রম এখন অনলাইনে করার ব্যবস্থা আছে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বিশেষ একটা প্রেক্ষাপটে ১৯৯২ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মূল ধারার শিক্ষার সাথে অনেকেই নানা কারণে এগিয়ে যেতে পারে না। ফলে শিক্ষাজীবন সেখানেই স্থবির হয়ে পড়ে। দেখা দেয় অনিশ্চয়তা এবং আর্থিক নানা টানাপোড়েন। অনেকেই জীবনজীবিকার তাগিদে কোন না কোন পেশায় নিয়োজিত হয়। এ কারণে জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়। এই বঞ্চিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য দূরশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সমাজের এই অবহেলিত অংশকে আলোকিত করা যায়। সমাজের অনগ্রসর গোষ্ঠীর সদস্যরা যাতে উচ্চশিক্ষা লাভে পিছিয়ে না থাকে সেক্ষেত্রে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যেহেতু এই শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বয়সী শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের সুযোগ পায় তাই নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে তাদের শিক্ষণপ্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা হয়। এই শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ উল্লেখ আছে-উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টেলিভিশনে সুবিধাজনক কোনো চ্যানেলে–যেমন বিটিভিতে দ্বিতীয় চ্যানেলে–অধিকতর সময় বরাদ্দ, রেডিও ট্রান্সমিশন এবং মাল্টি ইনফরমেশন সিস্টেম চালু করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।[৩৬]

ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে প্রচলিত মাদ্‌রাসা শিক্ষাধারায় শিক্ষার্থীরা ইসলামের ধারায় জীবনযাপন করার সুযোগ লাভ করে। এই শিক্ষার লক্ষ্য-শিক্ষার্থীরা এমনভাবে তৈরি হবে যেন তারা ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী ভাল করে জানে ও বোঝে, সে অনুসারে নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই আদর্শ ও মূলনীতির প্রতিফলন ঘটায়।[৩৭] শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়-অনেক আগে থেকেই মক্তব বা মাদ্‌রাসা শিক্ষাধারা প্রচলিত ছিল। আজকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এই শিক্ষাধারার নানা বিষয়ে পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে। বর্তমানে আলিয়া ও কওমী মাদ্‌রাসা নামে দুটি শিক্ষাধারা বিদ্যমান। আলিয়া মাদরাসায় এবতেদায়ি, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল এই পাঁচটি ধাপে শিক্ষাকার্যক্রম চলমান। এরমধ্যে এবতেদায়ি, দাখিল ও আলিম মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সমস্ত মাদরাসার অনুমোদন ও বাতিল, পাঠ্যক্রম, শিক্ষণপদ্ধতি, পরীক্ষা গ্রহণ, সনদ প্রদান প্রভৃতি কাজ মাদ্‌রাসা বোর্ড করে থাকে। মাদ্‌রাসা শিক্ষার ফাযিল ও কামিল বর্তমানে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-এর অধীনে পরিচালিত হয় (যদিও কিছুদিন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া নিয়ন্ত্রণ করতো)। মাদ্‌রাসা শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষা সমমান করায় আইনত অনেক জটিলতা হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে কওমী মাদরাসা, মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার মাদ্‌রাসা শিক্ষার কওমী ধারার সর্বোচ্চ ডিগ্রিকে সাধারণ শিক্ষাধারার মাস্টার্স-এর সমমান করায় এই ধারার শিক্ষার্থীরা চাকুরীক্ষেত্রে নানা সুবিধা পাচ্ছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ হলেও এর জনসংখ্যা অনেক বেশি। এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে উচ্চশিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য প্রয়োজন মাফিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই। এই প্রয়োজনীয়তাকে আমলে নিয়ে সরকার দেশের বিভিন্ন জায়গায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি দিয়েছে এবং এ যাবৎ ৯২টি[৩৮] বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলমান। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলে অনেকেই উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়েছে এবং কেউ কেউ আবার ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করছে। অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়

নিম্নোক্ত দুটি বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়[৩৯] হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। যেমন-

ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু মুসলিম শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার সুযোগ লাভ করে। এই বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সরকার থেকে অর্থ বরাদ্দ পায়না এবং সরকারি বিধিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। বরং অনেকটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বেসরকারি পরিচালনা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু নারী শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার সুযোগ পায়।

এম.ফিল ও পি-এইচ.ডি. প্রোগ্রাম

উচ্চশিক্ষায় গবেষণাধর্মী কাজের প্রতিফলনস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় এম.ফিল ও পি-এইচ.ডি. ডিগ্রি প্রদান করে থাকে। এটা উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রি। বর্তমানে এম.ফিল ও পি-এইচ.ডি. প্রোগ্রাম বাংলাদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু আছে। মূলত,

> মাস্টার্স, এম.ফিল বা পি.এইচ.ডি-কে বিশেষায়িত শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং শুধুমাত্র গবেষণা ও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষকতা করতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদেরকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করতে হবে। গবেষণা নিশ্চিত করার জন্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগে পর্যায়ক্রমে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম চালু করে সেখানে নিয়মিতভাবে মাস্টার্স, এম.ফিল ও পি.এইচ.ডি ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। সাধারণত মাস্টার্স এক বছরের, এম.ফিল দু বছরের এবং পি.এইচ.ডি রেজিস্ট্রেশনের সময় হতে ছয় বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে।[৪০]

গবেষণা মানেই নতুন জ্ঞানের অনুসন্ধান অথবা যে কোন বিষয়ের পুরাতন ধারণাকে শাণিত করা। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার উপর নির্ভর করে এবং গবেষণাকে কেন্দ্র করেই দেশের সফলতা-ব্যর্থতা নিরূপিত হয়।

আইন শিক্ষা

আইনের চোখে সবাই সমান। এখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমান অধিকার ভোগ করবে-এটাই আইন শিক্ষার মর্মবাণী। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শিক্ষার সুযোগ আছে। এই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আইন শিক্ষা দেশের জন্য অপরিহার্য। তাই-ভবিষ্যত প্রজন্মের আইন শিক্ষার্থীরা যাতে আইনের শাসন, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে এবং দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখতে পারে সেলক্ষ্যে আইন শিক্ষাকে অধিকতর বিশ্লেষণধর্মী ও প্রয়োগমুখী করা হবে।[৪১]

নারী শিক্ষা

বাংলাদেশে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। নারীদের সম্পর্কে অতীতে এমন কথা প্রচলিত ছিল যে, নারীরা পুরুষদের সাহায্য করার জন্য বাড়ীতে অবস্থান করবে। আজকে প্রতিযোগিতার যুগে নারীরা এই শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলেছে। প্রায় সকল কাজে নারীরা অনেক এগিয়ে গেছে। বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীরা তাদের মেধার স্বাক্ষর রাখছে। এমনকি উচ্চশিক্ষায়ও তাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। তাই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ বলা হয়েছে,

> অধিক সংখ্যক মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনা হবে এবং তাদের প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা/পেশাদারি শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে এবং এ বিষয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।[৪২]

ক্রীড়া শিক্ষা

মানুষের মৌলিক চাহিদা হলো-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। স্বাভাবিক বিকাশের জন্য মানুষের মৌলিক চাহিদার পাশাপাশি শরীরচর্চা আবশ্যক। কেননা শরীরের প্রশান্তি শিক্ষার্থীকে শিক্ষালাভে আগ্রহী

করে তোলে। আজকে প্রয়োজনের তাগিদেই উচ্চশিক্ষায় শারীরিক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ- ছাত্র-ছাত্রীসহ তরুণতরুণীদের পূর্ণ বিকাশে শরীরচর্চা ও ক্রীড়ার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।"[৪৩]

বাংলাদেশে বর্তমান উচ্চশিক্ষা কাঠামোতে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষার্থী থাকবে স্বাধীন। অথচ অভিভাবকসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থীকে চাপের মধ্যে রেখে বিষয়বস্তু বোঝার আগেই মুখস্থ করে ভালো ফল করতে বাধ্য করে। ফলে তার দ্বারা নতুন কিছু সৃষ্টি করা কঠিন হয়ে পড়ে। একারণে বর্তমান কাঠামোয় উচ্চশিক্ষার আসল উদ্দেশ্য বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। কেননা "শিক্ষার্থীর রুচি, পছন্দপ্রবণতা নিরপেক্ষ অভিন্ন এক শিক্ষা সবার উপরে চাপিয়ে দেয়া আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার এক বড় ক্রুটি।"[৪৪] অন্যদিকে অবকাঠামোর স্বল্পতার কারণেও উচ্চশিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে। একথা আকমলও স্বীকার করেছেন-"বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশতেই, পর্যাপ্ত জনবল, সুযোগ-সুবিধা ও অবকাঠামো পর্যন্ত নেই।"[৪৫] এর কারণ হলো সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব। তাই শহিদুল ইসলাম বলেন- "আমাদের দেশের শিক্ষা এতটাই পশ্চাদমুখী ও অগণতান্ত্রিক যে তা সমাজের বোঝা বাড়িয়ে চলেছে।"[৪৬] এর সাথে সাথে শিক্ষণপদ্ধতি শিক্ষার্থীবান্ধব নয় বলে দিনদিন শিক্ষা নিম্নমুখী হচ্ছে। শিক্ষার্থীর পছন্দকে গুরুত্ব না দিয়ে পুস্তক-এর বোঝা চাপিয়ে দিয়ে প্রতিভা বিকশিত হওয়ার সুযোগ নষ্ট করা হচ্ছে। ফলে তারা সৃজনশীল কাজে মনোযোগী হতে পারছে না। ফলে দেখা দিচ্ছে হতাশা ও বিশৃঙ্খলা।

শিক্ষাদান কার্যকে ত্বরান্বিত করার জন্য শিক্ষকের ভূমিকা অনন্য। কিন্তু মেধাবীরা বর্তমানে শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে বলা যায়-"উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও মর্যাদা না থাকার কারণে প্রতিভাবান প্রার্থীদের এ পেশায় আকৃষ্ট করা সম্ভবপর হচ্ছে না।"[৪৭] আর্থিক চাহিদা মেটানোর জন্য শিক্ষকরা নিজ প্রতিষ্ঠানের বাইরে অতিরিক্ত সময় দেওয়ার কারণে নিজের শিক্ষার্থীরা শিক্ষণপ্রক্রিয়ায় বঞ্চিত হয়। বাস্তবিক অর্থে শিক্ষা জীবনকে বদলিয়ে দেয়। জীবনের কোনো কিছুই শিক্ষার বাইরে নয়। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় জীবন বাস্তবতার তেমন কোনো নিদের্শনা নেই। তাছাড়া শিক্ষার পরিবেশ সুষ্ঠু শিক্ষার জন্য অপরিহার্য। এমন অনেক ঘটনা আছে যা শিক্ষাকে কলুষিত করে ফেলছে। বিশেষত; বাংলাদেশের রাজনৈতিক অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কারণে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং শিক্ষার আসল পরিবেশ ব্যাহত হয়। তাই বলা বলা হয়-"শিক্ষাব্যবস্থায় নৈরাজ্য, অনিয়ম, আদর্শের ভিন্নতা, মেধাশূন্যতা এবং সৃজনশীলতার অভাব প্রভৃতি মূলত শিক্ষার লক্ষ্যভ্রষ্টের কারণেই হয়ে থাকে।"[৪৮] অন্যদিকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষার্থী যেখানে জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা সেখানে তারা জ্ঞানচর্চায় অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ কাঠামোবদ্ধ কারিকুলামের কারণে তারা শুধু পাশ করার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। তাই বলা হয়–

> আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে পরীক্ষামুখীন শিক্ষাকে। ফলে একজন ছাত্র মারমুখী হয়ে ওঠছে পরীক্ষায় পাশের জন্য, সার্টিফিকেট অর্জনের জন্য। ছাত্রদের কাছে শিক্ষাগ্রহণ অপেক্ষা সনদ অর্জন এক ব্যাধিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে ছাত্ররা আগ্রহ দেখাচ্ছে শিক্ষার তাৎপর্য উপলব্ধি অপেক্ষা পাশ করার জন্য সীমিত বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত নোট সংগ্রহে।[৪৯]

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা ক্ষেত্রে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন বুয়েটের শিক্ষার্থীরা যে সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বিকশিত হয় অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তা পায় না। ফলে একজন শিক্ষার্থীর জীবনের শুরুটা বৈষম্য দিয়ে শুরু হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ সঠিকভাবে হচ্ছে না। উপরন্তু শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা ঢোকার কারণে উচ্চ বিলাসীরা সন্তানের যথার্থ শিক্ষার পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। সঠিক দিক-নির্দেশনা না দিয়ে শুধু হুজুগে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিদেশী ভাষার দিকে দৌড়াচ্ছে। তাই মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী বলেন, "...পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে আমার জানামতে শিশুদেরকে ভালভাবে মাতৃভাষা না শিখিয়ে ইংরেজি বা বিদেশি কোনো ভাষায় লেখাপড়া করতে দেওয়া হয় না, এটি কোনো সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ নয়, শিক্ষাবিজ্ঞান তা অনুমোদন করে না।"[৫০] বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জনসংখ্যার তুলনায় কম হওয়ায় অনেকেই উচ্চশিক্ষা

গ্রহণ করতে পারছে না এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নানা গাফলতির কারণে শিক্ষার্থীরা সময়মত শিক্ষাজীবন শেষ করতে পারছে না। তাই বলা হয়, "এর কারণ সময়মত শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষা না নেওয়া, ফলাফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রীতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা এসবই একজন শিক্ষার্থীর চলার পথকে রুদ্ধ করে দেয়।"[৫১] তাই তো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হবার প্রতি লক্ষ্য রাখি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য চেষ্টার দিন আসিয়েছে।"[৫২] উচ্চশিক্ষায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তের কারণে বাংলাদেশ আরও পিছিয়ে যাচ্ছে অথচ দেশের মোট শিক্ষার্থীর বিরাট অংশ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। তদারকী ব্যবস্থাপনা দুর্বল থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা নামেমাত্র নিম্নমানের ডিগ্রি নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের দ্বারা দেশ ও জাতির কোনো উপকার হচ্ছে না। বরং বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে সেখানে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া বাকি সব শিক্ষাকে সার্টিফিকেট অর্জনের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি অনুমোদন পাওয়ার জন্য যেসব বিধিবিধান অনুসরণ করা হয় তা অধিকাংশের সে শর্ত পূরণ হয় না। কারণ উদ্দেশ্য মহৎ না থাকার কারণে অনেক প্রতিষ্ঠান আবার টিকেও না। ফলে যে সমস্ত শিক্ষার্থী ভর্তি হয় তাদের লেখাপড়া নিয়ে বিপাকে পড়তে হয়। তাছাড়া অধিকাংশ ধনী পরিবারের সন্তানরা নামসর্বস্ব সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য ভর্তি হয়ে থাকে। এখানে না আছে অবকাঠামো সুবিধা না আছে চিত্তবিনোদনের সুযোগ। শুধু ব্যবসায়িক মনোভাব নিয়ে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। তাই বলা যায়, "এই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং এদের দ্বারা দিনের পর দিন বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ফলে সংকট আরও ঘনীভূত হচ্ছে। কারণ উপযুক্ত পরিবেশের জন্য যে নিজস্ব ক্যাম্পাসের দরকার তা অধিকাংশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পূরণ করতে অপারগ।"[৫৩] আবার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আনুপাতিক দৃষ্টিকোন থেকে মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। এক জরিপে দেখা গেছে শিক্ষার্থীর বিকাশ সাধনে যা যা প্রয়োজন মাদ্‌রাসা শিক্ষায় এর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এমনকি মাদ্‌রাসা শিক্ষায় অধিকাংশ শিক্ষার্থী অভাবী পরিবার থেকে আসে। এজন্য বলা হয়- "মূল ধারার বিজ্ঞানভিত্তিক সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা বিস্তৃত হয়ে দেশে সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থার রূপ নিলেও এতে শিক্ষার নিম্নমান, পাঠ্যক্রমগত বিশৃঙ্খলা ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ব্যাপক হয়ে উঠেছে।"[৫৪] আধুনিক চিন্তায় শিক্ষাকে সার্থক করার জন্য শিক্ষা সহায়ক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের বেশি ব্যস্ত থাকার কথা। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দৃশ্যত এরূপ অনুসরণ করার দৃষ্টান্ত কম। শুধু প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য নিজেদের ব্যস্ত রাখার দৃশ্য চোখে পড়ে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়,

> এই অবস্থা শহর ছেড়ে আজকাল গ্রামাঞ্চলেও বিস্তার লাভ করেছে। এমনকি প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চ স্তরের শিক্ষা পর্যন্ত এই কোচিং ব্যবসার বিস্তার ঘটেছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা সীমিত জ্ঞান অর্জন করে, নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করে সংক্ষিপ্ত ও সহজ উপায়ে আপাত ভাল রেজাল্ট বা গ্রেড লাভ করছে।[৫৫]

এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায়-"তাদের না-আছে অবসর, না আছে খেলাধুলা, নাচ, গান বা ছবি আঁকার মত চিত্তবিনোদনের সময়। সকাল থেকে স্কুল আর কোচিং সেন্টারে দৌড়াদৌড়ির মাঝে সবটুকু সময় চলে যাচ্ছে-সব মা-বাবা তাই-ই বলছেন।"[৫৬] বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজনমাফিক না থাকায় শিক্ষাদান প্রক্রিয়া দিনদিন আরও জটিলতায় রূপ নিচ্ছে। অর্থাৎ

> ডাক্তারি মতে 'ক্লিনিক্যালি' জীবিত বলে রোগীর যে অবস্থাটা বোঝানো হয়, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাটা ঠিক তাই। মৃত্যুর সব চিহ্ন প্রকট, সর্বশরীর অসাড়, সর্বইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াহীন, তবু মৃত্যু ঘটেছে বলা যায় না আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাটা আজও জীবিত বটে তবে সব অর্থে বিকল।[৫৭]

বিদ্যমান শিক্ষাকাঠামোয় উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। নানা ধারার শিক্ষা চালু থাকায় শিক্ষালাভে যেমন বৈষম্য বাড়ছে তেমনি চাকুরীর ক্ষেত্রে এই সংকট প্রকট হচ্ছে। তুলনামূলক সাধারণ ধারার শিক্ষার্থীরা অনুপাতে বেশি অথচ কর্মক্ষেত্রে তাদের সুযোগ-সুবিধা কম। আবার প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের অভাব থাকার কারণে নতুন ভাবনার উদয় হচ্ছে না। ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় অপরিকল্পিত নমুনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এজন্যই হাসান আজিজুল হক বলেন, "এই শিক্ষাব্যবস্থা শাসকদের, মালিকদের, জনগণের নয়।"[৫৮] পরিশেষে বলা যায় কম আর বেশি শিক্ষার এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে প্রতিবন্ধকতা নেই। তাই হাসান আজিজুল হক আরও বলেন, দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা-সব স্তরেই শিক্ষার মান নিদারুণ নেমে গেছে-একথাটা এখন সবাই আপ্তবাক্যের মতো বলেন বটে, কিন্তু এই নেমে যাওয়াটা যে-কোন অধঃপতনে যাওয়া তা নির্ণয় করা এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা করার কোনো উদ্যম আজ কোথাও আছে বলে মনে হয় না।[৫৯]

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে দার্শনিক বিশ্লেষণ

আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষাকে দার্শনিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা নিয়ে যে কয়েকটি দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হয়েছে তার মধ্যে ভাববাদ, জড়বাদ, প্রকৃতিবাদ, বাস্তববাদ, অস্তিত্ববাদ, প্রয়োগবাদ অন্যতম। ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষা হলো শিক্ষার্থীর আত্মোপলব্ধি যেখানে ধারণার জগতকে প্রাধান্য দিয়ে বাস্তবতা অস্বীকার করা হয়েছে যা বাংলাদেশের শিক্ষার সাথে যায় না। জড়বাদী শিক্ষাচিন্তাবিদরা মনে করেন-ইন্দ্রিয়ের বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়ের বাইরে এমন অনেক বিষয় আছে যা শিক্ষার্থীর আত্মিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন। তাই বাংলাদেশের শিক্ষা জড়বাদী শিক্ষাচিন্তাবীদদের মতকে প্রাধান্য দেয় না। আবার প্রকৃতিবাদী ভাবনায় শিক্ষার্থীর শিক্ষা হবে প্রকৃতিকেন্দ্রিক। সব কিছু প্রকৃতির উপর ছেড়ে দিলে বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা থেকে যায় এবং শিক্ষার্থী তার মনের মত করে সবকিছু করতে চাইবে। এই শিক্ষায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা উল্লেখ নাই। শিক্ষার লক্ষ্যের কথা না বলায় এই শিক্ষা বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে মাননসই নয়। বাস্তববাদী শিক্ষাচিন্তার সাথে বাংলাদেশের শিক্ষার কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও সব সময় বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে কাজ হয় না। কারণ মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া শিক্ষার্থীর প্রকৃত বিকাশের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তব জ্ঞানের সাথে সাথে সাহিত্য, সঙ্গীত, নৈতিকতাভিত্তিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অস্তিত্ববাদী শিক্ষাচিন্তায় শিক্ষার্থীর অস্তিত্ব ও স্বাধীনতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় একপেশে চিন্তার প্রাধান্য পেয়েছে। প্রয়োগবাদী শিক্ষা মানুষের বাস্তব উপযোগীতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় এই মতবাদেরও কিছুটা সংকীর্ণতা আছে। উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে কোনো মতবাদ এককভাবে বাংলাদেশের শিক্ষাকে প্রভাবিত করতে পারে না। তবে তুলনামূলকভাবে যে দার্শনিক চিন্তা বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা কাঠামোকে বেশি প্রভাবিত করেছে তাহলো প্রয়োগবাদী শিক্ষাচিন্তা।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর পছন্দ-অপছন্দ তেমনটা স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। ফলে শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় সনদ অর্জনে জোর করে কিছু শেখানো গেলেও তার সৃজনশীলতা লক্ষ্য করা যায় না। এতে শিক্ষার্থী যত বাধ্যবাধকতায় থাকে ততই তার মেধা বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। এজন্য শিক্ষাকে সার্থক করার জন্য শিক্ষার্থীর মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা দরকার যা প্রয়োগবাদী দার্শনিক চিন্তার ফসল। এতে তার মধ্যে জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা জাগ্রত হবে। উদ্ভাবনী চিন্তার দ্বারা নতুন জ্ঞান আহরিত হওয়ায় শিক্ষার্থীর বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। অন্যদিকে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা কাঠামো এমন যে, মেধাবীরা বর্তমানে শিক্ষকতা পেশায় আসতে অনীহা প্রকাশ করছে। এর কারণ অন্যান্য পেশার মতো শিক্ষকতা পেশাকে মূল্যায়ন করা হয় না। তাছাড়া অন্যান্য পেশার মতো এখানে সুযোগ-সুবিধাও কম। এমতাবস্থায় শিক্ষকতাকে অন্যান্য পেশা থেকে আলাদা করে দেখতে হবে। তবেই মেধাবীরা এ পেশায় আত্মনিয়োগ করবে। সত্যিকার অর্থে আদর্শ শিক্ষক জাতিকে আলোর পথ দেখায়। কাজেই অর্থ ও সম্মান

দিয়ে শিক্ষকতাকে অন্যান্য পেশার সাথে মেলানো যাবে না। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য- At the end of My Pedagogic Creed,

> Dewey stated, I believe that the art of thus giving shape to human powers and adapting them to social service, is the supreme art; one calling into its service the best of artists; that no insight, sympathy, tact, executive power is too great for such service.[60]

সনাতনী পদ্ধতিতে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থায় এখনও শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের মুখস্থকরণ এবং শিক্ষকদের বক্তৃতাপর্ব বিদ্যমান। এ অবস্থায় আসলে শিক্ষার্থীরা সৃজনাত্মক কাজের ধারে-কাছে যেতে পারে না। এজন্য শিক্ষার্থীদের সমস্যা মোকাবেলা ও সমাধানের সুযোগ দিতে হবে যা প্রয়োগবাদী শিক্ষায় লক্ষ্য করা যায়। এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে সহজেই তারা জ্ঞান অন্বেষণে অগ্রগামী হয়। তাই বলা যায়-

> Dewey saw problem solving as the catalyst for thinking, and he observed children acting as immature investigators of natural phenomena and social issues. Children often used the trial and error methods of scientists and acted on trial and error results. He believed that children needed to be guided in their use of this innate power of learning, engaging the world playfully at first, and then moving to a more disciplined, but still creative and engaging, forms of inquiry and problem solving.[৬১]

যথার্থ শিক্ষার জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এমন একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের মতামতের বাইরে শিক্ষার্থীদের কথা বলার কোন সুযোগ ছিল না। আজকে এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত পেশ করতে পারে। আদর্শ শিক্ষাকাঠামোয় কেউ কারো কাজে হস্তক্ষেপ করে না যা ডিউঈ-এর শিক্ষাচিন্তার অনুরূপ। ফলে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বিরাজমান থাকায় প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জায়গা থেকে জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করে। তাই বলা হয়,

> While Dewey accepted employment as one of many bounded experiences, he was unwilling to advocate a school program that focuses narrowly on preparation for employment. His aim was the transformation of that experience through reflective thought and social action. Dewey's vision was for a population of habitual reflective thinkers committed to the improvement of social welfare through active participation in a socioindustrial democracy.[৬২]

সঠিক পরিকল্পনা সঠিক ফলাফল দিবে-এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আজকে সঠিক পরিকল্পনার অভাবে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য পূরণ হচ্ছে না। অপরিকল্পিত শিক্ষার কারণে শিক্ষাব্যবস্থায় অসন্তোষ বিরাজ করছে। বিশেষ করে গুণগত মান না বাড়িয়ে শুধু পরীক্ষায় ভালো করার ইচ্ছা থাকায় অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। এর থেকে উত্তরণের জন্য সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন দরকার। এমনভাবে উচ্চশিক্ষাকাঠামো সাজাতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফলের প্রত্যাশায় না ঘুরে জানার ক্ষেত্রে আগ্রহী হয়। বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে শিক্ষার ভিতকে মজবুত করতে হবে যা প্রয়োগবাদী শিক্ষার অনুরূপ। বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাউপকরণসহ শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সহজেই অংশগ্রহণ করতে পারে। আধুনিক বিশ্বে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে চাইলে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পাঠ্যক্রমকে আধুনিক ও

বাস্তবসম্মত করতে হবে। এজন্য, "প্রকৌশল তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যার কোর্সগুলোকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার আলোকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির নিয়মিত হালনাগাদসহ শিল্প কারখানা ও কারিগরি সংস্থাসমূহে শিক্ষার্থীদের সহায়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।"[৬৩] শিক্ষার সহ-পাঠ্যক্রম হিসাবে বর্তমানে ক্রীড়াকেন্দ্রিক শিক্ষার গুরুত্ব বেড়ে যাচ্ছে যা ডিউঈ উপলব্ধি করেছিলেন। সুস্থ দেহে সুস্থ মন। আর সুস্থ মনে নতুনত্বের আহবান-এটাই হোক বাংলাদেশে শিক্ষার প্রত্যয়। কেননা খেলার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাকে বিরক্ত মনে করবে না। বরং সহজেই শিক্ষাদান প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়,

> যখন এই সমস্ত সহজ-প্রবৃত্তি প্রণোদিত অনুশীলন স্কুলের নিয়মিত কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন তাতে শিক্ষার্থীর পূর্ণসত্তা নিয়োজিত হয়, স্কুলের ভিতরের ও বাইরের জীবনের কৃত্রিম ব্যবধান হ্রাস পেয়ে বহুবিধ স্পষ্টতঃ শিক্ষামূলক সামগ্রী ও কার্যপ্রণালীর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার মনোবৃত্তি জাগে, এবং যে ধরনের সহযোগী মেলামেশা জ্ঞাপিত বিষয়কে সামাজিক কাঠামোতে স্থাপন করে, তার যোগাড় হয়। অল্প কথায়, খেলাধুলা ও কর্মকেন্দ্রিক কাজকে পাঠ্যক্রমের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান দেওয়ার কারণ সাময়িক সুবিধা ও ক্ষণিক চিত্তবিনোদন নয়, পরন্তু তার ভিত্তি হলো বুদ্ধিগত ও সামাজিক। এই ধরনের কোন ব্যবস্থা ছাড়া ফলপ্রসূ শিক্ষালাভের স্বাভাবিক অবস্থা আনা সম্ভব নয়, অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করার কাজটি স্কুলের চাপানো কোন কাজ না হয়ে, হবে উদ্দেশ্যমূলক,-অর্থাৎ যার নিজস্ব একটা উদ্দেশ্য আছে, এরকম ক্রিয়াকলাপের উপবৃদ্ধি। আরও সুনির্দিষ্টরূপে বলতে গেলে খেলাধুলা করা ও কাজকর্ম করা অবগতির প্রথম পর্যায়ের লক্ষণগুলোর সাথে পদে পদে মেলে।[৬৪]

বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে বিভিন্ন ধারার উচ্চশিক্ষা প্রক্রিয়া চালু আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে নানা ধারা চালু থাকায় অসমতা বিরাজ করছে। এই অসমতার কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অতৃপ্তি কাজ করছে। এই অতৃপ্তি দূর করার জন্য এমন শিক্ষাপ্রক্রিয়া চালু করতে হবে যেখানে শিক্ষার্থীরা সমান সুযোগ লাভ করবে তথা গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজমান থাকবে যা ডিউঈ-এর চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ,

> শিক্ষার প্রতি গণতন্ত্রের অনুরক্তি সুবিদিত। এর অগভীর ব্যাখ্যা এই যে, যারা নির্বাচন করে এবং যারা শাসকবর্গকে মেনে চলে, তারা যদি শিক্ষিত না হয়, তা হলে, জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার সফলকাম হতে পারে না। যে হেতু গণতান্ত্রিক সমাজ বাইরের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার নীতি প্রত্যাখান করে, সে জন্য এক স্বতঃস্ফূর্ত মানসতা ও স্বার্থবোধের মধ্যেই বিকল্প ব্যবস্থা দেখতে হয়, এবং কেবল শিক্ষা দ্বারাই এ ব্যবস্থা করা যায়।[৬৫]

শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারে শুরু হলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে তার পূর্ণতা পায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলো একটা সামাজিক সংগঠন। পরিবার ও সমাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন পরিবার থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগমন করে। সকল পরিবারের সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান একরকম নয়। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসার পর শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে সহানুভূতির জায়গা তৈরি হয়। প্রতিষ্ঠানের নিয়মতান্ত্রিক জীবন শিক্ষার্থীর সামাজিক জীবন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষাকাঠামোয় বর্তমানে এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা শিক্ষার্থীকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। তাই বলা হয়-

> Education being a social process, the school is simply that form of community life in which all those agencies are concentrated that will be most effective in bringing the child to share in the inherited resources of the race, and to use his own powers for social ends.[66]

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা শিক্ষার্থীবান্ধব না। এখানে গতানুগতিক শিক্ষার কারিকুলাম প্রদান করে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সনদ প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত-শিক্ষার্থীর নিজে নিজে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকে যত উদ্বুদ্ধ করা যাবে ততই তার মধ্যে নতুন ভাবনার উদয় হবে। তাছাড়া জোর করে শৃঙ্খলা শেখানো যায় না যা ডিউঈও স্বীকার করেছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি মেনে চলার জন্য বাধ্য করা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত পেশ করার সুযোগ কম পায়। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে যত বেশি ব্যবধান কমানো যাবে তত তারা মনের ইচ্ছা শিক্ষকের কাছে শেয়ার করার সুযোগ পাবে। আর যখনই শেয়ার করার সুযোগ পাবে তখনই তারা সবকিছু স্বাভাবিকভাবে মেনে চলবে। ফলে তাদের জন্য নিয়মনীতি আর বাধ্য করার প্রয়োজন হবে না বরং তারা স্ব-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হবে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়, "Self-discipline is a better weapon, and this can be taught through responsibility. When the educand is faced with the responsity of looking after most of the work of the college or school he automatically evolves self-discipline."[67]

শিক্ষা হবে শিক্ষার্থীর জন্য আনন্দদায়ক। শিক্ষাকে শিক্ষার্থী যখন নিরানন্দ মনে করে তখন তার মধ্যে অনীহা কাজ করে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা পদ্ধতির বেশিরভাগ অংশ বাধ্যবাধকতার বেড়াজালে আবদ্ধ। আর বাধ্যবাধকতা থাকলে এর প্রতি এমনিতেই অনীহা কাজ করে। তাই শিক্ষাদান প্রক্রিয়া হওয়া উচিত ডিউঈ-এর শিক্ষাপদ্ধতির মতো সক্রিয়তাকেন্দ্রিক যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজে থেকেই জ্ঞান অর্জনের দিকে অগ্রগামী হয়। এজন্য বলা হয়-

> উদ্দেশ্য-সম্বলিত যে কোনো অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই হোক, স্বার্থবোধ হ'ল, বিষয়বস্তুর গতিদায়ক শক্তির প্রতীক, তা সে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বশতঃই হোক, আর কল্পনাতে উপস্থাপিত হয়েই হোক। মূর্ত অর্থে, শিক্ষামূলক বিকাশের ক্ষেত্রে স্বার্থবোধের গতিদায়ক স্থানকে স্বীকৃতি দেওয়ার মূল্য এই যে, এতে বিভিন্ন শিশুদের বৈশিষ্টপূর্ণ সামর্থ্য, প্রয়োজন ও রুচি বিচার বিবেচিত হয়।[৬৮]

শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা তার স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে সম্পর্কিত। শিক্ষার্থীরা যত স্বাধীনভাবে কাজের সুযোগ পাবে তত তাদের মধ্যে নতুন ভাবনার উদয় হবে। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীকে নতুন কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করবে। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার আধুনিক পদ্ধতিতে এটা খুবই জরুরী যা ডিউঈ তাঁর ব্যবহারিক বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করেছিলেন। তাই বলা হয়-

> শিক্ষা সম্বন্ধে যে ধারণাবলী উপস্থাপিত করা হ'ল, তার সারাংশ দেখা যাবে অভিজ্ঞতার অবিরাম পুনর্গঠন সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে। যে শিক্ষানীতি শিক্ষাকে সুদূর ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতিরূপে, বহির্বিকাশরূপে, বাহ্যিক গঠনরূপে এবং অতীতকালের পুনবনুচিন্তনরূপে ধরে নেয়, আমাদের ধারণা সে সকল ধারণা থেকে পৃথক।[৬৯]

আজকে বর্তমান উচ্চশিক্ষা কাঠামোয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যে সম্পর্ক তা জ্ঞান অর্জনের জন্য সহায়ক নয়। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের আন্তরিকতা শিক্ষাদান কার্যকে আরও সহজ করে তোলে। যেমন "যারা শিক্ষাদান করে এবং যারা শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের স্নেহ যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।"[৭০] একজন শিক্ষক সবসময় শিক্ষার্থীর মঙ্গল কামনা করে। এরজন্য শিক্ষার্থীকেও শিক্ষকের কাছাকাছি আসতে হয়। একজন শিক্ষক তখনই সার্থক যখন তার শিক্ষার্থী সফলকাম হয়। কাজেই শিক্ষার্থীর সফলতা শিক্ষককে কেন্দ্র করে। শিক্ষকের গাইডলাইন শিক্ষার্থীর জন্য পাথেয় হিসাবে কাজ করে। এক্ষেত্রে শিক্ষক হবেন একজন আদর্শ পরামর্শক যিনি শিক্ষার্থীর ওপর অহেতুক কোন কিছু চাপিয়ে দিবেন না যা ডিউঈ-এর শিক্ষাব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা হয়,

> The teacher is not in the school to impose certain ideas or to form certain habits in the child, but is there as a member of the community to select the influences which shall affect the child and to assist him in properly responding to these influences.[71]

উপসংহার

বাংলাদেশ একটা ছোট দেশ হলেও এর জনসংখ্যা অনেক। এই বৃহৎ জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করার জন্য শিক্ষার ভূমিকা অনন্য যেখানে শিক্ষা জীবনের চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবনা থেকে মানুষের চিন্তায় বৃহৎ ভাবনার উদয় হয় যা দিয়ে মানুষ জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। যে দেশের (বাংলাদেশ) অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে সেখানে শিক্ষা একটা হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষাকে কেন্দ্র করে দেশের ভবিষ্যত নির্ধারিত হয়। প্রবন্ধের প্রারম্ভিক পর্যায়ে কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা দিয়ে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষাকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর নিম্নোক্ত বক্তব্যে প্রবন্ধের ফলাফল বিশ্লেষণ চেষ্টা করা হয়েছে। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়-প্রথমত উচ্চশিক্ষার একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে যেখানে ঋষি-মনীষীদের সাহচর্যে শিক্ষার্থীর দীক্ষালাভ করার প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনায় শিক্ষার একটা প্রাচীন পদ্ধতির চিত্র ফুটে উঠে। এরপর মুসলিম সময়কালে উচ্চশিক্ষার নানা অবদান পরিলক্ষিত হয়। এ সময় শাসকরা উচ্চশিক্ষা বিস্তারে রাজ্যের নানা জায়গায় নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এমনকি কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এই আমলে উচ্চশিক্ষার জন্য সুখ্যাতি অর্জন করে। এরপর ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের কথা এসেছে যেখান থেকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হতো এবং এখনও দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার কার্যক্রমকে কয়েকটি কালের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে বাংলাদেশ আমলের উচ্চশিক্ষার বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন-বাংলাদেশের শিক্ষা নিয়ে গঠিত প্রায় কমিশনই উচ্চশিক্ষার বিষয়ে নানা নির্দেশনা দিয়েছে। এই নির্দেশনার আলোকে উচ্চশিক্ষার ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যায়। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার আদিকথা, উচ্চশিক্ষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, শিক্ষণপদ্ধতি, পাঠ্যক্রম, মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশসহ প্রভৃতি বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া উচ্চশিক্ষার এই কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন ধারার উচ্চশিক্ষার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেমন-সাধারণ শিক্ষা, মাদ্‌রাসা শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা প্রভৃতি। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা থাকলেও অনেকেই উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর কারণ এই উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা আজকে নানা সমস্যায় পর্যবসিত। যেমন-উচ্চশিক্ষায় নানা বিভাজন, বিভিন্নমুখী শিক্ষার কারণে শিক্ষণপ্রক্রিয়ার দুর্বলতা, জনবলের সংকট, সৃজনাত্মক কাজ না থাকায় বেকারত্বের হার বৃদ্ধি, বিভাজিত শিক্ষার কারণে নানা বৈষম্য, নিজ ভাষা ভালোভাবে না শিখিয়ে বিদেশী ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান বজায় না থাকা, বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে চিত্তবিনোদনের সুযোগের অভাব, মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থীদের নানা দিক থেকে সুযোগ-সুবিধার অভাব থাকাসহ সর্বোপরি শিক্ষার গুণগত মান নিম্নগামী হওয়ার নানা চিত্র ফুটে উঠেছে। এই সমস্যার কারণে আজকে উচ্চশিক্ষার আসল উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে না। এই সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তার ব্যাখ্যা থেকে প্রয়োগবাদী শিক্ষাচিন্তাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কারণ প্রয়োগবাদী ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-শিক্ষাকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়। শিক্ষার পরিবেশ হতে হবে শিক্ষার্থীবান্ধব। শিক্ষা তখনই সার্থক হবে যখন একজন শিক্ষার্থী তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে। আরও বলা যায়-শিক্ষা হবে শিক্ষার্থীর জন্য আনন্দের। শিক্ষার্থী যেন শিক্ষণপ্রক্রিয়ায় বিরক্ত না হয় সেদিকেও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যা বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার জন্য সহায়ক। প্রয়োগবাদী শিক্ষাদার্শনিক ডিউঈ-এর শিক্ষণপদ্ধতির মতো যখন সমস্যাভিত্তিক বিষয় শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করা হবে তখন নিজে থেকেই শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ দেখা দিবে এবং নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে তা সমাধান করার চেষ্টা করবে যা উপরিউক্ত বিশ্লেষণে ফুটে উঠেছে।

তথ্যনির্দেশ

[১] এম এ ওহাব ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের শিক্ষা* (ঢাকা: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯), পৃ. ৩।
[২] সুবোধ কুমার সেনগুপ্ত, *আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা* (কলিকাতা: জগদিশ প্রেস, ১৯৬৪), পৃ. ২২-২৩।
[৩] মুহম্মদ শামসউল হক, *বিকাশমান সমাজ ও চিন্তা (*ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ৫৩।
[৪] সিরাজুল ইসলাম. সম্পা., *বাংলা পিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ (*ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, খণ্ড ৯, ২০০৩), পৃ. ৩৩৩।
[৫] শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, *বৈদিক ও বৌদ্ধশিক্ষা* (কলিকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বাংলা ১৩৬৫), পৃ. ৪১।
[৬] সুবোধ কুমার সেনগুপ্ত, *আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা*, পৃ. ৯১।
[৭] সিরাজুল ইসলাম. সম্পা., *বাংলা পিডিয়া,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩৩৫।
[৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকার, *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০* (ঢাকা: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১২), পৃ. ৭০ (সংযোজনী-১)।
[৯] *পূর্বোক্ত*।
[১০]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট* ১৯৭৪ (ঢাকা: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৭৪), পৃ. পরিশিষ্ট-১।
[১১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, সংশোধনীসহ মুদ্রিত, অক্টোবর-২০১১, ধারা ১৭, পৃ. ৫।
[১২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট* ১৯৭৪, পৃ. ১০১-১০২।
[১৩] কবীর চৌধুরী, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, হোসনে আরা শাহেদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা* (ঢাকা: সূচীপত্র, ২০০২), পৃ. ১৯৭।
[১৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকার, *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*, পৃ. ৭১ (সংযোজনী-২)।
[১৫] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১।
[১৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪*, পৃ. ৮৩।
[১৭] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকার, *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*, পৃ. ২২।
[১৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ বিস্তরণ ও বাস্তবায়ন-বিষয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (ঢাকা: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১৫), পৃ. ১৭-১৮।
[১৯] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকার, *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*, পৃ. ৮।
[২০] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০।
[২১] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০।
[২২] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৬।
[২৩] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০।
[২৪] বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তালিকা –উইকিপিডিয়া https://bn.wikipedia.org
[২৫] হাসান আজিজুল হক, "নীতি-দুর্নীতি: বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা", *প্রবন্ধসমগ্র* ২ (ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১১), পৃ. ৪৬৭।
[২৬] উদ্ধৃত: বিনয় মিত্র, *বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা: রূপ ও রীতি* (ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৪), পৃ. ১২৪।
[২৭] বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তালিকা –উইকিপিডিয়া https://bn.wikipedia.org
[২৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকার, *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*, পৃ. ৩৫।
[২৯] বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তালিকা –উইকিপিডিয়া https://bn.wikipedia.org
[৩০] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকার, *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*, পৃ. ২৫।
[৩১] বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তালিকা –উইকিপিডিয়া https://bn.wikipedia.org
[৩২] *পূর্বোক্ত*
[৩৩] *পূর্বোক্ত*
[৩৪] *পূর্বোক্ত*
[৩৫] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ* (ঢাকা: জাগরণী প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ৩৮৫।
[৩৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকার, *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*, পৃ. ২৪।
[৩৭] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮।
[৩৮] বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তালিকা –উইকিপিডিয়া https://bn.wikipedia.org
[৩৯] *পূর্বোক্ত*
[৪০] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকার, *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*, পৃ. ২৩।

[৪১] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭।
[৪২] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯।
[৪৩] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬।
[৪৪] আকমল হোসেন, "শিক্ষা, শিক্ষক আন্দোলন ও প্রাসঙ্গিক কথা", *শিক্ষাবার্তা* (ঢাকা: শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ২০১৭), পৃ. ১৯।
[৪৫] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩।
[৪৬] শহিদুল ইসলাম, *শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ* (ঢাকা: ভূমিকা, ২০১৫), পৃ. ৭ (ভূমিকা)।
[৪৭] এ. এন. রাশেদা. সম্পা., *১৯৮৭-১৯৯৭ নির্বাচিত রচনা* (ঢাকা: শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯৮), পৃ. ২৩৫।
[৪৮] বিজন হালদার, "বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিক্রমা: লক্ষ্যভ্রষ্টতা ও উত্তরণ", *শিক্ষাবার্তা* (ঢাকা: শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৬), পৃ. ৩৮।
[৪৯] আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, *রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও শিক্ষায় মূল্যবোধের সংকট* (ঢাকা: হালদার প্রকাশনী, ২০১১), পৃ. ৭৫।
[৫০] ড. মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী, *বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি*, (ঢাকা: নিউ শিখা প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ১৬।
[৫১] শিশির কুমার ভট্টাচার্য, "বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা", হাসান আজিজুল হক (সম্পা.), *বঙ্গ বাংলা বাংলাদেশ* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০১২), পৃ. ৩৩৪।
[৫২] উদ্ধৃত-বিনয় মিত্র, *বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা: রূপ ও রীতি*, পৃ. ১৩১।
[৫৩] শিশির কুমার ভট্টাচার্য, "বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা", পৃ. ৩৩৩।
[৫৪] এ. এন. রাশেদা, *(১৯৮৭-২০১২) পঁচিশ বছরের শিক্ষাব্যবস্থার দর্পণ: সম্পাদকীয় শিক্ষাবার্তা* (ঢাকা: শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, প্রথম খণ্ড, ২০১৬), পৃ. ২৭০।
[৫৫] মো: রেজাউল করিম, "বাংলাদেশে শিক্ষার বাণিজ্যকরণ: নানামুখী সমস্যা ও সমাধানের উপায়", *শিক্ষাবার্তা* (ঢাকা: শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, মার্চ-এপ্রিল ২০১৬), পৃ. ৬২।
[৫৬] এ. এন. রাশেদা, "শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থাই-জঙ্গী চাষের উর্বর ভূমি", *শিক্ষাবার্তা* (ঢাকা: শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, জুলাই-আগস্ট ২০১৬), পৃ. ৩৭।
[৫৭] হাসান আজিজুল হক, "গণ-প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : সমূহনাশের সংকেত", *প্রবন্ধসমগ্র ১* (ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন), ২০১১, পৃ. ৪২৪।
[৫৮] হাসান আজিজুল হক, "শিক্ষাব্যবস্থা : কী চাই, কী চাই না", *প্রবন্ধসমগ্র ২*, পৃ. ২৯।
[৫৯] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৪।
[৬০] John Dewey, *My Pedagogic Creed* (New York: E.L. Kellogg and Co., 1897), p. 94.
[৬১] Jeffrey Laurance Dow, "The New Vocationalism: A Deweyan Analysis" (Ph.D. dissertation, University of Florida, 2002), pp. 79-80.
[৬২] *Ibid*, p. 88.
[৬৩] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০১০*, পৃ. ২৫।
[৬৪] শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ রায়, *গণতন্ত্র ও শিক্ষা* (অনু.) (কলিকাতা: দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট্ লি., ১৯৬১), পৃ. ২৫৪-২৫৫।
[৬৫] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১২-১১৩।
[৬৬] John Dewey, *My Pedagogic Creed,* p. 7.
[৬৭] Soti Shivendra Chandra and Rajendra K. Sharma, *Philosophy of Education* (New Delhi: Altantic Publishers and Distributors, 1996), p. 114.
[৬৮] শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ রায়, *গণতন্ত্র ও শিক্ষা* (অনু.), পৃ. ১৭১।
[৬৯] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৪।
[৭০] বদরুদ্দীন উমর, "শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়", *অন্ত.বাঙলাদেশে শিক্ষা সংস্কৃতি* (ঢাকা : সুবর্ণ, ২০১৮), পৃ. ১৯৫।
[৭১] John Dewey, *My Pedagogic Creed,* p. 9.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

বুদ্ধদেব বসুর শিল্পচেতনা : 'যে আঁধার আলোর অধিক'
(The Art-Consciousness of Buddhadev Bose : 'Je Aadhar Alor Adhik')

গৌতম দত্ত*

Abstract: Rabindranath Tagore cherished Bengali poetry in his own tradition and brought it to the stage of world literature. On the other hand, post Rabindranath 'kallolakabis' brough various materials of world literature to Bengali literature. Among these materials are various aspects of poetry including mood, language, rhythm, rhetorics.Among these new poets Buddhadev Bose is foremost. The innovation of Bengali poetry can be seen in his eighteen original poems and about eight translations. Basically he is a poet of love, women, nature; reading world literature, various translated works, especially Baudelaire's poetry, add new dimensions to his poetic journey. In this case, his poetry 'je Aadhar Alor Adhik' is marked as a turning point. It is not only different from other poems of Buddhadev Bose, but it is particularly important in the history of Bengali poetry. The poem is basically an extract of the poet's experience about the path and capital of modern poetry. In the present article, an analytical investigation of that 'path' and 'capital' has been carried out.

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকটি (১৯২১-১৯৩০) বাংলা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্য একটি বিশেষ দশক। শিল্প-সাহিত্যে ভারতীয় ঐতিহ্যের যে দীর্ঘ ধারাবাহিকতা এখানে বহমান ছিল-তার স্রোত এ দশকে এসে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এ প্রবাহকে কেউ বলেন 'পাশ্চাত্যমুখী', কেউ বলেন 'সময়ের প্রয়োজন' আবার কেউ বলেন 'আধুনিক'। তবে এ সময়েও রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) স্বয়ং সমুজ্জ্বল। তাঁর সৃষ্টির সূর্যকিরণ তখনো সাহিত্যের বাংলা থেকে বিশ্বসভাকে পর্যন্ত আলোকিত করে যাচ্ছে। বুদ্ধদেব বসু-তো তাঁকেই 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা'[১] বলেছেন। আবার আমাদের সাহিত্যে তখনো 'উত্তরাধুনিক' (Postmodern) যুগ শুরু হয়নি। তাহলে রবীন্দ্রনাথের শিল্পজগৎ ছেড়ে নতুন জগতের সন্ধান কেন করতে হলো নবীন কবিদের? বস্তুত, বিশ্বসাহিত্যে এ সন্ধান শুরু হয়েছে অনেক আগে। "১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ফরাসী কবি শার্ল বোদলেয়ার রচিত ফ্ল্যর দ্যু মাল (*Les Fleurs du Mal*) বা 'ক্লেদজ কুসুম' কাব্যটিকে আধুনিক কবিতার প্রথম উৎস ও উদাহরণ বলা হয়।"[২] কারণ হিসেবে তিনি বলছেন, 'আধুনিক কবিতার মৌলিক লক্ষণগুলি প্রথম এই কাব্যে তীব্রতার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে দেখা গেল।'[৩] বোদলেয়ার (১৮২১-১৮৬৭)-এর কাব্যটি প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগে। কিন্তু বোদলেয়ারসৃষ্ট মৌলিক লক্ষণগুলো রবীন্দ্রনাথে দেখা গেল না। টি.এস. এলিয়ট যে Traditionand The individual Talent[৪]-এর কথা বললেন, সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি ভারতীয়। আর তাই বোদলেয়ার নন, তিনি হলেন বেদব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস-চণ্ডীদাসের উত্তরাধিকার। কিন্তু ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯), কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের কমিউনিস্ট ইশতেহারের প্রকাশ (১৮৪৮), ডারউইনের 'The Origin of the species'(১৮৫৯), ফ্রয়েডের 'The Interpretation of Dreams(১৮৯৯) , 'Three Essayson the Theory of Sexulity'(১৯০৫), ফ্রেজারের 'The Golden Bough'(১৯১৫) প্রভৃতি গ্রন্থ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮), রুশ বিপ্লব (১৯১৭), পরাধীন ভারতীয়দের স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রভৃতি ঘটনা একদিকে

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

যেমন ব্যক্তিকে বৈশ্বিক করে তুলল অন্যদিকে ব্যক্তিকে আরো বেশি করে তুলল ব্যক্তিগত। ব্যক্তির এই দ্বিধান্বিত ও দ্বিখণ্ডিত সত্তা শিল্পচৈতন্যকে সজোরে প্রভাবিত করলো। ফলে শিল্প-সাহিত্যের পথ হয়ে উঠলো বহুমুখী। বাংলাও এর ব্যতিক্রম হলো না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিজীবনের শুরুতে শুনেছিলেন 'প্রভাতপাখির গান' আর জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)-এর কবিতায় সে পাখির পালক ঝরে গেছে। তিনি শুরু করলেন 'ঝরা পালক' নিয়ে। বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)র দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থেই দেখা গেল সে 'পাখি' 'বন্দী'। তিনি বাংলা কবিতায় সরব হলেন সেই 'বন্দীর বন্দনা'য়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)র 'অর্কেস্ট্রা'য় 'ক্রন্দসী'র সুর। বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) চললেন তাই 'চোরাবালি'তে। অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) বুঝে গেলেন শুরু হয়েছে 'পালা-বদল'। দীপ্তি ত্রিপাঠী বিষয়টিকে ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত করেছেন এভাবে, 'বুদ্ধদেব প্রেমে বিশ্বাসী, বিষ্ণু দে সাম্যবাদী সমাজের আদর্শে। অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলেও দিব্যচেতনার প্রতি একটি বিশ্বাসের ভাব রয়েছে। এমনকি সুধীন্দ্রনাথের না-ধর্মীতাও একটি বিশ্বাসের মতো তাঁর কাব্যকে সংহতি দিয়েছে–তিনি অন্তত মালার্মে-ভালেরিকে বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু জীবনানন্দের অন্তর্লোকে যে-সমুদ্রমন্থন চলেছে তার উগরানো বিষ তাঁকেই পান ক'রে নীলকণ্ঠ হ'তে হয়েছে।'[৫] এভাবেই রবীন্দ্রসমুদ্রের অখণ্ড শিল্পচৈতন্য থেকে বেরিয়ে পড়লো ছোট ছোট নদী–আপন গতিপথে-আপন শক্তিতে। প্লাবিত হলো পুরো বাংলা। সিক্ত হলো মিছিলের রাজপথ থেকে ব্যক্তির অন্তর্শয্যা। রবীন্দ্রোত্তর কবিরা সে প্লাবনেরই প্রতিনিধিত্ব করলেন। বুদ্ধদেব বসু তারই পুরোহিত। রবীন্দ্রনাথ নিঃশব্দে বলে গেলেন, 'মাঝেমাঝে ভয় হয়েচে আমরা য়ুরোপের বর্তমান কালকে চিরকাল বলে মেনে নেবার ভুল করচি।'[৬] টি. এস. এলিয়ট যেমনটি বলেছিলেন, '...these beliefs have come to take their living...'[৭] ফলে শিল্পচৈতন্যে দেখা দিল বহুমত। রবীন্দ্রনাথের 'চিরন্তনতা', শুদ্ধবাদীদের 'শিল্পচেতনা' নাকি সাম্যবাদীদের 'সমাজচেতনা' কোনটি সাহিত্যের আসরে স্থায়ী হবে? নাকি রয়েছে এর চতুর্থ কোনো পথ–যার নাম সমন্বয়। কাব্যশিল্পের এই আদর্শিক দ্বন্দ্ববাদে বুদ্ধদেব বসু হয়ে ওঠেন স্বতন্ত্র সৈনিক।

বুদ্ধদেব বসু নোয়াখালীতে থাকা অবস্থায় ১৯২০/১৯২১-এ 'বিকাশ' নামে হাতে লেখা একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই নোয়াখালীতে তাঁর কবিজীবনের শুরু। এখানেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন।[৮] যাই হোক নোয়াখালী থেকে ঢাকায় এলে সেখানে ১৯২২/২৩ সালে সম্পাদনা করেন হাতে-লেখা আরেকটি পত্রিকা 'পতাকা'। ১৯২৭ সালে অজিত দত্তের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় বের করেন 'প্রগতি' আর ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশ পায় 'সচিত্র মাসিক পত্রিকা'। মূলত 'প্রগতি' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি একটি লেখকগোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ কবির সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা সেখান থেকেই। ঢাকা থেকে কলকাতায় আসার পর ১৯৩৫ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) ও সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭)-এর সঙ্গে বের করেন সেই বিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'কবিতা'। পত্রিকাটি পরবর্তীতে বুদ্ধদেব বসু একাই সম্পাদনা করেন এবং এই পত্রিকাটিই হয়ে ওঠে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিদের পরিচিতির প্রথম পদক্ষেপ ও পরীক্ষা। কেননা, প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞাপনে জানানো হয়, 'আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিরা সকলেই এতে তাঁদের রচনা প্রকাশ করবেন। নবীন কবির ভালো কবিতাও যতটা পাওয়া যায় প্রকাশিত হবে।'[৯] কবিদের পক্ষে 'আধুনিক' 'শ্রেষ্ঠ' আর কবিতার পক্ষে 'ভালো' শব্দতিনটি অত্যন্ত আপেক্ষিক। এই আপেক্ষিক শব্দতিনটির মাধ্যমে কবি ও কবিতা নির্বাচন করতে গিয়ে সম্পাদককে বেছে নিতে হয় একটা আদর্শিক অবস্থান। তার উপরে সম্পাদক স্বয়ং কবি। বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন। যার ফলে ১৯৪০ সালে তাঁর সম্পাদনায় 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র সংকলন প্রকাশিত হলে সেখানে ঠাঁই পান রবীন্দ্রনাথ। আবার 'কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত'[১০] আধুনিক কবির এমন সংজ্ঞা দিয়েও 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র সংকলনে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সর্বাগ্রে স্থান দেন রবীন্দ্রনাথকে। অন্যদিকে ১৯৫৮ সালে প্রথম প্রকাশিত দীপ্তি ত্রিপাঠীর গবেষণাগ্রন্থ 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়'-এ রবীন্দ্রনাথ নেই। আছেন

বুদ্ধদেব বসুসহ রবীন্দ্রপরবর্তী পাঁচজন কবি। এভাবেই 'আধুনিক'-এর বিভ্রান্তি বাড়ে। আর 'শ্রেষ্ঠ' ও 'ভালো' কবিতা নির্ভর করছে তাকে শিল্পাদর্শের কোন নিক্তিতে মাপা হচ্ছে তার ওপর। বাংলা কবিতার ইতিহাসে বুদ্ধদেব বসু এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে টি.এস. এলিয়টের বেশ মিল আছে। তাঁরা উভয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন চিত্রকল্পবাদী এজরা পাউন্ডের। কেননা, এজরা পাউন্ড কবিতা লেখার পাশাপাশি হয়েছিলেন 'কবিতার এক মহত্তম প্রভাব, কিভাবে [কীভাবে] কবিতা লিখতে হবে স্বয়ং তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন দ্বারা শিখালেন এবং সমকালীন শ্রেষ্ঠ লেখকদের উপর তাঁর অসাধারণ প্রভাব লক্ষণীয় হয়ে'[১১]উঠেছিল। ফলে পাউন্ডশিষ্য এলিয়ট ও বুদ্ধদেব বসু শুধু কবি-ই হলেন না, হলেন কবিদের শিক্ষক।

বুদ্ধদেব বসু কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথাসহ সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকে বেশ সফলতার সঙ্গে তাঁর শিল্পসৃষ্টিকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এসব কিছুর ভিত্তিমূলে কবিতাকেই করে তুলেছিলেন অঙ্গীরস। এ কারণে তাঁর গল্প, উপন্যাস কিংবা নাটকেও তার ছাপ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি এমন হয়েছিল। ফলে কবি হিসেবে বুদ্ধদেব বসু সবচেয়ে বেশি পরিচিত। আঠারোটি মৌলিক কাব্য লিখেছিলেন তিনি। তাছাড়া কালিদাস, শার্ল বোদলেয়ার, হোল্ডার্লিন, রাইনের মারিয়া রিলকে, পাউন্ড, রুশ কবিতা, চীনা কবিতা প্রভৃতির অনুবাদ করতে গিয়ে করেছেন মূলত কবিতার বিশ্বমন্থন। ১৯২৪ সালে বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কাব্য 'মর্ম্মবাণী' প্রকাশ পায়। এ কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়। একটা রাবীন্দ্রিক আনন্দ এ কাব্যের প্রায় সর্বত্র প্রকাশিত। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু অল্প সময়ের মধ্যে বুঝতে পারেন, 'গুরুদেবের কাব্যকলা মারাত্মকরূপে প্রতারক, সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না -বুঝে বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে।'[১২] এ কারণে বুদ্ধদেব বসু সচেতনভাবে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন। সে চেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০)। এ কাব্যে রবীন্দ্র-নজরুল প্রভাব একবারে মুছে যায়নি তবে বুদ্ধদেবের স্বকীয়তা স্পষ্ট। নারী এ কাব্যের সবচেয়ে বড় বিষয়। তবে সে নারী অধরা ও অপ্রাপ্ত। 'যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতটভূমে'[১৩] বসে কবির মনে হয়েছে 'যৌবন আমার অভিশাপ' [১৪]। 'একটি কথা' (১৯৩২)য় কবি পুরোমাত্রায় রোমান্টিক এবং স্বতন্ত্র। প্রেমকেই এ কাব্যের আধার করে তুলেছেন। এ কারণে তিনি অনুভব করেন, 'করতলে, পদতলে, বাহুতে, আঙুলে তার বহে ভালোবাসা'[১৫]–এরপরেই তিনি 'পৃথিবীর পথে' (১৯৩৬)। এ কাব্যে তিনি কবিতাকে গাঢ় সন্নিবদ্ধ করে তুলবার চেষ্টা করেছেন। কবিতায় অনুপ্রাসের সচেতন ব্যবহারে শ্রুতিমধুর করার চেষ্টা। তবে এ কাব্যে কবির একটা তৃপ্তির তুষ্টি লক্ষ করা যায়। বলতে পারেন, 'আমার প্রিয়ার প্রেমে নবজন্ম হ'লো মোর, হ'লো মুক্তিস্নান'[১৬]। 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭) আবারো অপেক্ষা সেই কাঙ্ক্ষিত নারীর জন্য। আহবান তার প্রেমের জন্য। কারণ তিনি জানেন 'কিছুই প্রেমের মতো নয়'[১৭]। এ কাব্যে কবি চিত্রকল্পকে বেশ প্রখর করে তুলেছেন। কবিতায় গল্পের একটা আভাস দিলেন। 'নতুন পাতা' (১৯৪০)য় ব্যবহার করলেন পুরো মাত্রায় গদ্যছন্দ। প্রিয়ার সঙ্গে কাল্পনিক কথার গল্পবুনন কবিতাগুলোকে অসাধারণ করে তুলেছে। সেই সঙ্গে নারীর শরীরী উপস্থাপনা তাঁর কবিতার মেজাজকে ক্রমেই বদলে দিচ্ছে। '২২ শে শ্রাবণ' (১৯৪২)-এ 'দারুণ দুর্দিনে' তিনি স্মরণ করছেন রবীন্দ্রনাথকে। 'দময়ন্তী' (১৯৪৩)তে তিনি হয়ে উঠছেন 'পূর্ণতার পুরোহিত'। 'দ্রৌপদীর শাড়ি' (১৯৪৮) তে তিনি উপলব্ধি করছেন যৌবনের অবিনশ্বরতাকে। যৌবন এক শরীর থেকে অন্য শরীরে স্থানান্তর হয়, হয় রূপান্তর। 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫)-এ তাই কবি বলতে পারেন 'সন্তানের যৌবনের তাপে রোদ্দুর পোহায় পিতা'[১৮]। এখানে পিতার প্রৌঢ়ত্ব শীতের প্রতীকে আর সন্তানের নব যৌবন বসন্তের প্রতীকে উদ্ভাসিত। বোদলেয়রীয় এ প্রতীকভাবনা বুদ্ধদেব বসুর কবিতার বিষয় ও প্রকরণ উভয় ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলে। তাঁর কবিজীবনের ধারাবাহিকতা লক্ষ করলে সেটা বোঝাও যায় যে, তিনি একটি পরিবর্তনের দিকে ধীরে ধীরে এগুচ্ছেন। পরবর্তী কাব্য 'যে আঁধার আলোর অধিক' (১৯৫৮) সে পরিবর্তনেরই মাইলপোস্ট।

'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যটি এ কারণেই আলাদা যে, এর পূর্বে প্রকাশিত কাব্যগুলোর বিষয় নারী, প্রেম, আশা, অপেক্ষা, হতাশা প্রভৃতি জাগতিক জীবনের প্রয়োজনীয় অংশ। আর এ কাব্যে বুদ্ধদেব বসু নারী, প্রেম, যৌবন বা জরা নয়–একমাত্র কবিতাকেই এ কাব্যের বিষয়বস্তু করে তুললেন। কবিতা কী, কবিতার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী, কাব্যশিল্পের পথ কেমন, কবির জীবনটাই কেমন, কীভাবে কাটে একজন কবির অহর্নিশ কিংবা কীভাবে জন্ম হয় একটি কবিতার–এমনই সব প্রশ্নের মীমাংসা দেবার চেষ্টা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তাঁর অনুবাদকের জীবন অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যের কবিতাগুলো লেখা মূলত ১৯৫৪-১৯৫৮ সালের মধ্যে। এর মধ্যে ১৯৫৬ সালে অনুবাদ করেন কালিদাসের 'মেঘদূতম'। তাছাড়া বুদ্ধদেব বসু শার্ল বোদলেয়ারের কবিতা অনুবাদ করেন ১৯৪৯-১৯৫৮ এই সময়ের মধ্যে। ফলে বোদলেয়ারের কাব্যভাবনার অনিবার্য ছাপ আছে এ কাব্যে। এসময় তিনি হোল্ডার্লিনের কয়েকটি কবিতা, কিছু চীনা কবিতা এবং এজরা পাউন্ডের কবিতাও অনুবাদ করেন। এসব অনুবাদের মধ্যে বুদ্ধদেব সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হন বোদলেয়ারের শিল্পভাবনা দিয়ে। বোদলেয়ারের কবিতার অনুবাদ এবং 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যের কবিতা লেখা প্রায় একই সঙ্গে এবং একই সময়ে চলে। এই বোদলেয়ার সম্পর্কে র‍্যাবো বলেছিলেন, 'আধুনিক ফরাসি কাব্যে প্রতীক চর্চা এবং ক্লাসিক ও রোমান্টিকতার এক অভিনব অভিযোজনায় নতুন ধারা সৃষ্টিতে বোদলেয়ার এক মহান কবি ও বিস্ময়-কবি।'[১৯] আর কাব্যজগৎ সম্পর্কে বোদলেয়ারের ধারণাটি এরকম, 'অদৃশ্যকে দেখতে হবে, অশ্রুতকে শুনতে হবে, ইন্দ্রিয়সমূহের বিপুল ও সচেতন বিপর্যয় সাধনের দ্বারা পৌঁছতে হবে অজানায়। জানতে হবে প্রেমের,দুঃখের, উন্মাদনার সবগুলি প্রকরণ, খুঁজতে হবে নিজকে, সব গরল আত্মসাৎ করে নিতে হবে। পেতে হবে অকথ্য যন্ত্রণা, অলৌকিক শক্তি, হতে হবে মহারোগী, মহাদুর্জন, পরম নারকীয়, জ্ঞানীর শিরোমণি। আর এমনি করে অজানায় পৌঁছানো।'[২০] এ কারণেই 'অন্ধকার ও বিষাদময়তার যন্ত্রণায় সমর্পিত ছিলেন বোদলেয়ার। তাই তাঁর অন্ধকারের প্রতি আত্মনিবেদন, অন্ধকারের ভেতরে, এর কোষে কোষে একবারে গোপনতম প্রদেশে স্থান দেবার জন্য কি করুণ আর্তি প্রকাশ পেয়েছে।'[২১] এই আর্তিই 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যের মূল সুর। বুদ্ধদেব বসু এই অন্ধকারকেই আলোর অধিক বলেছেন। মা যেমন নিজের গর্ভে একটা অন্ধকার আগলে রেখে অসহ্য যন্ত্রণার ভেতর অপেক্ষা করতে থাকেন অনাগত, বহু আকাঙ্ক্ষিত সন্তানের জন্য–তেমনি একজন কবিকেও এমন অন্ধকার সৃষ্টি করে সে অন্ধকার থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার নির্যাসে সিক্ত করে তুলতে হয় কাব্যভূমি। দীপ্তি ত্রিপাঠী কাব্যটির নামকরণে ক্রিস্টোফার ফ্রাইয়ের 'The darkness is light enough' নামটির সামঞ্জস্য খুঁজে পেলেও তিনি এ কাব্যের নামকরণে আঁধারের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন 'ভ্রূণ','নির্জ্ঞান মন', 'নরক', 'মৃত্যু', 'মাতৃগর্ভ', 'রাত্রি', 'সৃষ্টির পূর্ব মুহূর্ত'।[২২] বোদলেয়ারের মতো রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিদের কবিতায় অন্ধকার নানা ব্যঞ্জনায় ব্যবহৃত। জীবনানন্দ দাশ বলেন, 'গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত'[২৩] । সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'নিশীথের নির্জন আঁধারে' শুনতে পান 'বিপাশার আদিম আহবান' আর সেই অখণ্ড তিমিরের ডাকে কেড়ে নিতে চান 'মৃত্যুর বিজয় হতে তুষ্টির প্রসাদ।'[২৪] বুদ্ধদেব বসু 'বন্দীর বন্দনা', 'দময়ন্তী' প্রভৃতি কাব্যে এই অন্ধকারের আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যে অন্ধকারকেই শিল্পীজীবনের ভিত্তিভূমি হিসেবে নির্বাচন করলেন। তবে শুধু অন্ধকারের প্রতীকী ব্যঞ্জনা নয়, কবিতার সূক্ষ্ম প্রকৌশলসমূহও প্রযুক্ত হয়েছে এ কাব্যে।

১৯৫৮ সালে বুদ্ধদেব বসুর বয়স পঞ্চাশ বছর। পঞ্চাশের এই প্রৌঢ়ত্বে প্রকাশিত হলো কাব্যটি। তবে পঞ্চাশপূর্তির কয়েক বছর আগে থেকে এর কবিতাগুলো লেখা শুরু। সময়টা মূলত মানবজীবনের একটা সন্ধিলগ্ন। পেছনে পঞ্চাশ বছরের জীবনাভিজ্ঞতা আর সামনে প্রৌঢ়পরবর্তী হতাশা। অতিক্রান্ত যৌবন আর অনিশ্চিত প্রৌঢ়ত্ব এ হতাশাকে সাধারণত বাড়িয়ে তোলে। 'দময়ন্তী'র "এখন বিকেল" কবিতায় তার আশঙ্কাও ব্যক্ত। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু যাঁর মানস র‍্যাবো-বোদলেয়ার দ্বারা পরিগঠিত তিনি জীবনাভিজ্ঞতাকে

করে তুলতে পারেন স্মৃতির অক্ষয় সম্পদ। ফলে 'পঞ্চাশ' তাঁকে প্রৌঢ়ত্বে আচ্ছাদিত না করে করেছে পরিণত। এই 'পরিণত' পর্যায়ে এসে তাঁর উপলব্ধি হয় 'তোমাকেই দেবী ব'লে মানি। কিছু নেই, যা তোমার নয়।'[২৫] এই 'দেবী' কবিতার প্রতীক। সমস্তকিছুই কবিতার উপকরণ। বোদলেয়ারও তাঁর le Balcon কবিতায় বলেন, 'হে তুমি, স্মৃতির মাতা, দয়িতার ঈশ্বরীপ্রতিমা'[২৬]। তবে সব কিছু সরাসরি কবিতার অংশ হয়ে ওঠে না –এগুলো 'পৃথিবীর মাটিরে ক'রে চুমো খায় উজ্জ্বল আঙুর' এভাবে রূপান্তরিত হয়। পৃথিবী মাটি যেভাবে উজ্জ্বল আঙুরে রূপান্তরিত হয় বোদলেয়ার যাকে বলেছেন 'চুল্লির জ্বলনে দীপ্ত সেই সব সন্ধ্যার প্রয়াণ।' বুদ্ধদেব বসু রাইনের মারিয়া রিলকে'র জীবন সম্পর্কে এমনই মন্তব্য করেছিলেন। তিনি রিলকে সম্পর্কে বলেছিলেন, 'যাঁর কাছে তাঁর জীবন ছিলো তাঁর অন্তর্নিহিত অনলের ইন্ধন মাত্র: যত দেশ ও ভূদৃশ্য তিনি দেখেছিলেন; যত পশু, পাখি, ফুল, ফল, বৃক্ষকে গ্রথিত করেছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতায়; যত নগর ও স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন; যত পুরুষ তাঁকে বন্ধুতা দিয়েছিলো; যত নারী তাঁকে উৎসর্গ করেছিলো সৌহার্দ্য, ভক্তি, আতিথেয়তা, ও দেহমনের প্রণয়; সমকালীন যত লেখক, শিল্পী ও অভিনেত্রীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন–এই সব-কিছুর মূল্য যেন শুধু ততটুকুই, যতটুকু তাঁর চুল্লিতে জ্বালানি হ'তে পারে।'[২৭] 'এই সব-কিছু' হলো বাস্তব অভিজ্ঞতা যা শিল্পের চুল্লিতে (কবিমানস) জ্বালানি হয়ে সৃষ্টি করে শিল্প–জন্ম হয় কবিতার। কিন্তু কবির জীবন কেমন? এ কাব্যের "সমুদ্রের প্রতি–জাহাজ থেকে" কবিতায় বুদ্ধদেব বসু সমুদ্রের সঙ্গে নিজ কবিজীবনের অভিন্ন সত্তা (Alter ego) উপলব্ধি করেছেন। কবিকে 'সমুদ্রের মতো নিঃসন্তান' হওয়ার মতো নিঃসঙ্গ হতে হয়–বলতে হয় 'আমিও তোমারই মতো সর্বস্বান্ত হয়েছি এখন'[২৮]। বোদলেয়ারও সিন্ধু ও মানবের বৈপরীত্য বা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এই অভিন্ন সত্তার রূপটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি সিন্ধুর নিঃসঙ্গতার অতল অন্ধকারের গহ্বরকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি তুলনাটি করেছেন এভাবে, 'উভয়ে অপরিমাণ, অন্ধকার, সতর্ক তোমরা;/মানব, কেউ কি তল খুঁজে পায় তোমার গহ্বরে?/ হে সিন্ধু, কেউ কি জানে কত রত্ন তোমার অন্তরে?/ উভয়ে অসূয়াপন্ন, দাও নিজ রহস্যে পাহারা!'[২৯] এভাবেই কবির নিজের ভেতর একটি স্বনির্বাচিত অন্ধকার বা স্বেচ্ছানির্বাসন সৃষ্টি করতে হয়। এই অন্ধকারের ভেতরই অঙ্কুরোদগমিত হতে থাকে শিল্পের চারা, প্রস্ফুটিত হয় শিল্প–আলোকিত হয় মানবজীবন। কিন্তু শিল্পীকে এই শিল্পের বিনিময়ে বিসর্জন দিতে হয় সুখ। ১৯০২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ক্লারাকে লেখা রিলকে'র একটি চিঠিতে টলস্টয়ের জীবনের কথা উল্লেখ করে সুখ আর শিল্পের সম্পর্কটি এভাবে উপস্থাপিত হয়: '...অন্য সব-কিছু ছাড়তে হবে। টলস্টয়ের অপ্রীতিকর গৃহস্থালি, রদাঁর ঘরগুলির আরামহীনতা: সবই একই দিকে ইঙ্গিত করছে: তোমাকে বেছে নিতে হবে–হয় এটা, নয় ওটা। হয় সুখ, নয় শিল্প।...'[৩০] এ কারণে এ কাব্যে একাধিকবার বুদ্ধদেব বসু আশ্রয় নিয়েছেন পৌরাণিক আবহে। সেখানে কবি নিজে হয়ে উঠেছেন 'অতৃপ্ত অর্জুন'। পাঞ্চালীর অনুধ্যানে অর্জুন একের মধ্যে বিচিত্রকে অনুসন্ধান করবেন নাকি উলূপী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা প্রমুখের সান্নিধ্যে হয়ে উঠবেন বহুমুখী ও বিচিত্র। কোন পথে যাবেন কবি? কিন্তু এ পথ নির্বাচনও থাকে না কবির হাতে। কাল বা সময়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাঁর গতিপথ। "শিল্পীর উত্তর"-এ বুদ্ধদেব বলেন, 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর যদি বেছে নেন উত্তরচরিতে/তুচ্ছ ব্যাধের তীর, তবে আর কোন গুপ্ত ঋতে/গাণ্ডীবের অবিচ্ছেদ ব্যবসায়ে পূর্ণ থাকে তূণ?/ সারথি নিস্পৃহ যবে, সেইক্ষণে নিঃশেষ অর্জুন।'[৩১] তাহলে কি কবির জীবন দৈবের অধীন? দৈবের আরেক নাম তো প্রেরণা। মধ্যযুগের কবিরা দৈবাদেশে কবিতা লিখতেন। আধুনিক যুগে এসে এই আদেশই কি প্রেরণায় পরিণত হয়েছে? মূলত এই প্রেরণার আরেক নাম তাগিদ। আধুনিক কবিকে লিখতে হবে এ তাগিদ তিনি অনুভব করেন। স্বপ্ন ও সত্যের, কল্পনা ও কর্তব্যের, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির, ইচ্ছা ও অধীনতার নিরন্তন দ্বন্দ্ব আধুনিক কবিকে লিখতে বাধ্য করে। এ কাব্যের "কবি: তরুণ ও প্রৌঢ়" কবিতার Hans Christian Anderson (১৮০৫-১৮৭৫)-এর লোকগল্পের মতো তাঁকে প্রতিবার নতুন কথা কথা বলতে হয়। পাঠক শিশুর মতো শুনতে চান এর পরে কী হবে? ফলে কবিকেও 'নির্মাণের অসীম জঞ্জাল'[৩২] ভেদ করে এগিয়ে যেতে হয় গন্তব্যের দিকে। বুদ্ধদেব বসু সে পথকে

বলেছেন 'মরুপথ'। কেননা, সেই পথে '...শুধু বালি; দিগন্তের নেই অন্তরাল;/মাকড়শা, কাঁটারঝোপ, দু-একটা উটের কঙ্কাল;'[৩৩] শুধু তাই নয়, 'ভাষার পল্লীরে ঘিরে আকাশের বিরাট বন্ধনী/ ক্রমশ, ধর্ষণে, সব ভাবনাকে ভস্মে পরিণত/ ক'রে দিয়ে স্থির হয়।... [৩৪] অর্থাৎ স্বপ্ন,অভিজ্ঞতা, স্মৃতি আর বাস্তবতার বিশাল স্তর পার হয়ে তাঁকে থামতে হয় শব্দের কাছে–যেখানে অনুভূতির সর্বোচ্চ প্রকাশ। উল্লিখিত উপকরণগুলো শব্দের ভেতরে সুপ্ত হয়ে থাকে। পাঠককেই তা জাগিয়ে তুলতে হয়। কেননা, 'কোনো একটি অনশ্বর কবিতা প্রচুর অভিজ্ঞতা দাবি করে পাঠকের কাছ থেকে; ভাসা ভাসা অর্থ পেরিয়ে উপলব্ধির আলোয় অর্থের অনমনীয় শিবত্বে পোঁছানো দরকার।'[৩৫] ফলে আধুনিক কবিকেও অভিজ্ঞ হতে হয়। কারণ, 'অল্প জল, তৃষ্ণার যথেষ্ট নয়।...'[৩৬] কবির এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 'মরীচিকার পর্দা ছিঁড়ে, দেখা দেয় প্রথম খেজুর,'[৩৭] অর্থাৎ শিল্পের প্রকাশ্য কাব্যপ্রতিমা। এ প্রতিমার অন্ত্যমিল, ছন্দ এইসব অলংকার দৃশ্যমান নয়। সত্তার একাগ্রচিত্ততায় যেমন প্রতিমার প্রকৃত রূপ অনুভব করা যায় তেমনি আধুনিক কবিতার অন্ত্যমিল বা ছন্দ অনুভবসাপেক্ষ। একাগ্রতার নিবিড় পাঠে তা উপলব্ধি করা যায়। কারণ এর ছন্দ 'শূন্যতায় তার বেঁধে নিঃশব্দে' বেজে ওঠে, এর মাত্রার হিসেব 'নিরঞ্জন গণিত'-এর অংশ। এ ধরনের 'শূন্যতা' বোদলেয়ার ও বুদ্ধদেব বসু উভয়ের কবিতায় প্রকৃতিনির্বাচনে দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে বোদলেয়ারের স্বকীয় উক্তি আছে। তিনি মনে করেন, 'Nature is ugly'[৩৮]। প্রকৃতি শুধু কুৎসিৎ-ই নয়, প্রকৃতি অকৃত্রিম, অসম্পূর্ণ ও শুদ্ধ–এ-ই আধুনিক কবিদের বিশ্বাস। আধুনিক কবিরা এই কুৎসিৎ, অসম্পূর্ণতাকে তাঁদের শিল্পপ্রকৌশলে করে তোলেন সুন্দর ও সম্পূর্ণ। এ কারণে শিল্প কৃত্রিম ও অশুদ্ধ। কারণ প্রকৃতির নানা উপকরণ রূপান্তরিত হয় শিল্পে। দৃষ্টান্ত হিসেবে জীবনানন্দের "বনলতা সেন" কবিতার বিখ্যাত উপমাটির কথা বলা যেতে পারে। বাস্তবে খড়কুটো, ময়লা আবর্জনা কুৎসিৎ, অসুন্দর ও অকৃত্রিম। পাখির ঠোঁটে তা কিছুটা রূপান্তরিত হয়ে যখন নীড়ে পরিণত হয় তখন তা কিছুটা সুন্দর ও কৃত্রিম হয়ে ওঠে। এখানে প্রয়োজনটা বড়। এর পর সেই নীড় জীবনানন্দের চিন্তায় যখন শিল্পিত হয়ে বনলতার চোখের সঙ্গে উপমিত হয় তখন তা হয়ে ওঠে আশ্রয়ের প্রতীক। এ আশ্রয় পাখির নয়–এ আশ্রয় জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত,বিপর্যস্ত ব্যক্তির মানসিক আশ্রয়। আর তখনই সেই নীড় সুন্দর ও সম্পূর্ণ হয়ে হয়ে ওঠে। প্রকৃতি এভাবেই রূপান্তরের কয়েকটি স্তর পেরিয়ে শিল্পের অনুষঙ্গ লাভ করে। তবে এই পুরো প্রক্রিয়াটি ঘটে শিল্পীর অন্তরে–চিন্তার মধ্যে, বাইরের দৃশ্যমান জগতে নয়। ফলে বুদ্ধদেব বসুকে বলতেই হয়, 'প্রান্তরে কিছুই নেই; জানালায় পর্দা টেনে দাও'[৩৯]। এভাবেই 'রূপান্তর থেকে রূপান্তরের' মধ্য দিয়ে কবি প্রকৃতির ভেতর থেকে 'উন্মোচন' করেন আধুনিক মানুষের অন্তর্মুখ–শিল্পের শব্দপ্রতিমা। এ কারণে বুদ্ধদেব বসু বলতে পারেন, ' ...জগতেরে ছেড়ে দাও, যাক সে যেখানে যাবে;'[৪০] জগৎ ছেড়ে দিয়ে কবি কবিতা লিখবেন তাহলে কী নিয়ে? এর উত্তর উল্লিখিত রূপান্তরপ্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত। মূলত, 'বোদলেয়ার-প্রভাবিত হবার পরই বুদ্ধদেব বসু প্রকৃতি-বিরোধিতাকে কাব্যরূপ দেন।'[৪১] তাহলে কবিতার উদ্দেশ্য কী? জগতে মানুষকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক,শারীরিক, মানসিক এমনই নানা চাহিদা, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। এইসব চাহিদার যোগান দেয়া বুদ্ধদেব বসুর মতে কবিতার উদ্দেশ্য নয়। এ ব্যাপারে বুদ্ধদেব বসুর স্পষ্ট মতামত, 'আমি যদি কবি হই তাহ'লে কবি হিসেবে আমার কর্তব্য ভালো কবিতা লেখা, তাছাড়া কিছু নয়, জীবনের সঙ্গে সেই আমার যোগসূত্র।'[৪২] এই যোগসূত্র স্থাপনের জন্যই তিনি জীবন বা জগৎকে ততটুকুই প্রাধান্য দেন যতটুকু তাঁর কবিতার 'জ্বালানি' দরকার। ফলে শিল্পী হিসেবে তাঁর কাছে শিল্পই বড়–অন্য কিছু নয়। কেননা, শিল্প সৃষ্টি করতে গিয়ে জগৎকে বড় করে দেখলে শিল্প ছোট হয়ে যায় কিন্তু জগৎ বড় হয় না। অন্যদিকে নষ্ট হয় শিল্পীর প্রচেষ্টা। এ কারণে 'ব্যতিব্যস্ত পাণ্ডাদের জগঝম্প, চামর, পাহারা' এড়িয়ে কবি থাকেন 'উদাসীন, শান্ত, ছন্নছাড়া'[৪৩]। কবিতায় কী নেই বা খোঁজার চেষ্টা করে লাভ নেই তা বুদ্ধদেব বসু বলে দেন এভাবে,'এত নয় জড়িত জনগণের বিরাট নিয়তি-/অভ্যুদয়, পতন, পথ্য, সেবা, স্বাধীনতা। কোনো হাত নেই ইতিহাসে।...'[৪৪] কারণ মহাকবিদের শিল্প-দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেন, '...অর্থ আর মোক্ষের

প্রগতি/আনেননি বাল্মীকি, ভার্জিল,সাফো।...'[৪৫]। কবিতাটিতে কবি নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন তাহলে কেন কবিতা লেখা? এর কোনো উত্তর তিনি দেননি। শিল্পের কাছে মানুষের চাহিদা সংজ্ঞার বাইরে। তবুও বলা যেতে পারে আত্মিক পরিতৃপ্তি শিল্পের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সফলের জন্য চাই শিল্পের শুদ্ধতা। শিল্পের এ শুদ্ধতা সৃষ্টির জন্যই শিল্পীকে হতে হয় 'অচিকিৎস্য ক্ষরণের ব্যাধির অধীন', 'নামহীন, প্রাচীন অনলে' তাঁকে 'মোমের মতো জ্বলে' সৃষ্টি করতে হয় শিল্পের আলো। সে আলোয় স্পষ্ট হয় মানুষের অন্তর্জগৎ। শিল্পীর জন্য তখন 'আঁধার'ই হয়ে ওঠে শিল্পের আধার। এই আঁধারই আলোর অধিক।

বোদলেয়ার তাঁর কবিতায় 'ক্লেদজ কুসুম'-এর ক্লেদকে 'প্রোজ্জ্বল' করে তুলেছিলেন আর বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতায় 'আঁধার'কে করে তুলেছেন 'আলোর অধিক'। দৈবাদেশে দেবীর জন্য নয়, যন্ত্রণাক্লিষ্ট ব্যক্তি কবিতা লিখবেন নিজের জন্য–সেখানেই শিল্পীর মুক্তি। তবে, 'শিল্পের জন্য শিল্প' এ শর্ত তাঁকে অবশ্যই মানতে হবে–এই হলো বুদ্ধদেব বসুর শিল্পচেতনা। 'যে আঁধার আলোর অধিক' সে চেতনারই কাব্যনির্যাস।

তথ্যনির্দেশ

১. বুদ্ধদেব বসু, "ভূমিকাঃ সংস্কৃত কবিতা ও 'মেঘদূত' ", 'কবিতা সংগ্রহ ৪' (নরেশ গুহ সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৫

২. মঞ্জুভাষ মিত্র, "আধুনিকতার শিল্পতত্ত্বঃ ইয়োরোপীয় আধুনিক কবিতা ও বাংলা আধুনিক কবিতা", 'আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১১

৩. তদেব

৪. T.S. Eliot, Selected Prose (John Hayward edt.), Penguin Books Ltd., Great Britain,1963, p.21-30

৫. দীপ্তি ত্রিপাঠী, "জীবনানন্দ দাশ", 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১১৮

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সমকালীন প্রতিক্রিয়া", উদ্ধৃত, ভূঁইয়া ইকবাল, 'বুদ্ধদেব বসু', ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০২২, পৃষ্ঠা ২২

৭. T.S. Eliot, "TRADITION" Selected Prose (John Hayward edt.), Penguin Books Ltd. Great Britain,1963, P. 20

৮. ভূঁইয়া ইকবাল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮

৯. উদ্ধৃত, ভূঁইয়া ইকবাল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭

১০. আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), 'আধুনিক বাংলা কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৮

১১. মঞ্জুভাষ মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫০

১২. বুদ্ধদেব বসু,'সাহিত্যচর্চা', সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৩৬১, পৃষ্ঠা ১৩৭

১৩. বুদ্ধদেব বসু, "শাপভ্রষ্ট", 'বন্দীর বন্দনা', 'কবিতা সংগ্রহ ১', নরেশ গুহ (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১৯

১৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০

১৫. বুদ্ধদেব বসু, " প্রেমিকের প্রার্থনা", 'একটি কথা', 'কবিতা সংগ্রহ ১', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯০

১৬. বুদ্ধদেব বসু, "মুক্তিস্নান", 'পৃথিবীর পথে', 'কবিতা সংগ্রহ ১', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৩

১৭. বুদ্ধদেব বসু, "কিছুই প্রেমের মতো নয়", 'কঙ্কাবতী', 'কবিতা সংগ্রহ ১', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৬-১৪৮

১৮. বুদ্ধদেব বসু, "মৃত্যুর পরেঃ জন্মের আগে", 'শীতের প্রার্থনাঃ বসন্তের উত্তর', 'কবিতা সংগ্রহ ২'নরেশ গুহ (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৯৮

১৯. উদ্ধৃত, ড. সফিউদ্দিন আহমদ (ভাষান্তর), 'কবিতার বিস্ময় বোদলেয়ার-র‍্যাবো-পাবলো নেরুদা', জিনিয়াস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা ২২

২০. ড. সফিউদ্দিন আহমদ, পূর্বোক্ত

২১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৯

২২. দীপ্তি ত্রিপাঠী, "বুদ্ধদেব বসু",'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৩

২৩. জীবনানান্দ দাশ, "অন্ধকার", 'বনলতা সেন', 'কবিতা সমগ্র' (রবিউল ইসলাম সম্পা.), মৌ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা ১২২

২৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, "পুনর্জন্ম", 'অর্কেস্ট্রা', 'কাব্যসংগ্রহ' (বুদ্ধদেব বসু ভূমিকা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৪৮-৫০

[২৫] বুদ্ধদেব বসু, "স্মৃতির প্রতি ১", 'যে আঁধার আলোর অধিক', 'কবিতা সংগ্রহ ৩', নরেশ গুহ (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৬৭

[২৬] শার্ল বোদলেয়ার, le Balcon, spleen et ideal, বুদ্ধদেব বসু (অনু.), "বারান্দা", 'বিতৃষ্ণা ও আদর্শ', 'কবিতা সংগ্রহ ৪', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪২

[২৭] বুদ্ধদেব বসু, 'ভূমিকা: রাইনের মারিয়া রিলকে তাঁর কবিতা ও তাঁর জীবন' 'কবিতা সংগ্রহ ৫', নরেশ গুহ (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৬১

[২৮] বুদ্ধদেব বসু, "সমুদ্রের প্রতি-জাহাজ থেকে", 'যে আঁধার আলোর অধিক', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৯

[২৯] শার্ল বোদলেয়ার, "L' Homme et la Mer", 'spleen et ideal', বুদ্ধদেব বসু (অনু.), "সিন্ধু ও মানব", 'বিতৃষ্ণা ও আদর্শ', 'কবিতা সংগ্রহ ৪', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২২

[৩০] উদ্ধৃত, বুদ্ধদেব বসু, 'ভূমিকা: রাইনের মারিয়া রিলকে তাঁর কবিতা ও তাঁর জীবন',পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৯

[৩১] বুদ্ধদেব বসু, "শিল্পীর উত্তর", 'যে আঁধার আলোর অধিক', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৫

[৩২] বুদ্ধদেব বসু, "নির্বাসন", 'যে আঁধার আলোর অধিক', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮০

[৩৩] বুদ্ধদেব বসু, "মরুপথ", 'যে আঁধার আলোর অধিক', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮২

[৩৪] তদেব

[৩৫] জীবনানন্দ দাশ, "কবিতাপাঠ", 'কবিতা কথা', বিভাস, ঢাকা, ২০১১, পৃষ্ঠা ৪৯

[৩৬] বুদ্ধদেব বসু, "মরুপথ", পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৩

[৩৭] তদেব

[৩৮] শার্ল বোদলেয়ার, 'Curiosite's Esthetiques', উদ্ধৃত, মঞ্জুভাষ মিত্র, "আধুনিকতার শিল্পতত্ত্ব: ইয়োরোপীয় আধুনিক কবিতা ও বাংলা আধুনিক কবিতা", 'আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব',পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৮

[৩৯] বুদ্ধদেব বসু, "আটচল্লিশের শীতের জন্য:২", 'যে আঁধার আলোর অধিক',পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৫

[৪০] বুদ্ধদেব বসু, "রাত তিনটের সনেট:১", 'যে আঁধার আলোর অধিক', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮১

[৪১] মাহবুব সাদিক, 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা বিষয় ও প্রকরণ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১১৩

[৪২] বুদ্ধদেব বসু, 'সব-পেয়েছির দেশে', নাভানা, কলকাতা, ১৩৬০, পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯

[৪৩] বুদ্ধদেব বসু, "রাত তিনটের সনেট:১",পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮০-৮১

[৪৪] বুদ্ধদেব বসু, "কেন?", 'যে আঁধার আলোর অধিক', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৪

[৪৫] তদেব

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা : রাজনীতি-ভাবনা
(Sunil Gangopadhyay's Poetry : Political Thoughts)

নীলিমা তাবাস্‌সুম*

Abstract: Sunil Gangopadhyay is the fancy-agony poet of Bengali poetry. He who seeks the advanced dream-real life in the light of life, but in the end he gained helpless-incomplete human melancholy. On the 5th decade he started his career in Bengali poetry. At that time, Sunil became widely known as the initiator of new ideas in poetry. In his poetry, the reflection of the thoughts are noticeable beyond the old thoughts. He has presented contemporary global issues in his poetry through a simple and readable way. Political issues are significantly mentioned in Sunil Gangopadhyay's poetry. Political issues have seen established in poetry by his philosophical views. Sunil thought that, a state becomes peaceful only by establishing humanity. He had a dream for secular world. Overall he suggested to establish the political environment with humanitarian values; he always gave importance to common people above everything. He cherished socio-equal thoughts. He composed many poems on the subject of political happiness-prosperity, misery and anarchy of India in both subjugated and independent situations. Sunil arised his pen against political themes. His poetry is varied philosophically in it's political thoughts and situations. In this article there is an attempt to analyze the aspect of political thoughts in Sunil Gangopadhyay's poetry.

আধুনিকতা একটি কালগত ও জীবনদর্শনগত বিষয়। মানুষের বেঁচে থাকাই সবচেয়ে আধুনিক বিষয়। তার জীবননিষ্ঠ প্রাগ্রসর-ভাবনাই আধুনিকতা। পরিবর্তনকে ধারণ করার ক্ষমতা আধুনিকতারই নামান্তর। উনিশ-বিশ শতকের মানবিক চেতনাবোধ, বিশ্বাসপ্রবণতা, রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা পরিবর্তিত পালাবদলে আধুনিক হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে। সময়ের পরিক্রমায় এ রীতিতে সর্বদা পরিবর্তন হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে একজন কবি নিজ সময়ে নিজের মতো করে আধুনিক হয়ে উঠেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণীমতে, শুধু বাঁক বদলের মধ্য দিয়েই কবিতা আধুনিক হয়ে ওঠেনি, বরং সেই বাঁক বদলের ঝোঁকটিই মুখ্য বলে বিবেচিত। বাংলা সাহিত্যে বিশ শতক এক নবলব্ধ আধুনিক সময়। এ সময় সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধে সংশয় ও নৈরাশ্যবোধের তীব্রতা সবচেয়ে প্রকট হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় বিভিন্ন কাব্যান্দোলন, বৈশ্বিক তাৎপর্যময় বৈপ্লবিক ঘটনা, বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কার প্রভৃতির অনুপ্রেরণায় সমাজে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ের বাংলা কবিতার কবিগণ রবীন্দ্রনাথকে পরিহার করে ইউরোপীয় কবিদের আদর্শ গ্রহণের নিমিত্তে নিজেদের প্রস্তুত করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। তবে তা সম্পূর্ণরূপে ফলপ্রসূ হয়নি। বরং সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথও তাঁর রচনার মাধ্যমে নিজেকে আধুনিক হিসেবে প্রমাণ করেছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আধুনিক বাংলা কবিতায় যুগান্তকারী প্রভাব বিস্তার করে। এর প্রভাবে বৈশ্বিক চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। ভারতবর্ষে বিভিন্ন আন্দোলনের (বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, মুদ্রাস্ফীতি, দুর্ভিক্ষ) মাধ্যমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। কবিতার বিশ্লেষণ-কেন্দ্রিক সমালোচনায় দশক চিহ্নিতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর ধারাবাহিকতায় পঞ্চাশের দশক একটি তাৎপর্যময় সময়। এ সময়ের কবিতাকেন্দ্রিক সাহিত্য পত্রিকাগুলো সমকালীন অধ্যয়ন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ

---

* এম.ফিল. গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

হয়ে ওঠে। সেই ক্ষণের আলোচিত কবি হলেন– শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৯৫), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২), শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১), অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩-২০২০), আলোক সরকার (১৯৩৩-২০১৬) -সহ আরও অনেকে। *শতভিষা* ও *কৃত্তিবাস* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তাঁদের সাহিত্য রচনার পরিবেশ আবর্তিত হয়। প্রেম, প্রকৃতি, জীবন, মৃত্যু, মানুষ, সমাজ, রাজনীতিসহ সমকালীন সবকিছুই তাঁদের রচনায় নবরূপে আবিষ্কৃত হয়।

পঞ্চাশের দশকের আধুনিকমনস্ক কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সমগ্র জীবনব্যাপী কবি হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ ও আত্মপরিচিতি প্রদানে ব্যাকুল থেকেছেন। সাহিত্যের বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁর পরিভ্রমণ হলেও, কবি হিসেবে তাঁর আত্মতৃপ্তি ছিল সম্পূর্ণরূপে। তিনি মুক্তমনা ও উদারপন্থী মানুষ হিসেবে সমাদৃত। তাঁর কবিতায় এর স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষণীয়। স্বভাবসিদ্ধ রোমান্টিকতার পাশাপাশি সমাজ ও সমকালীন রাজনীতি তাঁকে পরিপূর্ণ নাগরিক ও সাহিত্যিক হিসেবে প্রবুদ্ধ করে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন একজন সংবেদনশীল মানুষ। সমকালীন রাজনীতিতে সংঘটিত বিভিন্ন পালাবদলকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। রাজনীতি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে গোষ্ঠিবদ্ধ মানুষ তাদের রাজনৈতিক আদর্শ অনুসারে নিজেদের সমাজকে বিন্যস্ত করে। সভ্যতার সূচনা থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির বিস্তার লক্ষণীয়। সময়ের সাথে সাথে রাজনীতির গতিপ্রকৃতিতেও পরিবর্তন আসে। বিশেষ করে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে বৈশ্বিক রাজনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ক্ষমতা ও আদর্শগতভাবে একে অপরের সাথে জড়িত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে রাজনৈতিক জটিলতা বিরাট আকার ধারণ করেছে। ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি বিচিত্র ও জটিল ধারায় আবর্তিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় উপাদান এ অঞ্চলের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা সঞ্চারিত করলেও, সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার সংকট সৃষ্টি করেছে। এই রাজনীতি মূলত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন সমস্যা ও তা সমাধানের মাধ্যমে রাজনীতির প্রক্রিয়া অগ্রসরমান হয়েছে। শুধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নয়; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর সাহিত্যকর্মে শৈল্পিক উপায়ে সমকালীন রাজনীতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সুনীলের পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাশ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, রাম বসু প্রমুখ কবির কবিতায় দেশীয় রাজনীতির পাশাপাশি বৈশ্বিক রাজনীতিরও প্রতিফলন লক্ষণীয়। তাঁদের কবিতায় দেশভাগ (১৯৪৭), হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা (১৯৪৬), তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬), তেলেঙ্গানা আন্দোলন (১৯৪৬), খাদ্য আন্দোলন (১৯৬৬), ভাষা আন্দোলন (১৯৫২), নকশাল বিদ্রোহ (১৯৬৭), মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) -সহ সমকালীন রাজনীতির প্রায় প্রতিটি প্রসঙ্গই স্থান করে নিয়েছে। সুনীলের কবিতায় এসব বৈশ্বিক রাজনীতির প্রতিফলন দেখা যায়, যা কবি সুনীলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাজনীতি ভাবনার পরিচায়ক।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জন্মসূত্রে বাংলাদেশের মাদারিপুর অর্থাৎ বর্তমান ফরিদপুরের অধিবাসী ছিলেন। ১৯৪৭ সনে দেশ স্বাধীন হবার অপেক্ষা, দেশবিভাগের যন্ত্রণা কবি ও তাঁর পরিবারকে পীড়িত করেছিল। এর পূর্বে ১৯৪৩ সনের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ তাঁকে ভীষণভাবে আহত করে। ১৯৪৬ সনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাঁর কিশোর মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নৃশংস পরিণাম তাঁকে পীড়িত করে, সেই সাথে ১৯৪৫ সনে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপের ঘটনা কবিসহ সমগ্র বিশ্ববাসীকে আলোড়িত করে। ১৯৫০ সনে পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায় কলকাতায় শরণার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এর প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ মোকাবেলায় সরকারকে হিমশিম খেতে হয়। ফলে পেশাগত সঙ্কট উপস্থিত হয় এবং বেকার সমস্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৫২ সনে পূর্ববঙ্গে ভাষা আন্দোলন তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ বছরেরই ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মিছিলে সরকারপক্ষের পুলিশবাহিনী গুলি চালায়। এর ফলে রফিক, সালাম, জব্বার, বরকতসহ অনেক ছাত্র-জনতা শহিদ হন। এ ঘটনায় সমগ্র বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষার প্রতি জনমত সৃষ্টি হয়। ১৯৬১ সনে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষের আনন্দানুষ্ঠানের ক্ষণে

শিয়ালদহের প্ল্যাটফর্ম উদ্বাস্তুতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ক্ষুধার হাহাকার সমগ্র রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে। এ বছরেরই নভেম্বর মাসে মলয় রায়চৌধুরী, সমীর রায়চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দেবী রায়ের উদ্যোগে পাটনা থেকে হাংরি আন্দোলনের ইশতেহার *হাংরি বুলেটিন* ইংরেজিতে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা সাহিত্যের এমন একটি ছোটকাগজ যা নতুন জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির উদ্রেক করে। এটি মধ্যবিত্তের প্রচলিত জীবনবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। হাংরি আন্দোলনের কবি তথা লেখকগণ প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাকে সমূলে বিনাশ করে মুক্তবোধের জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। ইংরেজ কবি চসারের “In the sowre hungry tyme” পঙ্ক্তিটি থেকে ‘হাংরি’ শব্দটি গ্রহণ করেন মলয় রায়চৌধুরী। পরবর্তীতে এই ছোটকাগজকে কেন্দ্র করে *হাংরি জেনারেশন* -এর উদ্ভব ঘটে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর “সীমান্ত প্রস্তাব ১-মুখ্যমন্ত্রী প্রতি নিবেদিত” কবিতাটি প্রতিরোধের উদ্দীপক হিসেবে এ ছোটকাগজে উপস্থাপন করেন:

> কবিতা ভাতের মতো কেন লোকে নিতেই পারছে না
> যুদ্ধ বন্ধ হলে নেবে? ভিখারিও কবিতা বুঝেছে
> তুমি কেন বুঝবে না হে অধ্যাপক, মুখ্যমন্ত্রী সেন?[১]

১৯৬৬ সনে স্বাধীন ভারতে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। সেই সময় থেকেই ভারতবর্ষে মুদ্রাস্ফীতি, পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের জন্য আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। খাদ্য, ওষুধসহ নিত্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলোতে ভেজালের আধিক্য দেখা দেয়। চোরাকারবারিরা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। অন্যদিকে, পূর্ববঙ্গে ছয় দফা আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারারুদ্ধ হন। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে এক ধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ১৯৬৮ সনে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের সূচনা হয়। এ সময় উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যা হয়। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত নকশাল আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে। সমগ্র কলকাতাব্যাপী এক ধরনের থমথমে পরিবেশ বিরাজ করে। নকশালদের বিক্ষোভে সরকারপক্ষ এবং সাধারণ জনতা তটস্থ হয়ে থাকে। ১৯৬৮ সনে নকশাল নেতা কানু সান্যাল গ্রেফতার হন। এরপর এ আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সন। পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতাকামী জনতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করে, যা স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ‘বাংলাদেশ’ নাম নিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নেয়। ১৯৯২ সনে রাম মন্দির-বাবরি মসজিদ-কেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও মৌলবাদীদের বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতাসহ সমগ্র বিশ্ববিবেককে আলোড়িত করে। এ সময় এবং তৎপরবর্তী রাজনৈতিক বিষয়গুলো কবি-সাহিত্যিকগণ শিল্পের আড়ালে বিভিন্ন উপায়ে উপস্থাপন করেছেন।

কবিতার ভেতরে কবির বিবেক প্রস্ফুটিত হয়। পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণকারী কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রাজনীতি-ভাবনায় ছিলেন প্রখর। শৈশবেই উপলব্ধি করেছেন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দুর্বিষহ শাসন ও অমানবিক রূপ। কিশোর বয়সেই আপন বিবেক থেকেই সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনিটিকে কণ্ঠসঙ্গী করে নিয়েছিলেন। ইংরেজদের অমানবিক শাসনে ভারতবর্ষ কতোটা অসহায় হয়ে উঠেছিল তা কিশোর কবি উপলব্ধি করেন। সেসময় *আজাদ হিন্দ ফৌজ-* এর বিচার বন্ধ করার দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে। পুলিশের গুলিতে প্রাণনাশও ঘটে কয়েকজন বিদ্রোহীর। কলকাতা শহরজুড়ে প্রতিদিন প্রতিবাদ-মিছিল লেগেই থাকতো। সাধারণ মানুষ পারস্পরিক ধর্মবিদ্বেষকে উপেক্ষা করে *আজাদ হিন্দ ফৌজ-* এর মুক্তির দাবিতে একজোট হন। এর পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টির কেউই নেতাজী সুভাষ বসু ও তাঁর অনুগামীদের যুদ্ধনীতিকে সমর্থন করেননি। জওহরলাল নেহেরু এর তীব্র বিরোধীতা করেন এবং বলেন যে, সুভাষচন্দ্র বসু সসৈন্যে ভারতবর্ষে এলে তিনি স্বয়ং তাদের বাধা দেবেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের মানুষ যখন সুভাষ বসু তথা *আজাদ হিন্দ ফৌজ-* এর মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন, তখন কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষেই বিরোধীতাপূর্ণ কর্মকাণ্ড সাধন সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

কলকাতায় প্রথম আন্দোলন শুরু করে ছাত্ররা। অস্ত্রধারী পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়েও তারা পিছপা হয়নি। তাদের সাথে সর্বস্তরের মানুষ একাত্মতা পোষণ করে রাজপথে নেমে আসে:

> হাজার হাজার মানুষ জমা হতে লাগল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। বিভিন্ন দিক থেকে মিছিল আসছে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আর তিল ধারনের জায়গা নেই, পঞ্চাশ-ষাট হাজারের চেয়েও বেশি মানুষ ছড়িয়ে আছে চারিদিকের রাস্তায়। তাদের মধ্যে কংগ্রেসের তে-রঙা পতাকা, মুসলিম লিগের সবুজ পতাকা, কমিউনিস্টদের লাল ঝাণ্ডা, হিন্দু মহাসভার গৈরিক পতাকা, এক একটা গোষ্ঠী আওয়াজ তুলছে, বন্দে মাতরম্, আল্লা হো আকবর, ইনকিলাব জিন্দাবাদ; আবার সমবেতভাবে গর্জন করছে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক! পুলিশি জুলুম চলবে না।[২]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাল্যকালেই দেশের রাজনীতি, দেশপ্রেমিকদের আত্মত্যাগ অর্থাৎ দেশপ্রেমকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং অনুভব করেছেন। *ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান* নামক গ্রন্থ পাঠ করে তিনি দেশপ্রেমিকদের জীবন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। ক্ষুদিরাম (১৮৮৯-১৯০৮), সত্যেন (১৮৮২-১৯০৮), কানাই (১৯০৯-১৯৩১), ভগৎ সিং (১৯০৭-১৯৩১), সূর্য সেন (১৮৯৪-১৯৩৪) প্রমুখ দেশপ্রেমিকদের জীবনী বালক সুনীলকে ঋদ্ধ করে। দেশের জন্য নিজের মনে আবেগ সঞ্চার হয়। *আজাদ হিন্দ ফৌজ* বাহিনীর ধর্মনিরপেক্ষতার মন্ত্রটি সুনীলের মনে স্থান করে নেয়। দেশ-মাটি-মানুষ-সংস্কৃতি তাঁর কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে।

১৯৪৬ সনে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা একটি বিশেষ বিশৃংখলার তৈরি করে। এর পূর্বেও ভারতে এমন দাঙ্গা হয়েছে, তবে তা এতো গুরুতর ছিল না। এ বছরের ১৬ই আগস্ট ভারতের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রথমে এটি কলকাতায় শুরু হলেও, পরবর্তীতে তা চট্টগ্রাম, পাবনা, বরিশাল, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সন্দীপ, বিহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। দেশজুড়ে পৈশাচিক নরহত্যার রোল ওঠে। এসময় সুনীলের বয়স ছিল বারো বছর। তিনি বা তাঁর পরিবার কেউই প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হননি, তবে চোখের সামনে সেই নারকীয় উল্লাসের ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখেছেন। সেই রক্তমাখা দিনগুলো সুনীলকে ভীষণ পীড়িত করে। সমস্ত শহরে আগুন জ্বলছে, নেতাদের ইন্ধনে হিন্দু-মুসলমানরা একে অপরের বুকে ছুরি চালাচ্ছে। সেই সব লাশে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেশপ্রেম ও ধর্মরক্ষার নামে চলছে অরাজকতা। সুনীলের কবিতায় লক্ষণীয়:

> তখন হিংসেয় জ্বলছে শহর, মানুষের হাতের ছুরি গেঁথে যাচ্ছে
> মানুষেরই বুকে
> রাস্তায় বসে লাশের আগুনে পুড়িয়ে খাচ্ছে ধর্ম
> রক্তবমির মতন ওগরাচ্ছে দেশপ্রেম[৩]

নেতাদের রক্ত গরম করা উস্কানিমূলক বক্তব্যে হিন্দু-মুসলমানরা লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও বাঁশ, ছুরি দিয়ে পিটিয়েছে। দরিদ্র থেকে শিশু-কিশোর কেউই রক্ষা পায়নি। অথচ সেই অসহায়, খেটে খাওয়া মানুষেরা জীবিকার তাড়নায়-ই দিনাতিপাত করেন, ধর্ম নিয়ে তাদের সেই অর্থে দ্বন্দ্ব নেই। এসব নৃশংসতা স্বচক্ষে উপলব্ধি করেও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেননি; বরং মানবধর্মকে কবিতায় বারবার প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্বাধীনতার অনেক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তবুও ধর্মের নামে অহেতুক রক্তপাত বন্ধ হয়নি। সাম্প্রদায়িক অরাজকতার মধ্যেও হিন্দু-মুসলিমরা নিজ নিজ ধর্ম পালনে ব্যস্ত হয়ে থাকেন, যা দৃষ্টিকটু এবং মূল্যবোধহীনতার পরিচায়ক। অন্যান্য ধর্ম খ্রিস্টান, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে সাম্প্রদায়িক বিপর্যয় পরিলক্ষিত হয়, তা নিতান্তই অমানবিক। কবি সুনীল ব্যক্তিজীবনে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখে দুঃখ পেয়েছেন। মন্দির-মসজিদ-গীর্জায় উপাসনায় ব্যস্ত স্ব স্ব ধর্মের মানুষ। কিন্তু ধর্মের

নামে হত্যাযজ্ঞ থেমে নেই। এসব অরাজকতার বিরুদ্ধে সুনীল তাঁর কবিতার মাধ্যমে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন:

আমি দ্বিধাহীনভাবে শতসহস্র নিঃশব্দ প্রতিবাদকারীর সঙ্গে
কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চায় [চাই]
যে হিন্দু স্বার্থপরের মতো রোজ পুজোআর্চায় মাতে
যে মুসলমান পারিপার্শ্বিকের প্রতি চোখ বন্ধ করে রোজ পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে
যে খ্রিস্টান অন্য ধর্মের মানুষদের অধঃপতিত মনে করে
যে শিখ শুধু ধর্মের দাবিতে রাজনৈতিক অধিকার চায়
তারা শুধু আত্মপ্রবঞ্চক নয়, তারা অধার্মিক, তারা খুনি
প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে তারা মাতৃহত্যা, শিশুহত্যার
জন্য দায়ী[৪]

শাসক-শোষিতের সম্পর্কের টানাপড়েনের মধ্য দিয়েই সমগ্র পৃথিবী পরিচালিত হচ্ছে। পৃথিবীর স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সমাজের সুবিধাবাদী নেতারা সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করে বিপদগামী করে। নিজেদের সুরক্ষিত রেখে তারা সাধারণ জনতাকে দেশপ্রেমের মেকি কথা শোনায়। মানুষ রাজপথে নেমে জীবন বিসর্জন দেয়, অথচ সুবিধাভোগী নেতাদের তখন খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা বিনা দ্বিধায় রাজনীতিতে বহাল থাকেন। এ ধরনের শোষকদের মেকি প্ররোচনা থেকে সাধারণ মানুষকে সাবধান হওয়ার আহ্বান করেছেন কবি। প্রতিনিয়ত দেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে এই খেটে খাওয়া মানুষদের আত্মত্যাগের কথা খবর হয়ে উঠেছে। তাদের শরীরের তাজা রক্ত দিয়ে লেখা খবরের কাগজের কালো অক্ষরগুলো। সাদামাটা জীবনধারী মানুষের প্রাণনাশ হচ্ছে রক্তপিপাসু ঘাতকদের কূটবুদ্ধিচক্রে। রাজনীতির স্বচ্ছতা সমাজ থেকে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। শহরের প্রতিটি সাদা দেয়ালে মেহনতি মানুষের রক্তের চিহ্ন দৃশ্যমান। নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নেতারা বদ্ধপরিকর। নিজেরা নিশ্চিন্তে সুখশয্যায় দিনাতিপাত করেন। মানুষ হয়ে ওঠে অমানুষ, পৈশাচিক বর্বর নেতারা জোঁকের মতো সংগ্রামী সাধারণ জনতার রক্তে দেশকে রক্তাক্ত করে তোলে। সেইসব শোষিত মানুষের কথা সুনীলের কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে:

কোথায় সাদা দেয়াল? সব দেয়ালে রক্তের ছোপ!
খবরের কাগজের কালো অক্ষর থেকে গড়িয়ে পড়ে রক্ত
মানুষের বুকে মানুষ ছুরি বসাচ্ছে, এই তো প্রতিদিনের
ইতিহাস
... ...
তবু এই সুন্দর ও চিরাচরিতের মধ্যেও রয়ে গেছে
রক্ত-
লোলুপের
দল[৫]

১৯৪৬ সনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। তবে এ স্বাধীনতা ভারতবাসীর উচ্ছ্বাসের কারণ হতে পারেনি, বরং দেশবিভাগের কারণে বিষাদের ছায়া পড়ে দেশব্যাপী। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিশোর বয়সেই দেশবিভাগের যন্ত্রণা অনুভব করেন। বর্তমান বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ কলকাতায় সপরিবারে চলে যান। কতো স্মৃতি, আবেগ, ভালোবাসার অকাল পরিসমাপ্তি ঘটে। স্বাধীনতার দিন অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট তিনি কলকাতায় ছিলেন। তাই দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আনন্দ-বিষাদমিশ্রিত পরিস্থিতি প্রত্যক্ষভাবে দেখেন। কিশোর সুনীলের সংবেদনশীল

মন বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করে। সাম্প্রদায়িক রেশের এই ফলাফল তাঁর কাম্য ছিল না। এমনকি তাঁর বাবা কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়ও দেশভাগ কিছুতেই মানতে পারেননি। তিনি আমৃত্যু এই কৃত্রিম সীমারেখার অবসান চেয়েছেন। ১৯৪৬ সনের দাঙ্গার বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীও ভেঙে পড়েছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে মানুষে মানুষে হিংসা বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প তিনি দমন করতে পারেননি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিশোর বয়সেই গান্ধীজিকে দেখেন; সেই স্মৃতি পরিণত বয়সেও স্মরণে রেখেছিলেন তিনি। তাঁর কবিতায় বেলেঘাটায় দেখা গান্ধীজির কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু *র‍্যাডক্লিফ মিশন*-এর হস্তক্ষেপে সেই দাঙ্গার সমাধান সম্ভব হয়ে ওঠেনি:

> গান্ধীজি ভাঙা ভাঙা গলায় মুসলমান ছেলেদের বললেন, হিন্দু ভাই লোগোঁকো
> পানি পিলা দেও
> আমরা ছুটে গিয়ে তাদের হাতের গেলাস থেকে জল খেলাম, কী অপূর্ব স্বাদ,
> যেন অমৃত, কত হর্ষময় কোলাকুলি হল,
> তবু ভাগ হয়ে গেল নদীগুলো, শূন্যে তারকাঁটা, এক পাশে পানি
> আর এক পাশে জল![৬]

দেশভাগের জন্য ইতিহাস গান্ধীজিকে দায়ী বলে মনে করে। কিন্তু ভারতবর্ষ বিভাজিত হয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিন গান্ধীজি উল্লসিত হননি, বরং তাঁর বেদনার দিন ভেবে সারাদিন কেঁদেছিলেন। মুসলিম নেতাদের কূটচক্রে গান্ধীজির অসাম্প্রদায়িক বাণী জয়লাভ করতে পারেনি। রাজনীতি সচেতন কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তা উপলব্ধি করেন। নেতাদের স্বার্থপরতার কারণে সাধারণ মানুষের অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। কবি নিজেকে বিদ্রোহী হিসেবে কল্পনা করে ভাবেন যে, তিনি সশস্ত্র বিপ্লবী হলে এই সুবিধাভোগী নেতাদের পাপার্জনে গড়া স্বর্গ ছিন্নভিন্ন করে দিতেন। তবে সত্যিকার দেশপ্রেমিক নেতাদের কথাও কবি বলেছেন। দীনেশ গুপ্ত, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, ভবানী ভট্টাচার্য, সূর্য সেন প্রমুখ বিপ্লবী নেতাগণ দেশের কল্যাণে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষের এমন স্মৃতিতে সুনীল গর্ববোধ করেন। সাম্প্রতিক নেতাদের অবক্ষয়িত রূপ দেখে তিনি দেশবাসীর কাছে সেই পরাধীন ভারতবর্ষের দেশপ্রেমিক কাণ্ডারীদের কথা উপস্থাপন করেন:

> সূর্য সেন পাঠালেন তাঁর শেষ বাণী:
> "আমি তোমাদের জন্য কী রেখে গেলাম?
> শুধু একটি মাত্র জিনিস,
> আমার স্বপ্ন–
> একটি সোনালি স্বপ্ন
> এক শুভ মুহূর্তে আমি প্রথম এই স্বপ্ন দেখেছিলাম!"[৭]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সমগ্র বিশ্বে 'মানুষ'-এর অস্তিত্ব সংকট অনুভব করেছিলেন। ছদ্মবেশী অমানুষে পৃথিবী পরিপূর্ণ। তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে ফুটফুটে নিষ্পাপ শিশুকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে, ধর্মের নামে দেশকে রক্তাক্ত করে, পেশিশক্তির জোরে নারীর প্রতি নির্যাতন চালায়, পৈশাচিক আনন্দ নিয়ে নারীকে সম্ভোগ করে, ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোতে ছিন্নমুণ্ড দিয়ে ভিত্তি স্থাপন করে। সমাজের স্বেচ্ছাসেবকরূপী অমানুষরা এসব অনাচার-অরাজকতা দেখেও আত্মসুখলীলায় মত্ত থাকেন। এমন পরিস্থিতি দেখে কবি সুনীলের কবিতায় বিক্ষোভ লক্ষ করা যায়:

> যারা ধ্বংসের অস্ত্র ছড়ায়, অনবরত ধ্বংসের উস্কানি দিয়ে
> নিজের সন্তানদের দুধে ভাতে রাখে আর বিকেলবেলা
> কুকুর নিয়ে বেড়াতে যায়,
> তারা কি মানুষ?[৮]

এই মানুষরূপী অমানুষরা মানবতাকে ছুঁড়ে ফেলে অস্ত্রের ব্যবহারে মত্ত হয়ে উঠেছে। বিশ্বাস ও ভালোবাসা সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নাগরিক জীবন অ্যাটম বোমার প্রভাবে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। সবাইকে অপরিচিত বলে মনে হয়। আবহমান সমাজ ব্যবস্থায় ফাটল ধরেছে। কৃষিজীবী আদিম সমাজ ভেঙে ধ্বংসের দিকে পতিত হয়েছে। সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা সুনীলের কবিতায় এসেছে উল্লেখযোগ্যভাবে:

বীজাণুর চেয়েও দ্রুতবেগে বেড়ে-ওঠা মানুষ এগিয়ে আসে
নিজের মুখচ্ছবিকেই সে ভয় পায়
ভাদ্রমাসের ব্যাঙ আশ্রয় নেয় মানুষের গলায়
জলে-রোদ্দুরে স্নান ক'রে মাঠে হাল ধরে আছে পাঁচ হাজার বছরের
পুরোনো মানুষ
আর নগরে বন্দরে নতুন মানুষেরা ছুঁয়ে আছে অস্ত্রের বোতাম
কেউ কারুর নয়, শোনা যায় এই নিঃশব্দ হাহাকার, কেউ কারুর নয়[৯]

কিশোর বয়সে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের চিন্তা-চেতনা ও মননে 'স্বাধীনতা' শব্দটিতে ভালোবাসার মতো শিহরণ মিশেছিল। স্বপ্নবিভোর তরুণ কবি প্রথম যৌবনে মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি আশাহত হয়েছেন। বাস্তবে তাঁর চোখে পড়েছে শৃংখলিত মানুষের আর্তনাদ। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ নিজস্ব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিলাসিতা এবং মোহজালে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থমগ্ন পৃথিবীকে আবৃত করে রেখেছে:

পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে দেখি
স্বাধীনতার পোশাক পরা অস্ত্রধারীদের মহড়া
আমার মন খারাপ আমি কেমন করে বোঝাবো
তবে কি এ পৃথিবী পরিপূর্ণ ধ্বংসের পর
প্রকৃত স্বাধীন হবে?[১০]

বিশ্বব্যাপী অস্থিতিপূর্ণ শাসন চলছে। এর ফলে মানুষ হাসিমুখে জীবন কাটানো ভুলে গেছে। শঙ্খধ্বনির সাথে সমরধ্বনি মিলিয়ে বীভৎস দূষণ তৈরি করছে। বিশ্বের রাষ্ট্রনায়করা শান্তি-সাম্য-ভ্রাতৃত্বের বাণী উপস্থাপন করেন না, বরং ক্ষমতালাভের আশায় পৃথিবীর বুকে মাইন পুঁতে রেখে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে। ভূমির উর্বরতার পাশাপাশি মস্তিষ্কের সুবুদ্ধির চর্চাও হ্রাস পাচ্ছে। সাংবিধানিক কূটকৌশলে মত্ত নেতারা ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এক অনন্য সৃষ্টি 'নীরা' চরিত্রটি। কখনও প্রেমিকা, কখনও কল্পনা, কখনও স্বপ্ন, কখনও স্ত্রীরূপে স্বীকার করেছেন নীরাকে। মধ্যরাত্রিতে নীরার জন্য কবিতা রচনা করতে যেয়ে কবি আবেগ ভুলে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা স্মরণ করেন। প্রেমিক কবি রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠেন। নীরাকে নিয়ে স্বপ্নমায়াজাল তৈরি না করে পাঞ্জাবের রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা লেখেন। কবিতায় আবেগপূর্ণ ভাষা উধাও হয়ে বাস্তব সত্য প্রবেশ করে। যুদ্ধবিমানের অস্থির মহড়ায় আকাশ ভারী হয়ে ওঠে। এমন ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির মধ্যে কবি সুনীল তাঁর প্রেয়সী নীরার মুখ হারিয়ে ফেলেন:

পাঞ্জাবে রোজ খুন-খারাপি হচ্ছে দশটা-পঁচিশটা
অথচ আমি এই মধ্যরাত্রিতে নীরার জন্য একটা
স্তোত্র লিখতে চাই
কৃপাণ ও বন্দুকের নল ফুঁড়ে ওঠে নীরার মুখের চারপাশে
যারা মরে ও যারা মারে দু'রকম দীর্ঘশ্বাস ঝলসে দেয় বাতাস
ডটপেন শুকিয়ে যায়, আমি অন্য কলমের খোঁজে তাকাই
এদিক ওদিক[১১]

ভারতবর্ষে পাঞ্জাব, জম্মু, কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এর প্রভাব আমেরিকা, বোসনিয়া, সাইবেরিয়াতেও ছড়িয়ে পড়েছে। ধর্মমত ও বর্ণভেদের কারণে সভ্যতার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। আদিম যুগের মতো অন্ধকার গ্রাস করছে সমগ্র বিশ্বকে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় এই ভয়াবহতার চিত্র বর্ণিত হয়েছে। স্বাধীন দেশের পথ-ঘাটে নিরাপত্তা নেই। রাস্তার নিচে বিস্ফোরক লুকিয়ে রেখে প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার নেশায় মত্ত হিংস্র নেতৃবৃন্দ। সচেতন কবি সুনীলের কবিতায় এর বাস্তবসম্মত দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে:

> বোসনিয়া-সারবিয়াতে শুরু হচ্ছে গ্যাস যুদ্ধ
> এতকালের প্রতিবেশী, শুধু ধর্মভেদের জন্য এত ঘৃণা?
> পশুরাও তো এমন ধর্মে বিশ্বাস করে না
> মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের পুড়িয়ে মারছে যে বর্ণগর্বী হিন্দুরা
> তারাই বাড়িতে বসে শ্লোক আওড়ায়, সব মানুষেরই মধ্যে
> রয়েছেন নারায়ণ![১২]

সংকীর্ণ দেশাত্মবোধ, দেশপ্রেমের নামে নিরীহ-নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা– এসব কবির কাম্য নয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে, মানবজন্ম মহৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়া উচিত। অন্যের কুমন্ত্রণায় প্ররোচিত হয়ে এ জীবন ধ্বংসের পথে নিঃশেষ করার মধ্যে কোনো গৌরব নেই। বিপ্লবীরা নিজের জীবনের বিনিময়ে দেশকে শান্তির পথে নিয়ে আসে, আর উগ্রপন্থী নেতারা সেই সুফল ভোগ করে নিজ আসনে বসে নিজের সুখের ব্যবস্থা করে। এইসব মুখোশধারী নেতাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। কবি সুনীল তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতাকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। মানসিক অস্থিরতায় তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি:

> অন্য কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম, কলম সরছে না আমার
> না, কবিতা আসছে না, ইচ্ছে করছে না ছন্দ মেলাতে
> খবরের কাগজে, বেতারে, দূরদর্শনে শুধু মৃত্যুর নির্লিপ্ত ধ্বনি
> অসহায় বিরক্তিতে ছটফট করছে আমার সমস্ত শরীর
> ধর্মশাস্ত্রগুলির মহান বাণী টুকরো টুকরো মনে পড়ে, তাতে
> আরও কষ্ট হয়
> 'হায় ধর্ম, একী সুকঠোর দণ্ড তব'?[১৩]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমৃত্যু বিশ্বমানবতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর কাছে মানুষের মূল্য সর্বাপেক্ষা বেশি। এজন্য পৃথিবীর যে প্রান্তেই নৃশংসতার ঘটনা ঘটে, কবি বিচলিত হয়ে ওঠেন। তিনি মনে করেন, প্রকৃত দেশপ্রেমিক তারাই যারা মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা পোষণ করে। এ প্রসঙ্গে সুনীল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করেন। লাটাভিয়ার রিগা শহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে এক জঙ্গলের মধ্যে অনেকখানি ফাঁকা জায়গায় আশি হাজার শিশু-যুবক-বৃদ্ধ-নারী হত্যা করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সুনীল সেই স্থানটি নিজ চোখে দেখেন। এমন নৃশংস স্থানে দাঁড়িয়ে তিনি আবেগী হয়ে ওঠেন। সেই বন্দুকধারী আততায়ীদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন:

> 'কার দিকে তুমি গুলি ছুঁড়ছো হে, এখানে সবাই মানুষ'!
> তুমি কে, তুমি কি গ্রহান্তরের দল-ছুট?
> তোমার কখনো ছিল না কি শৈশব?
> তুমি কি কখনো দেখোনি মাটিতে ঘুমন্ত কোনো শিশু?
> জানলার ধারে দাঁড়ানো, একলা, শূন্যদৃষ্টি নারী?
> কার দিকে তুমি গুলি ছুঁড়ছো হে, এখানে সবাই মানুষ! [১৪]

সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের বিভীষিকা চলছে। যুদ্ধপ্রিয় রাষ্ট্রনেতারা সেই দামামা বাজিয়ে চলছে। যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণাম জেনেও তারা নিজেদের স্বার্থ লাভে বদ্ধপরিকর। গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে। এই অরাজক পরিস্থিতিতে পৃথিবী ক্রমাগত পতনের দিকে যাচ্ছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শুধু ভারতবর্ষের কবি নয়, বরং তিনি আন্তর্জাতিক বোধসম্পন্ন কবি। তাঁর কবিতায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের কথা বারবার এসেছে, আবার স্পেন-এর কবি ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকা-র আত্মত্যাগের কথাও এসেছে। ফ্যাসিস্ট ফ্রাংকো-এর ভাড়াটে বাহিনীর হাতে তিনি খুন হন। গ্রানাদা অঞ্চলে একসময় মুসলিম মূর আরব শাসনের প্রচলন ছিল। সে স্থান জ্ঞানচর্চায় সমৃদ্ধ ছিল। তারপর মুসলিম শাসনকে পরাস্ত করে স্পেনে ক্যাথলিক শাসন শুরু হয়। তরুণ কবি লোরকা মনে করতেন, ক্যাথলিক শাসন স্পেনকে জীবনধর্মী সংস্কৃতি থেকে চ্যুত করেছে। শাসকরা গণতন্ত্রের শত্রু হয়ে উঠেছে। তারা লোর্কাকে বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য করতো। সেই একনায়কতন্ত্রী শাসকশক্তির সিভিল গার্ডদের হাতে গ্রানাদাতেই লোরকা খুন হন। তরুণ কবি লোরকা স্পেনের সমৃদ্ধিকে শিল্পের ছোঁয়ায় অমরত্ব দেন। তাঁর এই স্বদেশপ্রেমই শেষপর্যন্ত মৃত্যুর পরিণতি পায়। চিলির কবি পাবলো নেরুদা কবি লোরকার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বিষণ্ন কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, "স্পেনের সেরা ফুল ঝরে গেল"[১৫]। ভারতবর্ষের কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও লোরকার মর্মান্তিক মৃত্যুতে ব্যথিত হন। লোরকা-র মৃত্যুর বীভৎস রূপ আভাসিত হয় কবিতায়। সুনীল সেই বীভৎসতা থেকে মুক্তির আশায় বলেন:

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!
মানুষের মুক্তি আসুক!
আমার শিকল খুলে দাও!
কবি অত মানুষের মুখের দিকে চেয়ে খুঁজলেন একটি মানুষ
নারীদের মুখের দিকে চেয়ে খুঁজলেন একটি নারী
তিনি দু'জনকেই পেয়ে গেলেন
কবি আবার তাদের উদ্দেশ্যে মনে মনে বললেন,
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! মিলিত মানুষ ও
প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব বিপ্লব![১৬]

লোরকা-র মতো আরেকজন স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী হলেন চে গুয়েভারা। তাঁর সাহসিকতা ও বিপ্লবী মানসিকতার প্রতি কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। চে গুয়েভারার প্রকৃত নাম আর্নেস্টো গুয়েভারা। তরুণ বয়স থেকেই চে স্বপ্ন দেখতেন পৃথিবী থেকে সব রকমের অন্যায়-অত্যাচার-শোষণের অবসান ঘটবে। কৃষক-শ্রমিক তথা সমাজের শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেবার লড়াইয়ে তিনি কিউবার ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেন। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকোসহ একাধিক দেশে যেখানেই শ্রমজীবী মানুষকে বঞ্চনার শিকার হতে দেখেছেন, সেখানেই চে গুয়েভারা ছুটে গিয়ে অসহায় মানুষকে সাহস যুগিয়েছেন ও স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন। 'চে' শব্দের অর্থ 'বন্ধু', শ্রমজীবী মানুষের কাছে চে প্রকৃত অর্থেই বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। চে মনে করতেন, মাথা নিচু করে বেঁচে থেকে জীবন কাটানোর চেয়ে বুক চিতিয়ে মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়। ১৯৬৬ সনে চে যখন দক্ষিণ বলিভিয়ার কৃষক-শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেবার লড়াইয়ে সামিল হন, সেসময় মার্কিন ইন্ধনপ্রাপ্ত বলিভিয়ান সেনারা তাঁকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। তার দুটো হাত কেটে নেওয়া হয় এবং অজানা স্থানে কবর দেওয়া হয়। চে-র এই নৃশংস মৃত্যু কবি সুনীলকে অপরাধী করে তোলে:

চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়—
বোলিভিয়ার জঙ্গলে নীল প্যান্টালুন পরা
তোমার ছিন্নভিন্ন শরীর
তোমার খোলা বুকের মাঝখান দিয়ে
নেমে গেছে

শুকনো রক্তের রেখা
চোখ দুটি চেয়ে আছে
সেই দৃষ্টি এক গোলার্ধ থেকে ছুটে আসে অন্য গোলার্ধে
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়! [১৭]

১৯৭১ সনে সংঘটিত বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কারণ জন্মসূত্রে কবি পূর্ববঙ্গের তথা বাংলাদেশের মানুষ। তাঁর কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের বীভৎসতার বর্ণনা লক্ষ্যণীয়। এ অঞ্চলের মানুষের মৃত্যু তাঁকে বিষাদগ্রস্ত করে। লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী পাকিস্তানি বর্বর সেনাদের গুলিতে নিহত হয়। যুদ্ধের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে বহু নারীকে আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে হয়েছে। অনুভূতিপ্রবণ কবি সেসব ভুলতে পারেননি। সেইসব নির্যাতিত ও নিহতদের স্মৃতি লিপিবদ্ধ হয়েছে সুনীলের শব্দশিল্পে:

দূরে কাছে কয়েক লক্ষ আজিজুর অন্ধকার ফুঁড়ে আছে
ধপধপ হাড়ে
কোথাও একটি হাত মাটি খিমচে ধরতে চেয়েছিল।
যে যায় সে চলে যায়, যারা আছে তারাই জেনেছে
বাঁ হাতের উল্টোপিঠে কান্না মুছে হাসি আনতে হয়[১৮]

সংগ্রাম-হত্যা-আত্মত্যাগের রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। কিন্তু এপার-ওপার বাংলার মাঝখানে কাঁটাতারের বিভেদ রেখা বাঙালির বুকে শেলের মতো বিঁধে থাকলো। বাংলাদেশের মাটিতে জন্ম ও শৈশব অতিবাহিত করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো অনেককেই বাস্তবতার খাতিরে মাতৃভূমির মায়া বিসর্জন দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী হতে হয়েছিল। কিন্তু অনুভূতিপ্রবণ কবি তাঁর শৈশবের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি। কবির উচ্চারণ:

যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো!
বিষণ্ন আলোয় এই বাংলাদেশ
নদীর শিয়রে ঝুঁকে পড়া মেঘ
প্রান্তরে দিগন্ত নির্নিমেষ—
এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি[১৯]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলনের কথা এসেছে। প্রাসঙ্গিকভাবে নিজ অভিমতও ব্যক্ত করেছেন তিনি, "আসলে নকশাল আন্দোলন যখন চলে তখন আমার একটু বয়স হয়ে গেছে। কিন্তু আমার মনে হত আমি যদি তখন কলেজের ছাত্র হতাম তবে আমিও নকশাল হতাম।"[২০] সত্তরের দশকে একদল সংগ্রামী ও স্বাপ্নিক তরুণ পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। তারা পৃথিবী থেকে শোষণ-অরাজকতা নির্মূল করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষ সরকারের আজ্ঞাবহ বাহিনী নকশাল আন্দোলনকে কঠোরভাবে দমন করেছিল। নকশালপন্থী তরুণ যুবকরা পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল। আন্দোলনকারীদের এভাবে অসময়ে চলে যাওয়া মেনে নিতে পারেননি কবি:

অকাল বৃষ্টিতে পচে গেছে ধানের গোছ, পূর্ণিমার চাঁদের গায়ে কাদা
কালভার্টের পাশে তাড়া তাড়া নির্বাচনী ইস্তাহার সেঁতিয়ে পড়ে আছে
বাঁধ ভাঙা নোনা জলে ঘুরপাক খাচ্ছে ফটিকের ছেঁড়া চটি
এই অনন্তের টুকরো দৃশ্যের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মহাবিশ্ব
একটি নবীন তৃণের ডগা মাথা তুলে বললো, ফিরিয়ে দাও ফটিককে
তার নিজের জায়গায়
নইলে সব কিছু মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে...[২১]

নকশালপন্থী স্বপ্নকামী বিপ্লবী যুবকেরা যারা নিখোঁজ ছিলেন, তাদের কথা বিভিন্ন সংবাদপত্র, ছোট-বড় পত্রিকায় উল্লেখ আছে। কবি শঙ্খ ঘোষ বলেন, "উনিশশো সত্তর সালের জুলাই থেকে পুলিশ কমিশনার হন রঞ্জিত গুপ্ত, আর আমাদের মনে পড়ে সে বছরেরই নভেম্বরের এক ভোররাত, যখন বেলেঘাটার পাঁচশো বাড়িতে হানা দিয়ে চুয়াল্লিশটি পুলিশভ্যান টেনে বার করে কিছু স্কুলকলেজের ছাত্রকে, আর প্রমাণহীন বিচারহীনভাবে চারজনকে গুলি করে মেরে ফেলে সেখানেই, প্রকাশ্য অঞ্চলে"।[২২] প্রকৃতপক্ষে নকশালপন্থী তরুণরা সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারটুকু ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ এই স্বপ্নকামী তরুণদের সাহচর্যে এসে ভিন্নভাবে বাঁচার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল:

বাঁচতে হবে বাঁচার মতন, বাঁচতে বাঁচতে
এই জীবনটা গোটা একটা জীবন হয়ে
জীবন্ত হোক
... ...
গোটা জীবন
মানুষ সেজে আসা হলো,
মানুষ হয়েই ফিরে যাবো[২৩]

রাজনৈতিক ভাবনাসম্পন্ন কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমৃত্যু শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি স্বপ্ন দেখেন সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, মজুর মালিকশ্রেণির কারখানায় তাদের ন্যায্য মজুরী পাবে; নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেতন হবে। তিনি কবিতায় এ বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। গাড়ি বারান্দার নিচে তেরো দিন আমরণ অনশনে বসে থাকা তিনজন শ্রমিককে দেখে কবি নিজের ক্ষোভকে প্রশমিত করতে পারেননি। এসব স্বার্থান্বেষী শ্রমিকদের নেতা ও মালিকদের সতর্ক করে বলেন:

সাবধান!
মানুষ আর ব্যর্থ মৃত্যু মেনে নেবে না।
সাবধান! মানুষ আর ব্যর্থ মৃত্যু মেনে নেবে না! [২৪]

সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মের সংকীর্ণতাকে আশ্রয় করে হত্যাযজ্ঞ চালানোর চিত্র, নেতাদের অমানবিক স্বার্থপরতা– এসব বিষয় সুনীলের কবিতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্তমান বিশ্বে সাম্প্রদায়িকতার অমানবিক রূপ নতুন নয়, ইতিহাস সে কথাই বলে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলামসহ অনেক কবি-সাহিত্যিক প্রতিবাদ করেছেন তাঁদের সময়ে। ধর্ম লোক দেখানোর কোনো বস্তু নয়, মন্দির-মসজিদ-গীর্জা-প্যাগোডা অর্থাৎ উপাসনালয়ের ঐশ্বর্য প্রদর্শন ও ঔদ্ধত্যতা প্রদর্শনের বিষয় নয়; ধর্ম একান্তভাবে হার্দিক অনুভূতির বোধগম্যতার বিষয়। প্রকৃতিই তা সঠিকভাবে নির্দেশ করে। সুনীলের কবিতায় প্রতিভাত হয়েছে:

নদী উত্তাল, আকাশে বারুদ, প্যাঁচা ও বাদুড়
ওড়াউড়ি করে মধ্য দুপুরে
ক্ষুধিত মানুষ ধর্ম খাচ্ছে, মাথায় ও পায়ে ধর্ম মাখছে
ইতিহাস ছিঁড়ে জ্বালছে উনুন, কোথা থেকে এত হাঙর-কুমির
হাসি হাসি মুখে খেলতে এসেছে?[২৫]

ভারতবর্ষ যখন ইংরেজ শাসনাধীন ছিল সেখানকার মানুষ সবভাবে পরাধীন জীবন-যাপন করতো। তখন মানুষ দেশকে জননীর মতো ভালোবেসেছে, কোনোভাবেই দেশের অপমান সহ্য করেনি। আবেগ মিশ্রিত ভালোবাসা দিয়ে স্বদেশের বন্দনা গেয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর এর বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায়। দেশের মানুষের কাছে স্বদেশপ্রীতির চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থ মুখ্য হয়ে উঠেছে। সেই স্বাধীনতাকামী প্রতিবাদী মানুষেরা একেবারে অচেনা হয়ে উঠেছে:

জনমদুখিনী মা কোনোদিন স্বাধীন হলে না
এখন তোমাকে আর ভুলেও ডাকে না কেউ
আঁকে না তোমার কোনো ছবি

কেউ কারো ভাই নয়, রক্তের আত্মীয় নয়
নদীর এপার দিয়ে, নদীর ওপার দিয়ে চলে যায় বিষণ্ণ মানুষ![২৬]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কবি হিসেবে রোমান্টিক ভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু তবুও সমাজ-রাজনীতি অর্থাৎ বৈশ্বিক দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয়গুলো তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি। তিনি যুবক বয়সে বামপন্থী ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর বামবাদী লেখা তখনকার সাহিত্যিক পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারেনি। সুনীল সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন, যদিও সাহিত্যে তা পুরোপুরি প্রয়োগ করতে পারেননি। ব্যক্তিগত অনুভূতিকেই সবসময় প্রাধান্য দিয়েছেন। মার্কসবাদের মূল তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। তবে তিনি সাহিত্যের মধ্যে আনন্দ ও সৌন্দর্য খুঁজেছেন আমৃত্যু। "আমি মনে করি যে লেখকের এই সমাজের প্রতি একটা দায় আছে। মনুষ্যত্ব বা মানবতার প্রতি তার একটা আস্থা রাখা উচিত। কিন্তু তা বলে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংস্রব রাখতে হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।"[২৭] আর এজন্যই তাঁর কবিকৃতিতে ভারসাম্যপূর্ণ বিষয়ের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। রাজনীতি-ভাবনায় তিনি সবসময়ই সমাজের একদম সাধারণ অবস্থান থেকে বিষয় বিবেচনা করেছেন। তিনি পরিস্থিতি উপলব্ধির পাশাপাশি কবিতায় সেগুলোর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেই সাথে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিষয়গুলো সর্বসাধারণের সামনে এনেছেন। সুনীল স্পষ্টবাদী ছিলেন, সঙ্গে রাজনীতি সচেতনও বটে। তাঁর রাজনীতি-বিষয়ক কবিতাগুলো তত্ত্ব-তথ্য ও উপাত্তে সমৃদ্ধ। তিনি শিল্পের আড়ালে মানবতাবোধের জাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন। তাই রাজনীতি-ভাবনাসম্পন্ন কবিতার স্রষ্টা হিসেবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একজন শৈল্পিক চিন্তক হিসেবে প্রণম্য।

তথ্যনির্দেশ

[১] উত্তম দাশ, *হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন*, মহাদিগন্ত, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ১১
[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *অর্ধেক জীবন*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৬৯-৭০
[৩] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "নীরা,হারিয়ে যেও না", *নীরা,হারিয়ে যেও না, কবিতাসমগ্র* ৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ১৩০ (পরবর্তীতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা ও কাব্যের নাম, *কবিতাসমগ্র* ১- ২০১৬, *কবিতাসমগ্র* ২- ২০১৪, *কবিতাসমগ্র* ৩- ২০১৭, *কবিতাসমগ্র* ৪- ২০১৫, *কবিতাসমগ্র* ৫- ২০১৫, *কবিতাসমগ্র* ৬- ২০১৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা থেকে তথ্যনির্দেশ হিসেবে গৃহীত হবে।)
[৪] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "আমরা এ কোন্ ভারতবর্ষে", *সাদা পৃষ্ঠা,তোমার সঙ্গে*, পৃ. ৬৯
[৫] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "সাদা দেওয়াল", *সুন্দরের মন খারাপ,মাধুর্যের জ্বর*, পৃ. ১৯৯
[৬] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "সেই দিনটি", *ভোরবেলার উপহার*, পৃ. ৮২
[৭] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "সেই সব স্বপ্ন", *জাগরণ হেমবর্ণ*, পৃ. ২৪৫-২৪৬
[৮] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "দেশ-কাল-মানুষ", *বাংলা চার অক্ষর*, পৃ. ১২৮
[৯] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "আত্মদর্শন", *এসেছি দৈব পিকনিকে*, পৃ. ১১৫
[১০] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "স্বাধীনতার জন্য", *সাদা পৃষ্ঠা,তোমার সঙ্গে*, পৃ. ৫২
[১১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "নীরা, গৌতম বুদ্ধ", *বাতাসে কিসের ডাক,শোনো*, পৃ. ১০৬-১০৭
[১২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "হায়, ধর্ম!", *রাত্রির রঁদেভু*, পৃ. ২৩৭
[১৩] তদেব, পৃ. ২৩৭
[১৪] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "আর যুদ্ধ নয়", *সাদা পৃষ্ঠা,তোমার সঙ্গে*, পৃ. ৬৫
[১৫] অমিতাভ দাশগুপ্ত ও কবিতা সিংহ সম্পা., "ভূমিকা অংশ", *লোরকার শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৫২
[১৬] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "কবির মৃত্যু : লোরকা স্মরণে", *আমার স্বপ্ন*, পৃ. ১৮৯-১৯০
[১৭] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "চে গুয়েভারার প্রতি", *সত্যবদ্ধ অভিমান*, পৃ. ২২০
[১৮] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "উনিশশো একাত্তর", *আমার স্বপ্ন*, পৃ. ২০৩
[১৯] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "যদি নির্বাসন দাও", *আমার স্বপ্ন*, পৃ. ১৬৪
[২০] সুভাষ দে, "রবীন্দ্রনাথ সুনীল গাঙ্গুলি এবং তিন জোড়া লাথি", *বলাকা*, সেপ্টেম্বর, ২০০৭, পৃ. ৩৫
[২১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে...", *বাতাসে কিসের ডাক,শোনা*, পৃ. ১১৬
[২২] শঙ্খ ঘোষ, "বিশেষণে সবিশেষ", *কবিতার মুহূর্ত*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ১২৩-১২৪
[২৩] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "এই জীবন", *দেখা হলো ভালোবাসা বেদনায়*, পৃ. ১৪৩-১৪৪
[২৪] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "তিনজন মানুষ", *আমার স্বপ্ন*, পৃ. ১৮০
[২৫] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "কথা দেওয়া আছে", *বাংলা চার অক্ষর*, পৃ. ৯০
[২৬] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "জনমদুখিনী", *সোনার মুকুট থেকে*, পৃ. ২৩৩
[২৭] রফিক উল ইসলাম সংক. ও সম্পা., *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথাবার্তা সংগ্রহ*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৬৮

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

আরবি কবিতায় ইসলামি ইতিহাস-ঐতিহ্য (৬৬২-৭৫৮ খৃ.)
Islamic History and Culture in Arabic Poetry (662-758 AD)

আব্দুল মমিন*

Abstract: Arabic is the oldest language in the world. The literary practice of the oldest language also started through poetry. The real picture of the society was painted through poetry. After the demise of the Prophet (peace be upon him), the Umayyad era in the history of Islam began when the reign of the four major caliphs of Islam ended in thirty years. Just as the thoughts and feelings of the writers of this age have found a place in their writings, so the thoughts and feelings of the writers of this age have found a place in the history and traditions of this age. It was during this period that the heartbreaking incident of Karbala took place. In the observance of religious rules, everyone gave precedence to their own views. As a result, there was a difference of opinion among the Muslim scholars and different communities including Mutazila, Shi'ah, Khareji and Murjiya emerged. The Arabs, carrying the banner of Islam in the seventh century, migrated to neighboring Arabia, occupying the entire Persian Empire in the east and the Roman Empire in the west. All these wars that took place during the Umayyad rule, historical events, historical places and historical-traditional events have found a place in the poetry of the poets of this era. Islamic history and tradition in Umayyad Arabic poetry are depicted in this article.

ভূমিকা

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ভাষার সাহিত্যচর্চা কবিতার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। আরবি ভাষাও তার ব্যতিক্রম নয়। কারণ আরবরা ছিল যাযাবর জনগোষ্ঠী। তাদের ধমনীর প্রতিটি ধারায় শৈল্পিক ও নান্দনিকতার ছাপ লক্ষণীয় ছিল। তারা ছন্দের মাধ্যমে মনের মাধুরী মিশিয়ে কথা বলত। কবিতার মাধ্যমে মানুষের আচার-ব্যবহার, প্রেম-প্রীতি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতির পাশাপাশি বিভিন্ন ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। জাহিলী কাব্য সাহিত্যের বিশাল তথ্যপঞ্জিতে উল্লেখিত প্রবাদ-প্রবচন, অন্তমিল বিশিষ্ট শ্লোক, বাগ্মীদের প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষণ, প্রেমিকার বাস্তুভিটা শারাব পান ও উটের বর্ণনাসহ বিভিন্ন বিষয় স্থান পেয়েছে। ইসলামি যুগে এসে ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রভাবে এ যুগের কবিতায় জাহিলী কুসংস্কারকে দূর করে ইসলামি ভাবাদর্শে কবিতা রচনা করতে থাকেন। তাদের মধ্যে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব সু-প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ যুগের কবিরা জাহিলিয়াতের ধারা পুরোপুরি বর্জন করতে পারেননি। এ কারণে তাদের কিছু কিছু কবিতায় সে যুগের বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। আরবি সাহিত্যে জাহিলী ও ইসলামি যুগের পরেই উমাইয়া যুগের অবস্থান। উমাইয়া যুগ হলো ইসলামি নীতি-নৈতিকতা ও ভাবাদর্শের যুগ। ইসলাম এ যুগের কবিদের চিন্তা-চেতনায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। এ যুগের সাহিত্যিকদের চিন্তা-চেতনায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিষয় তাদের লেখনীতে স্থান পেয়েছে। এ যুগের সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে কবিতা চর্চা করেছেন। উমাইয়া যুগের কাব্যে স্থান পাওয়া ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ[১], কারবালার[২] ঐতিহাসিক ঘটনা, বিভিন্ন স্থান বিজয়ের ঘটনা। এছাড়া এ যুগের কবিতায় ফোরাত নদির প্রবাহিত পানির বর্ণনা, দজলা নদির বর্ণনা, ইয়ালামলাম পাহাড়ের বর্ণনা, হিন্দুস্তান ও রোমের বর্ণনাসহ

---

* পিএইচ.ডি গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

ঐতিহাসিক জাতি হিসেবে আদ ও সামুদ জাতির ঘটনা উদাহরণ হিসেবে উমাইয়া যুগের কবিতায় স্থান পেয়েছে। নিম্নে বিষয়গুলির উপর সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

যুদ্ধের ইতিহাস

উমাইয়া যুগ সাহিত্য চর্চার অবাধ বিচরণের যুগ। এ যুগের সাহিত্যিকদের চিন্তা-চেতনায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিষয় তাদের লেখনীতে স্থান পেয়েছে। এ যুগের সাহিত্যকগণ বিভিন্ন ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে কাব্যচর্চা করেছেন। হযরত ‘উছমান[৩] (রা.) নিজ গৃহে শত্রুদের হাতে শাহদাত বরণ করলে মুসলিম বিশ্বে বিশৃঙ্খলা নেমে আসে। খলীফার হত্যাকাণ্ডে ক্রোধান্বিত হয়ে বহু ঘটনা ঘটে যায়। ঐতিহাসিক সিফ্ফিনের যুদ্ধ তারই একটি উদাহরণ। উষ্ট্রের যুদ্ধের পর এটি ছিল মুসলিম ইতিহাসে সর্ববৃহৎ গৃহযুদ্ধ। যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সর্বাধিক অনুগত সাহাবীগণ বিদ্যমান ছিল। উভয়পক্ষ সিফ্ফিনের যুদ্ধে ৩ মাস ২০ দিন অবস্থান করছিলেন। যুদ্ধ চলাকালে পরস্পরের মধ্যে ৯০টি সংঘর্ষ হয়েছিল। এ আত্মঘাতী যুদ্ধে ‘আলী[৪] (রা.) এর বাহিনীর ২৫ হাজার এবং মু‘আবিয়া[৫] (রা.) এর বাহিনীর ৪০ হাজার মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন।[৬] পরবর্তিতে সিদ্ধান্ত হ’ল যে, হযরত ‘আলী (রা.) এর পক্ষ হতে একজন এবং মু‘আবিয়া (রা.) এর পক্ষ হতে একজন সালিশী প্রতিনিধি সুষ্ঠু সমাধান বের করবেন।[৭] তাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আবু মুসা আশ‘আরী[৮] ও ‘আমর ইবনুল আস[৯]কে নিযুক্ত করা হয়। উভয় পক্ষ ‘আজরুহ’ অর্থাৎ দুমাতুল জান্দালে ৪০০ সাহাবী নিয়ে মিলিত হলেন। ইতিহাসে এ মিমাংসাকে দুমাতুল জান্দাল বলা হয়ে থাকে। সিফ্ফিনের যুদ্ধ মুসলিম ইতিহাসের একটি বিভীষিকাময় অধ্যায়। এ যুদ্ধে মূলত শক্তিশালী মু‘আবিয়ার (রা.) বিরুদ্ধে ‘আলী (রা.) এর বাহিনীর যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ‘আলী (রা.) আল্লাহর সাহায্য কামনা করেন এবং বিজয় লাভ করেন। উমাইয়া যুগের কাব্যে স্থান পাওয়া ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ‘সিফ্ফিনের যুদ্ধ’। এটি জঙ্গে সিফ্ফিন নামেও পরিচিত। ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই মাসে ৩৭ হিজরীতে সংঘটিত হয়। যেমন কবি আখতাল সিফ্ফিনের ঘটনা বর্ণনা করে উমাইয়াদের উদ্দেশ্যে বলেন-

ويوم صفين، والأبعار خاشعه * أمدهم، إذا دعوا من ربهم مدد[১০]

হযরত ‘আলী (রা.) তাঁর সঙ্গে সিফ্ফিনের ভয়ানক যুদ্ধে তারা আল্লাহর সাহায্য
প্রার্থনা করেন আর আল্লাহ তাদের সে প্রার্থনা কবুল করে তাদের জয়ী করেন।

হযরত মু‘আবিয়া (রা.) ২০ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করে ৬০ হিজরিতে মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে বসরার শাসনকর্তা মুগিরার[১১] (রা.) প্ররোচনায় মু‘আবিয়া (রা.) তাঁর জ্যৈষ্ঠপুত্র ইয়াযিদকে খলীফা হিসাবে মনোনয়ন দিয়ে যান। এই নিয়োগ কার্যক্রম ছিল ইসলামের গণতান্ত্রিক নিয়োগের পুরোপুরি বিরোধী। ইয়াযিদ ছিল নিষ্ঠুর প্রকৃতির, মদ্যপ এবং ধর্মে অবিশ্বাসী এক ব্যক্তি। এ কারণে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের কেউ এটি মেনে নিতে পারেননি। যার কারণে তাদের উপর শুরু হয় অত্যাচার। এ কারণে ইমাম হুসাইন[১২] ও ‘আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র[১৩] ইরাক হতে মক্কায় চলে যান। এদিকে কুফাবাসী ইয়াযিদের বিপক্ষে অবস্থান করে। তারা ইমাম হুসাইন (রা.) এর সাহায্য প্রার্থনা করে দূত মারফত চিঠি পাঠান। চিঠিতে লেখা ছিল তারা ইয়াযিদের পরিবর্তে হুসাইনকেই খলীফা হিসাবে দেখতে চান। হুসাইন (রা.) এর মূল লক্ষ্য ছিল খিলাফত ব্যবস্থার পুনর্জীবন। ইয়াযিদের বিরুদ্ধে কুফাবাসীর সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে তিনি স-স্ত্রীক ২০০ অনুচর নিয়ে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ফোরাত নদির তীরবর্তী কারবালা নামক স্থানে পৌঁছালে ওবায়দুল্লাহ ইবন জিয়াদ তাকে বাধা দেন এবং হুসাইন (রা.) কে নিঃশর্ত আত্মসম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। তিনি ওবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদের আদেশ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলশ্রুতিতে চার হাজার বাহিনীর একটি বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে কারবালা নামক স্থানে ইমাম হুসাইন (রা.) কে অবরুদ্ধ করে রাখেন। ইমাম হুসাইন (রা.) সহ তার সহযোদ্ধারা ইয়াযিদ বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন।[১৪] উমাইয়া যুগে ইতিহাস সমৃদ্ধ কারবালা যুদ্ধে শহীদদের নিয়েও কবিতা রচনা করা হয়েছিল। কবি কুছায়্যির তার কবিতায় ইবনুল হানফিয়ার মৃত্যু প্রসঙ্গে কবিতায় বলেন-

فبسط سبط إيمان وبر * وسبط غيبته كربلاء
وسبط لا تراه العين حتى * يقود الخيل يتبعها اللواء[১৫]

তারা ইমানদার সু-আকৃতির অধিকারী এবং কারবালার শহীদ। অন্য একজন পূণ্যশীল দৃষ্টির অগোচর এবং তিনি সৈন্যদের সাথে যুদ্ধের জন্য আসবেন।

ইতিহাস খ্যাত নদির বর্ণনা

হযরত 'আলী (রা.) এর পুত্র হুসাইন (রা.) ও মু'আবিয়া (রা.) এর পুত্র ইয়াযিদের মধ্যকার কারবালার যুদ্ধ ফোরাত নদির তীরে সংঘটিত হয়। ফোরাত দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার একটি নদি।[১৬] এটি তুরস্কে উৎপত্তি লাভ করে সিরিয়া ও ইরাকের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দজলা নদির সাথে মিলিত হয়েছে এবং শাতিল আরব নামে পারস্য উপাসাগরে পতিত হয়েছে।[১৭] ফোরাত নদি ২৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এর অববাহিকায় আয়তন প্রায় ৫,০০০ বর্গকিলোমিটার। মোট অববাহিকার ৩০ শতাংশ তুরস্কে অবস্থিত এবং ৯০ শতাংশ পানির উৎস তুরস্কের উচ্চভূমি। ফোরাত নদি গঠিত হয়েছে মূলত দুটি নদির মিলনে। একটি কারা সু অন্যটি মুরাত সু। ফোরাত নদি রাজনৈতিক কারণে যেমন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত ঠিক তেমনি ধর্মীয় কারণেও ফোরাত নদির নাম মুসলিম বিশ্বে পরিচিত। ফোরাত নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যত বাণী করেছেন,

عن أبى هد يرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا ياخذ منه شيء.[১৮]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- অচিরেই (এমন একটি সময় আসবে) ফোরাত নদিতে স্বর্ণের খনি উন্মোচিত হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি ঐ সময় বেঁচে থাকবে সে যেন তার থেকে কোনো অংশ না নেয়।

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে,

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقولون كل رجل منهم لعلى أكون أنا ألذى أنجوه.[১৯]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত ফোরাত নদিতে একটি স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশ পাবে। মানুষ সেটি নিয়ে যুদ্ধে জড়াবে এবং প্রত্যেক দলের শতকরা ৯৯ জন মারা যাবে। তাদের প্রত্যেকের কামনা থাকবে হায়! বেঁচে যাওয়া মানুষটি যদি আমিই হতাম!

ফোরাত ও দজলা নদির পানি ব্যবহার করেই প্রাচীন মোসোপটেমীয় সভ্যতাগুলি বিকাশ লাভ করেছিল।[২০] এখানেই প্রাচীন সুমেরীয়, ব্যবিলনীয় এবং আসিরীয় সভ্যতাগুলি বিকাশ লাভ করেছিল। ফোরাত নদির পানির ইতিহাস বর্ণনা করে কবি আখতাল বলেন-

وما الفرات إذا جاشت حوالبه * فى حافتيه و فى أوساطه العشر[২১]

ফোরাতের ঢেউ যখন উত্তাল হয় সবকিছু ক্ষতিগ্রস্থ হয়, আর সামনে যা কিছু আসে ঢেউয়ের মাঝে বিলীন হয়ে যায়।

দজলা দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার একটি নদি। নদিটি তুরস্কে উৎপত্তি লাভ করে ইরাকের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফোরাত নদির সাথে মিলিত হয়েছে এবং শাতিল আরব নামে পারস্য উপসাগরে পড়েছে। উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান হাশেমীপন্থী মুস'আব ইবন যুবায়রের সাথে লড়াই করে বিজয় লাভ করেন। কৌশল হিসাবে তার ঘোড়াগুলোকে দজলার এক প্রান্ত হতে বের করেন। তখন দজলার কথা উল্লেখ করে আদি ইবনু রিকা' বলেন-

لعمرك لقد اصحرت خيلنا * باكناف دجله للمصعب
تقدمنا واضح وجهه * كريم الضرائب والمنصب[২২]

তোমার জীবনের কসম! মুস'আবকে মোকাবিলার জন্য আমাদের ঘোড়াগুলো বের হল দজলার এক প্রান্ত থেকে। আমাদের অগ্রনায়ক ছিলেন এমন ব্যক্তি যার চেহারা আলোয় উদ্ভাসিত। যার স্বভাব-প্রকৃতি ও পদমর্যাদা অত্যন্ত সম্মানিত।

অঞ্চল বিজয়ের ইতিহাস

ইসলামের বিজয়াভিযানের মাধ্যমে নতুন নতুন অঞ্চল বিজিত হয়েছে। উমাইয়া খলীফা আল ওয়ালিদের আমলকে সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বর্ণযুগ ধরা হয়। তাঁর আমলেই খিলাফত দেড় কোটি বর্গমাইলের এক বিশাল ভূখণ্ডে পরিণত হয়। এভাবেই মুসলিম মুজাহিদরা উমাইয়াদের জয়কে অব্যাহত রেখেছিল। মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ট্রান্স অক্সিনিয়া, সিন্ধু, মাগরেব এবং আন্দালুসকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। এ সকল বিজয়াভিযানের যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্য অন্যতম হলেন আফ্রিকার গভর্ণর মুসা ইবন নুসায়র।[২৩] তাছাড়া মধ্য এশিয়ার গভর্ণর কুতায়বা ইবন মুসলিম[২৪] এবং সিন্ধুর শাসক মুহাম্মাদ ইবন কাসিম[২৫] ছিলেন অন্যতম। আল্লাহর অনুগ্রহে বিশাল ভূখণ্ড ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। উমাইয়া যুগের কবিগণ এ সকল বিজয়াভিযানের বর্ণনা দিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। যেমন কবি ফারাযদাক বলেন-

فتحنا بإذن الله كل مدينة * من الهند أو باب من الروم مغلق[২৬]

আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা প্রতিটি শহর বিজয় করেছি। হিন্দুস্থান বা রোমের বন্ধ দরজার নিকটবর্তী পর্যন্ত।

ধর্মীয় চেতনার ইতিহাস-ঐতিহ্য

খারেজীদের সাথে যুদ্ধ ছিল ধর্মীয় যুদ্ধ। অথচ খারেজীগণ বিশ্বাস করতেন যে তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা ব্যতিত অন্য সকল মুসলমান আল্লাহর সীমারেখা থেকে বেরিয়ে গেছে। তাই তারা বিশ্বাস করত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা শরী'আতের দিকে ফিরে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে জিহাদ করা ফরজ এবং হত্যা করা বৈধ। তাদের চিন্তা এমন যে চতুর্থ খলীফা 'আলী (রা.) এর হত্যাকারী 'আব্দুর রহমান ইবন মুলজিম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ সংঘটিত করেছে বলে মনে করত। যেমন কবি ইমরান ইবন হিত্তান বলেন-

يا ضربة من تقى ما أراد بها * إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا

إنى لأذكره حينا فأحسبه * أوفى البرية عند الله ميزانا[২৭]

ওহে মুত্তাকীর পক্ষ থেকে সেই আঘাত! যা দ্বারা সে (ইবন মুলজিম) আরশের অধিপতির সন্তুষ্টিই কেবল কামনা করেছে। আমি তাকে (ইবন মুলজিমকে) অনেক দিন থেকে স্মরণ করি আর তাঁর সম্পর্কে বিশ্বাস করি যে, আল্লাহর কাছে তার পাল্লা অধিক ভারী হবে অন্যান্য মানুষের তুলনায়।

ইসলাম ধর্ম সত্য ও সুন্দরের ধর্ম। সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে ইসলাম অনন্য উচ্চতায় পৌঁছিয়েছে। শরী'আতের বাইরের কোনো কিছুকে এখানে স্থান দেয়া হয়নি। নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ইসলাম ধর্মে কোনো কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটানোকেও ইসলাম সমর্থন করেনি। আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত ওহীতে যেটি বর্ণিত হয়নি সেটি ধর্মের নামে প্রচলিত বিদ'আত হিসাবে গণ্য হয়েছে। এভাবেই উমাইয়া যুগের কবিগণ তাদের লেখনীতে ইসলামের সমুহান ঐতিহ্যকে ধারণ করেছেন। যেমন কবি আল-কুমায়ত বলেন-

لهم كل عام بدعة يحد ثونها * أزلوا بها أتباعهم ثم أوحلوا

كما ابتدع الرهبان مالم يجئ به * كتاب ولا وحي من الله منزل[২৮]

প্রতি বছরই তারা (উমাইয়ারা) বিদ'আত সংঘটিত করে, তার দ্বারা পদস্খলিত হয় তাদের অনুসারীরা। যেমনিভাবে পাদ্রীগণ বিদ'আত (নতুন অপকর্ম) সংঘটন

করেছে, সে সম্পর্কে কিতাবে কিছুই উল্লিখিত হয়নি। আর না আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত ওহীতে তা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। একটি নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরকালীন জীবনে ফিরে যেতে হবে। এ জীবনের কর্মের প্রতিদান পরকালীন জীবনে পাওয়া যাবে। উমাইয়া যুগের কবিগণ ইসলামি অনুশাসনের অনুরাগী ছিলেন। তাদের কবিতায় ইসলামের প্রভাব ফুটে উঠেছে। যেমন তিরিম্মাহ[২৯] বলেন-

يوم لا ينفع المخول ذا الثر * وة خلانه ولا ولده
ثم يوتى به وخصماه وسط ال * جن والإنس رجله ويده
إنما الناس مثل نابتة الزر * ع متى يأن يأت محتصده[৩০]

যেদিন অগাধ ধন-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধব, আর না তার সন্তান কোনো কাজে আসবে না। তার সামনে হাজির করা হবে জীন ও মানব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আর তাঁর বিপক্ষে যাওয়া হাত-পা। মানুষ তো ক্ষেতের শস্যের ন্যায়। যখন সময় হয়, তখন তাঁর কর্তনকারী এসে যায় (অর্থাৎ মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তাঁর রূহ নিয়ে যায়।

কবি আখতাল জন্মগতভাবে খ্রিষ্টান হলেও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবে ইসলাম ধর্মের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতা লক্ষণীয় ছিল। তাঁর জীবনে খ্রিষ্ট ও ইসলাম দ্বৈত ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি উভয় ধর্মের মাঝে সমন্বয় করে চলতেন। একবার খলীফা 'আব্দুল মালিক আখতালকে বলেন- আখতাল তুমি ইসলাম গ্রহণ করছো না কেন?[৩১] জবাবে আখতাল ইসলামের অন্যতম বিধান সাওম পালনের ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে বলেন-

إن أنت أحللت الخمر و وضعت عنى صوم و رماضان أسلمت[৩২]

আপনি যদি আমার জন্য মদ পান বৈধ করে দেন, আর রমজানের রোজা রাখা হতে অব্যহতি দেন তাহলে আমি ইসলাম গ্রহণ করতে পারি।

অর্থাৎ মদ পান ইসলামে হারাম এবং রমযানে সিয়াম পালন করা আবশ্যক এই ঐতিহ্যকে তিনি তার কবিতায় উল্লেখ করেছেন।

উমাইয়া যুগের কবি ইমরান ইবন হিত্তান[৩৩] তাঁর চাচাত বোন জুমারকে বিবাহ করেন। সে খারেজী মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। ইমরানের আশা ছিল বিবাহের পর খারেজী মতবাদ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। ইমরান ছিল কুৎসিত কদাকার। আর তাঁর স্ত্রী ছিল পরমা সুন্দরী। যার কারণে স্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেই খারেজী মতবাদ গ্রহণ করেন।[৩৪] তিনি এ মতবাদ গ্রহণ করলেও তাঁর কবিতায় ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি দুনিয়া বিমুখ এবং পরকালমুখী ছিলেন। তাঁর কবিতায় মানুষের জীবন যাপন যে স্বল্প সময়ের জন্য সেটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন নশ্বর পৃথিবীতে বিপদাপদ ও দুঃখ দূর্দশায় পরিপূর্ণ জীবন মানুষ কিভাবে পছন্দ করে।[৩৫] তিনি কবিতায় বলেছেন-

أرى أشقياء الناس لا يسأمونها * على أنهم فيها عراة وجوع
أراها وإن كانت تحب فإنها * سحابة صيف عن قليل تقشع[৩৬]

হতভাগ্য লোকদের দেখি যে তারা নগ্নতা ও ক্ষুধা সত্ত্বেও জীবনের প্রতি অতিষ্ঠ হয় না। জীবন অবশ্যই প্রিয়, কিন্তু তাঁর উদাহরণ গ্রীষ্মকালের মেঘের মতোই যা অল্প সময়েই বিলীন হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা

ইয়ালামলাম পাহাড়টি পবিত্র নগরী সৌদি আরবে অবস্থিত। এটি মক্কা হতে ৯২ কি. মি. দক্ষিণে অবস্থিত। ইয়ালামলাম পাহাড়টি ইসলামি ঐতিহ্যের সাথে জড়িত। হজ্জের মৌসুমে ইয়ামেন এবং এ পথে আগমনকারী, বাংলাদেশ, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়শিয়াসহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক হাজীদের

মিকাত ইয়ালামলাম পাহাড়। কবি ফারাযদাক ইয়ালামলাম পাহাড়কে ভারী অর্থে কবিতায় ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি নাজিয়া ইবন সামিয়ার বোনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

فلئن سفكت دماء بغير حريرة * لتخلدن مع العذاب ألا لام
ولئن حملت دمى عليك لتحملن * ثقلا يكون عليك مثل يلملم[৩৭]

যদি তুমি বিনা অপরাধে আমার রক্তপাত কর তবে তোমাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। যদি তুমি আমার রক্ত ওঠাও তাহলে ইয়ালামলাম পাহাড়ের মতো ভারী হবে।

খলীফা 'আব্দুল মালিক ছিলেন উমাইয়া খলীফাদের একজন যোগ্য শাসক। তাঁর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ প্রশংসার দাবী রাখে। তাঁর প্রশংসায় কবি আখতাল রূম পর্বতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন-

مسحنفرا من الجبال الروم تستره * منها أكافيف فيها دونه زور[৩৮]

রূম পর্বত থেকে দ্রুত গতিতে পানি প্রবাহিত হয়। স্তুপাকারে প্রবাহিত হওয়া সে পানিকে প্রবাহিত হওয়া থেকে আবদ্ধ রাখা হয়।

আরবভূমির প্রাচীন অধিবাসীদের সম্পর্কে কোনো সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এ কথা সঠিক যে, বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক বসবাস করত। হাযরামাউত আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তের একটি অঞ্চল। হাযরামাউতের অধিবাসী ছিল ইতিহাস খ্যাত আদ বংশ। এ বংশ হুদ নবীর আমলে ধ্বংস হয়। হাযরামাউতে তৈরীকৃত বিভিন্ন পোশাক বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ছিল। পশমের তৈরী নানান ধরণের পোশাকের ঐতিহ্য ছিল সর্বজনবিদিত। যেমন কবি জারীর বলেন-

طوى القياد مع الطراد بطونها * طى التجار بحضرموت برودا[৩৯]

ভ্রমণের ক্লান্তিতে এবং শত্রু পক্ষকে তাড়া করতে করতে তাদের পেটে এমন চিহ্নের ভাজ পড়েছে যেন ব্যবসায়িক দল হাযরামউতে চাদরগুলো সাজিয়ে রেখেছে।

সামুদ জাতির ইতিহাস

সামুদ জাতি খ্রিষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীর হেজাজের একটি প্রাচীন জাতি।[৪০] সামুদ জাতি আরব উপদ্বীপের উত্তরে তাদের বসবাস ছিল। তবে তাদের উৎপত্তির স্থান ছিল দক্ষিণ আরব। পরবর্তিতে তারা স্থানান্তরিত হয়ে উত্তরে মাদাইনে সালেহ (আ.) এর কাছে আতলাব পর্বতের ঢালে বসতি স্থাপন করে। আসিরিয়ার রাজা সারগণ-২ এর খ্রিষ্টপূর্ব ৭১৫ এর লিপিই সামুদ জাতি সম্পর্কে সবচেয়ে পুরানো প্রমাণ। ইসলামের ইতিহাসে সামুদ জাতির পূর্ব পুরুষ হিসাবে ইরাম ও আদ জাতিকে উল্লেখ করা হয়। আদ জাতির পরে এরাই সবচাইতে বেশি খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করেন।[৪১] কুরআন নাজিলের পূর্বেই এ জাতির কথা মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। পথহারা এ জাতিকে সর্বপ্রথম হযরত সালেহ (আ.) তাওহীদের দাওয়াত দেন। তিনি তাদেরকে মূর্তিপূজাসহ যাবতীয় শিরক ও কুসংস্কার ত্যাগ করে আল্লাহর ইবাদাত করার আহ্বান জানান। সালেহ (আ.) যতই দাওয়াত দিতে থাকেন ততই তাদের সীমালংঘন বাড়তে থাকে। হযরত সালেহ (আ.) এর দাওয়াতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা তার কাছে দাবী করে যে কাতেবা পাহাড়ের থেকে ১০ মাসের সবল স্বাস্থ্য গর্ভবর্তী একটি উটনী বের করে এনে দেখান। যদি আপনি এমন কাজ করতে পারেন তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। তখন সালেহ (আ.) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন এবং মু'জিযা স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা এমন একটি উটনী তাদের সামনে পেশ করেন। কিন্তু তাদের প্রতিশ্রুতি তারা রাখেনি এবং এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি।[৪২] এভাবে একের পর এক সীমালংঘন করতে থাকে। পরবর্তিতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সকল সীমালংঘন, হঠকারীতা ও অবাধ্যতার কারণে ধ্বংস করেন। উমাইয়া যুগের বিখ্যাত কবি জারীর সামুদ সম্প্রদায়ের খারাপ মানুষদের সাথে তুলনা করে ফারাযদাকের উদ্দেশ্যে বলেন-

وشبهت نفسك أشقى ثمود * فقالوا ضللت ولم تهتد[৪৩]

তোমার আত্মা তথা তুমি ছামূদ জাতির জঘন্যতম খারাপ লোকটির সাথে সাদৃশ্য রাখ। তাই মানুষেরা বলে, তুমি গোমরাহ হয়ে গিয়েছো, হিদায়াত পাওনি।

পৃথিবীতে মানুষের জীবন-যাপনের দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য আল্লাহ তা'আলা জীবন বিধানের তথা ধর্মের প্রবর্তন করেছেন। ধর্মের সাম্য ও মৈত্রীর বাণী নিয়েই মানুষ জীবন যাপন করে। ধর্মই মানুষকে সুসংহত ও সুগঠিত করেছে। বিশ্বব্যাপী আনুমানিক ১০,০০০ স্বতন্ত্র ধর্ম রয়েছে। আর সবাই কোনো না কোনোটির সাথে যুক্ত।[৪৪] অথচ আল্লাহ তা'আলার নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্মই ইসলাম।[৪৫] কবি আখতাল ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করে বলেন-

لعن إلاله من اليهود عصباة * بالجزع بين جلاجلا وصرار

জুলাজিল ও সিরার পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী উপত্যাকার প্রান্তে বসবাসরত ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পত করেছেন।

আনুগত্যের ঐতিহ্য

ইসলামের বীজ বপন হওয়ার পর থেকেই জাহিলী আরবের মানুষগুলো সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল। সকল প্রকার পাপাচার থেকে মুক্ত থেকে নিজেদেরকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখানো পথ অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে থাকে। তৎকালীন উমাইয়া সমাজে খলীফাগণ শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সমাজে খলীফাগণের আনুগত্য স্বীকার করা অন্যান্য ঐতিহ্যগত রীতি হিসাবে ধরা হতো। পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে গোত্র, গোত্র থেকে রাষ্ট্র সর্বত্রই আনুগত্যের এই সমুহান ঐতিহ্যকে ধারণ করে চলত। যেমন কবি জারীর উল্লেখ করেন-

رضينا بالخليفة، حين كنا * له تبعا وكن لنا إلمام[৪৬]

খলীফার প্রতি আমরা সে সময় থেকে সন্তুষ্ট, যে সময় থেকে আমরা তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়েছি এবং আমরা তাকে নেতা বানিয়েছি

উমাইয়া যুগের কবি আখতাল একবার কূফায় বানূ কায়স গোত্রের এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক এমন সময় মুয়াজ্জিনের আযানের শব্দ ভেসে আসছিল। তখন সেখানকার যুবকেরা কবিকে নামাজের জন্য মসজিদে আহ্বান করেন।[৪৭] তখন কবি ইসলামের সমুহান ঐতিহ্যকে তুলে ধরে বলেন-

أصلى حيث تدركنى صلاتى * وليس البر عند بنى رؤاس[৪৮]

যেখানে আমার নামাজের সময় হয় সেখানেই আমি নামায পড়ি। বানু রুওয়াসের মাঝে কোনো পূণ্য নেই।

উক্ত কবিতায় কবি বুঝাতে চেয়েছেন যে, নামাজ আদায়ের সময় হলেই আদায় করে নিব। নির্দিষ্ট কোনো গোত্রের কাছে পূণ্য নেই।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুরু করে উমাইয়া খলীফা মারওয়ান ইবনুল হাকাম পর্যন্ত পাহলবী, গ্রীক, সিরীয়সহ বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষাগুলো ব্যবহৃত হতো। নির্দিষ্ট কোনো সরকারী ভাষা ছিল না। ফলে সরকারী কাজকর্মে চরম অসুবিধা সৃষ্টি হতো।[৪৯] খলীফা আব্দুল মালিক এ সমস্যা সমাধানের জন্য আরবীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। উমাইয়া যুগেই সকল সরকারী অফিস আদালতে আরবী ভাষা ব্যবহৃত হতে থাকে। এ যুগে গভর্ণর নিয়োগ করা হতো খাঁটি আরব জনগোষ্ঠির মধ্য থেকে।[৫০] ফলে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সাথে কেন্দ্রীয় শাসনকর্তাদের যোগাযোগ আরো সহজ হয়।[৫১] ফলে আরবী ভাষা ও শিল্প-সাহিত্যে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়।

উপসংহার

উমাইয়া যুগের কবি সাহিত্যিকরা তাদের কাব্য চিন্তার মাধ্যমে আরবী সাহিত্যকে অনন্য মর্যাদায় সমাসীন করেছেন। তাঁদের কাব্যে, ইসলামি বিধি-বিধানের পাশাপাশি ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। যার ফলে মানুষ সাহিত্যের কাব্যিকরূপ আস্বাদনের পাশাপাশি ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১ **সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ:** সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ ছিল ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত ‘আলী (রা.) ও মু‘আবিয়া (রা.) এর মধ্যে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্খিত ঘটনা। হযরত ‘আলী (রা.) এর প্রতি মু‘আবিয়া (রা.) আনুগত্য প্রকাশে অনীহা, ‘উছমান (রা.) হত্যার বিচার দাবি ও মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভক্তিসহ নানাবিধ কারণে হযরত ‘আলী (রা.) ও মু‘আবিয়া (রা.) এর মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। হযরত মু‘আবিয়া (রা.) সিরিয়ার শহর ‘রাক্কার’ আশেপাশে ইউফ্রেট্রিস নদীর পশ্চিম তীরে সিফ্‌ফিন নামক স্থানে ৬০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে শিবির স্থাপন করেন। মু‘আবিয়া (রা.) ধৃষ্টতা ও অবাধ্য আচরণের কারণে খলিফা ৬৫৭ খ্রি. সিরিয়ার অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা আরম্ভ করেন। যুদ্ধের দুই মাসের বেশি সময় আগে সেনাবাহিনী ঘটনাস্থানে শিবির স্থাপন করে। অবশেষে হিজরী ৩৭ সালে ৬৫৭ খ্রি. ২৪ শে জুলাই থেকে ২৬ জুলাই সিরিয়ার গভর্ণর হযরত মু‘আবিয়া ও হযরত ‘আলী (রা.) এর মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মু‘আবিয়া পরাজয় বরণ করেন। পরবর্তিতে সালিশী বৈঠকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এ ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটে। দ্রঃ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী ১৯৭৫ খ্রি.), পৃ. ২৫৩-২৬০; আল ইয়া‘কুবী, *তারীখে ইয়া‘কুবী*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুস-সদর লিত্ তাবা‘আত ওয়াল নাসর, ১৩৭৯ হি.), পৃ. ১৮৮।

২ **কারবালা:** কারবালা ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রান্তর, যেখানে হিজরী ৬২ সনে মহররম মাসের ১০ তারিখ শুক্রবার হযরত হুসাইন (রা.) নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। কারবালা ইসলামের ইতিহাসে একটি বিয়োগাত্মক ঘটনা। কারবালা শব্দের ‘কারব’ অর্থ সংকট এবং ‘বালা’ শব্দের অর্থ মুসিবত। তাই কারবালাকে সংকট ও মুসিবতের প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ হিসাবে ধরা যায়। হযরত মু‘আবিয়া (রা.) ২০ বছর খলিফা হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনার পর হিজরী ৬০ সালে ইন্তিকাল করেন। মু‘আবিয়ার ইন্তিকালের পর ইয়াজিদ অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে। ইয়াজিদ ছিল নিষ্ঠুর ও মদ্যপ প্রকৃতির। এ কারণে মুসলিম বিশ্বের কেউ তাকে খলিফা হিসাবে মেনে নিতে পারেনি। এদিকে মদিনা ও কুফার জনগণ ইমাম হুসাইন (রা.) কে মুসলিম জাহানের খলিফা হিসাবে পেতে চেয়েছিল। কুফার মানুষ হুসাইন (রা.) এর নিকট পর পর কয়েকটি পত্র প্রেরণ করেন। এ পত্রে তারা দাবি জানান যে, সুন্নাহ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে তাকে দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন। অবশেষে কুফাবাসির ডাকে সাড়া দিয়ে হযরত হুসাইন (রা.) তাঁর চাচাত ভাই মুসলিম ইবন আকিলকে ইরাকের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠান। মুসলিম ইবন আকিল কুফায় পৌছানোর পর ১৮ হাজার কুফাবাসী তার কাছে এসে ইমাম হুসাইনের পক্ষে বায়‘আত গ্রহণ করে এবং শপথ করে যে, আমরা অবশ্যই জান মাল দিয়ে ইমামকে সাহায্য করবো। তখন মুসলিম ইবন আকিল ইমাম হুসাইনের কাছে পত্রে জানান কুফার পরিস্থিতি সন্তোষজনক এবং তিনি যেন কুফায় আগমণ করেন। পত্র অনুযায়ী ইমাম হুসাইন (রা.) পরিবারে ১৯ জন সদস্যসহ প্রায় ২০০ অনুসারী নিয়ে জিলহজ মাসের ৮ তারিখে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এ খবরে ইয়াজিদ নোমান ইবন বশির (রা.) কে পদচ্যুত করে ওবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদকে কুফার গভর্ণরের দায়িত্ব প্রদান করেন। ওবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ কুফার জনগণকে কঠোর হস্তে দমন করেন এবং মুসলিম ইবন আকিলকে শহীদ করেন। ইমাম হুসাইন তাঁর সফর সাঙ্গীসহ কারবালা নদীর তীরে পৌছালে ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ চার হাজার সৈন্য নিয়ে হুসাইন বাহিনীকে অবরোধ করে এবং ফোরাত নদীতে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেয়। ইয়াজিদ বাহিনী হযরত হুসাইন (রা.) কে আত্মসমার্পণ করার আদেশ দিলে ইমাম হুসাইন ঘৃণাভরে এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন। মহররম মাসের ১০ তারিখ ইয়াজিদ বাহিনী হুসাইন (রা.) এর অনুসারীদের উপর হামলা করতে থাকে। এ যুদ্ধে একমাত্র ছেলে জয়নুল আবেদিন ছাড়া পরিবারের শিশু-কিশোর নারীসহ সবাই শাহাদাত বরণ করেন। সীমার নামক এক পাপিষ্ঠ হুসাইন (রা.) এর দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। হযরত হুসাইন (রা.) এর শরীরে ৩৩ টি বর্শা ৩৩৪ টি তরবারীর আঘাত দেখা গিয়েছিলো। এ যুদ্ধে হুসাইন বাহিনীর ৭০ থেকে ৭২ জন শহিদ হয়েছিল। দ্রঃ Mahmood Datto “At Karbala”, *Karbala the Complete Picture*, p. 167; M. lafri, ‘Syed Husayn’, “The Origins and Early Development of Shi’a Islam”, Oxford University Press, USA (April 4, 2002).

৩ হযরত ‘উছমান (রা.) : মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা হযরত ‘উছমান (রা.) কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। ‘উছমান (রা.) এর উপনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ, আবূ ‘আমর ও আবূ লায়লা। তাঁর উপাধি ছিল গনী (অর্থ ধনী)। রাসূল (সা.) এর দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেছিলেন বলে তাকে যিননুরাইন বলা হত। ‘উছমান (রা.) ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। অঢেল সম্পদের মালিক হওয়ার কারণে ইসলামের জন্য মুক্ত হস্তে দান করতেন। বহু অর্থ ব্যয় করে প্রায় দুই হাজার কৃতদাসকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন। কথিত আছে মাত্র দুটি উট ব্যতিত সমস্ত সম্পদ ইসলামের উদ্দেশ্যে দান করেন। তিনি অধিকাংশ জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন এবং রাসূল (সা.) হতে ১৪৬ টি হাদিস-বর্ণনা করেন। পবিত্র কুরআন সংকলনে তাঁর অসামান্য অবদান আছে। হযরত আবূ বাকর (রা.) কর্তৃক সংগৃহীত ও সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির প্রতিরূপ তৈরি করে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেন। একারণে ‘উছমান (রা.) কে ‘জামিউল কুরআন’ বলা হয়। হযরত ‘উছমান (রা.) খিলাফতের শেষ দিকে চরম অশান্তি দেখা দেয়। সহজ, সরল ও খোদাভীরু খলীফা আসরের নামাজ শেষে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতরত অবস্থায় ঘাতকের হাতে ৩৫ হিজরী ১৮ জিলহজ্জ শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের সময় ‘উছমান (রা.) বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। হযরত যুবায়র ইবন মুতয়িম তাঁর জানাযা নামাজের ইমামতি করেন। মসজিদে নববীর পাশে

জান্নাতুল বাকী কবরস্থানের পাশে কাওকাব নামক অংশে রক্তাক্ত ও গোসল বিহীন অবস্থায় দাফন করা হয়। দ্রঃ মোঃ আবদুস সামাদ, *ধর্ম ও সভ্যতা* (ঢাকা: সামাদ পাবলিকেশন্স এণ্ড রিসার্স, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৪০২-৪০৪।

৪ **'আলী (রা.)** : আমিরুল মু'মিনিন 'আলী ইবন আবি তালিব ৬০০ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ রজব অর্থাৎ ২৩ হিজরী পূর্ব সনের ১৩ রজব শুক্রবার জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আবি তালিবের পুত্র। 'আলী (রা.) ছিলেন রিসালাত প্রকাশ পূর্ব সময় হতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সার্বক্ষণিক সহচর। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়াত প্রাপ্তির সাথে সাথেই ইমান এনে তাঁকে আল্লাহর রাসুল বলে স্বীকার করেন। তিনি তাবুক যুদ্ধ ব্যতিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় ইসলামের সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং বিরোধী বাহিনীর বীরগণকে পরাভূত করে ইসলামের ঝান্ডা সমুন্নত রাখেন। সাহাবীদের মধ্যে তিনি সবচাইতে জ্ঞানী ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী উহার দরজা"। তিনি আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রবর্তক এবং ইসলামের সর্বপ্রথম লেখক হিসাবে গণ্য। তাঁর পুস্তকের নাম "কিতাবে আলী" ও "জামেয়া"। এছাড়া দিওয়ানে 'আলী নামে আরবি কাব্য সংকলন গ্রন্থও বিখ্যাত। হযরত 'উসমান (রা.) এর শাহাদাত বরণের পর ৩৫ হিজরী ২১ জিলহজ মুসলিম জাহানের খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৪ বছর ৯ মাস খিলাফাতের দায়িত্ব পালনের পর ৪০ হিজরী সনের ১৯ রমজান কুফার মসজিদে ফজর সালাতের সময় গুপ্তাঘাতকের আঘাতে আহত হয়ে ২১ রমজান ৬৩ বছর বয়সে শহীদ হন। দ্রঃ ড. আলী মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, *আলি ইবনু আবি তালিব (রা.)* কাজী আব্দুল কালাম সিদ্দীক অনুদিত (ঢাকা: কালান্তর প্রকাশনী ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১০-১৫; *ধর্ম ও সভ্যতা*, পৃ. ৪০৪-৪০৬; *ইসলামের ইতিহাস*, পৃ. ২৫৩-২৫৫।

৫ মু'আবিয়া (রা.) ৬০৬ খ্রি. কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আবূ সুফইয়ান কাবাঘর রক্ষণাবেক্ষণকারীদের একজন ছিলেন, মাতা ছিলেন আবূ জেহেলের কন্যা হিন্দা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মু'আবিয়া ও তাঁর পিতা-মাতা ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিলেন। ৮ম হি./৬৩০ খ্রি. রাসূল (সা.) কর্তৃক মক্কা বিজয়ের পর মু'আবিয়া ও তাঁর পিতা-মাতা ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৪ বছর। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূল (সা.) এর ব্যক্তিগত ওহী লেখক হিসেবে নিযুক্ত হন। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা.) এর শাসনামলে রোমান সাম্রাজ্যের অংশ সিরিয়া বিজয় হয়। মু'আবিয়া (রা.) সিরিয়া অভিযানে তীক্ষ্ম মেধা দিয়ে যোগ্যতার পরিচয় দেন। তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি স্বরুপ ৬৩৮ খ্রি. সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। 'উছমান (রা.) এর শাসনামলে সমগ্র সিরিয়ার গভর্ণর নিয়োগ করা হয়। তাঁর নেতৃত্বেই প্রথম মুসলিম নৌবাহিনী গঠিত হয়। নৌবাহিনীর সাহায্যে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ সাইপ্রাস, ক্রীট, মেজর্কা, মাইনর্কা ইত্যাদি মুসলিমদের আয়ত্বে এসেছিল। ৬২২ খ্রি. হিরাতে বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি তাঁর অভিজ্ঞ সেনাদের দ্বারা বিদ্রোহ দমন করেন। ৬৬২ খ্রি. রোমানদের পরাজিত করে আর্মেনিয়া দখল করেন এবং 'আকব' নামক স্থানে একটি পোতাশ্রয় স্থাপন করেন। তাঁর আমলে মুসলিম রণতরীর সংখ্যা ১৭০০ তে পৌছেছিল। প্রতিটি রণতরীতে সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্রে সমৃদ্ধ ছিল। মু'আবিয়ার শাসনামলে দুই দুই বার স্থল ও নৌবাহিনীর সমন্বয়ে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের চেষ্টা করা হয়। অবশ্য দুই বারই মুসলিম বাহিনী কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। মু'আবিয়া (রা.) দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ, বিচক্ষণ কুটনীতিবিদ ও সুশাসক হিসেবে কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও ইসলামের মৌলিক আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে রাজতন্ত্রের সূচনা করেন। তিনি মজলিসে শূরার অস্তিত্ব বাতিল করে মনোনয়ন ভিত্তিক উত্তরাধিকারী ব্যবস্থার প্রচলন ঘটিয়ে স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে পরবর্তি খলিফার জন্য মনোনয়ন দিয়ে যান। একারণেই তাকে Founder of dynasty (রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হিসেবে) অভিহিত করা হয়। দ্রঃ G.H.A Juynboll, Caliph and caliphate, Oxford University Press (2010); p. 10-11; *ইসলামের ইতিহাস*, পৃ. ৩০৯-৩১১।

৬ William Muir, *The caliphate, its rise and fall* (London: william muir, 1891), p. 261.

৭ *Encyclopaedia of Britannica*, "Ali gathered support in kufa, where he had established his center, and invaded syria. The two armies met along the Euphrates river at siffin (near the syrian-Iraqi border), where they engaged in an indecisive succession of skirmishes, truces and battles, culminating in the legendary appearance of muawiyah's troops wita copies of the Quran impaled on their Lances- Supposedly a sign to let God's word decide the Conflict", Retrived on April 17, 2019.

৮ **আবূ মুসা আল আশয়ারী (রা.)** : নাম আব্দুল্লাহ, কুনিয়াত আবূ মুসা, তিনি কুনিয়াত দ্বারাই অধিক পরিচিত। পিতার নাম কায়েস, মাতার নাম তাইয়েব। তাঁর ইসলাম পূর্ব জীবন সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। এতটুকু জানা যায় যে, তিনি ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ইয়ামানের আল আশয়ার গোত্রের অধিবাসী হওয়ায় আল আশয়ারী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হযরত আবূ মুসা আশয়ারী ইসলামের পরিচয় লাভ করে ইয়ামান থেকে মক্কায় আসেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। কিছুদিন মক্কায় অবস্থানের পর ইয়ামানবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য স্বদেশে ফিরে যান। হযরত আবূ মুসা আশয়ারী মক্কা বিজয় ও হুনায়নের যুদ্ধে অংশ নেন। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে হযরত 'আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) এর পক্ষ থেকে একজন করে সালিশী প্রতিনিধি নির্বাচিত করার কথা হলে 'আলী (রা.) এর পক্ষ হতে আবু মুসা আশয়ারীকে নিযুক্ত করা হয়। দ্রঃ আবদুল মাবুদ, *আসহাবে রাসুলের জীবন কথা*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৭-১৪; Waqedi, Mughazi London 1966, p. 915-916; ইবন কাসির, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৫।

[৯] **'আমর ইবনুল আস (রা.) :** নাম 'আমর, কুনিয়াত আবু 'আবদিল্লাহ ও আবু মুহাম্মাদ। তার পিতার নাম আস ও মাতার নাম নাবিগা। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ইসলামের অন্যতম শত্রু ছিলেন। ৮ম হিজরীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। 'আমর ইবনুল আস কুফর ও ইসলাম উভয় অবস্থায় অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। পূর্বে যেমন ইসলামের মুলোৎপাঠনে বদ্ধপরিকর তেমনি ইসলাম গ্রহণের পর শিরকের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন- কাফির অবস্থায় আমি ছিলাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বড় দুশমন। তখন মারা গেলে জাহান্নামই হতো আমার একমাত্র ঠিকানা। আর ইসলাম গ্রহণের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনোই আমার চোখের আড়াল হতে পারতেন না। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে হযরত 'আলী (রা.) ও মু'আবিয়া (রা.) এর মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে 'আমর ইবনুল আস ছিলেন হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর অন্যতম পরামর্শক। 'আমর ইবনুল আসের পরামর্শেই এ যুদ্ধে আসন্ন পরাজয়ের সময়ে বর্শার মাথায় কুরআন ঝুলিয়ে মু'আবিয়া (রা.) 'আলী (রা.) এর কাছে আপোষ মিমাংসার প্রস্তাব দেন এবং আলী (রা.) কে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণায় বাধ্য করেন। বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দু'পক্ষের মধ্যে সালিশী বোর্ড গঠন করা হলে আমর ইবনুল আস ছিলেন মু'আবিয়ার (রা.) মনোনীত। আর আবু মুসা আশয়ারী (রা.) ছিলেন 'আলীর (রা.) মনোনীত। দ্রঃ মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, মিশর বিজয়ী আমর ইবনুল আস, আলোকধারা প্রকাশনী, ২০২২ খ্রি., পৃ. ১০-১২; *আসহাবে রাসুলের জীবনকথা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩-৫৮।

[১০] আল-আখতাল, *দীওয়ানুল আখতাল*, মাহদী মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন সম্পা. (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৯০-৯১।

[১১] **মুগিরা (রা.) :** তাঁর নাম 'আব্দিল্লাহ মুগিরা, পিতা শুবা ইবন আবী 'আমের। তিনি ছিলেন বনী সাকীফ গোত্রের সন্তান। তার মা উসামা বিনতে আফকাম বনী নাসের ইবন মুয়াবিয়া গোত্রের কন্যা। হিজরী পঞ্চম সনে খন্দক যুদ্ধের বছর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মুগিরা (রা.) হুদাইবিয়া অভিযানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সফরসঙ্গী হয়ে বায়'আতে রিদওয়ানে শরিক হন। হুদায়বিয়ার পর তিনি একাধিক অভিযানে অংশগ্রহণ করে গৌরব অর্জন করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বিশেষ বাহিনীর সাথে তাঁকে ও আবু সুফিয়ানকে তায়েফে পাঠান। হযরত 'আলী (রা.) ও হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর মধ্যে বিরোধ শুরু হলে প্রথম দিকে মুগিরা (রা.) 'আলী (রা.) এর পক্ষে ছিলেন। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের পর দুমাতুল জান্দালে সালিশী আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি হযরত মু'আবিয়ার (রা.) পক্ষে যোগ দেন। একপর্যায়ে তার হাতে বায়'আত তথা আনুগত্যের শপথ নেন। এরপর থেকে মুগিরা (রা.) প্রকাশ্যে হযরত 'আলী (রা.) এর বিরোধিতা শুরু করেন। মুগিরা (রা.) সমর্থন ও সহযোগীতা মু'আবিয়া (রা.) এর অনেক উপকারে আসে। অনেক বড় বড় সমস্যা তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে সমাধান করতেন। হিজরী ৪১ সনে মু'আবিয়া (রা.) মুগিরা (রা.) কে কুফার ওয়ালী নিয়োগ করেন। হিজরী ৫০ সনে কুফায় যে প্লেগ রোগ দেখা দেয় সেই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে ৭০ বছর বয়সে মুগিরা (রা.) মারা যান। দ্রঃ আল ইসাবা ৩/৪৫৩, মুসতাদারিক ৩/৪৫০।

[১২] হুসাইনঃ হযরত হুসাইন (রা.) ১০ জানুয়ারী ৬২৬ খ্রি. কুরাইশ বংশের বানূ হাশিম গোত্রে মদিনায় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত 'আলী (রা.) এবং মাতা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর কন্যা ফাতিমা (রা.)। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর দৌহিত্র ছিলেন। তিনি মহানবী (সা.) এর সান্নিধ্যে সাতটি বছর অতিবাহিত করেছিলেন। ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা পরিবার থেকেই পেয়েছিলেন। খিলাফতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মু'আবিয়া (রা.) পরই মুসলিম বিশ্বের খলীফা হওয়ার কথা থাকলেও হঠাৎ করে ইয়াযিদ ইবন মু'আবিয়া মুসলিম বিশ্বের খলীফা নির্বাচিত হন। মু'আবিয়া (রা.) হযরত হুসাইন (রা.) কে বায়'আত গ্রহণ করার নির্দেশ দিলে তিনি অস্বীকার করেন। এদিকে হুসাইন (রা.) এর অনুসারি কুফাবাসী যখন জানতে পারে যে. হুসাইন ইয়াজিদের বায়'আত অস্বীকার করেছেন তখন তারা ইমাম হুসাইনকে কুফায় আমন্ত্রণ জানান। এক পর্যায়ে ইমাম হুসাইন কারবালা নামক স্থানে পৌঁছালে ১০ ই মুহাররম ৬১ হি./১৯ অক্টোবর ৬৮০ খ্রি. ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০ বছর। দ্রঃ কেনেথ ডব্লিউ মরগন, অনু. অধ্যাপক মুয়াযযম হুসায়ন খান, *ইসলাম ও আধুনিক চিন্তাধারা* (ঢাকাঃ মদিনা পাবলিকেশন্স, ১৯৬৩ খ্রি.), পৃ. ২৪২-২৪৩; শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহহারী, *ইমাম হুসাইন এর কালজয়ী বিপ্লব* (ঢাকাঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দুতাবাস, ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৯-১১।

[১৩] **'আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা.) :** হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা.) ৬২৪ খ্রি. মদিনায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম, যুবায়র মা ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.) এর কন্যা আসমা বিনতে আবূ বকর। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী আয়েশা (রা.) ছিলেন তাঁর খালা। 'আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র ছিলেন হিজরতের পর মদিনায় জন্ম গ্রহণকারী প্রথম মুসলিম। নিজের পিতার নামের সাথে মিল রেখে মহানবী নিজেই তার নাম রাখেন 'আব্দুল্লাহ। তিনি খুলাফায়ে রাশিদূনের চার খলিফার শাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেন। মধ্য বয়সে তিনি সাক্ষী হয়েছেন উমাইয়াদের অন্যায় অবিচার আর অত্যাচারের। ৬৮০ খ্রি. যখন কারবালায় হত্যাকাণ্ড ঘটে তখন মক্কাতে বসে ৫৬ বছর বয়সে হুসায়নের পক্ষে বিদ্রোহ করেছিলেন। মক্কার মুসলমানেরা ইয়াজিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলো 'আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়রের নেতৃত্বেই। এ সময় ইয়াযিদ নানা রকম প্রলোভন দেখিয়েও 'আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়রকে বশে আনতে পারেননি। তখন ইয়াযিদ মক্কায় আক্রমণ করেছিলো। ৬৮৩ সালে ইয়াযিদ বাহিনী কাবা ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলো। এর কয়েকদিনের মধ্যেই ইয়াযিদের মৃত্যু হয়। ইয়াযিদের মৃত্যুর পর ৫৯ বছর বয়সে 'আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়ের ইসলামের খলিফা নির্বাচিত হন। দ্রঃ HAR Gibb, "Abd Allah ibn al Zubayr" The Encyclopedia of Islam, New edition, Volume 1: A-B, p.

54-55; I Hassan, "Al Zubayr b. Al Awarn" the Encyclopedia of Islam, New edition, Volume XI: W-Z, p. 549-551.

[১৪] Mahmood Datto, *At Karbala* (Karbala: the complet Picture, April 26, 2012), p. 167.

[১৫] ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ২য় খণ্ড (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), পৃ. ৩২৩; ইবন কুতায়বা, *আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা* (বৈরূত: লেবানন: দারুছ-ছাকাফা, ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ৩৩৪।

[১৬] আব্দুর রাজ্জাক, *ইউফ্রেটিস নদি*, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ০৪ জুন ২০১৮।

[১৭] *তদেব*।

[১৮] আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল বুখারী, *আল জামি আস-সহীহ* (দিল্লী: আসাহহুল মাতাবি, তা.বি.), হাদীস নং-৭১১৯।

[১৯] ইমাম আবুল হাসান মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহুল মুসলিম* (কায়রো: আল-মাকতাবাতুল মিসরিয়্যাহ, তা.বি.), হাদীস নং-৭৪৫৪।

[২০] Howard eves, Daily life in mosoptamia, p. 16-17.

[২১] *দীওয়ানুল আখতাল*, পৃ. ৯০-৯১।

[২২] ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ২য় খণ্ড (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), পৃ. ৩৪৪।

[২৩] **মুসা বিন নুসায়র :** মুসা বিন নুসায়র ৬৪০ খ্রি. সিরিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি উমাইয়া খলিফা প্রথম আল ওয়ালিদের অধীনস্থ একজন গভর্ণর ও সেনাপতি ছিলেন। তিনি উত্তর আফ্রিকার মুসলিম প্রদেশ শাসন করেন। খলিফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান মুসাকে ইরাকের সহকারী গভর্ণর হিসাবে নিয়োগ দেন। সেখানে করের অর্থ নিয়ে বিরোধের কারণে মুসার সামনে দুটি সিদ্ধান্ত থেকে একটি বেছে নিতে বলা হয়। প্রথমটি বিরাট অঙ্কের জরিমানা আর দ্বিতীয়টি হলো নিজের মৃত্যুর মাধ্যমে তা পরিশোধ করা। তখন তার পিতার পৃষ্ঠপোষক আব্দুল আজিজ ইবনে মারওয়ান মুসার পক্ষাবলম্বন করে মুক্তিপণের অর্থ পরিশোধ করেন। মুসা বিন নুসাইরের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো স্পেন বিজয়। খলিফা ওয়ালিদের অনুমতি নিয়ে ৪০০ সৈন্য ও ১১০ অশ্বসহ ৪টি রণতরি দিয়ে স্পেনে একটি পর্যবেক্ষক দল পাঠান। পর্যবেক্ষক দলটির তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক মুসা বিন নুসায়র ৭০০০ সৈন্যসহ মূর (বার্বার) সেনানায়ক তারিক বিন যিয়াদকে ৭১১ খ্রি. প্রেরণ করেন। পরবর্তিতে মুসা ইবন নুসায়র আরো ৫০০০ সৈন্য পাঠালে তারিকের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১২০০০। তারিক বীরদর্পে যুদ্ধ করে রডারিককে পরাজিত করেন। রডারিক গোয়াডিলেট নদির তীরে নিমজ্জিত হয়ে মারা যান। ফলে মুসা বিন নুসাইরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। এই দিগ্বিজয়ী বীর ৭৮ বছর বয়সে ৭১৬ খ্রি. মারা যান। বি:দ্র: David Levering Lewis, God's Cruible: Islam and the making of Europe, 570-1215, w.w. Norton and company 20096, p. 384; Ibn Abd al-Hakam, p. 329.

[২৪] **কুতায়বা ইবন মুসলিম :** বসরার বাহিলা উপজাতির একটি প্রভাবশালী পরিবারে ৬৬৯ খ্রি. কুতায়বা ইবন মুসলিম জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি উমাইয়া খিলাফাতের একজন আরব সেনাপতি ছিলেন। যিনি পরবর্তিতে খুরাসনের গভর্ণর হন এবং আল ওয়ালিদের রাজত্বকালে ট্রান্সস্যাকিয়ানা বিজয়ের মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ সৈনিক ও যোগ্য প্রশাসক হিসাবে গড়ে তোলেন। ৭০৫ থেকে আনুমানিক ৭১০ খ্রি. তিনি তোখাতিস্থান ও বোখারার স্থানীয় শাসকদের উপর মুসলিম শাসন সুসংহত করেন। তাছাড়া ৭১০-৭১২ খ্রি. তিনি খোয়ারাজম এবং সোগদিয়ার সমরকন্দ জয় করেন। মধ্য এশিয়া বিজয় এবং ধীরে ধীরে বিজিত অঞ্চল সমূহে ইসলামি শাসনের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য কুতায়বার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কুতায়বার মৃত্যুরপর তার পুত্র কাতান বুখারার গভর্ণর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সালাম নামক আরেক ছেলে বসরা ও রায়কে শাসন করেছিলেন। তার ভাগ্নে মুসলিম বালখের গভর্ণর ছিলেন। তার নাতি বিশেষত সালামের অসংখ্য পুত্র নবম শতাব্দী পর্যন্ত আব্বাসীয়দের অধীনে উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। বি:দ্র: Bosworth, C.E, Kutayba Ibn Muslim, The Encyclopaedia of Islam, New edition, Volume V. p. 541-542; Crone, patricia, Slaves on Horses: The Evolution of the Islamic pality, Combridge University Press, 2003, p. 302; Kennedy Hugh, The Great Arab Conquests: How the spread of Islam Changed the world we live in, Da Copa Press, 2007, p. 42.

[২৫] **মুহাম্মাদ বিন কাসিম :** মুহাম্মাদ বিন কাসিম ৬৯৪ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তায়েফের সাকিফ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার পিতা কাসিম বিন ইউসুফ তার বাল্যকালে মৃত্যু বরণ করেন। তার চাচা উমাইয়া গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেন। তিনি সিন্ধু বিজয়ের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। উমাইয়া, বংশের খলিফা আল-ওয়ালিদের শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র ও জামাতা মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে ভারতের সিন্ধু ও মুলতান প্রেরণ করে ভারত উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের দ্বার উন্মোচন করেন। তিনি এই অঞ্চলগুলোতে ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ন্যায় বিচার ছড়িয়ে দিলে মুসলমানদের আচরণ দেখে এই অঞ্চলের মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। এমনকি সিন্ধুর রাজা দাহিরের চাচাত ভাই রাজকুমার কাকাহ ইবন জান্দারও ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিক ক্ষমতা গ্রহণ করলে খলিফা ওয়ালিদের ঘনিষ্ঠজনদের বিভিন্নভাবে অপদস্ত করা হয়। এক পর্যায়ে মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে কারাগারে পাঠানো হয়। বন্দী অবস্থায় মাত্র ২৪ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। দ্র: মেজর জেনারেল আকবর খান, *মুহাম্মাদ বিন কাসিম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ১০-১৫; Andre wink, *Al-hind: The making of the indo-Islamic world*, vol. 1: Early mediaeval India and the expansion of Islam, Brill-1990, p. 396.

---

[২৬] ফারাযদাক, *দীওয়ানু ফারাযদাক*, ২য় খণ্ড (কায়রো: মাতবা'আতুল মাহাদ, ১৯৩২ খ্রি.), পৃ. ৩৮।

[২৭] ড. শাওকী দায়ফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭; আল-বাগদাদী, *খাযানাতুল-আদাব*, ১ম খণ্ড (বূলাক: আল-মাতবা'আতুস-সীরিয়্যা, তা.বি.), পৃ. ৪৩৬।

[২৮] দাউদ সাল্লুম ও নূরী হাম্মুদী, *হাশিমিয়্যাতুল কুমায়ত* (বৈরূত: মাকতাবাতুন-নাহদা আল'আরাবিয়্যাহ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), বয়ত নং ৩৭।

[২৯] আত-তিরিম্মাহ ইবন হাকীম। একজন খারিজী কবি। সিরিয়ার তা'ঈ গোত্রে জন্ম। সেখানে তিনি প্রতিপালিত হন। অতপর কূফা আগমন করেন এবং 'তায়মুল-লাত ইবন ছা'লাবা' গোত্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে এক খারিজী পণ্ডিতের সাহচর্যে এসে খারিজী মতবাদ গ্রহণ করেন। তিনি একজন শিক্ষক ও সুবক্তা ছিলেন। তিনি ইরানের রায়্যি প্রদেশ সফর করেন। খ্যাতনামা কবি আল-কুমায়ত ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁর 'আকীদা বিষয়ক কবিতাসমূহের ভাষা প্রাঞ্জল। কিন্তু মরুভূমির বর্ণনা বিষয়ক কবিতাসমূহের ভাষা বেশ কঠিন ও দুর্বোধ্য। [দ্রঃ *আল-মুনজিদ ফি আল-আ'লাম*, পৃ. ৩২০; ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল-'আরাবী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১১-১৪।]

[৩০] আত-তিরিম্মাহ, *দীওয়ান*, সম্পা., ড. 'ইযযাত হাসান (বৈরূত: দারুশ-শারকিল-'আরাবী, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৪০।

[৩১] বুতরূস আল বুস্তানী, *'উদাবাউল 'আরব*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারু নাযীর, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৩১৯।

[৩২] *তদেব*।

[৩৩] **ইমরান ইবন হিত্তান :** তার নাম ইমরান, পিতার নাম হিত্তান, কুনিয়াত আবু শিহাব। তিনি বসবার অধিবাসি ছিলেন। প্রথমে তিনি একজন সুন্নী মুসলমান ছিলেন। বিবাহ পরবর্তি সময়ে স্ত্রীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে খারিজী মতবাদ গ্রহণ করেন। দ্রঃ ওমর ফাররুখ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯০; ড. শাওকী দায়ফ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭।

[৩৪] ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল 'আদাবিল 'আরাবী*, *আল আসরুল ইসলামি* (কায়রো: দারুল-মা'আরিফ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ৩০৭; 'উমার ফাররূখ, *তারীখুল 'আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৯।

[৩৫] ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল 'আদাবিল 'আরাবী*, *আল আসরুল ইসলামি*, পৃ. ৩১০।

[৩৬] *তদেব*।

[৩৭] আল ফারাযদাক, *দীওয়ানুল ফারাযদাক* (বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১৯১-১৯২।

[৩৮] *দীওয়ানুল আখতাল*, পৃ. ৯০-৯১।

[৩৯] জারীর, *দীওয়ানি জারীর*, মাহদী মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন কর্তৃক ব্যাখ্যাসহ সংকলিত (বৈরূত: দারুল কুতুবুল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৪২০।

[৪০] এফাল ইসরায়েল, The Ancient Arabs: Nomans on the Borders of the Fertile Crescent 9th-5th Centuries B.C, 1982, p. 105.

[৪১] ড. এস.এম. আব্দুছ ছালাম, *মহানবী (সা.) এর জীবনপ্রবাহ* (রাজশাহী: ছালেহা পাবলিকেশন্স, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৩৩।

[৪২] মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রা.), অনুবাদ মাওলানা মহিউদ্দীন খান, *তাফসীরে মারেফুল কুরআন*, সুরা আরাফ, আয়াত: ৭৫-৭৮।

[৪৩] ড. সালাহুদ্দীন আল-হাদী, *ইত্তিজাহাতুশ-শি'র ফিল আসরিল উমাবী* (কায়রো: মাকতাবাতুল-খানজী, ১৪০৭৪ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৩১৩।

[৪৪] William James, *The Varieties of religious experience*, Harvard University Press, 1985, p. 31; The Global Religious Landscape, *Pew Research Centers Religion* and public life Project. December 2018, Report-2012.

[৪৫] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১৯।

[৪৬] মুহাম্মদ ইবন হাবীব, *শারহু দীওয়ানি জারীর* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), পৃ. ৪৪১।

[৪৭] আহমাদ হাসান বাসবাহ, *আল-আখতাল শা'ইরু বনী উমাইয়া* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৫৭।

[৪৮] *দীওয়ানুল আখতাল*, পৃ. ১৬০।

[৪৯] শেখ মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ* (রাজশাহী: বুক প্যাভিলিয়ান, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১০৭।

[৫০] ড. আহমাদ নাসীফ আল-জানাবী, *মালামিহু মিন তারীখিল-লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ* (ইরাক: দারুর-রাশীদ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১০৫।

[৫১] Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracens* (London: Macmilan and Co. Ltd., 1961), p. 186; শেখ লুৎফর রহমান, *আরব জাতীর ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা বাজার, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ২০৩।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহ্লভী: সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান
(Shah Waliullah Muhaddith Dehlawi: His Contribution to Social Reforms)

মুকাররম হুসাইন*

Abstract: Shah Waliullah, an Indian theologian and promulgator of modern Islamic thought, first attempted to reassess Islamic theology in the light of modern changes. Shah Waliullah had exceptional talent, ability of mind and spiritual purity. An outstanding scholar of Islamic sciences, who lived in the age of crisis and intellectual degeneration, he revolutionized the philosophical, social and economic ideas within the framework of Islam. In South Asia, understanding Islam as a socio religious movement is incomplete without studying the work of Shah Waliullah. As the eminent Muslim Philosopher Allama Iqbal writes " He was the first Muslim to feel the urge for rethinking the whole system of Islam without breaking traditions of past." Waliullah believed that the Muslim polity could be restored to its former splendor by a policy of religious reform that would harmonize the religious ideals of Islam with the changing social and economic conditions of India. According to him, religious ideas were universal and eternal, but their application could meet different circumstances. The main tool of his policy was the doctrine of *taṭbīq*, whereby the principles of Islam were reconstructed and reapplied in accordance with the Qurʾān and the Hadith. Shah Waliullah has enormous work, both academic as well as spiritual – to his credit. He inspired generations of ulama, scholars, and left great legacy. He shaped the Islamic thought in South Asia. Almost every school of thought and Islamic movement in Islam accepts him as an authority and takes lineage in South Asia from his works. Shah Waliullah was a writer par excellence. He wrote seventy-one books. He was the first person to translate Quran in any language from Asia. Shah Wali Allah was not only a writer and scholar but an activist also. This article deals with Shah Waliullah and his Reforms.

ভূমিকা

আল-কুরআনুল কারীমে মুসলিমদের ‘খাইরুল উম্মাহ’ বা উত্তম জতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও অন্য স্থানে এই মানুষকেই আবার নিম্নস্তরের জাতি হিসাবে বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতি উত্তম অবয়বে’।[১] অন্য স্থানে বলা হয়েছে- তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে’।[২] সূরা তীনের পরের আয়াতে বলা হয়েছে- ‘অতঃপর আমি মানুষকে নামিয়ে দিয়েছি নীচু থেকে নীচু স্তরে’।[৩] নবীসহ তাদের পরে যারা এসেছিলেন, তারাই উক্ত আয়াতের বাস্তব রূপ দেখিয়ে দিয়েছেন- ‘মুসলিমরা সর্বোত্তম জাতি’। নবী-রাসূলের পর আলেমদের মাধ্যমেই ইসলামের প্রচারের কাজ অব্যাহত রেখেছেন মহান রব। উপমহাদেশের কিংবদন্তী মহা পুরুষদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহ.)। মুসলিম পুনর্জাগরণ, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ও শিক্ষা বিস্তারের অগ্রদূত হিসেবে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাওহীদ, রিসালাত,

---

* পিএইচ.ডি. গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ফিক্বহ, মানবিক জীবন, রাষ্ট্রনীতি, সালাত, যাকাত সহ দ্বীনের প্রকৃত রহস্য নিয়ে গবেষণা করেছেন পথহারা মানুষের দিকনির্দেশনার জন্য। এজন্যই দক্ষিণ এশিয়ার মুজাদ্দিদ হিসাবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে বেশ।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও সমকালীন প্রেক্ষাপট

আঠারো শতকের পূর্বে উপমহাদেশের মুসলিমদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা নাযুক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। সে সময় কুরআনের তরজমাও নিষিদ্ধ ছিল। ইলমে হাদীছের চর্চা বলতে কিছুই ছিল না। দরবারী আলেমদের জারিকৃত ফৎওয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল জনতা। মাযারপন্থী বিদ'আতী পীরদের জয়জয়াকার ছিল। জ্যোতিষীর মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষার বদ অভ্যাস ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাষ্ট্রীয় কোন কাজ করতে গেলে রাজা-বাদশারাও গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগীসহ দুধ পর্যন্ত কাজের ভিত্তিপ্রস্তরের স্থানে ঢেলে দিত। এদিকে তাছাউওফের নবাবিস্কৃত হাকীকত, তরীকত ও মা'রেফাতের মিথ্যা ছায়ায় ইসলামের স্বচ্ছ আলো ঢেকে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। হিন্দু-মুসলিম যেন একাকার। শায়খ আহমাদ সারহিন্দী রহিমাহুল্লাহ (৯৭১-১০৩৭ হিজরী মোতাবেক ১৫৬৪-১৬২৪ খৃ.) সংস্কারের যে বীজ বপন করেছিলেন, শতবর্ষের ব্যবধানে তা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। সম্রাটের প্রসাদ হতে গরীবের পর্ণকুটীর পর্যন্ত বিস্তৃত কুসংস্কারের শিকড় উৎপাটনের জন্য সমগ্র জাতি একজন দূরদর্শী চিন্তানায়কের আগমনের জন্য পথ চেয়েছিল। এমনি অবস্থায় আল্লাহর অপার অনুগ্রহে জন্মগ্রহণ করেন ভারত উপমহদেশের প্রেরণা সৃষ্টিকারী ও আধুনিক যুগের অগ্রনায়ক শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহিমাহুল্লাহ (১১১৪-১১৭৬ হিজরী/১৭০৩-১৭৬২ খৃ.)।

আমেরিকান লেখক ড. লুফারাপে স্টাডার্ডে তার জগদ্বিখ্যাত 'নিউ ওয়ার্ল্ড অফ ইসলাম (New world of islam) বা 'আধুনিক মুসলিমবিশ্ব' গ্রন্থে আঠারো খ্রিস্টশতকে মুসলিমবিশ্বের চিত্র তুলে ধরেছেন। যাতে কিছু অতিরঞ্জন পাওয়া গেলেও তাতে সেসময়কার বহু আপত্তিকর ও লজ্জার বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে। তিনি লিখেছেন, "আঠারো শতকে মুসলিমবিশ্ব দুর্বলতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। সঠিক শক্তির প্রভাব কোথাও দেখা যেত না। সর্বত্রই ছিল অধঃপতন ও স্থবিরতা। সভ্যতা, ভদ্রতার নাম পর্যন্ত ছিল না, চরিত্র ছিল ঘৃণ্য, হতাশাজনক।"[৪]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রাথমিক জীবন : শাহ ওয়ালিউল্লাহ ভারতের দিল্লীতে অবস্থিত ফুলতে[৫] ৪ শাওয়াল ১১১৪ হিজরী মোতাবেক ১৭০৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী সূর্যোদয়ের সময় জন্ম গ্রহণ করেন।[৬] জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রতি শৈশব থেকেই শাহ ওয়ালিউল্লাহর আগ্রহ ছিল ভীষণ। প্রাথমিক পর্যায়ে দিল্লীতে তাঁর পিতা শাহ আব্দুর রহীম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা রহিমিয়াতে পিতার অধিনে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। একই বছর পিতার মৃত্যুর পর ১৭১৮ সালে পিতার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মাদরাসার প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি সেখানে দীর্ঘ ১২ বছর কাটিয়ে দেন।

নাম, জন্ম ও বংশ পরিচয় : নাম কুতুবুদ্দীন আহমাদ ইবনু আব্দুর রহীম। আরবীতে قطب الدين أحمد بن عبد الرحيم বলে। অবশ্য শাহ ওয়ালিউল্লাহ উপাধিতেই তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন। মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর মাত্র চার বছর পূর্বে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর এক ঐতিহাসিক ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বংশ পরম্পরাই বলা যায় এভাবে- কুতুবুদ্দীন আহমাদ ওরফে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহলভী বিন (২) আব্দুর রহীম ফারূকী আহমাদ বিন (৩) শহীদ আজীহুদ্দীন। এভাবে ৩১ তম পুরুষ হল আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর এবং ৩২তম মহান পুরুষ হল ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)। ওয়ালিউল্লাহ পরিবার নিয়ে নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩৭০ হি./১৮৩৩-১৮৯০ খৃ.) বলেন,

وكلهم كانوا علماء نجباء حكماء فقهاء كأسلافهم وأعمامهم كيف وهم من بيت العلم الشريف والنسب الفاروقي المنيف.

‘তাদের সকলে ছিলেন চাচাদের ন্যায় বিদ্বান, উচ্চ সম্মানিত, প্রজ্ঞাবান ও ফক্বীহ। কেন সেটা? তারা ছিলেন উঁচু ইলমী পরিবারের সন্তান এবং ভদ্র ফারূক্বী বংশের উত্তরসূরী’।[৭] বংশগতভাবেও শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও উঁচু বংশের। শাহ সাহেবের দাদা ছিলেন শায়খ ওয়াজিহুদ্দীন শহীদ। অনুরূপভাবে শাহ ওয়ালিউল্লাহর নানাও ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলেম শায়খ মুহাম্মদ ফুলতী (রহ.)। তার জীবনী নিয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ নিজেই একটি জীবনবৃত্তান্ত লিখে যান। যার নাম দেন العطية الصمدية في أنفاس المحمدية।[৮]
তার চাচা শায়খ আবু রেযা মুহাম্মাদও ছিলেন জ্ঞানী ব্যক্তি। যাকে ‘ইমামুত তরীকত ওয়াল হাকিকত’ এর মত উচ্চাঙ্গের উপাধিতে ভূষিত করা হত। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) নিজ চাচা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিখেছেন, قوي العلم، فصيح اللسان، عظيم الورع، وسيع المعرفة তথা বিজ্ঞ জ্ঞানী, প্রাঞ্জলভাষী, বাগ্মী, বিরাট সংযমী ও প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব।[৯]
পিতা শাহ আব্দুর রহীম সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) তাঁর লিখিত গ্রন্থ “বাওয়ারিকুল বিলাইয়্যাহ” তে পিতা আলোচনা করেছেন। একজন যোগ্য পুত্রের কলমে একজন যোগ্য পিতার জীবন-চরিত নিয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুব একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়না। শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেন, আব্বাজান অধিকাংশ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হলেও হাদীছ অনুসারে ফিকহকে মূল্যায়ন করতেন। যেমন ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ, জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ ছিল অন্যতম।[১০] শাহ আব্দুর রহীম সাহেব ছিলেন বিখ্যাত ফতোয়ায়ে আলাগমীরী সংকলনকারী ২১ জন আলেমদের অন্তর্ভূক্ত।[১১] এ ফতোয়া লিখতে গিয়ে শাহ আব্দুর রহীম তার সাহসিকতার পরিচয়ও দিয়েছেন। ‘আলকাওলুল জামীল’ গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তাঁর সম্মানিত মাতার নাম ছিল ফখরুন নিসা। তিনিও ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানী ছিলেন।[১২] সবমিলিয়ে বলা যায়, শাহ ওয়ালিউল্লাহ এক সম্ভ্রান্ত, ঐতিহাসিক এবং তাকওয়াবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
শিক্ষা জীবন : মাত্র ৭ বছর বয়সে শাহ ওয়ালিউল্লাহ পবিত্র কুরআনের হাফেয হন। তিনি কুরআনের পাশাপাশি আরবী, ফারসী ভাষা ও সাহিত্য এবং উচ্চস্তরের দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, অতীন্দ্রিয়তা ও আইনশাস্ত্রের উপর পাঠ নেন। নিঃসন্তান পিতা আল্লামা শাহ আব্দুর রহীম এর ৬০ বছর পার হওয়ার পরে দ্বিতীয় স্ত্রী ফখরুন নিসার গর্ভে শাহ ওয়ালিউল্লাহ, আহলুল্লাহ ও হাবীবুল্লাহ নামে পর পর তিনটি পুত্র সন্তান জন্ম হয়। ওয়ালিউল্লাহ ১০ বছর বয়সে শরহে জামী শেষ করে পিতার নিকটে ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ, তাফসীরে বায়যাভী, আক্বায়েদ, মানতিক, মিশকাত ও অন্যান্য কিতাব সমূহ পড়তে শুরু করেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে মুহাম্মাদ আফযাল শিয়ালকোটি, আফ্দুল্লাহ মাক্কী, তাজুদ্দীন মাক্কী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। শাহ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর লিখিত গ্রন্থ “আলজুযউল লাতীফ” এ তাঁর পঠিত পাঠ্যসূচির একটি বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে বুঝা যায় তিনি ফিকহ, উসূলে ফিকহ, মানতিক, আত্মশুদ্ধি, হকিকত, খাওয়াসসে আসমা, আলফাওয়ায়িদুল মিয়াহ এবং আয়াত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপরে প্রচুর বই পড়া-শোনা করেছেন। তাছাড়াও চিকিৎসা, দর্শন, মা‘আনী এবং গণিতশাস্ত্রেও বিভিন্ন বই পড়েন। শাহ ওয়ালিউল্লাহর প্রকৃত উসতায হলেন পিতা শাহ আব্দুর রহীম। মুলতান থেকে দিল্লীতে আগত শায়খ আব্দুল্লাহ ও শায়েখ আযিযুল্লাহ‘র সুবাদে ইলমে কালাম, বালাগাত ও মাকুলাতের বিভিন্ন কিতাব পড়ারও সুযোগ হয়।[১৩]
বিবাহ ও সন্তানাদি: শাহ ওয়ালিউল্লাহর বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বছর। পিতা আব্দুর রহীম তার বিবাহ দেন তারই মামাতো বোন শায়খ ওবাইদুল্লাহ সিদ্দীকী ফুলতীর কণ্যার সাথে। এ গর্ভেই তাঁর বড় ছেলে শায়খ মুহাম্মাদ জন্মগ্রহণ করেন।[১৪] মাত্র একটি সন্তান মুহাম্মাদ জন্মের পর শাহ ওয়ালিউল্লাহর বেগম সাহেবা মৃত্যুবরণ করেন। পরে দ্বিতীয় বিয়ে হয় প্রথম সাইয়েদ সানাউল্লাহ সোনাপতীর কণ্যা বিবি ইরাদতের সঙ্গে। এই স্ত্রীর উদরে শাহ সাহেবের খ্যাতিমান চার পুত্র শাহ আব্দুল আযিয, শাহ রফিউদ্দীন, শাহ আব্দুল কাদির এবং শাহ আব্দুল গণী জন্মগ্রহণ করেন। তারা ছিলেন ভারতবর্ষের দীন-ধর্মের পুনর্জাগরণের অন্যতম চার সদস্য। আমাতুল আযীম নামে এক কণ্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। আমাতুল আযীমেরও বিয়ে হয়

ভারতবর্ষের বিখ্যাত এক আলেমের সাথে। সবাই তাদের সন্তানদের দ্বীন প্রচারের কাজে উৎসাহিত করেন এবং বংশধারা এভাবেই চলতে থাকে।

জ্ঞানার্জনের জন্য হিজায গমন : মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী হজ্জ সফরে হারামাইনের দিকে রওনা দেন। হজ্জ ছাড়া জ্ঞানের প্রতিও কুতুবুদ্দীন আহমাদের নেশা ছিল অনেক বেশী। তাই তো শিক্ষক এবং মাদরাসার প্রধান হওয়া সত্ত্বেও এগুলো ছেড়ে দিয়ে তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য হেজাজে গমন করেন। সর্বদা নিজেকে শিক্ষার্থী ভেবে এক পর্যায়ে হাদীছ অধ্যায়ে অধিক জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। সে লক্ষ্যে ১১৪৩ হিজরীতে তিনি প্রথমে হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় গমন করেন। তিনি ১৫ জিলকদে মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করেন। সেখানে গিয়েই মসজিদে হারামে মুসাল্লায় দরস নেয়া শুরু করেন।[১৫] এরপর হিজাযে ২ বছর অবস্থান করে আবু তাহের বিন ইবরাহিম আল-কুর্দি আল-মাদানীর (মৃত ১১৪৫ হি.) মত পণ্ডিতদের কাছে হাদীছ, ফিক্বহ শিক্ষা লাভ করেন। বুখারীর উস্তাদ হিসেবে খ্যাতিমান ও অভিজ্ঞ আবু তাহের আল-কুর্দির কাছে তিনি ছহীহ বুখারীর দারস নেন। একই সময়ে তিনি মুসলিম বিশ্বের আরো বিভিন্ন প্রান্তের লোকের সংস্পর্শে আসেন এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। অর্জিত এ সকল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি 'ফুয়ূদ আল-হারামাইন' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় দিল্লীতে ফিরে আসেন। ১১৪৩ ও ১১৪৪ হিজরীতে পরপর দুবার হজ্জ করে ১০ রজব ১১৪৫ হিজরী শুক্রবার সুস্থ ও নিরাপদে নিজের আবাসস্থল দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।[১৬] অবশ্য তিঁনি إنسان العين في مشايخ الحرمين 'ইনসানুল 'আইন ফী মাশায়িখিল হারামাইন' নামে একটি পুস্তকও রচনা করেন।[১৭]

কর্ম জীবন : শাহ ওয়ালিউল্লাহর কর্মজীবন ছিল আলোকঝলমলে। তার বিভিন্ন কর্মমুখী তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় তাঁর কর্মময় জীবন ইতিহাস দেখলেই। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) হিজায থেকে ফিরে আসার পর স্বীয় পিতার মাদরাসায়ে রহীমিয়াতে শিক্ষকতা শুরু করেন।[১৮] শাহ সাহেবের দারসের কথা প্রচার হতেই অল্পকিছুদিনের মধ্যে দিকদিগন্ত থেকে তালিবে ইলম দলে দলে আসতে থাকে। এমনকি সেখানে ছাত্রের আধিক্যতার কারণে জায়গার সংকুলান হচ্ছিল না। অতঃপর জায়গা প্রশস্ত করার উদ্যোগ নেন সম্রাট মুহাম্মাদ শাহ। তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহকে শহরে এক বিশাল ভবন দিয়ে দারসের জায়গার ব্যবস্থা করে দেন।[১৯] একদিকে ক্ষুরধার লেখনী, অন্যদিকে মাদরাসায় ছাত্রদের ঈমানী চেতনায় বিপ্লব সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি ভবিষ্যতের ন্যজ্য নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন একদল মর্দে মুজাহিদ তৈরী করে যান। সেই মুজাহিদ দলের প্রথম কাতারে ছিলেন তাঁরই চার সন্তান আব্দুল আযীয, রফিউদ্দীন, আব্দুল কাদের ও আব্দুল গণি। তাঁর কর্মজীবন মূলত শিক্ষকতার মত মহান পেশা এবং দাওয়াতী কার্যক্রম দিয়েই পার করেছেন।

ইনতিকাল: ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে নিবেদিত, কুরআন-সুন্নাহর প্রচারক এই মহান ব্যক্তির শুভ সমাপ্তির দিন এসে পড়ে। ১১৭৬ হিজরীর মহররমের ২৯ তারিখ, মোতাবেক ২১ আগস্ট ১৭৬২ সালে শনিবার দ্বিপ্রহরে তিঁনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। অতঃপর দিল্লী তোরণের বামদিকে 'মুনহাদিয়া' নামক স্থানে শাহ ওয়ালিউল্লাহকে দাফন করা হয়। এই মুনহাদিয়া কবরস্থানে শাহ ওয়ালিউল্লাহর চার পুত্র এবং সম্মনিত পিতা শাহ আব্দুর রহীমকেও দাফন করা হয়।[২০] মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল একষট্টি বছর চার মাস।

শাহ ওয়ালিউল্লাহর বিভিন্নমুখী সংস্কার কার্যক্রম

কুরআনের খেদমত: যে যুগে কুরআন এর অনুবাদ করাও মহা অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হত, ঠিক সে সময় কুরআনের প্রাসঙ্গিক খেদমত করাটা খুবই দুরুহ ব্যাপার ছিল। অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস আল-কুরআন থেকে মুসলিমরা অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। আরবী ভাষা না জানার কারণে কুরআন পড়াটা তাদের নিকট ভীতিকর বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। এজন্য শাহ সাহেব কুরআনুল কারীমের ভাষান্তরের কাজ করে এবং মুসলিমদের মাঝে কুরআনের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। যাতে করে মুসলিমদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাসগুলোর সংস্কার করা যায় এবং শাশ্বত ধর্ম ইসলামের সাথে জনগণের সুন্দর

সম্পর্ক তৈরি হয়।[২১] কুরআন তেলাওয়াত করা, শ্রবণ করা, তরজমা পড়া, তাফসীর থেকে গবেষণা করা ইত্যকার বিষয় তিনি জনসাধারণের নিকট খুব সহজে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। আল-কুরআন আরবী ভাষার ৭টি উপ-শাখায় নাযিল হয়। এর পাঠেও ভিন্নতা রয়েছে- প্রতিটি হরফ তেলাওয়াতে ১০টি করে নেকী অর্জিত হয়, কুরআন মানব জীবনের আরোগ্য এবং একজন মানুষের কমপ্লিট লাইফ।

কুরআনের দরসের মাধ্যমে আক্বীদা সংশোধনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। আল-কুরআনের দারস দিতে গিয়ে اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ‘তোমরা ন্যায়বিচার কর, এটা তাক্বওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী’[২২] আয়াত পর্যন্ত দারস শেষে ইন্তিকাল করেন। অতঃপর পুত্র শাহ ‘আব্দুল ‘আযীয দেহলভী এখান থেকে শুরু করেন এবং إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ‘তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাক্বী’[২৩] আয়াত পর্যন্ত দারস প্রদান করেন।[২৪]

কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) বলেন, আমরা অনেকে আছি যারা কাফিয়া জানি, শাফিয়া জানি, গণিত বিজ্ঞান সবই আমরা জানি, শুধু জানি না কুরআন। আবার এক শ্রেণীর মানুষকে সর্বদা বলতে শোনা যায়- কুরআন কি এত সহজ? যে কেউ বুঝবে? যে কেউ এর অর্থ বুঝতে পারবে না, সবাইকে পড়া থেকেও বারণ করে থাকে একশ্রেণীর আলেম নামধারী ব্যক্তিরা। অথচ এই কুরআনকে মহান আল্লাহ সহজ করেছেন তা পবিত্র কুরআনে বারবার উল্লেখ করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ‘অবশ্য আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং উপদেশগ্রহণকারী কেউ আছে কি?’[২৫] তিনি আরো বলেন, আরে কুরআন যদি সহজ না হত তাহলে মহান আল্লাহ কেন বলবেন “তোমরা কি কুরআনের উপর চিন্তা-গবেষণা করো না? নাকি তাদের অন্তঃকরণে তালা লাগানো?[২৬] অর্থাৎ এ নির্দেশ সকল মুমিনদের জন্য; শুধু আলেম-বিদ্যানদের জন্য না। তাইতো হিজায সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে কুরআন-হাদীছ চর্চা ও প্রচার-প্রসারে কাজে লাগিয়েছেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত নিলেন- আকীদার সংশোধন ও সংরক্ষণ এবং মহান আল্লাহর সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কুরআনের হেদায়েত ও শিক্ষাকে সরাসরি প্রচার-প্রসার করার চেয়ে ফলপ্রসূ আর কিছু হতে পারে না। এর জন্য পন্থা একটিই, তা হচ্ছে- ‘কুরআনের ফার্সী অনুবাদ’। ‘ফাতহুর রহমান’ গ্রন্থের ভূমিকায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) সে বিষয়ে বিস্তারিত বলেছেন। আমরা মুসলিমরা যে যুগে অবস্থান করছি, মানুষের আমল-আকীদার যে দূরাবস্থা তাতে মুসলিমদের কুরআন জানানো ছাড়া বিকল্প নেই। কুরআন আমরা অনেকেই পড়ি কিন্তু তার মর্মার্থ না জানার কারণে কুরআনকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারি না।

কতিপয় বন্ধুকে পাণ্ডুলিপি সাজানোর জন্য দায়িত্ব দেন। সেই সাথে কুরআনের মূল আরবীও লিখে দেন, যেন মানুষের সন্দেহ দূর হয়। বন্ধুরা ১১৫০ হিজরীর ঈদুল আযহা থেকে কাজ শুরু করে কঠিন পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে ১১৫১ হিজরীর শাবান মাসে তরজমার কাজ সম্পাদনাসহ সম্পন্ন করে, ফালিল্লাহিল হামদ্। দীনী ভাই খাজা মুহাম্মাদ আলিম এর সক্রিয় প্রচষ্টায় ১১৫৬ হিজরীতে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং তার দারসও শুরু হয়ে যায়। শাহ ওয়ালিউল্লাহর প্রায় পঞ্চাশ বছর পর ১২০৪-০৫ হিজরীতে তাঁরই সুযোগ্য পুত্র শাহ আব্দুল কাদির দেহলভী (মৃত্যু ১২৩০ হি) উর্দূ ভাষায় কুরআনের তরজমা উপস্থাপন করেন। এরপর তারই বড়ভাই শাহ রফিউদ্দীন (মৃত্যু ১২৩৩ হিজরী) কুরআনের শব্দে শব্দে তরজমা করেন যা জ্ঞানী ও সাধারণ পাঠকদের কাছে সমাদৃত ও স্বীকৃত হয়।[২৭]

মুসলিম জাগরণ: শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) এর জন্ম হয় সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর (মৃত্যু ১১১৮ হিজরী)-এর মৃত্যুর চার বছর পূর্বে হিজরী ১১১৪ সালে। সম্রাট আলমগীর এই উপমহাদেশের সম্রাট অশোকের (মৃত্যু: খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮৩) পরে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় শাসক।[২৮] শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ সে সময় দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করে বাল্যকাল অতিক্রম করেছেন। রাজনৈতিক বিক্ষিপ্ততা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় থাকলেও এ যুগে শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা, সাহিত্য ও কাব্যচর্চার যুগ ছিল। শিক্ষার উন্নতির সাথে

সাথে সে যুগে যারা শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন তারা লেখনি রেখে গেছেন যথেষ্ঠ। বিশেষ করে 'সুল্লামুল উলুম' ও 'মুসাল্লামুস সুবুত' রচয়িতাগণ মুহিববুল্লাহ বিহারী (মৃত্যু ১১১৯ হিজরী), কাজী মুবারক গোপামবী (মৃত্যু ১১৬২ হিজরী) এদের লিখা প্রবন্ধ বা পুস্তক উল্লেখযোগ্য। তাছাড়াও মোল্লা নিযামুদ্দীন লাখনোবী (মৃত্যু ১১৬১ হিজরী) ছিলেন তাদের মাঝে সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি, যার নির্বাচিত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাব্যবস্থা ভারতবর্ষ থেকে বুখারা-সমরকন্দ পর্যন্ত চালু ছিল। তাদের মত বিচক্ষণ, দূরদর্শী, দেশের গৌরব ও যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, অধ্যাপক, লেখক-গবেষকরা ছিলেন ছাত্র-যুবকদের চেতনা। তারাই ছিলেন এই ময়দানে দীক্ষাদানের ত্রাণকর্তা এবং সেই শতকের মনীষী ও মহাপুরুষ।[২৯] ঘুমন্ত জাতিকে আবারও আলোর পথে চলার স্বপ্ন দেখান শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ)। শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা জাতিকে আবারও জাগিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালান। আন্তর্জাতিক অঙ্গনের মুসলিমদের অবদান, সময়পযোগী নতুন নতুন বই প্রকাশ, আর্টিকেল লিখন বিভিন্ন দিক থেকেই মুসলিমরা পিছিয়ে ছিল। মুসলিমদের মাঝে বিজ্ঞানীও ছিল খুবই কম। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানেও তাদের অবদান অতি সামান্য। তা অনুভব করেই জাতিকে জাগ্রত করার এই মহান দায়িত্ব মাথা পেতে নেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ।

হাদীছের খেদমতে অবদান

হাদীছের জ্ঞান প্রসারে শাহ ওয়ালিউল্লাহর (রহ.) অবদান অসামান্য। কুরআনের পাশাপাশি শরীআতের দ্বিতীয় উৎস রাসূলের হাদীছ প্রচার-প্রসারে এবং তা মানার ব্যাপারে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন, কিছুলোক বলে থাকে, কুরআন ও হাদীছ কেবল সেই অনুধাবন করতে পারে, যে গভীর জ্ঞান লাভ করেছে। তাদের জবাবে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মহান আল্লাহর এ বাণিটি উপস্থাপন করেছেন-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

তিনিই আল্লাহ, যিনি নিরক্ষরদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের পড়ে শোনান আল্লাহর আয়াতসমূহ। তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত; যদিও ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।[৩০]

হাদীছের প্রতি আমল আরো সহজ ও সাভাবিক করার জন্য তিনি চেয়েছিলেন, শুধু আলেম-ওলামারাই না; বরং কুরআনের ন্যায় হাদীছের অর্থ বুঝে আম সাধারণ মানুষও হাদীছকে ভালবাসতে পারে এবং আমল করতে পারে। যেমন কেউ বলে থাকে, আমরা শেষকালের লোক, হাদীছের অর্থ ও মর্মকথা উত্তমরূপে বুঝতে পারি? তাদের জবাব দিতেই তিনি মহান আল্লাহর বাণী উদ্ধৃতি করেছেন-

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

এবং তাদের মধ্যে হতে অন্যান্যদের জন্য যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৩১] অর্থাৎ পরবর্তী লোকজন শিক্ষিত হোক কিংবা অশিক্ষিত, যখন সে মুসলিম হবে এবং সাহাবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, কুরআন-হাদীছ শ্রবণ করবে, তখন তাদেরও পবিত্র করার জন্য তাই যথেষ্ঠ হবে। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষকে কুরআন-হাদীছ থেকে বিভিন্ন কৌশলে তাদের দূরে রাখা হয়েছে। উপমহাদেশের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে 'ইলমে হাদীছের খুব একটা বেশি প্রচলন ছিল না। তাই শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহ.) হাদীছের প্রচার ও প্রসারকে তাঁর মূখ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন। একারণে হাদীছের দারস ও গ্রন্থ রচনা উভয় খিদমতই আঞ্জাম দেন। সাথে সাথে হাদীছের ব্যখ্যাগ্রন্থও রচনা করেন তিনি।[৩২] সুদীর্ঘ সময়ে তিনি দারস প্রদান করেছেন এবং হাদীছ বিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেছেন। যেমন 'বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন', যেখানে মুহাদ্দিছগণের জীবনী উল্লেখিত হয়েছে এবং 'আল-উজালাতুন নাফি'আহ'।[৩৩]

আকীদার সংস্কারঃ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহলভী (রহ.) বলেন, এ ধর্মের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশ্য নিদর্শন হল, আকীদার উপর গুরুত্ব দেয়া। নবী আদম (আ.) থেকে শুরু করে আমাদের শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলই একটি সুনির্দিষ্ট আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দিতেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর।[৩৪] তিনি বলেন, বান্দা ও আল্লাহর মাঝে যে সম্পর্ক, সাহায্য, সন্তুষ্টি, ভালবাসা ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা কেবল সঠিক আকীদা-বিশ্বাস, ঈমানী চেতনা, নিস্কলুষ তাওহীদের উপর ভিত্তিশীল। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ আর তোমরা নিরাশ হয়ো না, চিন্তাও করো না। তোমরাই বিজয়ী হবে যদি খাঁটি মুমিন হও।[৩৫]

শিরক যে মানবজাতির সবচেয়ে ভয়াবহ ও পুরনো রোগ তা শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) এর সময়ে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর উপর আস্থা, বিশ্বাসের যবনিকাপাত ঘটায়। তাওহীদের অনুপস্থিতি ও শিরকের আড্ডায় মানুষ প্রায় ভুলতে বসেছিল যে, তাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা, রিযিকদাতা, জীবন-মৃত্যুর মালিক মহান আল্লাহ। কবরবাসীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা, তাদের কাছে আবেদন-নিবেদন, ফরিয়াদ, তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণের আরাধনার প্রচলন শুরু হয়েছিল। তাদের কবরের উপর বড় বড় মসজিদ নির্মাণ, কবরকে সিজদার স্থান বানানো, সেখানে প্রতি বছর মেলা বা ওরশের আয়োজন করা এবং দূর-দূরান্ত থেকে সেখানে লোকদের আগমনের প্রথা চালু করা।[৩৬] বিভিন্ন মাজারে হজ্জ পালন, আবার কোন সময় কিছু মাজার বা দরবার শরীফকে বায়তুল্লাহর হজ্জের ওপর প্রাধান্য দান করত নাউযুবিল্লাহ।[৩৭] অথচ কুরআনুল কারীমের ঘোষণা- أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ জেনে রাখুন, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। অধিকাংশ মানুষের এই তাওহীদের বিপরীত জীবন যাপন, মুসলিম সমাজে বিদ‘আতীদের আস্ফালন, হিন্দু ও শিয়াদের নানান রসম-রেওয়াজ ও অভ্যাসের অনুকরণ চলছিল। প্রকাশ্যে কবরপূজা, শায়েখদের সম্মানে তাদের সিজদা করা, বিভিন্ন মাজারকে সম্মান প্রদর্শন করা, কবরের উপর লাল শালু চড়ানো, তাতে মান্নত মানা, বুযুর্গদের নামে কুরবানী করা, মাজার তাওয়াফ করা। এক কথায় এমন কোন জঘণ্য কর্ম ছিল না, যা করা হত না। রোগ-ব্যাধি দূর করার লক্ষ্যে অলীক দানবের সন্তুষ্টি কামনা করা, নেককার অলীদের জন্য মান্নত মানা এ সবই মুসলিমদের ধর্মীয় রীতি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল। আলীবখশ, হোসাইনবখশ, পীরবখশ, মাদারবখশ, খোদাবখশ নামগুলো সেসময় ব্যাপক প্রচলিত ছিল। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহলভী (রহ.) সেই ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট আকীদা থেকে মানুষকে বের করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেন। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ পূর্ণ রূপেই চালিয়ে যান।

সুন্নাহবিরোধী ও বিভ্রান্ত ধর্মীয় গ্রুপের বিরুদ্ধে কার্যকর অবস্থান

হিজরী দশ শতকের শুরুতেই যখন ইরানে শী‘আ মতবাদকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয় এবং সুন্নী মতাদর্শকে ইরান থেকে প্রায় নির্বাসিত করা হয়, তখন থেকেই ভারতেও শী‘আ মতবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সাফাভী শাসনের দ্বিতীয় শাসক তুহমাসফ (মৃত্যু ৯৮৪ হি.)-এর শাসনামলে মীর গিয়াসুদ্দীন মানুছুর[৩৮] (মৃত্যু ৯৮৪ হি.)-এর ভারতীয় শাগরিদ আমির ফাতহুল্লাহ শিরাজী (মৃত্যু ৯৯৭ হি.)-এর মাধ্যমে ভারতবর্ষে শী‘আ মতবাদের উত্থান ঘটে।[৩৯] পরবর্তীতে ভারতবর্ষে শী‘আ মতবাদের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। ফলে রাফেযী ও শী‘আ মতবাদের প্রতিরোধ ও এর প্রভাব থেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতকে সংরক্ষণ করার জন্য শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী ‘ইযালাতুল খিফা ‘আন খিলাফাতিল খুলাফা’ নামক একটি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থ রচনার প্রাথমিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনায় বলেন, ‘এ যুগে শী‘আ ধর্মমত গ্রহণের বিদ‘আত চালু হয়েছে।[৪০]

শী'আ মতবাদের খণ্ডনের ব্যাপারে শাহ সাহেব যে পথের সূচনা করেছিলেন, সে পথে শক্তিদান করেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র শাহ 'আব্দুল 'আযীয দেহলভী (রহ.)। তিনিও তাঁর যুগে শী'আ মতবাদের খণ্ডন করে 'তুহফায়ে ইছনা 'আশারিয়্যা' নামে একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি গ্রন্থটি মোট ১২টি অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত করেছেন।[৪১]

সুফিবাদ সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেন, আমরা এমন লোকও দেখেছি যারা রাসূলের কথার রদবদল করে। রাসূল (সা.) বলেননি; অথচ তারা রাসূলের নামে মিথ্যারোপ করে। সুফীদের এমন সব বক্তব্য কেবল তাদের মুখেই শোনা যায়, কুরআন-হাদীছের সাথে যার দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। বিশেষত তাওহীদের বিষয়ে মনে হয় যেন তারা মোটেই শরীয়তের তোয়াক্কা করে না।[৪২]

বিজাতীয়দের অনুসরণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেন, ভবিষ্যতে এমন সময় আসবে, যখন মুসলিমরা তাদের কুরআনী আকীদা-বিশ্বাস ছেড়ে বিজাতিদের অনুসরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। ইহুদী খৃষ্টান যেমন তাদের সম্মানিত ব্যক্তিদের আল্লাহর স্থানে বসিয়েছে, মুসলিমরাও তাদের সম্মানিত ব্যক্তিদের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে। তাইতো স্বরণ হয় আমার নবীর কথা, তিনি সত্যই বলে গেছেন-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ؟

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা মুসলিমরা অবশেষে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মতাদর্শ গ্রহণ করে নিবে বা পদস্খলিত হবে। এমনকি কেউ যদি গুইসাপের গর্তে ঢুকে থাকে, তবে তোমরাও তাদের পিছু নেবে, পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। সাহাবায়েকেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পবূর্ববর্তী উম্মত বলতে কি আপনার উদ্দেশ্য ইহুদী খৃষ্টান? রাসূল (সা.) বললেন, 'নতুবা কে?'।[৪৩] শাহ ওয়ালিউল্লাহর অনুধাবন ছিল এমন যে, শরীয়তের অপব্যাখ্যা করে সেগুলোকে পছন্দনীয় ও জায়েয সাব্যস্ত করার সাহস কীভাবে হল?[৪৪]

রাজনৈতিক ভূমিকা : জীবনের শেষদিকে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীকে রাজনৈতিকভাবে একটি বড় ধাক্কা শামাল দিতে হয়। সেসময় তিনি বেশকিছু কার্যক্রম সম্পন্ন করার মনস্থ করে ময়দানে নামেন। যেমন ১. মারাঠাদের অব্যাহত শক্তিবৃদ্ধি থেকে দিল্লীর শাসনকে নিরাপদ করার দিকে মনোনিবেশ করেন। এজন্য আহমদ শাহ আবদালীকে পত্র লিখে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। ২. দিল্লীর মসনদকে যাবতীয় দুর্বল শাসন থেকে মুক্ত করে ইসলামের অনুকূল শাসন ব্যবস্থা নিয়ে আসা। ৩. বিভিন্ন মতভেদে আক্রান্ত মুসলিম সমাজকে একটি অভিন্ন ও মৌলিক চিন্তার আলোকে সমবেত করা। ৪. ব্রিটিশদের উত্থানকে রুখে দেয়ার জন্য জ্ঞানভিত্তিক এমন একটি সিলসিলা তৈরী করা: যাতে করে রাজনৈতিকভাবে তাদের পরাস্ত করা সম্ভব হয়। ৫. সর্বোপরি ভারতের মুসলিম সমাজের উপরে আরোপিত সব ধরণের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিপর্যয় রোধকল্পে স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা। ওসমান পরিবারের সুলতান, শাইখুল ইসলাম ও তুর্কি মুসলমানদের সহযোগী আলেমদের চিন্তাধারার প্রভাবে সে সব রাষ্ট্রের শিক্ষা ও ধর্মীয় পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।[৪৫]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ হিজরী ১১১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন আর ১১৭৬ সালে ইন্তিকাল করেন। এই ৬২ বছরের মধ্যে উসমানিয়া রাজত্বের সিংহাসনে পাঁচজন শাসক আসা-যাওয়া করেছেন। তাঁর জীবনের শেষ পাঁচ বছর তৃতীয় মোস্তফার শাসনামলে অতিবাহিত হয়। তৃতীয় মোস্তফা টানা ১৬ বছর শাসন করেছিলেন। যার প্রথম পাঁচ বছর শাহ ওয়ালিউল্লাহর কার্যক্রমের সাথে পূর্ণ সমর্থন এবং সহযোগিতা করেছিলেন।

ঐতিহাসিক হোমার মুসলিম মনীষিদের সম্পর্কে লিখেছেন, মুসলমানরা আগুনে চড়ানো বহু পাতিল পেয়েছে, যাতে গোশত ছিল।[৪৬] ১১৮৭ হিজরী তথা শাহ ওয়ালিউল্লাহর মৃত্যুর দশ বছর পরে ১২ ই জানুয়ারি ১৭৭৪ সালে ওসমানী খেলাফত এর সুলতান তৃতীয় মোস্তফা ইন্তেকাল করেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁর ইনসাফ ও কল্যাণকর কাজের প্রশংসা করেছেন। তিনি তার শাসনামলে অনেক মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেছেন। শাহ

ওয়ালিউল্লাহর যৌবনকালেই উসমানীয় সাম্রাজ্যে প্রেসের প্রচলন হয়। যা উপমহাদেশে প্রথম প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়। সে যুগেই নজদ ও হেজাজে শেখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব (রহ.) এর আন্দোলন পত্র পল্লবিত হয়।[৪৭]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ'র সংস্কার প্রস্তাবনার মূল ভিত্তি

চারটি মৌলিক নীতির আলোকে তাঁর কর্মপ্রক্রিয়া অগ্রসর হত যেমন: ১. তাহারাত বা পবিত্রতা ২. মহান প্রতিপালক আল্লাহর সমীপে বিনয় ও ভীতি ৩. সংযম ও ৪. ন্যায়নিষ্ঠা। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে তিনি দিল্লী থেকে শাহজাহানাবাদে তাঁর মাদ্রাসা সরিয়ে নেন। এখান থেকেই তাঁর প্রচুর শিষ্য ও আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়ার মত মানুষ তৈরী হয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের পর, এই রহিমিয়া মাদরাসার আদর্শেই উপমহাদেশের প্রখ্যাত কওমী প্রতিষ্ঠান দেওবন্দের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই প্রস্তাবনা সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী (রহ.) বলেন, শাহ সাহেব এবং তার উত্তরসূরিদের যদি এই তাওহীদের আকিদা সংস্কার, এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, প্রচার-প্রসার ও এ সংক্রান্ত ভুল তথ্য-জ্ঞান দূরিভূত করা ছাড়া আর কোনো কৃতিত্ব নাও থাকতো, তবু এই একটিমাত্র কৃতিত্বই তাকে উম্মতের মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক বলে গণ্য করার জন্য যথেষ্ট ছিল। অন্যান্য কৃতিত্ব তো আরো উর্দ্ধে।[৪৮]

উপসংহার : ইউরোপীয় রেঁনেসা ও শিল্প বিপ্লবের শক্তি সমৃদ্ধ চতুর ব্রিটিশরা যদি এই আন্দোলনের বিরোধিতা না করত, তবে উপমহাদেশে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর চিন্তা ও সংস্কার আন্দোলন অবশ্যই চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করত। অবশ্য ব্রিটিশদের অব্যাহত বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রভাব সর্বাংশে ম্লান হয়নি। বরং ১৯০ বছরের শাসনামলে ইংরেজরা যে বারংবার বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে; তাঁর অন্যতম কারিগর ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লহ দেহলভী। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। আজ অনেক ধরণের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার শিকার হলেও, এই উপমহাদেশে মুসলমানদের স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা মহান এই ব্যক্তির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনসহ আরো অনেক ক্ষেত্রেই আমরা তার সুস্পষ্ট প্রভাব দেখতে পাই। এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাস্টার মাইন্ড হিসেবে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর কৃতিত্ব অপরিসীম। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার অব্যাহত নৈতিক স্খলন ও ভারসাম্যহীনতার সমাধানকল্পে তাঁর জীবন ও তৎপরতা নিয়ে পর্যালোচনার গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্যনির্দেশ

১. *আল-কুরআন,* সূরা আত-ত্বীন : আয়াত ৫ ।

২. *আল-কুরআন,* সূরা আলে-ইমরান ১১০।

৩. *আল-কুরআন,* সূরা আত-ত্বীন : আয়াত ৬।

৪. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী , *সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি,* ১ম খণ্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ২০০৩ খৃ.), ১/৬৯-৭০ পৃ.।

৫. ফুলত- ভারতের একটি স্থানের নাম, যার বর্তমান নাম মুযাফফরনগর।

৬. ফুলত এর বর্তমান নাম মুযাফফরনগর।

৭. সিদ্দীক বিন হাসান আল-কানূজী, *আবজাদুল উলূম,* ৩য় খণ্ড (দিমাশক : ওয়াযারাতুছ ছাকাফাহ ওয়াল ইরশাদ আল-কওমী, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খৃ.), ২৪৩ পৃ.।

৮. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, *মাজমু'আ রাসায়েল ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ,* (শাহ ভ্যালিলাহ ইনস্টিটিউট, নিউ দিল্লি, ২০১২; পৃ. ২৩-২৫, পৃ. ৪২।

৯. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, *আনফাসুল আরিফীন,* (প্রিন্ট : দিল্লি, ১৩১৫ হি./১৮৯৭ খৃ.), পৃ. ৮৬-৮৯।

১০. প্রগুক্ত, পৃ. ৮৫।

১১. সাইয়েদ আব্দুল হাই হাসানী রহ., *আসসাকাফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ,* (মুআসসাাহ হানদবী লিছছাকাফাহ আল-ইসলামী, কায়রো, মিশর, ১৪৩৩ হি./২০১২ খৃ.) পৃ. ১১১।

১২. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, *আলকাওলুল জামিল ফী বায়ানে সাওইস সাবীল*, (কপি : ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ শাহীন, ১২৯৭ হি./১৮৮০ খৃ.), পৃ. ১০৭।

১৩. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, *আল-জুযউল লতীফ*, তাহক্বীক : মুহাদ্দেছ আবু তইয়ব আতাউল্লাহ বিন হুসাইন (ইসলামী শিক্ষা, ইন্ডিয়ান ওলামা, দিল্লী, তাবি.) পৃ. ৩।

১৪. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, *আলইরশাদ ফি মুহিম্মাতিল ইসনাদ*, (দারুল আফাক, কায়রো, মিশোর, ১৪৩০হি./২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ), পৃ. ৮৭।

১৫. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, *আল-কাওলুল জামীল ফি বায়ানি সাওয়াইস সাবীল*, (কপি : ইবরাহীস বিন মুহাম্মাদ শাহীন, ১২৯৭ হি./১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ), পৃ. ২৭।

১৬. আল-জুজউল লতীফ, *প্রগুক্ত*, পৃ. ৫।

১৭. মুহাম্মাদ মুহসিন বিন ইয়াহইয়া আল-বিকরী আত-তায়মী আত-তারহীতি, *আল-ইয়ানি'উ আল-জানী মিন আসানীদি আব্দুল গণী*, পৃ. ১৩৩।

১৮. বর্তমান যা বিলীন হয়ে গেছে, কোন অস্তিত্ব নেই।

১৯. মৌলবী বশিরুদ্দীন, *ওয়াকিয়াতে দরুল হুকুমত দিল্লী*, (উর্দু একাডেমী, দিল্লি, ১৯৯০ খ্রি.) ২/২৮৬ পৃ.।

২০. ড. সাইয়েদ মুঈনুল হক, মালফুযাতে শাহ আব্দুল আযীয, (উর্দু সংস্করণ, করাচি, ১৯৬০ খ্রি.) পৃ. ৫৫।

[২১]. উপমহাদেশে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী আল-কুরআনের দ্বিতীয় ফার্সি অনুবাদক ছিলেন। তাঁর অনুবাদ ও তাফসীরের নাম 'ফাতহুর রহমান' (فتح الرحمن)। তা ১৬৪৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২২]. *আল-কুরআন*, সূরা আল-মায়িদাহ : ৮ ।

[২৩]. *আল-কুরআন*, সূরাহ আল-হুজুরাত : ১৩

[২৪]. রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দা'ওয়াতি ফিল ইসলাম, (বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৮৭।

[২৫]. *আল-কুরআন*, সূরা আল কামার ২২।

[২৬]. *আল-কুরআন*, সূরা মুহাম্মাদ ২৪।

[২৭]. মুযিহুল কুরআন, পৃ. ১/২।

২৮. সম্রাট আওরঙ্গজেব বা আলমগীরের রাজত্ব ভারতবর্ষের সকল সম্রাটের রাজত্ব অপেক্ষা সর্বাধিক বিস্তৃত ছিল। ক্যমব্রিজ হিস্ট্রোরি রচয়িতা লিখেছেন, 'তার শাসন গযনী থেকে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মির থেকে করনাটক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল' *(Cambridge Historry of India, 4:316.* আরেক ঐতিহাসিক লিখেছেন 'প্রাচীন যুগ থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত ভারতবর্ষের এতো দীর্ঘ ও বিস্তৃত শাসন কখনোই প্রতিষ্ঠিত হয়নি' *(Cambridge History of World, P. 175, Delhi. 1970.)*। সম্রাট আওরঙ্গজেব নিজে কুরআনুল কারীমের হাফিজ হওয়ার কারণে কুরআনের বেশ কিছু খেদমত করেছেন (তারীখে হিন্দুস্তান, মৌলভী যাকাউল্লাহ দেহলভী ৯/৩৩)।

[২৯]. আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী, নযহাতুল খাওয়াতির (বৈরু : দারু ইবনি হাযম, ১৪২০হিঃ/১৯৯৯খ্রিঃ), ৭ম খণ্ড, পৃঃ১০৩০)।

[৩০]. *আল-কুরআন*, সূরা আল জুমু'আ : ২।

[৩১]. *আল-কুরআন*, সূরা আল জুমু'আ : ৩।

[৩২]. তিনি হাদীছের প্রাচীনতম গ্রন্থ 'মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালিক'-এর দু'টি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেন। একটি হল- 'আল-মুছাফ্ফা' (المصفّى), যা আরবী ভাষায় প্রণীত। অপরটি হল- 'আল-মুসাওয়া' (المسوّى), যা ফারসী ভাষায় প্রণীত। তাছাড়া তিনি ছহীহুল বুখারীর শিরোনামের ব্যাখ্যা সম্বলিত 'শারহু তারাজুমি আবওয়াবি ছহীহিল বুখারী' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। (ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছগণের অগ্রণী ভূমিকা), অনুবাদ : নূরুল ইসলাম (রাজশাহী : শ্যামলবাংলা একাডেমী, মার্চ ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৪২-৪৩।

[৩৩]. আছ-ছাক্বাফাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল হিন্দ, পৃ. ১৪৪; রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দা'ওয়াতি ফিল ইসলাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৯০; ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছগণের অগ্রণী ভূমিকা, পৃ. ৪৩-৪৪।

[৩৪]. *আল-কুরআন*, সূরা নাহল আয়াত : ৩৬।

[৩৫]. *আল-কুরআন*, সূরা আলে ইমরান : ১৩৯।

[৩৬]. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী, *মনসাবে নবুওয়াত আওর উসকে কে আলী মাকামে হামেলীন*, (মাজলিসে তাহকীকাতে ইসলাম প্রকাশনী, লাখ্নৌ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খৃ.), পৃ. ৭২।

[৩৭]. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী, *তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত (সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস)*, ২/২০৪-২১৫ পৃ.।

[৩৮]. তিনি শাসক তুহমাসফ এর সময়কার একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ছিলেন। সাথে সাথে শিরাজের মাদরাসায়ে মানসূরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

[৩৯]. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী, *রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দা'ওয়াতি ফিল ইসলাম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৯।

[৪০]. মুহাদ্দিছু হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী, *ইযালাতুল খিফা 'আন খিলাফাতিল খুলাফা*, ১ম খণ্ড (প্রকাশনা স্থান, সংস্থা, সংস্করণ ও সাল বিহীন), পৃ. ৪।

[৪১]. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী, রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দা'ওয়াতিল ফিল ইসলাম ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৯৭।

[৪২]. তাফহীমাতে ইলাহিয়্যাহ, ২/১৩৪-১৩৫ পৃ.।

[৪৩]. ছহীহুল বুখারী, হা/৩৪৫৬; তাফহীমাতে ইলাহিয়্যাহ, ২/১৩২ পৃ.।

[৪৪]. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী, *সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস*, মাকতাবুল হেরা প্রকাশনী, ২০১৬), ৫/১৩২ পৃ.।

[৪৫]. প্রগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬-২৭)।

[৪৬]. মুহাম্মাদ ফরিদ বেক, *তারিখুদ দাওলাহ আল ইল্লিয়াতুল উসমানিয়া, (মিশোর, ২য় প্রকাশনী, রবিউস ছানী ১৩১৪ হি./ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ খৃ.), পৃ. ১/২১৩।*

[৪৭]. আব্দুল আজিজ আমিরের এই দাওয়াত মুজাহিদ চেতনা ও সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ১২১৮ হিজরীতে হেজাজ আরব উপদ্বীপের বিরাট অংশের উপর দল প্রতিষ্ঠা করেন ১২৩৪ হিজরীতে মোহাম্মদ আলী মিশর শাসকের প্রচেষ্টায় এ অংশের উপর পুনরায় তুর্কি নেতৃত্বে পুনর্দখল প্রতিষ্ঠিত হয় নজদী আমির আবদুল্লাহ ইবনে সউদ ইবনে আবদুল আজিজকে উপমহাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আর সেখানেই তাকে হত্যা করা হয়।

[৪৮]. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস*, প্রগুক্ত, ৫/১৩৮ পৃ.।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

আল-কুরআনে উল্লিখিত মস্তক ও মুখমণ্ডল সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহ : একটি পর্যালোচনা
(Head and Face Related Organs Maintained in Al Quran : An Analysis)

ড. আবু নোমান মুহাম্মদ মাসউদুর রহমান*

Abstract: Al-Quran is the latest and conclusive Devine book for mankind. It is also final source of all kinds of knowledge. Every knowledge is discussed here directly or indirectly. Physiology is one of them. Physiology is also called the anatomy. There is vast description about various organs of human body in anatomy. Allah mentioned almost eighteen human organs in the holy Quran according to need and purpose. It is very essential to realize the mystery behind mentioning these organs. This article tries to focus on human organs related to head and face and it is also an attempt to realize the purpose of mentioning these in the holy Quran.

ভূমিকা

মহান আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম সৃষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করে তাদেরকে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সুবিন্যস্ত করেছেন। মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই সমভাবে প্রয়োজনীয়। একটির ওপর আরেকটিকে প্রাধান্য দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকাংশের বিবরণ কুরআন মাজীদে উপস্থাপন করেছেন। কুরআন মাজীদ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,[১] وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَئٍ -'আমি কুরআন মাজীদকে প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণসহ আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি।' সকল কিছুর বিবরণ এ কিতাবের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। চাই তা সংক্ষেপে হোক আর সবিস্তরে হোক। বিভিন্ন প্রেক্ষাপট অথবা উপমা স্বরূপ আল্লাহ কুরআন মাজীদে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হৃদপিণ্ড, গোশত, অস্থি, মাথা, মুখমণ্ডল, নাক, জিহ্বা, চোখ, কান, পেট, পিঠ, লজ্জাস্থান, শরীর, হাত-পা প্রভৃতি। এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং মানুষের জীবন প্রণালী সম্পর্কে আল্লাহ মানবজাতিকে গবেষণা করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,[২] وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ -'তোমরা কি তোমাদের নিজেদেরকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে না?' মানবদেহের এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে কেবল মস্তক ও মুখমণ্ডল সম্পর্কে যে সকল আয়াত বর্ণিত হয়েছে সেগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে অত্র প্রবন্ধে।

১. মস্তক

মানবদেহের প্রধানতম অঙ্গ হলো মস্তক বা মাথা। এটির মধ্যে রয়েছে মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্মকেন্দ্র। মানুষের মস্তিষ্ক কিছুটা গোলাকৃতি এবং দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম। মস্তিষ্ককে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। তাহলো অগ্রমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক ও পশ্চাৎমস্তিষ্ক।[৩] মস্তক বা মাথা শব্দের 'আরবী প্রতিশব্দ رَأْسٌ (রা'স)। শব্দটির বহুবচন رُءُوْسٌ (রু'উস), أَرْؤُس (আর'উস)। অনুরূপভাবে رَأْسٌ (রা'স) শব্দটি رَئِيْس (রাঈস) বা প্রধান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর শরীরের প্রধান হলো মাথা।[৪] ড. ইবরাহীম মাদকূর বলেন, اَلرَّأْسُ مِنْ كُلِّ شَيٍ أَعْلَاهُ. -'প্রত্যেক বস্তুর সর্বোচ্চ অংশকে রা'স (মাথা) বলা হয়।'[৫] আল-কুরআনে رَأْسٌ(রা'স) শব্দটি একবচন ও বহুবচন আকৃতিতে মোট ৭টি আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু ও প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করা হলো।

ক. অযুর ফরয সম্পর্কে

অযুর চারটি ফরযের মধ্যে মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা একটি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,[৬] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

---

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

إِلَى الْكَعْبَيْنِ. -'হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর)।'

হুসাইন ইবন মাসউদ আল-বাগাভী (র.) বলেন, إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ مَرَّةٍ إِلَى الصّلاة وَأَنْتُمْ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ. -'যখন তোমরা সালাত আদায়ের ইচ্ছা পোষণ করবে তখন তোমাদের জন্য অযূ করা ওয়াজিব হবে যতবার সালাত আদায় করবে, যদি তোমরা অপবিত্র অবস্থায় থাক।'[৭]

চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের ভাষায়, ভেজা হাতে মাথা মাসেহ করতে হয়। আর মাথা ও চুল দীর্ঘ সময় খোলা থাকে, যার ফলে চুলের মধ্যে ময়লা ও রোগ জীবাণু জমা হতে পারে। সুতরাং ভেজা হাতে মাথা মাসেহ করলে সে সব দূর করা সম্ভব। তাই এটাও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্মত।[৮]

খ. মূলধন অর্থে

আল-কুরআনে শব্দটি মূলধন অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ বলেন,[৯] فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ. -'কিন্তু যদি তোমরা তা না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে।' অত্র আয়াতে শব্দটি মূলধন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, মূলধনকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হয়ে থাকে। আর যদি কেউ লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদ পরিহার করেন তিনি অবশ্যই তার মূলধন ফেরত পাবেন।

ইবনুল জাওযী (র.) বলেন, فَلَكُمْ الَّتِيْ أَقْرَضْتُمُوْهَا، لَا تَظْلِمُوْنَ فَتَأْخُذُوْنَ أَكْثَرَ مِنْهَا، وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتَنْقُصُوْنَ مِنْهَا. -'যা তোমরা ঋণ দিয়েছিলে তা অবশ্যই পাবে। তার অতিরিক্ত গ্রহণ করে কারো উপর অত্যাচার করবে না এবং তোমরা তার চেয়ে কম গ্রহণ করে তোমরাও অত্যাচারিত হবে না।'[১০]

গ. মানুষের মাথা অর্থে

আল-কুরআনে রা'স শব্দটি মানুষের মাথা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ বলেন,[১১] وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. -'আর সে ফলকগুলো ফেলে দিল। আর স্বীয় ভাইয়ের মাথা ধরে নিজের দিকে টেনে আনতে লাগল।'

অত্র আয়াতে 'মাথা' দ্বারা উদ্দেশ্য কী এ বিষয়ে ইবনুল জাওযী (র.) তিনটি অভিমত উপস্থাপন করেছেন। এক. দাড়ি ও দাড়ির চুল। দুই. মাথার চুল। তিন. কান। এসব ধরার উদ্দেশ্য হলো, মূসা (আ.) ধারণা করেছিলেন যে, তার ভাই অন্যদের সাথে একত্রিত হয়ে তাওহীদকে ভুলে গেছে।'[১২] অনুরূপ বিষয়ে আরো আয়াত বর্ণিত হয়েছে।[১৩]

ঘ. মাথার চুল অর্থে

যাকারিয়া (আ.) বার্ধক্যের বিভিন্ন নিদর্শন উল্লেখ করে সন্তান না হওয়ার বিষয়টি তাঁর রবকে জানিয়েছেন। কেননা, তিনি যখন সন্তানের সুসংবাদ পান তখন তাঁর মাথার চুল শুভ্র হয়েছিল। কিন্তু তাঁর রব মহান আল্লাহ যে কোনো বয়সেই সন্তান দিতে পারেন। তাই তিনি সন্তানের আশা বাদ দেননি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,[১৪] قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا. -'সে বলেছিল, হে আমার রব! আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গেছে এবং বার্ধক্যবশতঃ আমার মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে।'

ঙ. শয়তানের মাথা অর্থে

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে জাহান্নামীদের খাবার যাক্কুম বৃক্ষের ফলকে শয়তানের মাথার সাথে তুলনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ইরশাদ করেন,[১৫] طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ. -'এর ফল যেন শয়তানের মাথা।'

চ. মাথা মুণ্ডন করা প্রসঙ্গে

হজ্জে গমনের পর ১০ই জিলহজ্জ তারিখে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি পশু কুরবানী করতে হয়। এরপর স্বীয় মাথা হাজীগণ মুণ্ডন করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,[১৬] وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ

مَحِلَّهُ-'আর তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করো না, যতক্ষণ না পশু তার যথাস্থানে পৌঁছে।' এ প্রসঙ্গে আরো আয়াত বর্ণিত হয়েছে।[১৭]

২. মুখ ও মুখমণ্ডল:

চোখ, নাক, মুখ, ঠোঁট, কপাল, গাল ইত্যাদির সমন্বয়ে মুখমণ্ডল গঠিত। এটির 'আরবী প্রতিশব্দ وَجْهٌ (ওজহুন), বহবচনে وُجُوْهٌ (উজূহুন)। প্রত্যেক বস্তুর সম্মুখভাগকে وَجْهٌ (ওজহুন) বলা হয়। যেমন 'আরবগণ দিনের প্রথমভাগকে وَجْهُ النَّهَارِ বলে অভিহিত করে থাকেন।[১৮] আল-কুরআনে উভয় শব্দই বিভিন্নভাবে ২০টি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে সেগুলোর প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য আলোচনা করা হলো।

ক. আল্লাহর সত্তা অর্থে

আল-কুরআনে وَجْهٌ (ওজহুন) শব্দটি মূলসত্তা বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,[১৯] وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.- 'আর বহাল থাকবে শুধু মহামহিম ও মহানুভব তোমার রবের সত্তা।'

খ. অযুর ফরয সম্পর্কে

অযুর চারটি ফরযের মধ্যে সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা একটি। আল্লাহ বলেন,[২০] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ.- 'হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ধৌত কর।'

চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায়, মুখমণ্ডল ধৌত করার অভ্যাস পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি দেহ ও মনে সজিবতা আনে। মুখমণ্ডল ও দুইহাত শরীরের সবচেয়ে বেশি আবরণমুক্ত অঙ্গ। সুতরাং প্রথমে হাত ধুয়ে মুখমণ্ডল ধৌত করলে বিভিন্ন রোগ থেকে সহজেই মুক্ত থাকা সম্ভব।[২১]

গ. মুখ ফেরানো অর্থে

মুসলিম জাতির কিবলা বাইতুল্লাহ তথা কা'বাঘর। নুবুওয়াত লাভের পর মহানবী (স.) বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন। কিন্তু তাঁর মনবাসনা ছিল কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা। আল্লাহ তাঁর মনবাসনা পূর্ণ করেন এবং মুখমণ্ডল কা'বার দিকে ফিরিয়ে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেন। কিবলা পরিবর্তন সম্পর্কে বেশ কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়, যেগুলোতে وَجْهٌ (ওজহুন) ও وُجُوْهٌ (উজূহুন) শব্দদ্বয় বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,[২২] وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.- 'আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও।' এ প্রসঙ্গে আরো আয়াত বর্ণিত হয়েছে।[২৩]

ঘ. জান্নাতী দল অর্থে

আখিরাতে মানুষ দুইভাগে বিভক্ত হবে। একদল হবে জান্নাতী, যাদের মুখমণ্ডল হবে শুভ্র। আরেক দল হবে জাহান্নামী, যাদের চেহারা হবে কালো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,[২৪] يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ.- 'সেদিন কতক চেহারা সাদা হবে এবং কতক চেহারা হবে কালো।' অনুরূপ অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে।[২৫]

ঙ. জাহান্নামী দল অর্থে

'উজুহুন' শব্দটি জাহান্নামী দল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে,[২৬] وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ.-'আর সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে বিবর্ণ–বিষন্ন।' এ প্রসঙ্গে আরো ইরশাদ হচ্ছে,[২৭] وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ.- 'আর কিছু কিছু চেহারার উপর সেদিন থাকবে মলিনতা।' অনুরূপ আরো আয়াত বর্ণিত হয়েছে।[২৮]

চ. মানবিক সত্তা অর্থে

কোনো কোনো সময় কুরআন মাজীদে মানবিক সত্তা অর্থ বুঝাতে ওজহুন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,[২৯] وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا.- 'এবং তুমি নিজেকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ একনিষ্ঠভাবে।' অনুরূপ আরো আয়াত বর্ণিত হয়েছে।[৩০]

ছ. মানুষের সন্তুষ্টি অর্থে

মানুষের সন্তুষ্টি বা আনুকূল্য অর্থেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা তাঁকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। তারা আশা করেছিল, ইউসুফ বেঁচে না থাকলে তারা পিতার সন্তুষ্টি বা আনুকূল্য বেশি পাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,[৩১] اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ.-'তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোনো যমীনে ফেলে আস, তাহলে তোমাদের পিতার আনুকূল্য কেবল তোমাদের জন্য থাকবে এবং তোমরা সৎ লোক হয়ে যাবে।'

হুসাইন ইবন মাসউদ আল-বাগাভী (র.) বলেন, كَانَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَدِيدَ الْحُبِّ لِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَانَ إخوته يرون منه مِنَ الْمَيْلِ إِلَيْهِ مَا لَا يَرَوْنَهُ مَعَ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا هَذِهِ المقالة-'ইয়াকূব (আ.) ইউসুফ (আ.)-কে অত্যধিক ভালবাসতেন। তার বৈমাত্রীয় ভাইয়েরা বিষয়টি লক্ষ্য করলো যে, তাদের পিতা ইউসুফের প্রতি যেমন অনুরক্ত তেমন তাদের প্রতি অনুরক্ত নন। ফলে তারা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে।'[৩২]

জ. মানুষের চেহারা অর্থে

মানুষের চেহারা অর্থেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহর নবী ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদের মাধ্যমে তাঁর পিতার নিকট স্বীয় পোশাক প্রেরণ করেছিলেন। যা দেখে ইয়া'কূব (আ.) দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,[৩৩]

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ.

-'তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও, এরপর সেটি আমার পিতার চেহারায় ফেল। এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলকে নিয়ে আমার কাছে চলে আস।'

হাসান বসরী (র.) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল মারফত তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, এ জামা সম্মুখে গেলেই তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পাবেন। উল্লেখ্য যে, এ জামাটি ইউসুফ (আ.) স্বীয় শরীর থেকে খুলে দিয়েছিলেন।'[৩৪]

৩. চোখ

চোখের সাহায্যে মানুষ দেখতে পায়। এটি মানুষের আলোক সংবেদনশীল অঙ্গ ও পঞ্চ ইন্দ্রীয়-এর একটি। মানুষের দুইটি সরল চোখ রয়েছে। মানুষ চোখের সাহায্যে দৃশ্যমান পরিবেশের দর্শনীয় বস্তুসমূহ দেখতে পায় ও সেসব সম্বন্ধে জানতে পারে। কোনো বস্তু থেকে আগত আলোক রশ্মি চোখে পতিত হলে চোখের প্রাচীরের অন্তঃগাত্র বা রেটিনার প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। এ প্রতিবিম্বের উদ্দীপনা স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে গেলে মানুষ দেখতে পায়। চোখের গোলকের পাঁচভাগ বা ছয়ভাগের একভাগ অংশ উন্মুক্ত থাকে। অবশিষ্ট অংশ অক্ষিকোটরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। মানুষের প্রতিটি চোখের প্রধান তিনটি করে অংশ থাকে। তাহলো ক. চক্ষুপত্র বা চোখের পাতা খ. অক্ষিপেশী বা চোখের পেশী গ. অক্ষিগোলক বা চোখের গোলক।[৩৫]

চোখের 'আরবী প্রতিশব্দ عَيْن (আইন), বহুবচনে عُيُوْن (য়ুউন) ও أَعْيُن (আ'য়ুন)।[৩৬] ড. ইবরাহীম মাদকূর বলেন, اَلْعَيْنُ هِيَ عُضْوُ الْإِبْصَارِ لِلْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيْوَانِ.-'মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী যে অঙ্গ দিয়ে দেখে তাকে চোখ বলে।'[৩৭] অনুরূপভাবে চোখ শব্দের আরেকটি প্রতিশব্দ হলো بَصَر (বাসর), এটির বহুবচন أَبْصَار (আবসার)।[৩৮]

ড. ইবরাহীম মাদকূর বলেন, اَلْبَصَرُ: اَلْعَيْنُ وَهِيَ قُوَّةُ الْإِبْصَارِ وَقُوَّةُ الْإِدْرَاكِ لِلْحَيْوَانِ.-'বাসার অর্থ চোখ, এটি প্রাণীদের দৃষ্টিশক্তি ও অনুধাবন শক্তি।'[৩৯] আল-কুরআনে শব্দগুলো বিভিন্নভাবে মোট ১৬টি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে সে সকল আয়াতের প্রেক্ষপট ও তাৎপর্য আলোচনা করা হলো।

ক. মানুষের অঙ্গ অর্থে

আল-কুরআনে শব্দটি মানুষের অঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যা দ্বারা মানুষ দেখতে পায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন[৪০], أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ -'আমি কি তার জন্যে দু'টি চোখ বানাইনি?' আল্লাহ তা'আলা

বান্দাদেরকে যে সকল নি'আমত প্রদান করেছেন সেগুলো থেকে চোখ দু'টি অন্যতম। অত্র আয়াতে সে বিবরণ দেয়া হয়েছে।

আয়াতে আল্লাহ স্মরণ করে দিয়েছেন যে, তিনি মানুষকে চক্ষু দান করে কতই না অনুগ্রহ করেছেন। চক্ষু দিয়ে মানুষ দেখে যার পদ্ধতি হলো, দৃষ্ট বস্তুর ছায়া চোখে পড়ে যা মস্তিষ্কের বিশেষ ক্ষমতায় মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। মানুষের উন্নততর চিন্তা ও গবেষণা শক্তি মস্তিষ্কের মধ্যে রয়েছে বলে মানুষ বাকি সকল সৃষ্টজীব থেকে শ্রেষ্ঠ।[৪১]

খ. দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন অর্থে

আল-কুরআনুল কারীমে শব্দটি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ বলেন,[৪২] وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ -'আর স্মরণ কর আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কুবকে। তারা ছিলেন হাত ও চোখের অধিকারী।' অত্র আয়াতে ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূব (আ.)-কে অন্তর দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ তাঁরা হিদায়াত প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তদানুযায়ী জীবন পরিচালনা করেছেন।

ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, أُولِي الْقُوَّةِ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَالْأَبْصارِ فِي الْمَعْرِفَةِ بِاللهِ أَيِ الْبَصَائِرُ فِي الدِّينِ. –'আল্লাহর আনুগত্য বাস্তবায়নে তারা ছিলেন শক্তিশালী এবং আল্লাহকে চেনার ব্যাপারে তারা ছিলেন দৃষ্টিসম্পন্ন। অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।'[৪৩]

গ. বাহ্যিক দৃষ্টি অর্থে

শব্দটি কখনো কখনো বাহ্যিক দৃষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বদর যুদ্ধে মুসলমানগণ স্বীয় বাহিনীকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দ্বিগুণ দেখেছিল। ফলে তারা যুদ্ধ ময়দানে মনোবল হারায়নি। বরং সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,[৪৪] فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ. -'একটি দল লড়াই করছিল আল্লাহর পথে এবং অপর দলটি কাফির, তারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদেরকে ওদের দ্বিগুণ দেখছিল।'

ঘ. কিসাস প্রসঙ্গে

ইসলামী আইনে শাস্তি প্রয়োগের একটি বিধান হলো কিসাস। এটির মাধ্যমে ক্ষতির সমপরিমাণ জরিমানা বা সমপরিমাণ অঙ্গের ক্ষতি করতে হয়। যেমন চোখের পরিবর্তে চোখ বিনষ্ট করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৪৫] وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. -'আর আমি এতে তাদের উপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। এরপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফ্ফারা হবে।'

ইবন জারীর আত-তাবারী (র.) বলেন, يَقُوْلُ: وَفَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنْ يَّفْقَأُوا الْعَيْنَ الَّتِيْ فَقَأَ صَاحِبُهَا مِثْلَهَا مِنْ نَفْسٍ أُخْرَى بِالْعَيْنِ الْمَفْقُوْءَةِ. -'আল্লাহ বলেন, আমি তাদের জন্য আবশ্যক করেছি, তারা যেন তার চোখের ক্ষতিসাধন করেন যে তার চোখের ক্ষতিসাধন করেছে। অনুরূপ করবে যা তার সাথে করা হয়েছে। (তার অতিরিক্ত নয়)।'[৪৬]

ঙ. আল্লাহর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ

আল্লাহ তা'আলা সকল কিছুর উপর ক্ষমতাশীল। বান্দার চক্ষু যদিও তাঁকে দেখতে পায় না, কিন্তু আল্লাহ স্বয়ং বান্দার চক্ষুকে আয়ত্ব করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,[৪৭] لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ. -'চক্ষুসমূহ তাকে আয়ত্ব করতে পারে না। আর তিনি চক্ষুসমূহকে আয়ত্ব করেন।' আয়াতটির

ব্যাখ্যায় মহানবী (স.) বলেন, إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا. - 'অবশ্যই তোমরা তোমাদের প্রভূকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে।'[৪৮]

চ. অধম বান্দার উপমা উপস্থাপন

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এমন কিছু অধম বান্দার উপমা তুলে ধরেছেন যারা অন্তরের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর বিধান বুঝে না, চোখ থাকা সত্ত্বেও দেখতে পায়না, কান থাকা সত্ত্বেও শুনতে পায় না। তাদের এমন স্বভাবের কারণে আল্লাহ তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট বলে অভিহিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন,[৪৯] وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. - 'আর অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষকে। তাদের রয়েছে অন্তর, তা দ্বারা তারা বুঝে না, তাদের রয়েছে চোখ, তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের রয়েছে কান, তা দ্বারা তারা শুনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট।' অনুরূপ আরো আয়াত বর্ণিত হয়েছে।[৫০]

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، হুসাইন ইবন মাসউদ আল-বাগাভী (র.) বলেন, أَيْ: كَالْأَنْعَامِ فِي أَنَّ هِمَّتَهُمْ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالتَّمَتُّعِ بِالشَّهَوَاتِ، بَلْ هُمْ أَضَلُّ لِأَنَّ الْأَنْعَامَ تُمَيِّزُ بَيْنَ الْمَضَارِّ وَالْمَنَافِعِ، فَلَا تُقْدِمُ عَلَى الْمَضَارِّ و هَؤُلَاءِ يُقْدِمُونَ عَلَى النَّارِ مُعَانَدَةً مَعَ الْعِلْمِ بِالْهَلَاكِ، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. - 'তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ তারা খাওয়া, পান করা, জৈবিক চাহিদা উপভোগ করার বিষয়ে পশুর ন্যায়। তার চেয়ে নিকৃষ্ট হলো এভাবে যে, পশু কোনটি তার জন্য উপকারী কোনটি ক্ষতিকারক তা পার্থক্য করতে জানে, ফলে তারা ক্ষতির নিকট গমন করে না। কিন্তু এরা জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়, অথচ তারা জানে যে, তারা ধ্বংস হবে। এ বিষয়ে তারা উদাসীন।'[৫১]

ছ. পর্দার বিধান প্রবর্তন

নারী-পুরুষ সকলের জন্য আল্লাহ তা'আলা পর্দার বিধান প্রবর্তন করেছেন। সেক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সকলের জন্য চক্ষু অবনমিত রাখার নির্দেশ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,[৫২] وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. - 'আর মু'মিন নারীদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে।'

ফখরুদ্দীন আর-রাযী (র.) বলেন, اعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا خَصَّهُمْ بِذَلِكَ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ لَا يَلْزَمُهُ غَضُّ الْبَصَرِ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ كَالْفُرُوعِ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُؤْمِنُونَ مَأْمُورُونَ بِهَا - 'জেনে রাখো, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি মু'মিনদেরকে বলুন, আর এটি তাদের জন্য নির্দিষ্ট। আর যাদের সাথে বিবাহ বন্ধন বৈধ নয় সেক্ষেত্রে চক্ষু অবনত করা আবশ্যক নয়। এটি ইসলামী বিধানের একটি শাখা। আর মু'মিনদেরকে এ ব্যাপারে আদেশ দেয়া হয়েছে।'[৫৩]

জ. চক্ষুষ্মান বান্দাদের পরিচয় দিতে

আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে যারা তাঁর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে তারাই কেবল তাঁর শক্তি ও কুদরত সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকে। আর তাদেরকে চক্ষুষ্মান হিসেবে আখ্যায়িত করে আল্লাহ বলেন,[৫৪] يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. - 'আল্লাহ দিন-রাতের আবর্তন ঘটান, নিশ্চয়ই এতে অন্তরদৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।' অনুরূপ আরো আয়াত বর্ণিত হয়েছে।[৫৫] আবুল লায়স আস-সামারকান্দী (র.) أُولِي الْأَبْصَارِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, لِذَوِيْ الْعُقُوْلِ وَالْفَهْمِ فِيْ الدِّيْنِ. - 'জ্ঞানবিশিষ্ট ও দীনের ব্যাপারে বুঝশক্তি।'[৫৬]

ঝ. জাহান্নামীদের চক্ষুর বিবরণ প্রসঙ্গে

মহানবী (স.) কাফিরদেরকে কিয়ামতের বিভিষিকা ও জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করলে তারা তা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু সত্যিই যখন তাদের সামনে তা আগমন করবে তখন তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবে, যা তাদের চক্ষুসমূহ দেখলেই অনুমান করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ

করেন,[৫৭] إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا. -'যখন তারা তোমাদের কাছে এসেছিল তোমাদের উপরের দিক থেকে এবং তোমাদের নিচের দিক থেকে আর যখন চক্ষুগুলো বক্র হয়ে পড়েছিল এবং প্রাণ কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছেছিল।' অনুরূপ আরো আয়াত বর্ণিত হয়েছে।[৫৮] কাতাদাহ (র.) বলেন, شَخَصَ الْبَصَرُ فَلَا يَطْرِفُ مِمَّا يَرَى مِنَ الْعَجَائِبِ الَّتِي كَانَ يُكَذِّبُ بها في الدنيا. -'চক্ষু হতচকিত হয়ে যাবে। ফলে দুনিয়ায় যে সকল আশ্চার্য বিষয় দেখে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো সেগুলোর দিকে সে আর তাকাতে পারবে না।'[৫৯]

ঞ. দৃষ্টিশক্তি অর্থে

আল-কুরআনে শব্দটি দৃষ্টিশক্তি অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মি'রাজ রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবনে একটি অন্যতম মু'জিযা। সে মি'রাজে মহানবী (স.) আল্লাহর দর্শন লাভ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৬০] مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. -'তাঁর দৃষ্টি এদিক–সেদিক যায়নি এবং সীমাও অতিক্রম করেনি।'

ইবন 'আব্বাস (রা.)-এর মতে মহানবী (স.)-এর দৃষ্টি ডানে বা বামে যায়নি এবং তাঁকে যে আদেশ করা হয়েছে তা তিনি লঙ্ঘন করেননি। এটি আনুগত্যের ক্ষেত্রে একটি বড় গুণ।[৬১]

জাহান্নামীরা যেদিন জাহান্নামে প্রবেশ করবে সেদিন তারা মু'মিন বান্দাদেরকে জাহান্নামে না পেয়ে আশ্চার্যান্বিত হয়ে যাবে। তারা মনে করবে হয়তো তাদের দৃষ্টিভ্রম হয়েছে। আল্লাহ বলেন,[৬২] أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ. -'তবে কি আমরা তাদের ঠাট্টা–বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম, নাকি তাদের ব্যাপারে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে?'

ট. দৃষ্টিশক্তিতে পর্দা ফেলানো প্রসঙ্গে

মানুষের অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তাদের বিভিন্ন অঙ্গে মোহর মেরে দেন এবং চোখের উপর পর্দা ফেলেন। ফলে তারা আর সঠিক পথ লাভ করে না। আল্লাহ বলেন,[৬৩] خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. -'আল্লাহ তাদের অন্তরে এবং তাদের কানে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের চোখসমূহে রয়েছে পর্দা।'

হুসাইন ইবন মাসউদ আল-বাগাভী (র.) বলেন, غِطَاءٌ عَلَى أَبْصَارِهِمْ فَلَا يَرَوْنَ الْحَقَّ. -'তাদের দৃষ্টিশক্তির উপরে ঢাকনা, সুতরাং তারা আর সত্যকে দেখতে পাবে না।'[৬৪] আরো আয়াত বর্ণিত হয়েছে।[৬৫]

ঠ. বারংবার দৃষ্টিশক্তি কাজে লাগানো প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্টিতে কোনো ত্রুটি নেই। যারা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তিনি তাদেরকে বারংবার সে সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে চিন্তা করার কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে,[৬৬] الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ. -'যিনি সাত আসমান স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন অসামাঞ্জস্য দেখতে পাবে না। তুমি আবার দৃষ্টি ফিরাও, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?'

ইবনুল জাওযী (র.) বলেন, كَرِّرِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى فِيْهَا فُرُوْجًا وَّصدوْعًا.. -'দৃষ্টি বারবার ঘুরিয়ে নাও। তাতে কোনো ফাটল বা বক্রতা দেখতে পাবে?'[৬৭] আরো আয়াত বর্ণিত হয়েছে।[৬৮]

ড. দৃষ্টিশক্তির নিয়ন্ত্রণকারী সম্পর্কে

মানুষের দৃষ্টিশক্তির নিয়ন্ত্রণকারী স্বয়ং আল্লাহ। যিনি সবকিছুর প্রাণদানকারী ও হরণকারী। আল্লাহ বলেন,[৬৯] قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. -'বল, আসমান ও যমীন থেকে কে তোমাদের রিয্ক দেন? অথবা কে (তোমাদের) শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক?'

ইবনুল জাওযী (র.) বলেন, خَلَقَ اللَّهُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. -'মহান আল্লাহ শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সৃষ্টি করেছেন।'[৭০]

ঢ. কিয়ামতের ক্ষণ সম্পর্কে

কিয়ামত সুনিশ্চিত সংঘটিত হবে। যদিও কেউ কেউ এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে থাকে। তবে এটি যে মুহূর্তে সংঘটিত হবে তা অতি সামান্য, সেকেন্ড বা ন্যানো সেকেন্ডের ন্যায়। আমরা যেমন চোখের পলক ফেলে থাকি। কিয়ামত চোখের পলকে সংঘটিত হবে। তখন আদম সন্তানদের কিছুই করার থাকবে না।[৭১] এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৭২] وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. -'আর কিয়ামতের ব্যাপারটি শুধু চোখের পলকের ন্যায়। কিংবা তা আরো নিকটবর্তী।'

আয়াতটির অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ বলেন, 'কাফিররা বারংবার মহানবী (স.)-কে কিয়ামতের সময়কাল সম্পর্কে প্রশ্ন করতো এবং তা কত দ্রুত হবে এ বিষয়ে জানতে তারা আগ্রহী ছিল। তাদের প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ করেন।'[৭৩]

হুসাইন ইবন মাসউদ আল-বাগাভী (র.) বলেন, كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَاللَّمْحُ: النَّظْرُ بِسُرْعَةٍ، وَالْمَعْنَى: إِنَّ الْقِيَامَةَ فِيْ سُرْعَةِ قِيَامِهَا كَلَمْحِ الْعَيْنِ. -'চোখের পলকের ন্যায়। আর লাম্‌হ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্রুত চোখের পলক সরানো। এর অর্থ হলো, নিশ্চয় কিয়ামত অতি দ্রুততার সাথে সংঘটিত হবে যেমন চোখের পলক।'[৭৪]

ণ. দৃষ্টিশক্তির ব্যাপারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

আল্লাহ তা'আলা আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন। একেকটি অঙ্গের আলাদা আলাদা কাজও রয়েছে। বান্দা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এ প্রসঙ্গে বলেন,[৭৫] وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ -'আর আল্লাহ তোমাদেরকে বের করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমতাবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিসমূহ এবং অন্তরসমূহ। যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর।'

আবুল লায়স আস-সামারকান্দী (র.) বলেন, لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَهُمْ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ بُطُونِ الْأُمَّهَاتِ وَإِنَّمَا أَعْطَاهُمُ الْعِلْمَ بَعْدَ الْخُرُوجِ. -'কেননা আল্লাহ মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই এ সকল অঙ্গ সৃষ্টি করেছেন এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে জ্ঞান দান করেছেন।'[৭৬]

৪. অশ্রু বা চোখের জল

চোখের পাশাপাশি আল-কুরআনে অশ্রু বা চোখের জল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,[৭৭] وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ -'আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে যখন তারা তা শুনে, তুমি দেখবে তাদের চক্ষু অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে, কারণ তারা সত্যকে জেনেছে।' আল-কুরআনে শব্দটি ২টি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ এর ব্যাখ্যায় ইবন জারীর আত-তাবারী (র.) বলেন, "فَيْضُ الْعَيْنِ مِنَ الدَّمْعِ"، امْتِلَاؤُهَا مِنْهُ، ثُمَّ سَيَلَانُهُ مِنْهَا. -'পানি দ্বারা চোখের ধারা প্রবাহিত হওয়া। প্রথমে চোখ পানি দ্বারা পূর্ণ হয় এরপর তা থেকে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত হয়।'[৭৮] এ প্রসঙ্গে আরো আয়াত বর্ণিত হয়েছে।[৭৯]

৫. নাক ও দাঁত:

মানুষ নাকের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে থাকে। এ ছাড়াও এটির সাহায্যে বিভিন্ন কিছুর গন্ধ নেয়া যায়। এটির 'আরবী প্রতিশব্দ أَنْف (আন্‌ফ), বহুবচনে أُنُوف (উনূফ)। দাঁতের সাহায্যে মানুষ খাদ্য চিবিয়ে খায় এবং স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে। শব্দটির প্রতিশব্দ سِنّ (সিন্ন), বহুবচনে اَسْنَان (আসনান)। আন্‌ফ ও সিন্ন শব্দদ্বয় কুরআন মাজীদের ১টি আয়াতে দুইবার করে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,[৮০] وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. -'আর আমি এতে তাদের উপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে

চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম।'

৬. কান

কর্ণ বা শ্রবণ ইন্দ্রিয় ও ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ। মানুষের মাথার নিচে মুখের দুইপাশে দুইটি কান বা বহিঃকর্ণের কর্ণছত্র বা পিনা (Pinna) থাকে।[৮১] কানের 'আরবী প্রতিশব্দ أُذُنٌ (উযুন), বহুবচনে آذَانٌ (আযান)।[৮২] কুরআন মাজীদে উভয় শব্দই মোট ১৩টি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক. শ্রবণকারী অর্থে

আল-কুরআনের কোনো কোনো আয়াতে أُذُنٌ (উযুন) শব্দটি শ্রবণকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স.) সম্পর্কে কাফিরদের বক্তব্য তুলে ধরে আল্লাহ বলেন,[৮৩] وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ.-'এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, তিনি (সব বিষয়ে) শ্রবণকারী। তুমি বল, তোমাদের জন্য যা কল্যাণের তা শ্রবণকারী।' অত্র আয়াতে أُذُنٌ (উযুন) শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে। উভয় স্থানে শব্দ দুইটি السَّامِعِ বা শ্রবণকারী অর্থ প্রদান করেছে।

ইবন কুতাইবা (র.) বলেন, اَلْأَصْلُ فِيْ هَذَا أَنَّ الْأُذُنَ هِيَ السَّامِعَةُ، فَقِيْلَ لِكُلِّ مَنْ صَدَّقَ بِكُلِّ خَبْرٍ يَّسْمَعُهُ: أُذُنٌ.-'এখানে মৌলিকভাবে 'উযুন' শব্দটি শ্রবণকারী অর্থ প্রদান করেছে। যিনি প্রতিটি সংবাদ শ্রবণ করে তাকে সত্যায়ন করে থাকেন তাকে 'উযুন' বলা হয়।'[৮৪]

খ. আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত শাস্তির ভয়াবহতা প্রকাশ

কাফিররা বিভিন্ন সময় আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নানামুখী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। পরীক্ষা স্বরূপ যখন তারা রাতের অন্ধকারে বজ্রধ্বনী বা অনুরূপ কোনো আওয়াজ শ্রবণ করে তখন তারা বাঁচার জন্য কানের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করে। আল্লাহ বলেন,[৮৫] أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ.-'কিংবা আকাশের বর্ষণমুখর মেঘের ন্যায়, যাতে রয়েছে ঘন অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক। বজ্রের গর্জনে তারা মৃত্যুর ভয়ে তাদের কানে আঙুল দিয়ে রাখে।' আরো আয়াত বর্ণিত হয়েছে।[৮৬]

বজ্রপাত থেকে বাঁচার জন্য মহানবী (স.) নিচের দু'আটি বলতেন, "اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ"-'হে আল্লাহ তোমার ক্রোধের মাধ্যমে আমাদেরকে হত্যা করো না, তোমার আযাবের মাধ্যমে আমাদেরকে ধ্বংস করো না, এর পূর্বেই আমাদেরকে ক্ষমা করো।'[৮৭]

গ. অধম জাতির বিবরণ প্রকাশ

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে এমন এক শ্রেণির লোকের বিবরণ দিয়েছেন, যারা চোখ থাকার পরেও দেখতে পায় না এবং কান থাকার পরেও শুনতে পায় না। আর তারাই হলো পশুর ন্যায় মূর্খ জাতি। আল্লাহ বলেন,[৮৮] وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.-'আর অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষকে। তাদের রয়েছে অন্তর, তা দ্বারা তারা বুঝে না, তাদের রয়েছে চোখ, তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের রয়েছে কান, তা দ্বারা তারা শুনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট। তারাই হচ্ছে গাফেল।' আরো আয়াত বর্ণিত হয়েছে।[৮৯]

ঘ. কানের উপরে পর্দা ফেলানো প্রসঙ্গে

যারা আল্লাহ তা'আলার বিধানকে অমান্য করে তারা কুরআনের ভাষায় যালিম বলে সাব্যস্ত হয়।[৯০] আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহে পর্দা ফেলানোর পাশাপাশি তাদের শ্রবণ শক্তিতেও পর্দা ফেলান। ফলে তারা আর হিদায়েত লাভ করতে সক্ষম হয় না। আল্লাহ বলেন,[৯১] إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا.-'নিশ্চয় আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর পর্দা দিয়ে

দিয়েছি, যাতে তারা তা (কুরআন) বুঝতে না পারে। আর তাদের কর্ণসমূহে রয়েছে বধিরতা এবং তুমি তাদেরকে হিদায়াতের প্রতি আহ্বান করলেও তারা কখনো হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে না।' আরো আয়াত বর্ণিত আছে।[৯২]

ইবন জারীর আত-তাবারী (র.) বলেন, وَجَعَلَ فِيْ آذَانِهِمْ ثِقْلاً وَصَمَمًا عَنْ فَهْمِ مَا تَتْلُو عَلَيْهِمْ - 'আপনি তাদের সামনে যা তিলাওয়াত করবেন তারা যেন তা না বুঝে এ জন্য তিনি তাদের কর্ণসমূহে ভারত্ব ও বধিরতা প্রদান করেছেন।'[৯৩]

ঙ. আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি

কাফিররা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি সাধন করতো। যেমন তারা পশুর কান ছিদ্র করতো। অথচ তাদের এ কাজ আল্লাহর নিকট মোটেই পছন্দনীয় ছিল না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,[৯৪] وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. -'আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে।'

فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ এর ব্যাখ্যায় আবুল লায়স আস-সামারকান্দী (র.) বলেন, وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَشُقُّوْنَ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَيُسَمُّوْنَهَا بَحِيْرَةً -'অন্ধকার যুগের লোকেরা পশুর কান কেটে দিতো এবং তাদের নামকরণ করতো বাহীরা।'[৯৫]

চ. কিসাসের বিধান

আল্লাহ তা'আলা কিসাসের বিধান বর্ণনাকালে কান প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। কারণ কেউ যদি কারো কান বা শ্রবণশক্তির ক্ষতি করে তবে, তারও সমভাবে অনুরূপ ক্ষতিসাধন করা হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,[৯৬] وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. - 'আর আমি এতে তাদের উপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। এরপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফ্ফারা হবে। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফায়সালা করবে না, তারাই হচ্ছে যালিম।'

হুসাইন ইবন মাসউদ আল-বাগাভী (র.) বলেন, وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، تُقْطَعُ بِهَا -'কানের পরিবর্তে কান কর্তন করা হবে।'[৯৭]

ছ. আসহাবে কাহ্ফ প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহ্ফ তথা সেই গুহার বাসিন্দাদের কান দীঘ দিনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিলেন। যাতে তারা বাহিরের কোনো আওয়াজ শুনতে না পায়। তাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,[৯৮] فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. -'ফলে, আমি গুহায় তাদের কান বন্ধ করে দিলাম অনেক বছরের জন্য।'

আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল জাওযী (র.) বলেন, فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ أي: مَنَعْنَاهُمْ أَنْ يَسْمَعُوْا، لِأَنَّ النَّائِمَ إِذَا سَمِعَ انْتَبَهَ. -'আমি তাদের কান বন্ধ করে দিলাম, অর্থাৎ, তাদেরকে কোনো কিছু শুনতে নিষেধ করেছিলাম। কারণ, ঘুমন্ত ব্যক্তি যখন কোনো কিছুর শব্দ শুনতে পায় তখন জাগ্রত হয়।'[৯৯]

আল-কুরআনে السَّمْعُ (আস-সাম'উ) শব্দটি কান বা শ্রবণশক্তি বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। السَّمْعُ (আস-সাম'উ) শব্দটি একবচন, বহুবচনে أَسْمَاعُ (আসমা'উ), أَسَامِعُ (আসামি'উ), أَسَامِيْعُ (আসামী'উ) প্রভৃতি। যে অঙ্গের শ্রবণশক্তি রয়েছে তাই السَّمْعُ (আস-সাম'উ)।[১০০] রাগিব আল-ইসবাহানী (র.) বলেন,

اَلسَّمْعُ قُوَّةٌ فِيْ الْأُذُنِ بِهِ يُدْرِكُ الْأَصْوَاتِ وَفِعْلَهُ يُقَالُ لَهُ السَّمْعُ أَيْضاً.-'কানের যে শক্তি দ্বারা আওয়ায অনুভব করা যায় এবং কানের কাজ করাও যায় তাকে السَّمْعُ (আস-সাম'উ) বলে।[১০১] শব্দটি আল-কুরআনে বেশ কয়েকটি আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,[১০২] خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ-'আল্লাহ তাদের অন্তরে এবং তাদের কানে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের চোখসমূহে রয়েছে পর্দা।' শব্দটি কুরআন মাজীদের তিনটি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপ আরো বর্ণনা রয়েছে।[১০৩]

মুফাসসিরগণ বলেন, আয়াতে কাফিরদের সত্য বিমুখতার পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা তারা সত্য জানার পরেও তা থেকে বিমুখ ছিল এবং মহানবী (স.)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ফলে আল্লাহ তাদের অঙ্গসমূহে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। তাই তারা আর কখনো হিদায়েত লাভ করবে না।[১০৪]

জ. শ্রবণশক্তির ব্যাপারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

আল্লাহ আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন। একেকটি অঙ্গের আলাদা আলাদা কাজও রয়েছে। বান্দা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,[১০৫] لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ-'তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিসমূহ এবং অন্তরসমূহ। যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর।'

৭. দাড়ি

দাড়ি পুরুষ ও পৌরষের প্রতীক। দাড়ি লম্বা করার ব্যাপারে হাদীসেও উৎসাহিত করা হয়েছে।[১০৬] দাড়ি লম্বা করা সুন্নাত। দাড়ির আরবী প্রতিশব্দ لِحْيَةٌ (লিহইয়া), বহুবচনে لُحًي (লুহা) ও لِحًي (লিহা)।[১০৭] ড. ইবরাহীম মাদকূর বলেন, اَللِّحْيَةُ: شَعْرُ الْخَدَّيْنِ وَالذِّقْنِ.-'লিহইয়া হলো দুই গাল ও চিবুকের চুল।'[১০৮] কুরআন মাজীদে শব্দটি মোট ১টি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,[১০৯] قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي-'সে বলল, হে আমার সহোদর! আমার দাড়িও ধরো না, মাথার চুলও ধরো না।'

৮. জিহ্বা

জিহ্বা দ্বারা মানুষ কথা বলতে পারে। এছাড়াও এর দ্বারা খাদ্যসহ বিভিন্ন কিছুর স্বাদ গ্রহণ করা যায়। শব্দটির 'আরবী প্রতিশব্দ لِسَان (লিসান), বহুবচনে أَلْسِنَة (আলসিনাহ)। لِسَان (লিসান) শব্দটি ভাষা, মুখের কথা, কথা বলা ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন 'আরবরা বলে থাকেন, فُلَانٌ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ قَوْمِهِ.-'অমুক ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের ভাষায় কথা বলেছে।[১১০] এ ছাড়াও শব্দটি চিঠি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন 'আরবরা বলে থাকেন, أَتَتْنِيْ لِسَانُ بَنِيْ عَامِرٍ.-'আমার নিকট 'আমির সম্প্রদায়ের চিঠি এসেছে।'

জিহ্বার সংজ্ঞায় ড. ইবরাহীম মাদকূর বলেন, جِسْمٌ لَحْمِي مُسْتَطِيْلٌ مُتَحَرِّكٌ. يَكُوْنُ فِيْ الْفَمِ. وَيُصْلَحُ لِلتَّذَوّقِ وَالْبَلْعِ وَلِلنُّطْقِ. - গোশত দ্বারা গঠিত লম্বা একটি অঙ্গ, যা নড়াচড়া করতে পারে এবং মুখের মধ্যে থাকে। এটির সাহায্যে কোনো কিছুর স্বাদ গ্রহণ করা যায়, খাবার গলধঃকরণ করা যায় এবং কথা বলা যায়। শব্দটি স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয়।'

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায়, জিহ্বার অগ্রভাব ও দুইপাশে লাল ছোট ছোট বিশেষ কোষগ্রন্থি যার চার রকম স্বাদ রয়েছে: মিষ্টতা, লবণাক্ততা, তিক্ততা ও অম্লতা। জিহ্বার ব্যবহার তিন প্রকার: ক. জিহ্বা খাদ্যদ্রব্য দাঁতের নিচে ঠেলে দেয় যা দাঁত চিবাইতে সক্ষম হয় এবং যা পরে নরম ডেলা হয়ে গিলতে সহজ হয়। খ. জিহ্বা স্বাদ গ্রহণ করে থাকে এবং জিহ্বার স্পর্শ ক্ষমতাও খুবই উন্নত। গ. জিহ্বা কথা বলতে সর্বাধিক সাহায্য করে। জিহ্বা প্রথম দুইটি কাজ সকল প্রাণীর বেলায় দেখা যায়, কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা কেবল মানুষেরই রয়েছে। জিহ্বা, তালু ও ঠোঁটের বিভিন্ন রকম ব্যবহারে সৃষ্ট শব্দ কথায় পরিণত হয়।[১১১] আল-কুরআনে لِسَان (লিসান) শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়ভাবে ৭টি স্থানে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে আয়াতসমূহ প্রেক্ষাপটসহ বিশ্লেষণ করা হলো।

ক. মুখ অর্থে ব্যবহৃত

আল-কুরআনে لِسَان (লিসান) শব্দটি মুখ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,[১১২] لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. -‘বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে দাঊদ ও মারইয়াম পুত্র ‘ঈসার মুখে লা‘নত করা হয়েছে। তা এই কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়েছে এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত।’

অত্র আয়াতে লিসান শব্দটি বদদু‘আ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা দাঊদ (আ.) তাঁর অবাধ্য জাতির জন্য আল্লাহর নিকট এভাবে দু‘আ করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! তাদের প্রতি আপনার অভিশাপ বর্ষিত হোক এবং তাদেরকে পরবর্তী জাতির জন্য নিদর্শন বানিয়ে দিন।[১১৩]

খ. ভাষা অর্থে ব্যবহৃত

কোনো কোনো আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা লিসান শব্দটি ভাষা অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি বলেন,[১১৪] وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. -‘আর আমি অবশ্যই জানি যে, তারা বলে, তাকে তো শিক্ষা দেয় একজন মানুষ, যার দিকে তারা ইঙ্গিত করছে, তার ভাষা হচ্ছে অনারবী। অথচ এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষা।’ অনুরূপ আরো আয়াত বর্ণিত আছে।[১১৫]

গ. স্পষ্টভাষী অর্থে

কোনো কোনো আয়াতে লিসান শব্দটি স্পষ্টভাষী বা সুমিষ্টভাষী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মূসা (আ.)-এর মুখে কিছুটা জড়তা থাকলে তিনি তাঁর ভাই হারূন (আ)-কে সাথে নিয়ে দা‘ওয়াতী কাজ সম্পাদন করেছেন। কারণ তিনি তাঁর মুখে কোনো জড়তা ছিল না। আল্লাহ বলেন,[১১৬] وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي. -‘আর আমার ভাই হারূন, সে আমার চেয়ে স্পষ্টভাষী, তাই তাকে আমার সাথে সাহায্যকারী হিসেবে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে।’

أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا এর ব্যাখ্যায় ইবন জারীর আত-তাবারী (র.) বলেন, أَحْسَنُ بَيَانًا عَمَّا يُرِيدُ أَنْ يُبَيِّنَهُ -‘যে বিষয়ে তিনি বর্ণনা দিতে ইচ্ছুক সে বিষয়ে তিনি ছিলেন উত্তম বর্ণনাকারী।’[১১৭]

ঘ. সুনাম-সুখ্যাতি অর্থে

কোনো কোনো আয়াতে লিসান শব্দটি সুনাম-সুখ্যাতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,[১১৮] وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. -‘এবং আমি তাদেরকে আমার অনুগ্রহ দান করলাম আর তাদের সুনাম সুখ্যাতিকে সমোচ্চ করলাম।’ আরো আয়াত বর্ণিত হয়েছে।[১১৯]

ইবন জারীর আত-তাবারী (র.) বলেন, وَاجْعَلْ لِيْ فِيْ النَّاسِ ذِكْرًا جَمِيْلًا وَثَنَاءً حَسَنًا، بَاقِيًا فِيْمَنْ يَجِيء مِنَ الْقُرُوْنِ بَعْدِيْ. -‘মানুষের মাঝে আমার জন্য নির্ধারণ করুন সুন্দর আলোচনা ও সুন্দর প্রশংসা। যা আমার পরে আগমনকারীর নিকট বিদ্যমান থাকবে।’[১২০] হুসাইন ইবন মাসঊদ আল-বাগাভী (র.) বলেন, أَيْ ثَنَاءً حَسَنًا وَذِكْرًا جَمِيلًا وَقَبُولًا عَامًّا فِي الْأُمَمِ الَّتِي تَجِيءُ بَعْدِي، فَأَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ فَجُعِلَ كُلُّ أَهْلِ الْأَدْيَانِ يتولونه ويثنون عليه خيرا ويؤمنون به. -‘অর্থাৎ আমার জন্য নির্ধারণ করুন উত্তম প্রশংসা, সুন্দর আলোচনা ও সামগ্রীক গ্রহণযোগ্যতা যা আমার পরে অন্যদের নিকট গমন করবে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা এ সকল বিষয় দান করলেন।’[১২১]

ঙ. কথা বলার অঙ্গ হিসেবে

কোনো কোনো আয়াতে লিসান শব্দটি কথা বলার বিশেষ অঙ্গ জিহ্বাকে বুঝিয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,[১২২] وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. -‘এবং একটি জিহ্বা ও দু’টি ঠোঁট।’ আরো আয়াত বর্ণিত হয়েছে।[১২৩]

لِسَانًا শব্দের ব্যাখ্যায় ইবন মাসঊদ (রা.) বলেন, وَلِساناً يُفْصِحُ عَمَّا فِي بَاطِنِهِ. -‘এবং তিনি জিহ্বা দিয়েছেন যার মাধ্যমে তোমরা গোপন বিষয়কে ভাষায় প্রকাশ করো।’[১২৪]

৯. ঠোঁট

মুখের যে অংশটুকু দেখা যায় এবং কথা বলার সময় নড়াচড়া করে ও দাঁত ঢেকে রাখতে সাহায্য করে তাকে ঠোঁট বলে। এটির ‘আরবী প্রতিশব্দ شَفَةٌ (শাফাহ), বহুবচনে شِفَاه (শিফাহ)। মূলতঃ شَفَةٌ (শাফাহ) শব্দের অর্থ প্রান্ত বা কিনারা। যেহেতু ঠোঁট মুখের কিনারা তাই তাকে شَفَةٌ (শাফাহ) বলা হয়।[১২৫] আল্লাহ মানুষের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন। মানুষ এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না। বরং কোনো কোনো মানুষ নিজেকে খুবই শক্তিশালী মনে করে। অথচ আল্লাহই হলেন সকল শক্তির মূল এবং তিনিই সকলের স্রষ্টা। এ সকল বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে আল্লাহ বলেন,[১২৬] وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. -‘ এবং একটি জিহ্বা ও দু’টি ঠোঁট।’ আল-কুরআনের কেবল ১টি আয়াতেই শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। ইবন মাসঊদ (রা.) বলেন, عَدَّدَ تَعَالَى عَلَى الْإِنْسَانِ نِعَمَهُ فَقَالَ: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ شَفَتَيْنِ يُطْبِقُهُمَا عَلَى فِيْهِ وَيَسْتَعِينُ بِهِمَا عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالنَّفْخِ. -‘এখানে মহান প্রভূ মানুষের প্রতি কিছু নি‘আমত তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে দুইটি ঠোঁট দান করিনি? যাদের মাধ্যমে মুখে ভারসাম্য থাকে এবং পানাহার ও নিশ্বাস নিতে সাহায্য করে।’[১২৭]

১০. গাল

মুখমণ্ডলের দুইপার্শ্বকে গাল বলা হয়। যা চোখের নিচ থেকে কানের পার্শ্ব ঘেষে দাড়িতে এসে সমাপ্ত হয়েছে।[১২৮] এটির ‘আরবী প্রতিশব্দ خَدّ (খাদ্দ), বহুবচনে خُدُوْد (খুদূদ)। প্রকৃতপক্ষে خَدّ (খাদ্দ) শব্দের অর্থ গর্ত। যেহেতু গালের অভ্যন্তরে গর্ত রয়েছে, যাকে আমরা মুখ বলে থাকি, তাই গালকে خَدّ (খাদ্দ) বলা হয়।[১২৯]

রাগিব আল-ইসবাহানী (র.) বলেন, لِلْإِنْسَانِ خَدَّانِ، وَهُمَا مَا اكْتَنَفَا الْأَنْفَ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشِّمَالِ. -‘মানুষের দুইটি গাল রয়েছে। যেগুলো ডান ও বামদিক থেকে নাককে বেষ্টন করে আছে।’[১৩০] আল-কুরআনের কেবল ১টি আয়াতেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,[১৩১] وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. -‘আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ (গাল) ফিরিয়ে নিয়ো না।’

১১. কপাল

দুই চোখের উপরিভাগ ও মাথার সম্মুখভাগ যেখানে চুল গজায় না তাকে কপাল বলে। এটির ‘আরবী প্রতিশব্দ نَاصِيَة (নাসিয়াহ), বহুবচনে نَوَاصِي (নাওয়াসী), نَوَاصٍ (নাওয়াস) ও نَاصِيَات (নাসিয়াত)।[১৩২] একবচন ও বহুবচন উভয় আকৃতিতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কপাল শব্দটি ভাগ্য ও মান-সম্মান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন কেউ কাউকে অপমান করলে ‘আরবগণ বলে থাকেন, أَذَلَّ فُلَانٌ نَاصِيَةَ فُلَانٍ: أَهَانَهُ وَحَطَّ مِنْ قَدْرِهِ. -‘অমুক অমুকের কপালকে নীচু করেছে। তাকে অপমান করেছে এবং তার মর্যাদা বিনষ্ট করেছে।’[১৩৩]

আল-কুরআনে শব্দটি ৩টি আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে প্রেক্ষাপটসহ বিশ্লেষণ করা হলো।

ক. কপাল একটি অঙ্গ

কপাল মানুষের একটি অঙ্গ বিশেষ। আল্লাহ বলেন,[১৩৪] كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. -‘কখনো নয়! যদি সে শান্ত না হয়, তবে আমি তাকে কপালের সম্মুখ ভাগের চুল ধরে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাব। মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠ কপাল।’

উল্লিখিত দুইটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াতে নাসিয়াহ শব্দটি কপালের সম্মুখভাগের চুল বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে শব্দটি মাথার সম্মুখভাগ তথা কপাল বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।[১৩৫] ইবনুল জাওযী (র.) বলেন, وَالنَّاصِيَةُ: شَعْرُ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ. -‘মাথার সম্মুখভাগের চুলকে ‘নাসিয়াহ’ বলা হয়।’[১৩৬]

খ. আল্লাহ সকলের নিয়ন্ত্রণকারী

আল্লাহ সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক। তিনি যাকে ইচ্ছা ছেড়ে দিতে পারেন আবার যাকে ইচ্ছা টেনে ধরতে পারেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,[১৩৭] مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. -‘প্রতিটি বিচরণশীল প্রাণীরই তিনি নিয়ন্ত্রণকারী।’

আয়াতটির ব্যাখ্যায় আবূ উবায়দা (র.) বলেন, নিশ্চয় কপাল আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, তাঁর রাজত্বে এবং তাঁর বাদশাহীর আওতায় রয়েছে। যদি প্রশ্ন করা হয়, এখানে কপালকে উল্লেখ করার কারণ কী? উত্তরে বলা হবে, কপাল মাথার অগ্রভাগ, যদি কেউ কারো কপাল ধরে তখন ঐ ব্যক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তার অধীনে চলে আসে এবং সে অপমানীত হয়। এ জন্য এখানে কপালকে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩৮]

গ. মাথার অগ্রভাগের চুল

আল্লাহ তা'আলা শব্দটিকে কোনো স্থানে মাথার অগ্রভাগের চুল অর্থে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,[১৩৯] يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.- 'অপরাধীদেরকে চেনা যাবে তাদের চিহ্নের সাহায্যে। এরপর তাদের অগ্রভাগের চুল ও পা ধরে নেয়া হবে।'

মুকাতিল (র.) বলেন, أَنَّ خَزَنَةَ جَهَنَّمَ تَجْمَعُ بَيْنَ نَوَاصِيْهِمْ إِلَىْ أَقْدَامِهِمْ مِنْ وَّرَاءِ ظُهُوْرِهِمْ ثُمَّ يَدْفَعُوْنَهُمْ عَلَى وُجُوْهِهِمْ فِيْ النَّارِ.- 'জাহান্নামের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা তাদের মাথার অগ্রভাগের চুল ও পা পৃষ্ঠদেশের দিক থেকে একত্রিত করে সম্মুখভাগ দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।'[১৪০]

উপসংহার

আল-কুরআনুল কারীম সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ এবং সকল জ্ঞানের আধার। এমন কোনো জ্ঞান নেই যার বিবরণ কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়নি। অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতিসহ সকল প্রকার নীতির প্রতিফলন ঘটেছে এ গ্রন্থে। মানবদেহ এবং মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। কারণ, মানব জাতি যদি তাদের দেহ সম্পর্কে চিন্তভাবনা করে তবে তারা সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কে আরো অধিক জানতে সক্ষম হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে মস্তক ও মুখমণ্ডল সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে অত্র প্রবন্ধে। অঙ্গসমূহ হলো মস্তক, মুখমণ্ডল, চোখ, চোখের জল, নাক, দাঁত, কান, দাড়ি, জিহ্বা, ঠোঁট, গাল ও কপাল। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে উপদেশ দেয়ার লক্ষ্যে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নানারকম উপমা উপস্থাপন করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মস্তক ও মুখমণ্ডল সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মস্তক ও মুখমণ্ডল সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ উপস্থাপন করে তার পেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে অত্র প্রবন্ধে। সেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে। ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ উপস্থাপনের কারণ উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং মহান আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল ও সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি মানবদেহে সম্পর্কে গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

[১] আল-কুরআন, সূরাতুন নাহল, ১৬:৮৯; সূরাতুল আনআম, ৬:৩৮।

[২] সূরাতুয যারিয়াত, ৫১:২১।

[৩] নাসিম বানু, *জীববিজ্ঞান*, দ্বিতীয় পত্র (ঢাকা: হাসান বুক হাউস, ১০ম প্রকাশ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ২৪৯।

[৪] ড. ইবরাহীম মাদকূর, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (দেওবন্দ: কুতুবখানা হোসাইনিয়াহ, ১৯৯৫), পৃ. ৩১৯; হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন* (মিসর: আল-মাতবা'আতুল মায়মানিয়্যাহ্. তা. বি.), পৃ. ১৮৯।

[৫] *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৩১৯।

[৬] .সূরাতুল মায়িদাহ, ৫:৬।

[৭] হুসাইন আল-বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ১৪২০ হি.), পৃ. ২০।

[৮] Board of Researchers, *Scientific Indications in The Holy Quran* (Dhaka: Islamic Foundation Bd,, 2004), P 142.

[৯] সূরাতুল বাকারা, ২:২৭৯।

[১০] ইবনুল জাওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৪২২ হি.), পৃ. ২৪৯।

[১১] সূরাতুল আ'রাফ, ৭:১৫০।

[১২] *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬।

[১৩] সূরা ত্বহা, ২০:৯৪; সূরা ইউসুফ, ১২:৩৬।

[১৪] সূরা মরিয়ম, ১৯:৪।

[১৫] সূরাতুস সাফফাত, ৩৭:৬৫।
[১৬] সূরাতুল বাকারা, ২:১৯৬।
[১৭] সূরাতুল ফাতহ, ৪৮:২৭।।
[১৮] *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, পৃ. ৫২৯; *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ১০১৫।
[১৯] সূরাতুর রহমান, ৫৫:২৭।
[২০] সূরাতুল মায়িদাহ, ৫:৬।
[২১] *Scientific Indications in The Holy Qur`an*, P. 141.
[২২] সূরাতুল বাকারা, ২:১৪৯।
[২৩] সূরাতুল বাকারা, ২:১৪৪; ১৫০; ১৭৭।
[২৪] সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৬।
[২৫] সূরাতুল কিয়ামাহ, ৭৫:২২; সূরা আবাসা, ৮০:৩৮; সূরাতুল গাশিয়াহ, ৮৮:৮।
[২৬] সূরাতুল কিয়ামাহ, ৭৫:২৪।
[২৭] সূরা আবাসা, ৮০:৪০।
[২৮] সূরাতুল গাশিয়াহ, ৮৮:৮; সূরাতুল মুলক, ৬৭:২৭; সূরাতুল হাজ্জ, ২২:৭২।
[২৯] সূরা ইউনুস, ১০:১০৫।
[৩০] সূরাতুর রূম, ৩০:৩০; সূরাতুর রূম, ৩০:৪৩; সূরাতুল আ'রাফ, ৭:২৯; সূরাতুল ইসরা, ১৭:৭; সূরাতুন নিসা, ৪:১২৫।
[৩১] সূরা ইউসুফ, ১২:৯।
[৩২] *মা'আলিমুত তানযীল*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৭।
[৩৩] সূরা ইউসুফ, ১২:৯৩।
[৩৪] নাসির উদ্দীন আল-বায়যাভী, *আনওয়ারুত তানযীল*, ১ম খণ্ড (ইউপি: কুতুবখানা মজতাবাই, তা বি), পৃ. ২৭৮; কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৪ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৫২০; মাহমূদ আল-আলূসী, *তাফসীর রূহুল মা'আনী*, ৭ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সং., ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৬৯।
[৩৫] নাসিম বানু, *উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান*, ২য় পত্র, পৃ. ২৫৯; *Scientific Indications in The Holy Quran*, P. 230-231.
[৩৬] *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, পৃ. ৩৫৭-৩৫৮; *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৬৪১।
[৩৭] *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৬৪১।
[৩৮] *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, পৃ. ৫৯; *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৯।
[৩৯] *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৬৪১।
[৪০] সূরাতুল বালাদ, ৯০:৮।
[৪১] *Scientific Indications in The Holy Qur`an*, P. 578.
[৪২] সূরা সাদ, ৩৮:৪৫।
[৪৩] *মা'আলিমুত তানযীল*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৪।
[৪৪] সূরা আলে 'ইমরান, ৩:১৩।
[৪৫] সূরাতুল মায়িদা, ৫:৪৫।
[৪৬] মুহাম্মদ ইবন জারীর, *তাফসীরুত তাবারী*, ১০ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ৩৫৯।
[৪৭] সূরাতুল আনআম, ৬:১০৩।
[৪৮] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ৭৪৩৫।
[৪৯] সূরাতুল আ'রাফ, ৭:১৭৯।
[৫০] সূরাতুল আ'রাফ, ৭:১৯৫; সূরাতুল হাজ্জ, ২২:৪৬।
[৫১] *মা'আলিমুত তানযীল*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৩।
[৫২] সূরাতুন নূর, ২৪:৩১।
[৫৩] ফখরুদ্দীন আর-রাযী, *আত-তাফসীরুল কাবীর*, ২৩ খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ১৪২০ হি.), পৃ. ৩৬০।
[৫৪] সূরাতুন নূর, ২৪:৪৪।
[৫৫] সূরাতুল হাশর, ৫৯:২।
[৫৬] আবুল লায়স আস-সামারকান্দী, *বাহরুল 'উলূম*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৫১৮।
[৫৭] সূরাতুল আহযাব, ৩৩:১০।
[৫৮] সূরা ইবরাহীম, ১৪:৪২; সূরাতুল আম্বিয়া, ২১:৯৭; সূরাতুল কিয়ামাহ, ৭৫:৭।
[৫৯] *মা'আলিমুত তানযীল*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩।
[৬০] সূরাতুন নাজম, ৫৩:১৭।
[৬১] হাফিয ইবন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ৪র্থ খণ্ড (মিসর: দারুল হাদীছ, ৬ষ্ঠ সং., ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৩২২।
[৬২] সূরা সাদ, ৩৮:৬৩।

[৬৩] সূরাতুল বাকারা, ২:৭।
[৬৪] *মা'আলিমুত তানযীল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬।
[৬৫] সূরাতুল জাসিয়া, ৪৫:২৩।
[৬৬] সূরাতুল মুলক, ৬৭:৩।
[৬৭] *যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত তাফসীর*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১৪।
[৬৮] সূরাতুল মুলক, ৬৭:৪।
[৬৯] সূরা ইউনুস, ১০:৩১।
[৭০] *যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত তাফসীর*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৯।
[৭১] *Scientific Indications in The Holy Quran*, P. 314.
[৭২] সূরাতুন নাহল, ১৬:৭৭।
[৭৩] *যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত তাফসীর*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৪; *মা'আলিমুত তানযীল*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৯।
[৭৪] *মা'আলিমুত তানযীল*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৯।
[৭৫] সূরাতুন নাহল, ১৬:৭৮।
[৭৬] *বাহরুল 'উলূম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৪।
[৭৭] সূরাতুল মায়িদাহ, ৫:৮৩।
[৭৮] *তাফসীরে তাবারী*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫০৭।
[৭৯] সূরাতুত তাওবা, ৯:৯২।
[৮০] সূরাতুল মায়িদাহ, ৫:৪৫।
[৮১] নাসিম বানু, *উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান*, ২য় পত্র, পৃ. ২৬৪; *Scientific Indications in The Holy Quran*, P. 229.
[৮২] *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, পৃ. ২৩; *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ১১।
[৮৩] সূরাতুত তাওবা, ৯:৬১।
[৮৪] *যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত তাফসীর*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭২।
[৮৫] সূরাতুল বাকারা, ২:১৯।
[৮৬] সূরা নূহ, ৭১:৭।
[৮৭] আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, হাদীস নং ৩৪৫০।
[৮৮] সূরাতুল আ'রাফ, ৭:১৭৯।
[৮৯] সূরাতুল আ'রাফ, ৭:১৯৫।
[৯০] আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ -'আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফায়সালা করবে না, তারাই হচ্ছে যালিম।' দ্র. সূরাতুল মায়িদা, ৫:৪৫।
[৯১] সূরাতুল কাহফ, ১৮:৫৭।
[৯২] সূরাতুল হাজ্জ, ২২:৪৬; সূরা হা-মীম- সাজদাহ, ৪১:৪৪; সূরাতুল আন'আম, ৬:২৫; সূরাতুল ইসরা, ১৭:৪৬।
[৯৩] *তাফসীরে তাবারী*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩০৬।
[৯৪] সূরাতুন নিসা, ৪:১১৯।
[৯৫] *বাহরুল উলূম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০।
[৯৬] সূরাতুল মায়িদাহ, ৫:৪৫।
[৯৭] *মা'আলিমুত তানযীল*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫।
[৯৮] সূরাতুল কাহ্ফ, ১৮:১১।
[৯৯] *যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত তাফসীর*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৬।
[১০০] *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৪৪৯।
[১০১] *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, পৃ. ২৪৮।
[১০২] সূরাতুল বাকারা, ২:৭।
[১০৩] সূরাতুশ শু'আরা, ২৬:২১২।
[১০৪] *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৮।
[১০৫] সূরাতুন নাহল, ১৬:৭৮।
[১০৬] মহানবী (স.) বলেন, أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى -'তোমরা গোঁফ খাট করো এবং দাড়ি লম্বা করো।' দ্র. আহমদ ইবন শু'আইব আন-নাসাঈ, সুনানুন নাসা'ঈ, হাদীস নং ১৫।
[১০৭] *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৮২০।
[১০৮] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮২০।
[১০৯] সূরা ত্বহা, ২০:৯৪।
[১১০] *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, পৃ. ৪৫৩; *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৮২৪।
[১১১] *Scientific Indications in The Holy Qur`an*, P. 578-579.

---

[১১২] সূরাতুল মায়িদা, ৫:৭৮।
[১১৩] *আত-তাফসীরুল কাবীর*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪১১।
[১১৪] সূরাতুন নাহল, ১৬:১০৩।
[১১৫] সূরাতুর রূম, ৩০:২২।
[১১৬] সূরাতুল কাসাস, ২৮:৩৪।
[১১৭] *তাফসীরে তাবারী*, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৫৭৭।
[১১৮] সূরাহ মারইয়াম, ১৯:৫০।
[১১৯] সূরাতুশ শু'আরা, ২৬ : ৮৪।
[১২০] *তাফসীরে তাবারী*, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৪।
[১২১] *মা'আলিমুত তানযীল*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭১।
[১২২] সূরাতুল বালাদ, ৯০:৯।
[১২৩] সূরাতুন নাহল, ১৬:১১৬।
[১২৪] *যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত তাফসীর*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৮।
[১২৫] *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৪৮৮।
[১২৬] সূরাতুল বালাদ, ৯০:৯।
[১২৭] *যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত তাফসীর*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৮।
[১২৮] *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ২২০।
[১২৯] *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, পৃ. ১৪৯; *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ২২০।
[১৩০] *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, পৃ. ১৪৯।
[১৩১] সূরা লুকমান, ৩১ : ১৮।
[১৩২] *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৯২৭; *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, পৃ. ১৪৯।
[১৩৩] *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৯২৭।
[১৩৪] সূরাতুল 'আলাক, ৯৬:১৫-১৬।
[১৩৫] *মা'আলিমুত তানযীল*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৮০।
[১৩৬] *যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত তাফসীর*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬৭।
[১৩৭] সূরা হূদ, ১১:৫৬।
[১৩৮] *যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত তাফসীর*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮০; *মা'আলিমুত তানযীল*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৩।
[১৩৯] সূরাতুর রহমান, ৫৫:৪১।
[১৪০] *যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত তাফসীর*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১২।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সভ্যতা সুরক্ষায় শিশুর ভবিষ্যৎ : একটি পর্যালোচনা
(Future of Children in Protecting Human Civilization from Islamic Perspective : An Analysis)

মো. মুনসুর আলম*

Abstract: Islam is the complete code of life. Islam is the best way of life for people irrespective of nation, religion, caste, community, language and regionalism. Islam is universal. Islam is way of life for peace, liberation and social welfare. This is the religion of humanity. The human race practices and expands it. Men and women, children, teenagers and all walks of people are the members of this human society. Human race is the best creation of Allah. Allah said, I have made the children of Adam (mankind) honored'. [Al-Quran, surah Israyel, 70] Many newborns at the moment of the birth are neglected, useless and hopeless in our society. Many children are grown up in our society under the shadow of parential disharmony without proper care. We want the right environment. We want kind mentality and fellow feelings among human beings. We want the care of love. So there is no alternative in Islam to the universal protection of the children. That is why, it is said that children are the future generation of human civilization. So, the future of children should be ensured for the preservation of human civilization.

ভূমিকা
সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর দরবারে যিনি ইসলামকে বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ, একমাত্র মনোনীত ধর্ম এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। বিশ্ব মানবতা আজ আন্ধকারের পথ ছেড়ে আলোর পথ পেয়েছে, তৈরি করতে পেরেছে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে বেঁচে থাকার প্লাটফর্ম। আর অবহেলিত, নির্যাতিত ও নিপিড়ীত শিশু সন্তানেরা পেয়েছেন সামাজিক, পারিবারিক এবং অর্থনৈতিকভাবে সুরক্ষা ও বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার। ভবিষ্যৎ মানব সভ্যতা সুরক্ষার ক্ষেত্রে ইসলাম নারী পুরুষের কোন পার্থক্য করে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব করা হয়েছে।' (আল-কুরআন, ৩:১১০)। আজকের শিশু মানব প্রজন্ম ও বিশ্ব মানবতার ভবিষ্যৎ। জাতির আগামী দিনের কর্ণধার। বিশ্ব মানব সভ্যতার রক্ষাকবচ, মুসলিম উম্মাহর সমৃদ্ধ জীবনের আশার আলো। মানব শিশু স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলংক বিমল পুষ্প বিশেষ। এই মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব থেকেই মৌলিক অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। ইসলাম শিশুর সেই সব অধিকার সংরক্ষণে বিশেষ যত্নবান ও আপোষহীন। আজকের শিশু দেশ-জাতি ও পৃথিবীর সোনালী ভবিষ্যতের নির্মাতা হিসেবে শিশুদের জন্য প্রয়োজন এমন সুন্দর পরিবেশ, প্রতিপালন, পরিচর্যা, এবং শিক্ষা-প্রশিক্ষণ যেখানে জাতির ভবিষ্যৎ স্থপতিগণ সুস্থ, স্বাভাবিক ও স্বাধীন মর্যাদা নিয়ে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারবে। আজকের অবুঝ শিশু অবহেলার স্বীকার না হয়ে যেন আগামী দিনে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার, বুদ্ধিমান, কীর্তিমান হতে পারে এরই পরিপ্রেক্ষিত আলোচ্য প্রতিবেদন।

ক. শিশু ও সভ্যতার পরিচয়
জীবনের সূচনালগ্নে একজন মানুষকে শিশু বলা হয়। আমরা প্রত্যেকেই একসময় শিশু ছিলাম, আর এর মাধ্যমেই পৃথিবীতে মানব সভ্যতার আবাদ শুরু হয়। সুতরাং এ পর্যায়ে শিশুর পরিচয় এবং তার সভ্যতা সম্পর্কে আগে জেনে নেওয়া দরকার।

* পিএইচ. ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শিশুর আভিধানিক অর্থ

আভিধানিক দৃষ্টিকোন থেকে শিশু শব্দের অর্থ মানুষের শাবক। শিশু শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হল الطِّفْلُ (তিফলু)।[১] এর বহুবচন হল الأَطْفَالُ (আল-আতফাল)। এর অর্থ ছোট বা শাবক বা ছোট বস্তু। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুর ছোটকে শিশু বলা হয়।[২]

Webster's New Twenty Century Dictionary Unabridged-এ শিশু শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ An infant, a baby, an inborn off spiting, child.[৩]

বাংলা অভিধান অনুযায়ী অল্প বয়স্ক বালক-বালিকাকে শিশু বলা হয়।[৪] আবার বাংলা বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে দু'বছর পর্যন্ত বয়সের মানব সন্তানকে শিশু বলা হয়।[৫]

শিশুর পারিভাষিক অর্থ

লিসানুল আরব প্রণেতা ইবন মানযূর র. এর মতে,

الصَّبِيُّ يُدْعى طِفْلًا حِيْنَ يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّه إِلَى أَنْ يَحْتَلِمَ "অর্থাৎ, মায়ের গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে বয়ঃসন্ধিকাল তথা স্বপ্নদোষ হওয়া পর্যন্ত বয়সকালীন মানব সন্তানকে শিশু বলা হয়।"[৬]

বিশ্বের সর্বজন স্বীকৃত Shorter Oxford English Dictionary তে শিশু সম্পর্কে বলা হয়েছে, Childhood : The Stage of life a child. The time during which one is a child the time from birth to puberty.[৭]

আল-কুরআনের আলোকে শিশু

শিশুর বয়ঃসন্ধির সাথে সাথে শিশুত্বের সমাপ্তি ঘটে। কুরআনুল কারীমে শিশুর বয়সের নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা উল্লেখ নেই, তবে কুর-আনুল কারীমে এরশাদ হয়েছে- حَتَّى إِذَا بَلَغُوْا النِّكَاحَ

"যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়।"[৮]

অন্যত্রে বলা হয়েছে, وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

'আমি আমার ইচ্ছায় নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করে আনি।'[৯]

ফিক্‌হবিদগণের দৃষ্টিতে শিশু

ইমাম আবু হানিফার মতে, পনের বছর পূর্ণ হওয়ার পর শরীরে বয়ঃসন্ধির লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও বালক বা বালিকা উভয়েই ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বালেগ বলে গণ্য করতে হবে। অনধিক পনেরো বছর পর্যন্ত একজন বালক বা বালিকা শিশু হিসেবে বিবেচিত হয়।[১০]

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে শিশু

সাধারণভাবে বয়সের তারতম্যের কারণে আমরা কাউকে শিশু, যুবক, আবার কাউকে বৃদ্ধ বলে থাকি। তবে, বাংলাদেশ ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী শিশু বলতে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত কোন ব্যক্তি। তবে শিশু বিবাহ নিরোধ আইন-১৯২৯ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী ছেলে এবং ১৬ বছরের কম বয়সী মেয়েকে শিশু বলা হয়। আবার বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে ২১ ও ১৮ পূর্ণ না হলে ছেলে ও মেয়ে শিশু হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে, নিম্নতম মজুরী আইনে ১৮ পূর্ণ না হলে শিশু হিসেবে গণ্য হবে। আবার কারখানা আইনে বলা হয়েছে, শিশু অর্থ ১৬ বছরের কম বয়সের কোন ব্যক্তি।[১১]

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক আইনে শিশু

জাতিসংঘ সনদে ১নং ধারায় শিশু সম্পর্কে বলা হয়েছে একটি শিশু কতবছর পর্যন্ত শিশু থাকে, তার বয়সসীমা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নীতি, সনদ ও আইনে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯) সহ আন্তর্জাতিক যে কোন নীতিমালা এবং সনদ প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রাখা হয়। তাই দেখা যায়, শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণে

দেশীয় আইনের সাথে আন্তর্জাতিক ও ইসলামী আইনের কিছুটা বৈপরীত্য থাকে। জাতিসংঘ সনদের ধারা-১-এ ১৮ বছরের কম বয়সী প্রত্যেককেই শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।[১২] ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর ১৯১টি রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসমর্থিত শিশু অধিকার সনদের প্রথম অনুচ্ছেদেই শিশুকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, শূন্য (০) থেকে আঠারো (১৮) বছর বয়সসীমার মধ্যে সব মানবসন্তানই শিশু। তবে শর্ত হলো- অন্য কোন আইনের আওতায় যদি তাকে সাবালক ঘোষণা না করা হয়।[১৩]

খ. সভ্যতার পরিচয়

সভ্যতার ইংরেজি হল Civilization যা ল্যাটিন শব্দ Civis or Civitas থেকে আগত। এর অর্থ-নাগরিক বা নগরে বসবাসরত কোন ব্যক্তি।[১৪] আক্ষরিক অর্থে- সুসংগঠিত আকারে দলবদ্ধ বসবাস। সুসংগঠিত বসবাসের ক্রমোন্নত স্তরই হলো সভ্যতা। এর নিজস্ব আইন-কানুন, সংস্কৃতি, জীবনব্যবস্থা এবং আত্মরক্ষার নিজস্ব পদ্ধতি থাকে। পৃথিবীর সভ্যতার আদি ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম এ সম্পর্কে অং সান সুচি[১৫] বলেন, 'পৃথিবীর সভ্যতা ধর্মের উপরই দাড়িঁয়ে আছে। সুতরাং অনেকগুলো সুসংগঠিত জনসমষ্টির সমন্বয়, যার প্রাথমিক একক হচ্ছে পরিবার। কারণ পরিবারগুলোই মানব সভ্যতার প্রজনন কেন্দ্র। আর এই পরিবার গঠিত হয়ে একজন পুরুষ এবং একজন নারীর বৈধ দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত্তিতে, যাকে বিবাহ বন্ধন বলা হয়। ধর্মের মাধ্যমে পারস্পারিক সর্ম্পক ও সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয়। সুতরাং সভ্যতা বলতে, অজ্ঞ, অবহেলিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত অবস্থা থেকে উন্নতর অবস্থার জন্য উন্নত বাসযোগ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা, সভ্য-সামাজিক, নৈতিক মূল্যবোধ এবং অর্থনৈতিক অবস্থায় পরিবর্তনকে বুঝায়।

গ. ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সভ্যতা সুরক্ষায় শিশুর ভবিষ্যৎ

আজকের শিশুরাই মানব সভ্যতার রক্ষাকবচ। অথচ চলমান বিশ্বে অসংখ্য শিশু মৌলিক অধিকারসমূহ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশেষ করে দারিদ্র জনগোষ্ঠীর শিশুদের মৌলিক মানবাধিকার তথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং সুশিক্ষার অধিকার অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে এবং শিশুরা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ নষ্ট, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, শিশুপাচার, যৌন নির্যাতান, মাদকাসক্ত এবং সন্ত্রাসের মত জঘন্যতম কাজে শিশুকে জড়ানো হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো বর্তমান আধুনিক বিশ্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে শিয়াল কুকুরের সাথে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া খাবার থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব তার ক্ষুধা নিবারণ করতে দেখা যায় যাদেরকে আমরা টোকাই বা পথশিশু নামে চিনে থাকি। একটি নিষ্পাপ শিশুর দূর্দশার এমন জীবন-যাপন আমরা কেহই আশা করি না। সুতরাং আমাদের সকল পর্যায়ের অভিভাবকদের সামান্য সচেতনে সকল সম্ভাবনা আশ্রয় ও শিশুদের সম্পদে পরিণত করা যায়। শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত হলে দেশ ও জাতির উন্নত সুরক্ষা সম্ভব। মানব সভ্যতা সুরক্ষায় শিশুর ভবিষ্যৎ শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুসারে এ প্রবন্ধটি যথার্থ নির্বাচন।

১. মানব সভ্যতা সুরক্ষায় ইসলাম

পৃথিবী নামক সভ্যতার জগতে মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব থেকেই মৌলিক অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ইসলাম শিশুর সেইসব অধিকার সুরক্ষায় নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। শিশুর অধিকার প্রদান ও সংরক্ষণে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইসলামী জীবন দর্শনে মানব শিশুর জন্মের পবিত্রতা, নিরাপত্তা, প্রতিপালন, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং আদর্শ মানবরূপে গড়ে তোলার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছে। মানব শিশু, মানব বংশধারা, অস্তিত্ব রক্ষা ও বিস্তারের ভিত্তি ভূমি হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সুখী দাম্পত্য জীবন। এই দাম্পত্য জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতির বংশ বিস্তার ও মানব সভ্যতা রক্ষার অগ্রায়ণ। আল্লাহ তায়ালা মানব সভ্যতা সৃষ্টি করে জাতিবন্ধন সম্পর্কে সতর্কতার কথা বলে কিভাবে তা ছড়িয়ে দিয়েছেন তার বর্ণনা সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে-

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِه وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

“হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের সে প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে, তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রী এবং যিনি তাদের দুজন থেকেই বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট আবেদন কর, এবং সতর্ক থাকো জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।”[১৬]

আগামী দিনের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আল্লাহ তায়ালা একের পর এক স্বজাতীয়দের মধ্যে বংশবিস্তার করে গেছেন। বৃদ্ধি পেয়েছে মানব শিশু আর এ মানব শিশু ও সভ্যতাকে সুরক্ষা দেওয়া আমাদের অভিভাবকদের নৈতিক দায়িত্ব। এ সম্পর্কে আল-কুরআনের অন্যত্রে বলা হয়েছে,

جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ لَيْسَ

‘তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপভাবে প্রাণীকুলের মধ্য হতে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এবং এভাবেই তিনি তোমাদের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার করেন।’[১৭]

২. পবিত্র বিবাহ বন্ধন ও নেক সন্তান লাভের দোয়া

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার সুরক্ষা বলতে, ইসলামী শরীয়া মোতাবেক সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য এবং দ্বীনদারিত্বের ভিত্তিতে বৈধ বিবাহ বন্ধনের সম্পর্কের মাধ্যমে আবদ্ধ নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বংশ রক্ষা। আর এ মানব বংশধারা টিকিয়ে রাখতে হলে শিশু সন্তানের কোন বিকল্প নেই। যেহেতু পরিবার হচ্ছে সমাজ জীবনের প্রথম স্তর, সুতরাং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আল্লাহর কাছে নেককার সন্তানের জন্য দোয়া প্রার্থনা করা পিতা মাতার দায়িত্ব। মানুষ যতই ধন-সম্পদের মালিক হোক না কেন সন্তান জন্মদানের কোন ক্ষমতা রাখেনা এবং কোন পীর, মুরীদ, দরবেশ, ওলী-আওলিয়ার পক্ষেও সম্ভব না। সন্তান দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ, তার কাছেই চাইতে হবে। ছেলে হবে না মেয়ে হবে সব ফয়সালা তার হাতেই। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ

‘আল্লাহর জন্যই আসমান ও জমিনের রাজত্ব, তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছে পুত্র সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছে উভয় দান করেন, আবার যাকে ইচ্ছে তিনি নিঃসন্তান রাখেন[১৮]।

জন্মগত বৈধতা প্রদান ও আদর্শ পরিবারে প্রতিপালন হওয়া শিশুর ন্যায্য অধিকার। যেমন, বৃদ্ধ বয়সে হযরত যাকারিয়া আ. ও হযরত ইব্রাহীম আ. সহ বহু নবী-রাসূল নেককার সন্তানের জন্য দোয়া করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক পিতা-মাতার উচিত শরীয়া সম্মত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নেক ও কর্মশীল সন্তান লাভের জন্য কুরআনুল কারীমের আলোকে সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া করা। যেভাবে হযরত ইব্রাহিম আ. দোয়া করেছিলেন, رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

“হে আল্লাহ আপনি আমাকে নেক কর্মশীল সন্তান দান করুন।”[১৯]

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে নিঃসন্তান পিতামাতাকে সুসন্তান কামনায় আল্লাহ তায়ালা প্রার্থনা শিখিয়েছে এভাবে-

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

‘হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তান দান কর যারা আমাদের জন্য চক্ষুশীতলকারী হয় এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের অগ্রগামী বানাও।[২০]

হযরত যাকারিয়া আ. সুসন্তানের আশায় আল্লাহর কাছে যেভাবে দোয়া করেছেন কুরআনুল কারীমে তার বর্ণনা করেছে, رَبِّ هَبْ لِيْ مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

‘হে আমার প্রভু! তুমি তোমার নিকট থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান দান কর।’[২১]

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক দাম্পত্যের সুখী-সমৃদ্ধ জীবনে মানব শিশু জন্মদানের মাধ্যমে বংশবিস্তার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরী করে থাকেন এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেছেন,

وَهُوَ الَّذِىۡ خَلَقَ مِنَ الۡمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهۡرًا ‌ؕ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيۡرًا

"তিনিই মানুষকে পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সমন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।"[২২] এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقۡنٰكُمۡ مِّنۡ ذَكَرٍ وَّاُنۡثٰى وَجَعَلۡنٰكُمۡ شُعُوۡبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوۡا

"হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার।"[২৩]

৩. জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা ভ্রূণ হত্যা মানব সভ্যতা সুরক্ষার পরিপন্থী

আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীতে মানব জাতিকে পাঠিয়েছেন তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। কিয়ামত পর্যন্ত এ মানব জাতিকে টিকিয়ে রাখতে সন্তান-সন্ততি ও বংশ বিস্তারের জন্য নারী পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের বিধান দান করেছেন। তবে আধুনিক সমাজে নারী পরুষ উভয়েই জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। এখানে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলতে মহিলাদের গর্ভাবস্থা প্রতিরোধে গর্ভধারণের ক্ষমতা ও সম্ভাবনাকে হ্রাস করতে ব্যবহৃত যে কোন কৌশল বা পদ্ধতিকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বলা হয়।[২৪] গর্ভধারণ প্রতিরাধের এক বা একাধিক কর্মপ্রক্রিয়া, সংযত যৌনাচার অথবা ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে গর্ভধারণকে বাধাগ্রস্থ করা হয়।[২৫] এটাকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ, গর্ভবিরতীকরণ, গর্ভনিরোধ, প্রজনন নিয়ন্ত্রণ এবং Birth Control ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এটা বর্তমান সমাজে বহুল প্রচলিত Family Planning বা 'পরিবার পরিকল্পনা' এর একটি প্রধানতম অংশ, যা মানব সভ্যতা সুরক্ষার পথে প্রতিবন্ধক। অথচ আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন, وَقَدِّمُوۡا لِاَنۡفُسِكُمۡ "তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা কর।"[২৬] ভ্রূণ যে অবস্থায় থাকুক তা শরীয়া অনুমোদিত কারণ ছাড়া হত্যা করা নিষিদ্ধ। কেননা, আল-কুরআনে এরশাদ হচ্ছে,

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الۡاَرۡضِ لِيُفۡسِدَ فِيۡهَا وَيُهۡلِكَ الۡحَـرۡثَ وَالنَّسۡلَ‌ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الۡفَسَادَ

"যখন যে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শষ্যক্ষেত্র ও 'নসল' বা বংশধারা নিপাতের চেষ্টা করে"।[২৭]

জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি একান্ত প্রয়োজনে বৈধ হলেও স্থায়ী পদ্ধতি সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। সুতরাং মাতৃগর্ভে শিশুর ভ্রূণ হত্যার প্রতিবন্ধক না হয়ে তা মাতৃগর্ভে সুরক্ষার মাধ্যমে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা নিজেই শিশুর ভবিষ্যৎ তথা মানব সভ্যতার সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে একদম শিকড় থেকে শিশুর ভ্রূণকে বিকাশের কয়েকটি ধাপ নির্ধারণ করেছেন। যেমন- ক) মাটির সার নির্যাস[২৮], খ) ডিম্বানুতে শুক্রাণুর অবস্থান গ্রহণ[২৯], গ) আলাকাহ বা রক্তপিন্ড [৩০], ঘ) মুদগাহ বা মাংসপিন্ড রূপে অবস্থান[৩১], ঙ) মাংসপিন্ডের সাথে সংযুক্ত করার জন্য হাড় তৈরি [৩২], চ) মাংসপেশী গঠন[৩৩], ছ) এবং পরিশেষে শিশুর পূর্ণাঙ্গ আকৃতি গঠন।[৩৪]

অর্থনৈতিক অভাবগত এবং জনসংখ্যা হ্রাসের কারণেই এখন জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাও আবার রাষ্ট্রীয়ভাবেই ফলাও করে প্রচার করা হয় এবং সকলকে বিজ্ঞাপন, লিফটলেট, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে এ গর্হিত কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হলেও স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোন ধরনের জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি অবলম্বন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[৩৫] এছাড়া গৌতম বোদ্ধ বলেছেন,"জীব হত্যা মহাপাপ"[৩৬]। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন,

وَلَا تَقۡتُلُوۡۤا اَوۡلَادَكُمۡ خَشۡيَةَ اِمۡلَاقٍ‌ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُهُمۡ وَاِيَّاكُمۡ‌ؕ اِنَّ قَتۡلَهُمۡ كَانَ خِطۡاً كَبِيۡرًا

"তোমরা দারিদ্রতার ভয়ে তোমাদের সন্তানকে হত্যা করোনা। আমি তাদেরকে রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।"[৩৭]

মানবতা ও মানব সভ্যতার জয়যাত্রা এ পৃথিবীতে শুরু হয়েছিল একজন মানুষ দিয়ে। পরে তারই অংশ থেকে তার জোড়া তথা স্ত্রী সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর এ দুজনের পবিত্র দাম্পত্য জীবনের ফলে বিশ্বময়

অসংখ্য পুরুষ ও নারী অস্তিত্ব লাভ করেছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, মানব বংশধারার বিস্তার ও মানব সভ্যতা সুরক্ষায় হচ্ছে শিশুর সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ। পৃথিবীতে মানবজাতির বসবাস তথা মানব সভ্যতাকে সুরক্ষার জন্য শিশুদের সুন্দরভাবে লালনপালন করতে হবে। তাদের সামাজিক, পারিবারিক এবং ধর্মীয়ভাবে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এ আদর্শ শিশুর উৎপত্তিস্থল হচ্ছে পুরুষ-নারীর দাম্পত্য জীবন। এই দাম্পত্য জীবনকে তথা নারীকে কুরআনুল কারীমে ক্ষেত্রস্বরূপ উল্লেখ করে বলা হয়েছে- نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ফসল ক্ষেত্র।"[৩৮]

ক্ষেত বা খামারে চাষাবাদ ও বীজ বপনের লক্ষ্য হচ্ছে ফসল উৎপাদন, বিশেষ একটি ফসলের বংশবৃদ্ধি ও বংশের ধারা রক্ষা। অনুরূপভাবে স্ত্রী লোকেরা মানব-বংশরূপ ফসলের জন্য ক্ষেত্র স্বরূপ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব বংশের বিস্তার ও অস্তিত্ব রক্ষা তথা মানব সভ্যতার সুরক্ষা।

৪. মানব সভ্যতা সুরক্ষায় শিশুর বিকাশ

শিশুর বিকাশের দু'টি দিক। যথা- ১. শারীরিক বিকাশ, ২. মানসিক বিকাশ।

১. শারীরিক বিকাশঃ শারীরিক বিকাশ বলতে, শিশুর দৈহিক উন্নতি ও সুস্থ্যতা। একটি শিশুর দেহের আকার, আয়তন, ওজন ও উচ্চতার স্বতঃস্ফুর্ত ও স্থায়ী পরিবর্তনই হল বৃদ্ধি বা শারীরিক বিকাশ। বয়সের বৃদ্ধির সাথে শারীরিক বৃদ্ধি একদম স্বাভাবিক। কিন্তু শিশুর বয়স পরিণত হবার আগেই আমরা শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং তাড়াতাড়ি হাঁটতে শেখানোর জন্য বিভিন্ন ধরণের আধুনিক জিনিসপত্র ব্যবহার করে থাকি। যার অন্যতম হল বেবি ওয়াকার। বিশ্ববিখ্যাত শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক জার্নাল 'আমেরিকান অ্যাসোসিয়েসন অব পেডিয়াট্রিক্স' বেবি ওয়াকার ব্যবহারের ক্ষতির দিক বিবেচনা করে এটাকে শিশুর জন্য 'ডেঞ্জারাস চয়েস' বলে আখ্যায়িত করেছেন। বেবি ওয়াকার নিয়ে গবেষণার ভিত্তিতে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব পেডিয়াট্রিক্স' জানিয়েছে, "বেবি ওয়াকার ব্যবহার করলে শিশুর পেশি ও হাঁড়ের স্বাভাবিক গঠন বাধাগ্রস্ত হয়। এতে শিশুর পেশি ও হাঁড়ের গঠন যতটা সমৃদ্ধ হওয়ার কথা ততটা হয় না। এর ফলে শিশু ভবিষ্যতে বড়ধরণের ক্ষতির সম্মুখ হতে পারে।"[৩৯]

২. মানসিক বিকাশঃ মানসিক বিকাশ বলতে, জন্মের পর থেকে শিশুর জীবনব্যাপি সামগ্রিক গুণগত পরিবর্তনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গের ব্যবহারের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, আচার-আচরণ, ভাষার প্রকাশ, বোধশক্তি, অনুভূতি, ভাবের আদান প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্রমিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়া। শিশুর মেধা বিকাশের চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।[৪০] যেমন-

ক. মায়ের ভূমিকাঃ শিশু মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময়ে মায়ের খাদ্যাভাস, যত্ন, পরিচর্যা ও সুন্দর মানসিকতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গর্ভাবস্থায় মা যদি পুষ্টিহীন থাকে সন্তান রুগ্ন, ওজন ও উচ্চতা কম নিয়ে জন্মাবে। এজন্য সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃগর্ভের সঠিক যত্ন নিতে হবে। মাতৃগর্ভ থেকেই শিশুর বিকাশে মাতা-পিতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যেমন- গর্ভবর্তী মাকে দুশ্চিন্তা ও প্রফুল্ল মনে থাকা, পুষ্টিকর খারার সরবরাহ ও আধুনিক চিকিৎসাসেবা প্রস্তুত, সংযত চলাফেরা করা, মায়ের গীবত ও মিথ্যাচার থেকে দূরে থাকা, মায়ের ভালো কাজ যেমন ইবাদতে ব্যস্ত থাকা, নবজাতকের আগমনে আনন্দ ও শুকরিয়া প্রকাশ করা, শিশুর কানে আযান দেয়া, তাহনীক করা, নামকরণ করা, আকীকা করা, পূর্ণ দু'বছর মায়ের দুধ পান করানো ইত্যাদি।[৪১]

খ. পরিবারের ভূমিকাঃ শিশুর ভবিষ্যৎ সুরক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। শিশুদের আদর স্নেহ করা, তাদের সাথে গল্প করা, খেলাধুলা করা, ছড়া, কাবিতা ও ইসলামি সঙ্গীত শোনানো, তাদের সাথে ভালো আচরণ করা। শিশুর নিরাপত্তা ও মতামতের গুরুত্ব দিতে হবে এবং শিশুকে মাঝে মাঝে বেড়াতে নেওয়ার মাধ্যেমে শিশুর বিকাশ ঘটে। খোলা মাঠ, মুক্ত আকাশ, বিশুদ্ধ বাতাশ শিশুর মনকে প্রফুল্ল করে। সুস্থ্য দেহ-সুস্থ্য মন এর জন্য চাই চিত্তবিনোদন। শিশুর সুস্থ্য থাকার জন্য ৫টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র রয়েছে।

যেমন- পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ভালো রাখা, সৃজনশীল খেলনার ব্যবহার, ছবি আঁকা, সংগীত চর্চা, এবং বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করা।[৪২]

গ. শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষকরা সবসময় শিশুর বুদ্ধিমত্তা বিকাশের গুরুত্ব দিবেন। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের ২৯নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'শিশুদের পাঠদানের লক্ষ্য হবে শিশুর ব্যক্তিত্ব, ধীশক্তি এবং মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ'।[৪৩] শিশুর মনের বিকাশ ঘটে তার পড়াশুনা, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা ও পরিণতির উপর নির্ভর করে। সততা, সহানুভূতি, ভালবাসা, সহযোগিতা ইত্যাদি নৈতিক গুণাবলী বিকাশ সাধন করে থাকে, যা শিশুর উচ্চ মূল্যবোধের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে।

ঘ. প্রশাসনিক ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ

শিশুর প্রতি সংবেদনশীন হওয়া, বাড়িতে এবং বিদ্যালয়ের শিশু পরিবেশ বান্ধব পরিবেশ, ভালো কাজে উৎসহিত করা, যেমন- সিজদাহ তথা নামাজ, পর্যাপ্ত ঘুমের সুযোগ দেয়া এবং শিশুর সামনে ধূমপান ব্যবহার না করা। প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুনসহ সমসাময়িক বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করা।

৫. সন্তানের প্রতি পিতার-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামী জীবন দর্শনে মানব সন্তান হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নিয়ামত। পিতা-মাতার চোখ জোড়ানো ধন, যা নিষ্পাপ হয়ে পৃথিবীতে পদার্পন করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 'ধনৈশ্বর্য এবং সন্তান-সন্তুতি পার্থিব জীবনের শোভা।'[৪৪]

শিশুর ভবিষ্যৎ সুরক্ষার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সদা-সচেতন থাকতে হবে। সন্তান জন্মের পরতার প্রতিপালনের ব্যাপারে পিতামাতা উভয়েরই বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। তাদের উচিত সন্তানদের প্রত্যেকটি বিষয়ে সমান সতর্ক দৃষ্টি রাখা। কুরআন ও হাদীসে শিশুর চরিত্র গঠনের ব্যাপারে তথা আখলাকে যমীমা (দুষ্ট চরিত্র) ও আখলাকে হামীদার (উত্তম চরিত্র) প্রতি জোর তাগিদ দিয়েছে। রাসূল সা. বলেছেন, مَنْ وَلِدَلَهُ وَلَدٌ فَلْيَحْسِنْ إِسْمَهُ وَادَبَهُ

"কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে যেন তার সন্তানের সুন্দর একটি নাম রাখে এবং উত্তমরূপে আদব-কায়দা, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়।"[৪৫]

এ সম্পর্কে হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে; রাসূল সা. এরশাদ করেছেন, "কোন পিতা তার সন্তানকে উত্তম আদব শেখানোর চাইতে আর কোন মূল্যবান পুরস্কার দিতে পারে না।"[৪৬]

সন্তান প্রতিপালন সাওয়াবের কাজ এতে কোন সন্দেহ নেই, তবে এমনভাবে প্রতিপালন করতে হবে যাতে মানব সভ্যতা সুরক্ষিত হয় এবং নিশ্চিত হয় সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সন্তানকে সহজ, সুন্দর এবং সৎ পথে প্রতিপালন করাই হবে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সন্তানকে সুশিক্ষা দান এবং তার যথাযথ ভরণপোষণ দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন,

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ "জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা।[৪৭]"

মানবশিশুর সঙ্গে বাবা-মায়ের সম্পর্ক হবে অত্যন্ত গভীর স্নেহ-মমতা ও ভক্তি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাদের চাহিদা শুধু ভাল পোশাক কিংবা খাবার নই, তাদের মনের স্নেহের চাহিদা মেটানো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল সা. আরো বলেন,"স্নেহ ভালোবাসা পাওয়া শিশুদের অধিকার"।[৪৮] তবে সন্তান যদি সঠিক স্নেহ-ভালোবাসায় গড়ে তোলা না যায় তাহলে তা হবে পিতামাতার জন্য ফিতনাস্বরূপ। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

"আর জেনে রাখ, 'তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হচ্ছে একটি পরিক্ষা।"[৪৯]

এভাবে মানব শিশুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের সর্বপ্রথম অবদান হল শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার সুনিশ্চিত করা। যেমন-স্বাস্থ্য সুরক্ষা, খাদ্য-পানীয়, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাক স্বাধীনতার সুযোগ দেয়া এবং বাস উপযোগী

সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা, সন্তানকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা, তার মতামতের গুরুত্ব দেওয়া, শিশুর বন্ধুমহল তথা কার সাথে মিশে কোথায় যায় সার্বক্ষণিক খোঁজখবর ও দেখাশুনা করা, শিশুর ব্যক্তিগত ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয় সম্পর্কে সু-পরামর্শ দেয়া, শিশুস্বাস্থ্যের যত্ন নেয়া সম্পর্কে সচেতন করা, পুষ্টিকর খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত বাসযোগ্য পরিবেশের সুযোগ করে দেওয়া পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। ইসলামী নিয়মনীতি অনুসারে শিশু-সন্তানের খাওয়া দাওয়া, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছেদ, চিকিৎসা, প্রতিপালন এবং শিক্ষা-দীক্ষার তত্ত্বাবধায়ন প্রতিটি মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক।[৫০] সন্তানের প্রতি পিতামাতার বহু দায়িত্ব রয়েছে, এ দায়িত্বের উপরই শিশুর সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। কিন্তু আধুনিক সমাজব্যবস্থায় কিছু ভিন্ন চিত্র লক্ষ্য করা যায়। যেমন- সন্তানের সাথে বাবা-মায়ের সম্পর্ক ভালো না, পিতামাতা সন্তানের দায়িত্ব নিতে চায় না, সন্তানও বাবা-মায়ের ভরণ-পোষণ বা দেখাশুনা করে না। মা-বাবার হতে সন্তান খুন হয়, সন্তানের হাতে বাবা-মাকে খুন হয়। এমনকি পিতামাতা তাদের সন্তানকে, অপরদিকে সন্তানও তার পিতামাতাকে ঘর থেকেও বের করে দেওয়ার মত অনেক ঘটনা ঘটে থাকে। এটা শিশুর প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব অবহেলা, পারিবারিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ না থাকা একমাত্র দায়ী। সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে বৈষম্যহীনভাবে কন্যাকে সৎ পাত্রে পাত্রস্থ করা, আর ছেলে হলে সৎ পাত্রীস্থ করা পিতামাতার অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। ফিকহবিদদের মতে, শিশুর প্রতিপালনের মেয়াদ ৭ বছরই যথেষ্ট। কেউ বলেন, ৯ বছর। আবার কারো মতে, ১১ বছর পর্যন্ত তথা বয়ঃসন্ধিক্ষণ পর্যন্ত। অর্থাৎ পুত্র সন্তান বড় না হওয়া পর্যন্ত আর কন্যা সন্তানের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সামর্থ্য অনুযায়ী পিতার উপর বর্তায়।[৫১] এ সম্পর্কে রাসূল সা. বলেছেন,

مَا نَحَلَ وَالِدُهٗ مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلِ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ

“পিতামাতা সন্তানকে ভাল আদব-কায়দা ও স্বভাব-চরিত্র শিক্ষাদান অপেক্ষা উত্তম কোন শিক্ষাদান দিতে পারেনা।”[৫২]

শিশুর ভবিষ্যৎ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বাবা-মা ও ছেলে মেয়ের সাথে এক গভীর সুসম্পর্ক, স্নেহ-মমতা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং আর্থিক প্রয়োজন পূরণে পারস্পারিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সার্বিক বিষয় সম্পর্কে রাসূল সা. বলেছেন, “তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্ববান এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”[৫৩] সুতরাং মানবসভ্যতা সুরক্ষায় পিতামাতার ভূমিকা অপরিসিম।

৬. মানব সভ্যতা সুরক্ষায় শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা

শিক্ষাব্যবস্থা দু'ধরনের-পারিবারিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। যদিও ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে শিশুদের শিক্ষার সামাজিক ও পারিবারিক কোন মর্যাদাই ছিল না, ছিল না কোন অধিকার। কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর শিশুদের সকল মর্যাদা সুনিশ্চিত হয়েছে এবং তাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাদের পিতামাতার উপর। আরবীতে একটি প্রবাদ আছে ‘মাতৃক্রোড়ই শিশুর প্রথম বিদ্যালয়’। এজন্য ছোট থেকেই শিশুকে সঠিক ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা দিতে হবে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানব শিশুর সাথে পিতা-মাতা ও অন্যান্য অভিভাবকের আচরণ হবে দায়-দায়িত্বের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ মানবিক। বড়দেরকে শ্রদ্ধা এবং ছোটদের স্নেহ করার মত মানবিক গুণাবলী সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। মিথ্যা না বলা, অন্যের প্রতি অপবাদ, পরনিন্দা, গীবত, হিংষা এবং আত্ম-অহংকার না করার শিক্ষা দেওয়া, আত্ম মর্যাদাবান, কর্মকুশলী, দক্ষ, সুশীল, ন্যায়পরায়ণ, শৃঙ্খলানুবর্তী হওয়া সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া, ইন্টার্নেট মোবাইল গেমে আসক্ত হতে না দেওয়া, সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন ফেসবুক, ইমো, লাইকি, টিকটক, স্লেপচ্যাট, ইন্সটাগ্রাম এবং ইউটিউব ব্যবহার সচেতনতা তৈরি করে প্রযুক্তির অপব্যবহার না করার পরামর্শ দেয়া। চলমান প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বুকার পুরস্কার বিজয়ী ব্রিটিস লেখক হাওয়ার্ড জ্যাকবসন বলেন, ‘ইন্টানেটসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আধিপত্যের কারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিশুরা অশিক্ষিত হয়ে পড়বে। তিনি বলেন, আগামী ২০ বছরের মধ্যে এমন শিশু পাবো যারা পড়তে পারবে না, মূর্খ বানাবে ফেসবুক-টুইটার’।[৫৪] এভাবে শিশুর

ভবিষ্যৎ মানব সভ্যতা সুরক্ষা বিঘ্নিত হবে। শিশুর শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অবৈধ পদ্ধতিতে শিক্ষা অর্জন, ব্যবসা ও অপসংস্কৃতির মাধ্যমে হারাম উপার্জন না করা, সুদ, ঘুষ, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই না করার পরামর্শ দেওয়া। এবং আদর্শ মানুষরূপে সন্তানের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক সুশিক্ষা-ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুকে আধুনিক শিক্ষায়ণে সুনাগরিক ও সৎ চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলতে পারিবারিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আল কুরআনে বর্ণিত হযরত লুকমান আ. তার সন্তানের প্রতি দেওয়া শিক্ষামূলক উপদেশসমূহ উপস্থাপন করা হল। যেমন يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ-

‘হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক কর না, অবশ্যই শিরক চরম জুলুম।’[৫৫]

এরপর তিনি নামায ও সৎকাজের প্রতি আদেশ করে বলেছেন যা আল্লাহ তায়াল আল-কুরআনের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন,

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

“সালাত কায়েম করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করবে, এটাই দৃঢ় সংকল্পের কাজ।”[৫৬]

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

“অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উশৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করো না। কারণ আল্লাহ উদ্ধত বিশৃঙ্খলা অহংকারকে পছন্দ করেন না।”[৫৭]

শিশুরা মানব সভ্যতার রক্ষাকবচ এজন্যই Napolean Bonapart[58]বলেছেন, Give me an educated mother, I will give you an educated nation. প্রত্যেক মানবশিশু মানুষ না, তাদেরকে মানুষ বানাতে হয়। আজকের শিশুকে আগামী দিনের অভিভাবক নিশ্চিত করার আগে তার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানব শিশুকে মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই।

৭. মানব সভ্যতা সুরক্ষায় শিশু স্বাস্থ্যের যত্ন

প্রবাদ আছে, Prevention is Cheaper than cure. ‘রোগ প্রতিরোধ হচ্ছে নিরাময়ের চাইতে সস্তা।’ একটা শক্ত মজবুত ইমারত তৈরি করতে হলে শক্ত মজবুত ভিত্তির প্রয়োজন। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি হল শিশুকাল। এ সময় দেহ ও মনকে রোগমুক্ত রাখলে পরিণত বয়সে একজন সুস্থ্য-সবল মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে পারবে। জন্মের পর থেকে শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে প্রথম সোপান হল মাতৃদুগ্ধ দান। শিশুর সুস্থ্যতার কথা বিবেচনা করে আল্লাহ বলেন, ‘মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু’বছর দুধ পান করাবে।’[৫৯] আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে-সন্তান যখন মায়ের গর্ভে থাকে, তখন মায়ের হরমন সন্তানের শরীরেও প্রভাবিত হয়। গর্ভাবস্থায় মায়েদের আবেক অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা কার্যক্রম সবকিছুই তার গর্ভে থাকা সন্তানের ব্রেইনে সঞ্চারিত হয়।[৬০] মা ভালমন্দ যে কাজই করুক বা বলুক তা সন্তান অনুকরণ করে থকে। আজকের একজন সুস্থ্য শিশু আগামী দিনের একজন সুস্থ্য নাগরিক এটা সম্পূর্ণই মায়ের উপর নির্ভর করে। একটি সুস্থ্য মানবজাতি গঠনে শিশু স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়া জরুরী। রাসূল সা. বলেন, বান্দাকে কিয়ামতের দিন তাকে নি‘য়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, ‘আমি কি তোমাকে শারীরিক সুস্থ্যতা দেইনি’?[৬১] সুতরাং শিশু স্বাস্থ্যের যত্নের ব্যাপারে মানব সভ্যতা বিনির্মাণে আধুনিক চিকিৎসা সেবাও উন্নত হওয়া দরকার।

৮. পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সুরক্ষা

জন্মগতভাবেই মানুষের পারিবারিক জীবনের মাধ্যমেই সামাজিক জীবনের সূচনা হয়। কাজেই আদর্শ সমাজ গঠনে একটি আদর্শ পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। জন্মের মুহূর্ত থেকেই যথাযথ প্রতিপালন ও পরিচর্যা লাভ শিশুর মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। ইসলামের আইনে শিশুর পরিচর্যা ও যথাযথ প্রতিপালন তার

পিতামাতা, প্রতিবেশি, আত্মীয়-স্বজন এবং অভিভাবকের অবশ্য কর্তব্যরূপে নির্ধারিত। পরিবারেই সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার ভিত রচিত হয়। শিশু সর্বপ্রথম প্রভাবান্বিত হয় তার পরিবার তারপর প্রতিবেশির উপর। কেননা, শিশু তার আচার আচরণে তাদেরকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করে। তাই সন্তানদের সামনে সুন্দর চরিত্র ও উত্তম আচরণ প্রকাশ করাই পিতামাতার কর্তব্য। এ সম্পর্কে রাসূল সা. বলেছেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদের মহৎ করে গড়ে তোলবে এবং তাদের আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে।[৬২] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

"তোমরা তোমাদেও পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্থ, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির, এবং অধিকারবুক্ত দাসদাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।"[৬৩]

একটি জাতি হলো তার পরিবারগুলোর নারী-পুরুষের সমষ্টি। আমরা যদি একটি জাতিকে বদলাতে চাই কিংবা শিশুর ভবিষ্যৎ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চাই, তাহলে আমাদের ঘরগুলোকে বদলাতে হবে আগে, বদলাতে হবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবারিক সংস্কৃতি এবং সমাজিক কুসংস্কার। শিশু সামাজিক ও পারিবারিকভাবে যেন কোন হয়রানি বা নির্যাতনের স্বীকার না হয়। শিশুপাচার, যৌন হয়রানি এবং মাদকসেবন বন্ধ করতে হবে। একটি শিশু পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নিরাপত্তাহীন ও ঝুঁকির মধ্যে থাকার মানে হলো একটি পরিবার তথা শিশুর ভবিষ্যৎটাই পুরো ঝুঁকির মধ্যে। পরিবার সমাজ এবং শিশুর ভবিষ্যত পরিবর্তন আনার জন্য আমাদের নিজেদের আগে পরিবর্তন আনতে হবে। এ সম্পর্কে আল কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, اِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ

"আল্লাহ তায়ালা কোন জাতির অবস্থা নিশ্চয়ই পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের পরিবর্তন করে।"[৬৪]

সুতরাং মানব সভ্যতা বিনির্মাণে এবং শিশুর ভবিষ্যৎ আলোকিত করতে সামাজিক ও পারিাবারিক ভূমিকা অপরিসীম। এজন্য খেয়াল রাখতে হবে আর কোন শিশু যেন এতিম, পথশিশু না থাকে তাকে সামাজিক পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। এ সম্পর্কে **১৯৮৯** সালে পিলু খানের সুরে শিশুদের নিয়ে গানটির কথা বলা যায়। যেমন,

"আজ যে শিশু পৃথিবীর আলোয় এসেছে আমরা তার তরে একটি সাজানো বাগান চাই
রেল লাইনের পাশে নয়, অন্ধকার সিঁড়িতে নয়-প্রতিটি শিশু মানুষ হোক আলোর ঝর্ণাধারায়
হাসি আর গানে ভরে যাক সব শিশুর অন্তর-প্রতিটি শিশু ফুলেল হোক সবার ভালবাসায়।[৬৫]"

৯. মানব সভ্যতা সুরক্ষায় অর্থনৈতিক ভূমিকা

ধন-সম্পদ আল্লাহর দেওয়া যেমন নেয়ামত, অনুরূপভাবে সন্তান-সন্ততিও। সম্পদ অন্যায় পথে ব্যয় করলে যেমন আমানতের খিয়ানত হয়, তেমনি সন্তান-সন্ততিকে সামাজিক, পারিবারিক ও আর্থিকভাবে সহযোগিতা এবং পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে মর্যাদা ও গুরুত্ব না দিয়ে ভুল পথে কিংবা অন্যায় কাজে নিয়োজিত করলে আল্লাহর আমানতের খেয়ানত হবে। মুসলিম পারিবারিক আহিন **১৯৬১** অনুসারে সম্পত্তি বণ্টন হলেও ব্যক্তিগত রেশারেশি, পারিবারিক কলহ, পুরুষতান্ত্রিক অব্যবস্থাপনা, সম্পদ বন্টনের অজ্ঞতা ও সামাজিক কুসংস্কারের কারণে শিশুর সম্পত্তির উত্তরাধিকার নীতি পরিপূর্ণভাবে বাংলাদেশে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। ইসলাম এহেন মানবতা বিরোধী এ কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তানের মতই স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য সামাজিক ও পারিবারিকের পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে। যাতে সন্তান সমাজে-সংসারে অভাবগ্রস্থ না থাকে এবং ভবিষ্যতে কারো কাছে হাত না পাতে, রবং সমাজে সৎ ও আদর্শ নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে। মানব শিশুর অর্থনৈতিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায়

ইসলামের দিক নির্দেশনা অত্যন্ত সুন্দর, সুস্পষ্ট এবং সুনিশ্চিত। ইসলামই প্রথম শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার ঘোষণা করেছে। অভাব-অনটনসহ কোন অবস্থাতেই সন্তান গুম বা হত্যা করা যাবে না। এ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা -وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرًا

"অভাবের ভয়ে তোমরা তোমাদের শিশুদের হত্যা কর না, আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিজিক দান করি। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।"[৬৬]

সুতরাং মানব সভ্যতা সুরক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে উত্তরাধিকার সূত্রে তার প্রাপ্য সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে। কোনভাবেই এতিম ও অসহায় শিশুর সম্পদ ভোগ করা যাবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

'তোমরা একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায় অবৈধভাবে আত্মসাৎ কর না।'[৬৭]

আর স্বামী বা পিতার মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশীদার হবে স্ত্রী-কন্যাগণ। এ সম্পর্কে আল কুরআনে এরশাদ হচ্ছে,

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের একভাগ পাবে, যদি তোমাদের সন্তান না থাকে। তবে তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের আট ভাগের এক অংশ।"[৬৮] নিঃসন্তান ভাইয়ের সম্পত্তিতে বোনের অধিকার আছে।[৬৯]এমনকি নপুংসক বা হিজড়া সন্তান হলেও উত্তরাধিকার পাবে।[৭০] সুতরাং শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন সুরক্ষার ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছলতার ভিত তৈরি করতে ইসলামের সহজ সমাধান ও নমনীয় পদ্ধতির কোন বিকল্প নেই।

১০. মানব সভ্যতা সুরক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকা

একটি শিশুর সকল অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একজন সরকার প্রধানের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। একটি দেশ, জাতি এবং রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হচ্ছে শিশুরা। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ২৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের পাশাপাশি মাতা-পিতা বা তার অভিভাবক সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে শিশু উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।[৭১] রাষ্ট্রীয়ভাবে বেঁচে থাকা শিশুর অধিকার। এই অধিকার সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্র যে সকল জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যেমন- শিশু মৃত্যুর হার কমাতে হবে, সকল শিশুর জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে, পুষ্টিকর খাবার ও বিশুদ্ধ পানি এবং পরিবেশ দূষণ রোধে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া, মায়েদের গর্ভকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবা উন্নত করা, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং প্রতিরোধক স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন করা ইত্যাদি।[৭২] সুতরাং শিশু মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ যে ধর্মেরই হোক এবং যেমনই হোক দুস্থ কিংবা ইয়াতিম, প্রতিবন্ধি, বিকলাঙ্গ, উদ্বাস্তু, বাল্যবিবাহের স্বীকার অথবা সুবিধা বঞ্চিত পথশিশু কিংবা তৃতীয় জেনারেশন-হিজরা শিশুরাও যেন দেশের জন্য জনসংখ্যা না হয়ে জনশক্তি বা জনসম্পদে পরিণত হয় সে লক্ষ্যে রাষ্ট্র প্রধানদের সুদূরপ্রসারী কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আজ যারা শিশু তাদেরকে যদি আমরা সচেতন, সুস্থ-সুন্দর পরিবেশ লাভের সুযোগ তৈরি করে দেই, তাহলে তারা ভবিষ্যতে একজন আদর্শ, কর্মক্ষম এবং সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেছে, শিশুর উন্নত ভবিষ্যতের জন্য সন্ত্রাস, মাদক এবং জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রেখে শিশুদের জীবনকে আলোকিত ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলা আমাদের দায়িত্ব। শিশু অধিকার আইন, প্রতিবন্ধি ফাউন্ডেশন, প্রতিবন্ধি সুরক্ষা আইন, পারিবারিক সহিংসতা থেকে শিশুদের সুরক্ষা, নিরাপদ শিশু খাদ্য নিশ্চিতকরণের জন্য 'নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২০২৫' প্রণয়ন করেন।[৭৩] বাংলাদেশ শিশু অধিকার সনদের মূলনীতিগুলো হল-

ক. বৈষম্যহীনতা,

খ. শিশুর সবোত্তম স্বার্থ,

গ. শিশুদের অধিকার সমুন্নত রাখা পিতামাতার দায়িত্ব,
গ. শিশুর মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।[৭৪] সর্বশেষ এ চারটি মূলনীতি রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়নের ও প্রয়োগের মাধ্যমেও শিশুর ভবিষ্যৎ সুরক্ষা সম্ভব।

১১. মানব সভ্যতা সুরক্ষায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক পিছিয়ে থাকা দেশ। এদেশের শিশুরা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। দেশের সরকারী-বেসরকারী সংস্থাগুলো শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা ও বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু স্বদিচ্ছা, ন্যায়পরায়ণতার এবং আইনি সুশাসন ব্যবস্থার অভাবে সফল হতে পারে না, মাঝে মাঝে নামে মাত্র বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। বাস্তবায়নের নীতিমালা থাকলেও এর সঠিক কোন প্রয়োগ নেই। শিশুরা পৃথিবীতে নবীন অতিথি। তাদের চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ, অসহায় দৃষ্টি, পায়ে নেই চলার গতি, তাই তারা দেশের মানুষের কাছে ওদের স্নেহ ভালবাসার বুভুক্ষ হৃদয়ের প্রসারিত আহবান। বাংলাদেশের জনসম্পদ আজ শিশুগৃহে পরিত্যক্ত, ডাস্টবিনে সদ্য-নবজাতকের বেঁচে থাকার আকুতির কান্না কিংবা নিস্পাপ শিশুর নিথর কমল মরদেহটি ভাগাভগিতে কাক-পক্ষির কলহ, ইয়াতিম হলেই অনাথ, সন্তান আজ পথশিশু, কেউ ক্ষুধার তাড়নায় ছটপট করে, থাকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, পরনে নেই বস্ত্র, অসুখে ওষুধ নেই, ক্ষুধার অন্ন নেই। শিক্ষার কোন বালাই নেই, অধিকাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষায় গ্রহণের পূর্বেই ঝরে পরে। অধিকাংশ শিশুরাই দারিদ্র্য ও অপুষ্টির স্বীকার। দু-বেলা খাবার জোটাতে অন্যের গৃহে, বাসা বাড়ি, কারখানা, যানবাহনসহ হোটেল-রেস্টুরেন্টে কাজ করতে হয়। এভাবেই আমরা তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎটাকে অনিশ্চিতের মুখে ঠেলে দিচ্ছি। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে লেখক ও প্রাবন্ধিক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'শিক্ষা হবে সর্বজনীন, সহজলভ্য। শিক্ষা কোন পণ্য হতে পারেনা, এটা সব স্তরের মানুষের অধিকার। কিন্তু বাংলাদেশ হওয়ার পর শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমাগতভাবে পণ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার সর্বনাশের জন্য একমাত্র রাষ্ট্র দায়ী।'[৭৫] এ থেকে উত্তরণের পথ হচ্ছে শিশুর সার্বিক সুরক্ষার প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে তার সমাধান নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি ও সামাজিক কুসংস্কৃতি থেকে মুক্ত করে সন্তানদের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করতে হবে, প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে এবং ইসলামী বিধান আলোকে খাদ্য, বস্ত্র, সুশিক্ষা, সুচিকিৎসা, পরিবেশ বান্ধব বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করণের মাধ্যমে মানব সভ্যতা সুরক্ষায় শিশুর উজ্জল ভবিষ্যৎ তৈরি করা সম্ভব।

উপসংহার

কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য[৭৬] বলেছিলেন, "এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার"। আজকের শিশুরা আগামী দিনের আশা-ভরসার প্রতীক। স্বপ্নীল সকালের সোনালী সূর্য। শিশুরাই যে আগামী দিনের কর্ণধার এ কথা সবচেয়ে বেশী হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ সা.। প্রত্যেকটি মানুষের শিশুকাল অবধারিত, কেবলমাত্র হযরত আদম আ.ও হাওয়া আ. ব্যতীত অতীতের সকল মানুষই একদিন শিশু ছিলেন। আর পরবর্তী জীবনে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য তাদের পরিচর্যা ছিল অত্যাবশ্যক। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। সন্তানকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা এবং কন্যা সন্তান হলে সৎ পাত্রে পাত্রস্থ করা পিতামাতার অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। সারা জীবন বাবা-মা ও ছেলে মেয়ের সাথে এক গভীর সু সম্পর্ক, স্নেহ-মমতা, ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং আর্থিক প্রয়োজন পূরণে পরস্পর সহযোগিতায় এগিয়ে থাকুক। আর এ ক্ষেত্রেই মানব সভ্যতার সুরক্ষায় নিশ্চিৎ হবে শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। যেমন কবি গোলাম মোস্তফা[৭৭] তাঁর 'কিশোর' কবিতায় বলেছেন, ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে। (৬ষ্ঠ শ্রেনী পাঠ্য বই, ঢাকা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৯৪)। এ অভিব্যক্তি যথার্থই সত্য। মহানবী স. বলেছিলেন, "তোমরা সন্তানদেরকে উত্তম শিক্ষা দাও, কারণ তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্ট।" তিনি উপলদ্ধি করেছিলেন যুগের প্রয়োজন মত শিক্ষা না দিলে তারা পিছিয়ে পড়বে, আর সেটা হবে মানব সভ্যতা ধ্বংস করার শামিল। সুতরাং মানব সভ্যতা সুরক্ষার তাগিদে 'শিশুদের

জন্য চাই নতুন বিশ্ব' এ স্লোগানের ধারা বাস্তবায়িত করা। শিশুকে জনগন বা জনসংখ্যা নই বরং জনশক্তিতে রূপান্তর করতে হবে, আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলতে পারলেই নিশ্চিত হবে শিশুর উজ্জল ভবিষ্যৎ ও সুন্দর আগামী।

তথ্যনির্দেশ

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯ খ্রি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৬৬০।

২. ইবন মানযূর, মুহাম্মদ ইবন মুকাররাম আল-আফরীকী আল মিশরী, লিসানুল আরব, (বৈরূতঃ দার'সাদির, ১ম সংস্করণ, তা.বি.), ১১তম খন্ড, পৃ.১০৪; ড. শাহ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামে সন্তান লালন পালন, (ঢাকাঃ সোনালী সোপান প্রকাশন, ২০১২ খ্রি.), পৃ.১৯; মোঃ মনোয়ার পারভেজ মুন্না, ইসলামে শিশুর মৌলিক অধিকারঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, (ঢাবিঃ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ২০১৪ খ্রি.), পৃ.৯১।

৩. Webster's New Twenty Century Dictionary Unabridged, 2nd ed, William Collins Publishers. Inc-1979, p. 313.

৪. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ৮ম পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারী ২০০৭, ২০১১), পৃ. ১০৮২।

৫. বাংলা বিশ্বকোষ, (ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৭৫ খ্রি.), পৃ- ৪৬৯।

৬. ইবনে মানযুর, *লিসানুল* আরব; (বৈরুতঃ লেবানন, ১১তম খন্ড), পৃ. ৪০১, তারবিয়াতুল তিফলি ফিল ইসলাম, পৃ. ১৪; তাজুল উরূস, ১৫তম খন্ড, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪। শামীমা আখতার, ইসলামের আলোকে মা ও শিশুঃ দায়িত্ব ও কর্তব্য, (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ আরবী বিভাগ, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, খ্রি. ২০২০), পৃ. ৭০।

৭. Shorter Oxford English Dictionary, (Newyork, Oxford University press, v-1,15th ed,A-M, 1993), p-393. উইলিয়াম কেরীর Dictionary of Bangali Language এ শিশুকে Infant বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে- Child form child to go by leaps, a child, an infant, a boy under eight years of age."

৮. আল-কুরআর, সূরা আন নিসা, আয়াত ৬। [অর্থাৎ যে পর্যন্ত না তারা এয়াতিমদেরকে যাচাই করবে।]

৯. আল-কুরআন, সূরা আল হজ্জ, আয়াত ৫।

১০. মাওলানা মুফতী আহমদ শফী, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, মহীউদ্দীন খান অনূদিত, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭।

১১. মোঃ আনছার আলী, শিশু বিষয়ক আইন, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ল'বুক কোম্পানী, বাংলাবাজার, ২য় সংস্করণ), পৃ. ৬৪-১১৯; মোঃ সানাউল্লাহ, ইসলাম ও বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১, (ঢাবিঃ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, এমফিল অভিসন্দর্ভ, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৯।

১২. ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশ শিশু ও তাদের অধিকার, (ঢাকাঃ ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ১৯৭৭খ্রি.), পৃ. ৯; মোঃ মনোয়ার পারভেজ মুন্না, ইসলামে শিশুর মৌলিক অধিকারঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৯১।

১৩. জাতিসংঘ সনদে ১নং ধারায় শিশু সম্পর্কে বলা হয়েছে Child is defined in the UN convention on the right of the child (drd) as a person the age of 18. This includes infancy, early childhood, middle childhood and adolescence. Ahmaduzzaman, International Human Right Law, (Shams Publication, April 2008), P. 09; ক্লাস্টার, রাইটস, শিশু অধিকার, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, (ঢাকাঃ ইউনিসেফ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৮। মোটকথা, আন্তর্জাতিক আইনে তথা জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এবং মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ এর সাবালকত্ব আইন ধারা-৩ এ ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক মানব সন্তানকে শিশু হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে যা একেবারেই অযৌক্তিক নয়। তবে ইসলামী শরীয়তে শিশু- সাবালকত্বে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত, যে বয়সে পৌছানোর পূর্বে মানব সন্তান ভাল মন্দ বুঝতে পাওে না এবং শরীয়তের বিধি বিধান পালনের বাধ্যবাধকতাও আরোপিত হয় না।

১৪. wikipedia.org, 4.09.2022; রাজিফুল হাসান, সভ্যতা বিনির্মাণে ইসলামকেই বেছে নিতে হবে, (অনলাইন ইসলামিক ব্লগার, প্রকাশঃ ২৯ মার্চ, ২০২০ খ্রি), ৭.৯.২০২২ খ্রি.

১৫. একজন বর্মী রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক এবং লেখিকা। তিনি ১৯ জুন, ১৯৪৫ সালে বার্মার রেঙ্গুনে জন্মগ্রহণ করেন এবং নারী হিসেবে প্রথম মায়ানমারের (২০১৬-২০২১১) রাষ্ট্রপতি ছিলেন। উইকিপিডিয়া, ৮/৯/২০২২।

১৬. আল-কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত ১।

১৭. আল-কুরআন, সূরা আশ-শুরা, আয়াত ১১]

১৮. আল- কুরআন, সূরা আশ সূরা, আয়াত ৪৯-৫৯।

১৯. আল-কুরআন, সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত ১০০।

২০. আল- কুরআন, সূরা আল ফুরকান, আয়াত ৭৪।

২১. আল- কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৮।
২২. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ৫৪।
২৩. আল কুরবান, সূরা আল হুজরাত, আয়াত ১৩।
২৪. http://banglaparnting.firstcry, Date:28.12.2021
২৫. http://ur.wikipe dia.org/w/indes.php?, Date: 28.12.2021
২৬. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ২২৩।
২৭. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ২০৫।
২৮. আল্লাহ বলেন, 'আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে'। আল-কুরআন, সূরা মুমিনুন, আয়াত ১২।
২৯. আল্লাহ বলেন 'আমি তাকে এক শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত জায়গায় স্থাপন করেছি'। আল-কুরআন, সূরা মুমিনুন, আয়াত ১৩।
৩০. আল্লাহ বলেন, 'এর পর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি'। সূরা মুমিনুন, আয়াত ১৪।
৩১. আল্লাহ বলেন, 'অত:পর জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি'। আল-কুরআন, সূরা মুমিনুন, আয়াত ১৪।
৩২. আল্লাহ বলেন, 'এরপর সেই মাংসপিন্ড থেকে অস্থি বা হড্ডি সৃষ্টি করেছি'। আল-কুরআন, সূরা মুমিনুন: ১৪।
৩৩. আল্লাহ বলেন, 'অত:পর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃতি করেছি'। আল-কুরআন, সূরা মুমিনুন, আয়াত ১৪।
৩৪. আল্লাহ বলেন, 'অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি'। আল-কুরআন,সূরা মুমিনুন, আয়াত ১৪।
৩৫. আল-কুরআন, সূরা আন আম, আয়াত ১৫১।
৩৬. http://www.protidinrsangbad.com/todays-newspapr/editor-choic/36957,
৩৭. আল-কুরআন, সূরা বানী ইসরাইল, আয়াত ৩১।
৩৮. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২২৩।
৩৯. http://fb.watch/fMmR-L9XsQ/,
৪০. ডা. মোঃ আতিকুর রহমার আরিফ, সহকারী রেজিস্টার (শিশু বিভাগ), বারিন্দ্র মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী।
৪১. জাবেদ মুহাম্মদ, আদর্শ পরিবার গঠনে ইসলাম, (ঢাকা: আল মারুফ পাবলিকেশন্স, কাটাবন, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৪৫৭।
৪২. ডা. নাফিসা আবেদীন, আবাসিক চিকিৎসক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। প্রথম আলো, তারিখ-৯/৮/২০২২ খ্রি.
৪৩. নাজমুল শামিম, শিশু অধিকার, (ঢাকা: মুক্তচিন্তা প্রকাশনী, চতুর্থ সংস্করণ, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ১২৩।
৪৪. আল কুরআন, সূরা আল কাহফ, আয়াত ৪৬।
৪৫, সম্পাদনা পরিষদ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, শিশু কিশোর পরিচর্যায় ইসলাম, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ১৫৬; মাসউলিয়্যাতুল আবিল মুসলিম ফী তারবিয়াতিল আওলাদ, পৃ. ৫৭।
৪৬. তিরমিযী, জামিউ'ত তিরমিযী, কিতাবুল বিররি ওয়াস মিলাহ, বাবু মা জামা ফি আদাবিল অলাদি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; ইমাম আহমদ, মুসনাদ আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

حَدَّثَنَا ايُوْبُ بِنْ موسَى عن أبيه عن جَدَةش أَنَّ رَسْوِلُ الله عليه وسلم قال مَادَخَلَ وَالِدًا مِنْ أَفْضَلُ مَنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

অপর এক বর্ণনায়, আয়েশা র. হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ ইমান সে লোকই লাভ করেছে যার চরিত্র সর্বোত্তম এবং যিনি পরিবারের লোকদের সাথে কোমল আচরণকারী'। [ইমাম, তিরমিযী, জামিউত তিরমিযী, ৫ম খন্ড, হাদীস নং ২৬১২, পৃ ৯]

৪৭. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৩।
৪৮. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-১৩০৫, পৃ. ৮৪০।
৪৯. আল-কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত ২৮।
৫০. জাওয়াহিরুল কালাম, আল্লামা সাইয়েদ ইবন হাসান নাজাফী এর বরাতে, উসূলুত তারবিয়াহ (বাংলা অনুবাদ), তাবি, পৃ.২৫; ড. শাহ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামে সন্তান লালন-পালন, (ঢাকা: সোনালী সোপান প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৪৫।
৫১. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য, ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ৩য় খণ্ড, ধারা ১৩১১, ২০০১খ্রি.), পৃ. ৮৪৪।
৫২. ইমাম তিরমিযী, ***জামিউত তিরমিযী,*** কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, বাবু মা জা'আ ফি আদাবিল অলাদি, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩৩৮; সম্পাদনা পরিষদ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, শিশু কিশোর পরিচর্যায় ইসলাম, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৪র্থ সংস্করণ, ২য় অধ্যায়, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ১৫৯।
৫৩. সম্পাদনা পরিষদ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ১২৯।
৫৪. http://www.akushy-tv.com/scince-and-tchnology/news/110899, 31 August, 2020, Collction Date: 04.01.2022,
৫৫. আল কুরআন, সূরা লুকমান, আয়াত ১৩।
৫৬. আল কুরআন, সূরা লুকমান, আয়াত ১৭।

৫৭. আল কুরআন, সূরা লুকমান, আয়াত ১৮।

৫৮. তিনি ছিলেন সমরনেতা, রাজনীতিবীদ ও ফরাসি সম্রাট। তিনি ১৫ আগস্ট ১৭৬৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৫১ বছর বয়সে ৫ মে ১৮২১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১৮০৪ থেকে ১৮14 পর্যন্ত ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন। ইতালির রাজাও ছিলেন।

৫৯. আল-কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৩৩।

৬০. ড. মিজানুর রহমান আজহারি, ম্যাসেজ, (ঢাকা: গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ২০৪।

৬১. সম্পাদনা পরিষদ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম; (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৭খ্রি.) পৃ. ১৫২।

৬২. সম্পাদনা পরিষদ, শিশু কিশোর পরিচর্যায় ইসলাম, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম; (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৭খ্রি.) পৃ. ১৫৩, ইসলামে শিশু পরিচর্যা, পৃ. ৫০

৬৩. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ৩৬।

৬৪. আল-কুরআন, সূরা আর রাদ, আয়াত ১১।

৬৫. গানের শিল্পী: রেনেসাঁ ব্যান্ড, সুর করেছেন পিলুখান, গীতিকার: শহীদ মাহমুদ জঙ্গী, চট্টগ্রাম, ১৯৮৯।

৬৬. আল কুরআন, সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৩১। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, "আর্থিক অনটনের জন্য তোমরা নিজেদেও সন্তানকে হত্যা করো না। আমি তোমাদেরকে যেভাবে জীবিকা দান করি তাদেরকেও অনুরূপভাবে দান করবো।" [আল কুরআন, সূরা আল আন-আম, আয়াত ১৫১]।

৬৭. আল-কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৮৮।

৬৮. আল কুরআন, সূরা আন-নিসা, আয়াত ১২। এছাড়াও কুরআনুল কারীমের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর তোমরা উত্তরাধিকারীদেও প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে ফেল না' (আল কুরআন, ৮৯:১৯)। অন্য আরেক আয়াতে বলা হয়েছে, নিজেদের অসহায় সন্তানদের ছেড়ে গেলে ভবিষ্যতে তাদের কি হকে এই ভেবে যারা উদ্বিগ্ন তাদেও উচিত অন্য মানুষদের এতিম সন্তানদের ব্যাপারেও অনুরূপ ভয় করা, এবং আল্লাহকে ভয় করা ও সদ্ভাবে কথা বলা উচিত।' [সূরাহ আন নিসা, আয়াত- ৯]।
অন্য আয়াতে কঠিন হুশিয়ারি দিয়ে আল্লাহ বলেন,'যারা অন্যায়ভাবে এতিমদেও সম্পত্তি গ্রাস কওে, নিশ্চয়ই তরা তাদেও পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করছে। শীঘ্রই তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে' ।[সূরা আন নিসা, আয়াত ১০ ।]

৬৯. বেগম নূর জাহান রশীদ, ইসলামী আইনে নারীর স্থান ও অধীকার, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০খ্রি.), পৃ. ২২।

৭০. মাওলানা আব্দুল আজীজ, সহজ ফারায়েজ শিক্ষা, (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৪৩।

৭১. নাজমুল শামিম, শিশু অধিকার, (ঢাকা: মুক্তচিন্তা প্রকাশনী, চতুর্থ সংস্করণ, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ১২৫।

৭২. ড. শাহ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামে সন্তান লালন-পালন, (ঢাকা: সোনালী সোপান প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১০।

৭৩. দেশ রূপান্তর, ১৭ মার্চ, ২০২১।

৭৪. ডা. মুনিরুজ্জামান মানিক, শিশুর যত্ন, (ঢাকা: সরলরেখা প্রকাশনী, --খ্রি.) পৃ.২১।

৭৫. http://www.facebook.com/100063708602432/post/pfbid02B; Date: 11.09.2022.

৭৬. তিনি ছিলেন প্রগতিশীল চেতনার অধিকারী তরুণ কবি। তাকে কিশোর কবিও বলা হয়। তিনি ১৫ আগস্ট ১৯২৬ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহন করেন। এবং ১৩ মে, ১৯৪৭ সালে প্রায় একুশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর মধ্যে ছাড়পত্র (১৯৪৭), পূর্বাভাস(১৯৫০), ঘুম নেই(১৯৫০) প্রসিদ্ধ। উইকিপিডিয়া, তারিখ-২০/৭/২০২২ খ্রি.

৭৭. তিনি বাংলাদেশি লেখক হিসেবে তাঁর কাব্যের মূল বিষয় ছিল ইসলাম ও প্রেম। তিনি ১৮৯৭ সালে যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৩ অক্টোবর ১৯৬৪ সালে ঢাকা (পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমান বাংলাদেশ) মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার মধ্যে হাসনাহেনা(১৯৩৮), খসরোজ(১৯২৯), সাহারা, গুলিস্তান, তারানা ই পাকিস্তান, বুলবুলিস্তান ইত্যাদি।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

চৌর্য্যবৃত্তি প্রতিরোধে ইসলামী দণ্ডবিধির বিশ্লেষণ
(Analysis of the Islamic Punishment towards the Prevention of Theft)

মোঃ মাহফুজুর রহমান*

Abstract: Islam is the name of complete life system. So, it not only offers the reward for good deeds, but also establish punishment system for bad deeds. There are a lot of wrongdoings in our society. Among them, Theft is usually considered as a distractive one of the society. In the Holy Quran, Allah has mentioned the particular punishment for the sin. We can mention several types of action for expressing the meaning of theft; like- piercing secretly, having possession on someone`s wealth confidentially, collecting wealth of others without having right to it, etc. In Islam- if any person steals someone`s wealth that amount at least 10 dirham and that will be protected by a protector, we can define it as theft. Theft Act or instance of stealing is taking wealth from a person or place illegally or secretly. The clandestine taking of a thing belonging to someone else, not entrusted to the taker is theft. This is an illegal way of earning wealth. According to Islamic shariah, it is considered as an abhorrent sin. In the Holy Quran, Allah has mentioned the punishment of this particular sin. He has said, " If any man or woman steals something, cut their hands. This is the result of their deeds and the standard punishment directed by Allah Indeed, Allah is almighty and wise." (Surah Maayidah.)

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে তার ইবাদতের জন্য তৈরি করেছেন। আর পৃথিবীকে মানুষের বসবাস উপযোগী করেছেন। তবে পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে প্রেরণ করার পেছনে উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পরীক্ষা করা যে কে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজি ভোগ করার পরে আল্লাহর আনুগত্য করে আর কে আল্লাহর নাফরমানী করে। আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে সুখে বসবাস করার জন্য যতগুলো নিয়ামত দান করেছেন তার মধ্যে অন্যতম নিয়ামত হলো সম্পদ। মানুষের জীবনে ধন সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা তা বেঁচে থাকার উপকরণ। এই ধন সম্পদ উপার্জন ও ভোগের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান উপস্থান করেছে ইসলাম। বৈধ পন্থায় ধন সম্পদ উপার্জন যেমন উৎসাহ প্রদান করেছে, তেমনি অন্যায় ও অবৈধ পন্থায় আহরিত ধন সম্পদকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। কেউ আল্লাহর বিধান অমান্য করে অন্যের সম্পদ নিসাব পরিমাণ চুরি করে এবং বিচারকের নিকট তা প্রমাণিত হয়, তাহলে তাকে ভোগ করতে হবে হাত কাটার মত কঠোর শাস্তি।
চুরি তথা চৌর্য্যবৃত্তি ইসলামী শরী'য়াতে একটি জঘন্য অপরাধ। যার শাস্তি মহান আল্লাহ আল-কুরআনুল কারীমে সরাসরি উল্লেখ করেছেন। এ অধ্যায়ে চৌর্যবৃত্তি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হলো।

১ চৌর্য্যবৃত্তির পরিচয়

চুরির আরবী প্রতিশব্দ 'আস-সারিকাতু' (السرقة)। এ শব্দটি আরবী 'আল ইসতিরাক' (الستراق) শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। যার অর্থ-গোপনে ছিদ্র করা।[১] এর অন্য আরেকটি অর্থ হলো 'গোপনে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা'।[২] চুরি করে কথা শোনাকে বলা استراق হয়। যেমন: আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

إِلَّا مَنِ ٱسۡتَرَقَ ٱلسَّمۡعَ فَأَتۡبَعَهُۥ شِهَاب مُّبِين

* এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

'তবে কেউ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা তার পিছু ধাওয়া করে।' এ আয়াতে লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু শোনাকে বলা হয়েছে চুরি করে শোনা।' [৩]
ইব্‌ন 'আরাফাহ' বলেন, 'আরবদের নিকট 'সারিক' বা চোর হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে, সংরক্ষিত স্থানে সংগোপনে আসে এবং তার মালিকানাভুক্ত নয় এমন সম্পদ গ্রহণ করে।'[৪]
ইসলামী আইনের পরিভাষায় কোন জ্ঞানবান ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি কর্তৃক অন্যের মালিকানাধীন বা দখলভুক্ত সম্পদ নিসাব পরিমাণ বা তার সমমূল্যের সম্পদ সংরক্ষিত স্থান থেকে গোপনে হস্তগত করাকে চুরি বলা হয়।[৫]
আরবীতে 'ইসতারাকা আল-সাম'আ' (استرق السمع) অর্থ-গোপনে শ্রবন করা।[৬] আরো বলা হয় ''হুয়া সারিকুন নাজরি ইলাইহি'' (هو سارق النزر اليه) অর্থাৎ "সে তার দিকে দৃষ্টিপাতের চোর" এ বাক্য ঐ সময় বলা হয়, যখন গাফলতিতে অচেতন থাকে, যাতে তার দিকে দেখে নেয়।
এদিকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ্ বলেন,

إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ

"তবে যে ব্যক্তি গোপনে চুরি করে শ্রবণ করে অতঃপর তার পশ্চাদ্ধাবন করে 'স্পষ্ট উজ্জ্বল উল্কাপিন্ড।"[৭]
অতএব গোপনে চুরি করে শ্রবণ করাকে ইসতিরাক (استراق) বলা হয়। 'আল-সারিকাহ' এর শাব্দিক অর্থ গোপনে কোন কিছু নিয়ে যাওয়া। আর ইসতিরাক (استراق) বলা হয় গোপনে হিফাজতকৃত সম্পদের দিকে যাওয়া, যাতে হিফাজত থেকে অবৈধভাবে অপরের সম্পদ নিতে পারে।[৮] আরবদের নিকট আল-সারিক (السارق) ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তি সংরক্ষিত স্থানে গোপনে যায়। আর ঐ জিনিস গ্রহণ করে যাতে তার অধিকার নেই।[৯]
ইংরেজী ভাষায় বলা হয়ঃ Theft Act or instance of stealing. Taking wealth from a person or place illegally secretly.[10]The clandestine taking of a thing not entrusted to the taker of belonging to someone else.[11] উক্ত শাব্দিক অর্থে তিনটি জিনিস চুরির মধ্যে বিদ্যমান। তাহলে পরের সম্পদ নেয়া, গোপনে নেয়া আর সম্পদ সংরক্ষিত হওয়া। যদি সম্পদ অপরের মালিকানায় না হয়, অথবা প্রকাশ্যভাবে নেয়া হয়। অথবা সম্পদ সংরক্ষিত না হয়, তখন চুরি দ্বারা কর্তনের শাস্তি অবিসাম্ভাবী। অন্যথায় তা বাস্তবায়িত হয় না।[১২]

- ইবনে নাজীম বলেনঃ আল-সারিকাহ- চুরি হলো শাব্দিকভাবে কৌশলে গোপনে কোন কিছুকে হরণ করা, বলা হয় ও তার সম্পদ চুরি গেছে, সম্পদকে চিরতরে হারালো, রূপক অর্থে চুরিকৃত সম্পদকেও সিরকাত বলে।[১৩]
- ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, চুরি বলা হয় প্রাপ্তবয়স্ক লোকের অপরের সম্পদকে গোপনে হরণ করা, যার পরিমাণ দশ দিরহাম, যা কোন স্থানে সংরক্ষক দ্বারা সুরক্ষিত।[১৪]
- আল্লামা ছারখ্সী বলেন ঃ অপরের সম্পদ গোপনভাবে হরণ করাকে শাব্দিকভাবে চুরি বলে, কেননা সে সংরক্ষকের চোখকে চুরি করে। তার সম্পদ নেয়ার জন্য এসব করে অথবা সাথীদের চোখকে ফাকি দেয়-যারা হিফাজতের দায়িত্বে আছে। যে রাতে কিসসা বলে। কেননা রাতের ফরিয়াদে কমই কেউ সাড়া দেয়।[১৫]

বস্তুত ইসলামী আইনে চুরির সংজ্ঞা শাব্দিক অর্থের পুরোটাই বহন করে। তবে শুধুমাত্র চুরি দ্বারাই কিন্তু তার বিধান আরোপ করা বাধ্যতামূলক নয়। বরং এরূপ চুরি হতে হবে যাতে কতিপয় শর্ত পূরণ করে। তাই ইসলামী আইনবিদগণ এ শর্তাবলী নিয়ে মতভেদ করেছেন। যদি নেছাবের থেকে কম পরিমাণ সম্পদ গোপনে নিয়ে নেয়, তাহলে আইনের ভাষায় চুরি বলা হবে। কিন্তু ইসলামী আইন কর্তনের হুকুম জারী করবে না। আর শরীয়াহ আইনে এর জন্য প্রমাণেরও একান্ত শর্তারোপ করা হয়েছে। তবে এটা বলাই

প্রযোজ্য হবে যে, চুরি প্রমাণ দ্বারাই কর্তনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হবে।[১৬] অতএব প্রাপ্ত বয়স্ক বিবেক সম্পন্ন চোরের গোপনভাবে চুরি দ্বারা সাব্যস্ত হয়। তার জন্য নিছাব দশ দিরহাম হওয়া অপরিহার্য, অনুরূপভাবে স্থান কিংবা হেফাজতকারী দ্বারা সম্পদ সংরক্ষিতের শর্ত রয়েছে। তেমনিভাবে স্বীকারোক্তি কিংবা প্রমাণ কিংবা শপথ দ্বারা চুরি প্রমাণিত হতে হবে।[১৭]

- আল্লাম সিরাজী বলেন, চুরি হলো বালেগ, বিবেক সম্পন্ন, স্বাধীন, অভাবহীন ব্যক্তি চুরির উদ্দেশ্যে অনুরূপ সংরক্ষিত সন্দেহবিহীন নিছাব পরিমাণ সম্পদ হরণ করা।[১৮]

২ চৌর্য্যবৃত্তির শ্রেণী বিন্যাস

চুরি দু' প্রকার। এক. যে চুরিতে 'তা'যীর' দন্ডবিধি কার্যকরি করা হয়। দুই. যে চুরিতে 'হদ' তথা বিধিবদ্ধ শাস্তি ওয়াজিব হয়।

সুতরাং যে সকল চুরিতে হদ কার্যকর করার শর্তাবলী পূরণ করে না, তাতে তা'যীরী শাস্তি রয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সুদৃঢ়ভাবে যে সকল জিনিস চুরি করলে হাত কাটা বর্তায় না, তাতে 'তা'যীরী' শাস্তির ফয়সালা দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তিনি ঝুলন্ত ফল ও চারণভূমি থেকে বকরী চুরি করাতে হাত কাটার ফয়সালা 'তা'যীরী' শাস্তি হিসেবে দিয়েছেন। এজন্য রাসূল (সা) বলেন,

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده -

'আল্লাহর অভিসম্পাত ঐ চোরের উপর, যে ডিম চুরি করার কারণে তার হাত কাটা গেল এবং রশি চুরি করার কারণে হাতকাটা গেল।"[১৯]

আর এ ধরনের শাস্তি "তা'যীরী" ও হুমকী মূলক শাস্তি ইসলামের প্রথম যুগে পবিত্র কুরআনের আয়াত অনুযায়ী দেয়া হতো। অতঃপর ফল ও বেদানা চুরিতে চোরের হাত কাটা মওকুফ করা হয়। এমনকি অল্পমূল্যের জিনিস চুরি-যা মুখে এসে যায়, যার প্রতি তার প্রয়োজন রয়েছে। তাতে হাত কাটা ও তা'যীরের ব্যবস্থা বৈ কিছুই নয়।[২০]

আর এক প্রকারের শাস্তি যাতে হাত কাটা যায়, তাহলে-দশ দিরহাম নিছাবের পরিমাণ বস্তু। উল্লেখিত শর্তাবলী পূরণ স্বাপেক্ষে চুরির শাস্তি কার্যকরী করা হবে। আর এ ধরনের চুরি দু' প্রকার । এক প্রকার হলো ছোট চুরি, আর দ্বিতীয় প্রকার চুরি হলো যাকে বড় চুরি বলা বলা হয়। বড় চুরি হলো ডাকাতি, যা নির্ধারিত অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা এখানে কেবল ছোট চুরি সম্পর্কে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। আর তাহলো অপরের মালিকানার নিসাব পরিমাণ সম্পদ গোপনভাবে নিয়ে যাওয়া, যা এক ব্যক্তি ও নির্দিষ্ট সম্পদের উপর সীমাবদ্ধ। তাই তাকে ছোট চুরি হিসেবে নামকরণ করা হয়। কেননা তা এমন চুরি যা সংরক্ষিত সম্পদকে সংরক্ষণ থেকে অলক্ষ্যে রাত কিংবা দিনে নিয়ে যাওয়া।[২১]

আর এ চুরির বিভিন্ন প্রকারের যার অধিকাংশের জন্য "তা'যীরী" শাস্তির বিধান রয়েছে। কেননা এর অধিকাংশে শর্তাবলী পূরণ হয় না, যাতে হাত কর্তন দায়বদ্ধ হয়। এজন্যই ইমাম শাফে'য়ী (র) বলেন, চালাক চোরের হাত কাটা যায় না।[২২]

এদিকে লক্ষ্য রেখে আবূ জোহরা ইঙ্গিত করেন যে, আমরা যদি ইসলামী আইনবিদদের সকল মতামতগুলো পাশাপাশি রাখি, তাহলে তাদের প্রত্যেক মতামতের শরীয়াহ আইনে বিশেষ ওজন ও গুরুত্ব রয়েছে। এজন্যই সকল ইমামদের নিকট যদি হাত কাটার হুকুম ওয়াজিব না হয়, তাহলে হাত কাটা যাবে না। এজন্য আমরা দশ হাজার চুরির মধ্যেও একটি চুরি কখনও পাব না যে, তাতে হাত কাটার যথার্থতা পাওয়া যাবে।[২৩]

ইমাম শাফে'য়ী বলেন, হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, চালাক চোর হলে হাত কাটা যায় না, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে কেমন করে তা হয়? তিনি বলেন, এক চোর ঘরের ছাদ ফাক করলো অন্য চোর ঘরে প্রবেশ করে মাল তার হাতে দিল। সুতরাং অপর চোরতো সংরক্ষণ নষ্ট করে নাই।

৩ চৌর্য্যবৃত্তির ভয়াবহতা ও পরিণাম

সমাজ জীবনের শান্তি শৃংখলা বিনষ্ট হওয়ার যত উপাদান তার মধ্যে চৌর্য্যবৃত্তি অন্যতম। মহান আল্লাহ তা'আলা চৌর্য্যবৃত্তির বিরূদ্ধে কঠোর শাস্তির কথা বলেছেন। চৌর্য্যবৃত্তি একটি বড় ধরণের পাপ । যার জন্য ইহকালে ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের দ্বারা শাস্তিতো আছেই উপরন্তু আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা এই চৌর্য্যবৃত্তি সম্পন্নকারীর জন্য তৈরী করে রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি ।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেছেন,

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

'' আর কোন নবীর পক্ষে আত্মসাৎ করা শোভনীয় নয় এবং কেউ আত্মসাৎ করলে, যা সে আত্মসাৎ করেছে কিয়ামতের দিন তা হাজির করা হবে। সে দিন প্রত্যেককেই তার কর্ম ফল পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। কারো প্রতিই অন্যায় করা হবে না।''। [২৪]

এই আয়াতে বলা হয়েছে কিয়ামতের দিন চোরকে তার চুরি কৃত মাল সহ তোলা হবে ।

চুরি না করার জন্য আল্লাহ তা'আলা সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ [২৫]

অর্থ্যাৎ '' হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না। ''

অত্র আয়াত দ্বারাও চুরির নিষেধাজ্ঞার কথা স্পষ্ট বুঝা যায়।

সুতরাং চৌর্য্যবৃত্তি একটি জঘন্য অপরাধ যা আল্লাহ ও রাসূল (সা.) কতৃক সরাসরি নিষিদ্ধ।তারপরেও যদি কেউ এমন কাজে লিপ্ত হয় আল্লাহ তার শাস্তি আল-কুরআনে বলেন, এভাবে-

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم

'পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্দেশিত আদর্শ দণ্ড। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।[২৬]

চুরি একটি ঈমান বিধ্বংসী অপরাধ এর মাধ্যমে মানুষ ঈমান হারা হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল (সা.) হাদীসে বলেন,

، ولا يَسْرِقُ السّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وهو مُؤْمِنٌ

''আবু হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেন, কোন মানুষ যখন চুরি করে তখন সে আর মুমিন থাকে না।'' [২৭]

উপরের আয়াত ও হাদীস সমূহের মাধ্যমে আমরা চুরি নামক এ জঘন্য অপরাধের ব্যপারে আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তির কথা জানতে পারি । তাই আমাদের সকলের উচিত এমন ঘৃণ্য কাজ হতে নিজেকে দূরে রাখা এবং অন্য কেউ দূরে রাখার চেষ্টা করা।

৪ চৌর্য্যবৃত্তির মৌলিক উপাদানসমূহ

চৌর্য্যবৃত্তি নামক ঘৃণিত অপরাধের জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা ভয়ংকর শাস্তির উল্লেখ করেছেন। আর এই শাস্তিটি কার্যকর করার জন্য কোন ব্যক্তি যে এমন কাজটি করেছেন তা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হতে হবে । শুধু তাই নয়, ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম, কোন মানুষকে শাস্তি দিয়ে তার জীবনকে বিপন্ন করা ইসলামের উদ্দেশ্য নয় বরং পথহারা মানুষকে ভ্রান্ত পথ হতে আলোর দিশা দেয়ার জন্য ও মানুষকে সংশোধনের জন্যই মূলত এমন শাস্তির বিধান করা । তবে চুরির শাস্তি কখন দিতে হবে, কি চুরি করলে শাস্তির আওতাভূক্ত হবে এসব বিষয়াবলীর দিক দিয়ে চৌর্য্যবৃত্তিতে তিনটি উপাদান পাওয়া যায়। যেমন

এক. চৌর্য্যবৃত্তি কর্ম সম্পাদনকারীর সাথে সম্পর্কিত উপাদান।

দুই. চুরিকৃত সম্পদের সম্পর্কিত উপাদান ।

তিন. চুরিকৃত সম্পদের মালিকের সাথে সম্পর্কিত উপাদান ।

এই তিনটি উপাদানের মাঝে বেশ কিছু শর্ত বিদ্যমান। চৌর্য্যবৃত্তি নামক অপরাধের জন্য হাতকাটা শাস্তিটি কার্যকর করতে হলে উপরে উল্লিখিত উপাদানগুলো মাঝে বিদ্যমান শর্তাবলী পূরণ হওয়া আবশ্যক । উক্ত উপাদানের শর্তাবলী পূরণ না হলে চুরি অপরাধে চোরকে হদ্দের শাস্তির আওতাভুক্ত করা যাবে না বরং তাকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া হবে।[২৮]

এক. চৌর্য্যবৃত্তি কর্ম সম্পাদনকারীর সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী

চৌর্য্যবৃত্তি কর্ম সম্পাদনকারী তথা চোরের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলীর বেশ কিছুর বিষয়ে আলেম সমাজ একমত তবে কিছু মত পার্থক্যও বিদ্যমান ।

ক. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া : সকল ইলামী আইনবিদগণ এ ব্যপারে একমত যে চোরকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। কেননা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা চুরি করলে তাদের উপর হদ্দ কর্যকর করা যাবে না।[২৯]

কেননা রাসুল (সাঃ) বলেন,

رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق

তিন ব্যক্তি থেকে আমলনামা লিখার কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে, বালক থেকে যতক্ষণ সে বালেগ হয়, ঘুমন্ত থেকে যতক্ষণে জাগ্রত হয়, পাগল থেকে যতক্ষণে সুস্থ হয়।

খ. বিবেকবান হওয়া : ইসলামী আইনবিদগণ এ ব্যাপারেও একমত হয়েছেন যে কোন পাগল বা মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তির উপর শুধু চৌর্য্যবৃত্তির হদ্দ নয় বরং কোন হদ্দই কার্যকর করা হবে না । কেননা তারা মস্তিষ্ক বিকৃত তথা পাগল ।[৩০]

গ. স্বাধীন হওয়া : স্বাধীন হওয়া শর্তের ব্যাপারে শাফে'য়ী ও মালিকী ইমামদের মত হলো চোরকে চুরির কাজটি নিজ ইচ্ছায় সম্পন্ন করতে হবে । যদি তার উপরে কেউ বল প্রয়োগ করে তাকে বাধ্য করে চুরি করতে তাহলে তার উপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কেননা যখনই কাউকে বাধ্য করা হয় তখনি তার স্বাধীনতা হরণ করা হয় বা লুপ্ত হয় । আর স্বাধীনতা যার থাকে না তার উপর শরীয়াতে বিধান বলবৎ হয় না বা কার্যকর হয় না ।

ঘ. চুরি নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া : হাম্বলীদের মতানুসার চোরকে চুরি কর্মের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কেও জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা একজন মানুষকে তার কৃত অপরাধ থেকে সে অপরাধ এর প্রতিক্রিয়া ও শাস্তি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানই ফিরিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট। তাই অপরাধীকে তার অপরাধ ও তার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জানতে হবে ।[৩১]

ঙ. চোর ও মালিকের সম্পর্ক হদ্দ কার্যকরে সন্দেহ সৃষ্টি কারী না হওয়া : চোর ও মালিকের মধ্যে এমন সম্পর্ক না থাকা যার কারণে চুরির ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যার দ্বারা হদ্দ কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। যেমন,পিতা পুত্রের সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, মুনীব ও ভৃত্যের সম্পর্ক এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক।[৩২]

দুই. চুরিকৃত সম্পদের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী

চুরিকৃত সম্পদের মাঝে কিছু আবশ্যক শর্তাবলী রয়েছে। হদ্দ কার্যকর করার জন্য এ সকল শর্তাবলী পূরণ আবশ্যক। তা হলো :

ক. চুরিকৃত বস্তু ক্রয় বিক্রয়ে অবৈধ না হওয়া : যে জিনিস বা বস্তু ইসলামী আইনে ক্রয়-বিক্রয় করা অবৈধ, সেই বস্তু চুরি করার দায়ে কারো উপর চুরির হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। যেমন মদ, শুকর, বাদ্যযন্ত্র কেউ যদি চুরি করে, তাহলে এই জন্য হাত কাটা যাবে না। কারণ এগুলো মাল হওয়ার মর্যাদা রাখে না এবং শরী'আতের দৃষ্টিতে এগুলো ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ নয়।

খ. চুরিকৃত বস্তুটির আর্থিক মূল্য থাকতে হবে : চুরিকৃত বস্তু অবশ্যই মাল হতে হবে। বস্তু মাল হওয়ার অর্থ হলো এর আর্থিক মূল্য থাকতে হবে। যে বস্তুর আর্থিক মূল্য নেই তা হস্তগত করলে চুরি বলে গণ্য হবে না এবং তা চুরির শাস্তির হদ্দ এবং আওতায় পড়বে না ।[৩৩]

গ. সম্পদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকা : সম্পদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকার অর্থ হলো যে সম্পদে ক্রয়-বিক্রয় আইনত ভাবে কারো অধিকার প্রতিষ্ঠা আছে। যে সম্পদে অধিকার প্রতিষ্ঠা থাকে না , সেই মাল চুরি করার অপরাধে কারো হাত কাটা যাবে না।[৩৪] চুরিকৃত সম্পদ অপরের দখলভূক্ত হওয়া অর্থ্যাৎ অন্যের মালিকানাধীন থাকতে হবে। কারও দখলবিহীন বা মালিকানাবিহীন কোন মাল যদি কেউ হস্তগত করে কিংবা নিয়ে যায়, তাহলে তা চুরি বলে গণ্য হবে না এবং এ কারণে তার হাত কাটা যাবে না।[৩৫]

ঘ. চুরিকৃত মাল নিসাব পরিমাণ হতে হবে : চুরিকৃত সম্পদ অবশ্যই নিসাব পরিমাণ হতে হবে । নিসাব পরিমাণ থেকে কম মাল চুরি করার অপরাধে কারো হাত কাটা যাবে না। তবে চুরির মালের নিসাবের পরিমাণ নিয়ে আইনবিদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

ক. হানাফী আইনবিদদের মতে চুরির মালের সর্ব নিম্ন নিসাব হলো এক দিনার বা দশ দিরহাম। তাদের ভাষ্য হলো সর্বনিম্ন এক দীনার অথবা দশ দিরহাম অথবা এতদুভয়ের কোন একটি সমমূল্যের কোন বস্তু চুরি করা হলে তবেই চুরির হদ্দ কার্যকর করা যাবে।[৩৬]

ইব্ন 'আব্বাস (রা,) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,قطع رسول الله يد رجل في مجن قيمته دينار او عشرة دينار

'রাসূল (সা.) একটি ঢাল চুরির কারণে এক ব্যক্তির হাত কাটেন, যার মূল্য এক দীনার বা দশ হিরহাম।'[৩৭]

'আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা.) এর বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, চুরির পরিমাণ কমপক্ষে দশ দিরহাম না হলে চোরের হাত কাটা যাবে না।[৩৮]

'আব্দুর রাযযাক ও তাবরানী কাসিম ইব্ন 'আব্দুর রহমান (রহ.) থেকে 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদের (রা.) উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এক দীনার কিংবা দশ দিরহামের কমে হাত কাটা যাবে না। এ হাদীসটি মুরসাল। কারণ ইব্ন মাস'উদ (রা.) থেকে কাসিম (রহ).কিছু শুনেছেন বলে প্রমাণিত হয়নি।[৩৯]

খ) ইমাম দাউদ যাহিরী, হাসান বসরী ও খারিজীদের মতে চুরির কোন নির্দিষ্ট পরিমাণের নিসাব নেই। কম বেশী যা কিছুই চুরি করুক না কেন তাতে হাত টাকা যাবে।[৪০] কেননা আয়াতে নির্দিষ্ট পরিমাণের উল্লেখ নেই। তাছাড়া আবূ হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.) বলেছেন,

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده و يسرق الحبل فتقطع يده

'চোরের উপর আল্লাহর অভিশাপ নিপতিত হয়, যখন সে একটি ডিম চুরি করে এবং এর জন্য তার হাত কাটা যায়। যে একটি রশি চুরি করে এবং এর জন্য তার হাত কাটা যায়।''[৪১]

গ) ইমাম মালেক (র:), ইমাম শাফে'য়ী (র:) ও হাম্বলীদের মতানুযায়ী স্বর্ণের তৈরী এক দীনারের এক চতুর্থাংশ অথবা রূপার তৈরী তিন দিরহামের সমান হলো চুরির নিসাব।[৪২] আয়েশা (রা.) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে-[৪৩]।تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا 'এক দীনারের এক চতুর্থাংশ বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ সামগ্রী চুরির ক্ষেত্রে কেবল শাস্তি স্বরূপ হাত টাকা যাবে।'

অপর একটি হাদীসে রয়েছে,

لا تقطع يد السارق فيما دون المجن قيل العاءشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار

'একটি ঢালের মূল্যের চাইতে কম মূল্যের বস্তু চুরিতে হাত কাটা যাবে না। 'আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, একটি ঢালের মূল্য কত? তিনি বললেন, এক দীনারে এক চতুর্থাংশ।'[৪৪]

অভিমতসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন :

মালিকী, শাফে'য়ী ও হাম্বলী আইনবিদগণ চুরির নিসাবের বিষয়ে তাদের মতের পক্ষে যে সকল হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন, সেগুলো বিশুদ্ধ হাদীস। পক্ষান্তরে হানাফী আইনবিদদের উপস্থাপিত হাদীস গুলো তুলনামূলক দুর্বল।

যেমন ইব্ন আরব ও শু'আয়বের হাদীসের বর্ণনাকারী ইসহাক, সালিম, যুফার ও হাজ্জাজ সকলেই দুর্বল।[৪৫] এছাড়াও রাসূল (সা.) এর সময়কালে ঢালের মূল্য দশ দিরহাম ছিল বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা বর্ণনাকরীর নিছক ধারণা ও অনুমান মাত্র। কেননা ঢালের আকার ও গুণগত কারণে মূল্যের তারতম্য

হওয়াটাই স্বাভাবিক। এজন্যই ঢালের মূল্য নিরূপনে সাহাবীরে মধ্যে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইব্ন ‘উমর (রা.) বলেন তিন দিরহাম, ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) বলেন, দশ দিরহাম, আনাস (রা.) বলেন, পাঁচ দিরহাম এবং ‘আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে এক দীনারের এক চতুর্থাংশ।[৪৬] অন্যদিকে দাউদ যাহিরী, হাসান বসরী ও খারিজীদের মতের স্বপক্ষে উপস্থাপিত হাদীস খণ্ডন করে বলা হয় যে, এ হাদীসের বর্ণনাকারী আ‘মাশ হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন, ডিম দ্বারা লোহার ডিম বুঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধের এক ধরণের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং তা ঢালের মতই। এর মূল্য ঢালের মূল্যের চাইতে বেশী হয়ে থাকে আর রশি দ্বারা কয়েক দিরহাম মূল্যমানের নৌকার রশিকে বুঝানো হয়েছে। [৪৭]

ঙ. মালামাল হস্তান্তরযোগ্য হওয়া : চুরিকৃত মাল হস্তান্তরযোগ্য হওয়া চুরির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কারণ চুরির অর্থই হলো অন্যের সম্পদ সরিয়ে নিজের দখলে নিয়ে যাওয়া। আর এটা কেবল স্থানান্তরযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রেই সম্ভভ। যেসব মাল এক স্থান থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে নেওয়া যায় না তা দখল করা অবৈধ হলেও তাকে চুরি বলা হয় না।[৪৮]

চ. চুরিকৃত বস্তু সংরক্ষিত স্থানে থাকা : চুরিকৃত বস্তুর স্থান এর জন্য অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে চুরিকৃত মাল সংরক্ষিত স্থানে থাকা। এ ব্যাপারে আইনবিদদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। যদিও তাঁরা কোন স্থান সংরক্ষিত আর কোনটি সংরক্ষিত নয় তা নিয়ে মতভেদ করেছেন। বস্তুত যে বস্তুর সংরক্ষণের জন্য যে স্থান নির্ধারিত সেটিই ঐ বস্তুর স্থান হিসেবে গণ্য। যেমন বাড়ি, দোকান, আস্তবল, গোয়াল ঘর, প্রাচীর বেষ্টিত বাগ-বাগিচা ইত্যাদি। শরী‘আতে সেই স্থানকেই সংরক্ষতি মনে করে যে জিনিসটির মালিক জিনিসটিকে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষায় যথাসাধ্য সচেষ্ট ও যত্নবান।[৪৯] এর প্রমাণ হলো আর ইব্ন শু‘আয়ব (রা.) এর দাদা কর্তৃক হাদীস। তিনি বলেন,

الحريسة التى توجد فى مراتعها قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما اخز من عطنه ففيه القطع ازا بلغ ما يؤخز من زالك ثمن المجن قال يا رسول الله فالثمار وما اخز منها فى اكمامها قال من اخز بفمه ولم يتخز خبنة فليس عليه شىء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين و ضربا نكالا وما اخز من اجرانه ففيه القطع ازا بلغ ما يؤخز من زالك ثمن المجن

এক ব্যক্তি রাসূলকে (সা.) তার চারণভূমিতে বিচরণশীল পশুর চুরি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বললেন, এ ধরণের পশু চুরি করলে তার দ্বিগুণ মূল্য আদায় করা হবে ও অপমান সূচক পিটুনী দেয়া হবে। আর গোয়াল থেকে যা নেয়া হবে তা যদি ঢালের সমমূল্যের হয়, তবে তার হাত কাটা যাবে। লোকটি বললো হে আল্লাহর রাসূল! যে কাপড়ের আঁচলে বেঁধে নেয়না, তার কোন শাস্তি নেই। আর যে ব্যক্তি বহন করে কিছু নিয়ে যায় তার নিকট থেকে তার মূল্যের দ্বিগুণ জরিমানা আদায় করা হবে ও অপমান সূচক প্রহার করা হবে। আর ফসল সংরক্ষণের জায়গা কিছু নেয়া, তা ঢালের সমমূল্যের হারে হাত কাটা যাবে।[৫০]

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) আরো বলেন,

‘গাছে ঝুলন্ত ফল ও পাহাড়ে বিচরণশীল পশু চুরিতে হাত কাটা হবে না। তবে তা খোয়ারে রক্ষিত থাকা অবস্থায় হস্তগত করলে হাত কাটা হবে, যদি তার মূল্য একটি ঢালের সমান হয়।[৫১]

তিন. চুরিকৃত সম্পদের মালিকের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী

হদ্দযোগ্য চুরি প্রমাণের জন্য মালের মালিক জানা থাকতে হবে। যদি মালের মালিক জানা না থাকে তাহলে হদ্দ কার্যকর হবে না। ইমাম আবূ হানীফা, শাফে‘য়ী ও আহমাদ (রহ.) এর মতে চোরাই মালের দাবি জানানো ও চোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা দণ্ডের পূর্বশর্ত। তবে মালিকীদের মতে চুরি প্রমাণিত হলেই হদ্দ কার্যকর করতে হবে। চাই মালিক জানা থাকা বা না থাক। তাঁদের দৃষ্টিতে হদ্দ কার্যকর করার জন্য মালিকের দাবি থাকা শর্ত নয়। [৫২]

৫ চৌর্য্যবৃত্তি প্রমাণের পদ্ধতি

চুরির প্রমাণের জন্য তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা-

ক. সাক্ষ্য প্রমাণ
খ. মৌখিক স্বীকৃতি
গ. হলফ বা শপথ

ক. সাক্ষ্য প্রমাণ

চুরি প্রমাণ করার জন্য দু'জন ন্যায়পরায়ন পুরুষ হতে হবে, যাদের মধ্যে সাক্ষ্য প্রদানের সকল শর্তাবলী উপস্থিত থাকতে হবে। যেমন ঃ হুদুদের সাক্ষ্যর জন্য অগ্রীম আবেদন না থাকা শর্ত, তেমনি চুরির মধ্যেও ঐ শর্ত রয়েছে। চুরির জন্য সন্দেহকে প্রতিরোধ করার জন্য কারো মামলা দায়ের ও তলব থাকতে হবে। যখন সম্পদের মালিক উপস্থিত হয়ে মোকাদ্দমা দায়ের করবে, তখন সন্দেহ নিরসন হবে। আর শাস্তি জারী অপরিহার্য হবে। অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রত্যেক ব্যক্তি যার জন্য চুরিকৃত সম্পদে নির্ভেজাল মালিকানা রয়েছে তিনিই মোকাদ্দমা করবেন। চাই সে মালিকানা প্রকৃত মালিকানা হোক কিংবা অর্পিত মালিকানা হোক কিংবা আমানতের মালিকানা হোক। অতএব সম্পদের মালিক ধারকৃত সম্পদের মালিক, ব্যবসায় লাভের ভিত্তিতে কারবারের মালিক, আমানতের মালিক, বন্ধককৃত সম্পদের মালিক সবাই মোকাদ্দমা দায়েরের অধিকারী।[৫৩]

খ. মৌখিক স্বীকৃতি

অধিকাংশ ইসলামী আইনবিদগণের নিকট একবার মৌখিক স্বীকৃতি এবং হাম্বলী আইনবিদদের নিকট দু'বার মৌখিক স্বীকৃতি দ্বারা চুরি প্রমাণিত হয়। যদি স্বীকারকারী স্বীকৃতি থেকে ফিরে যায়, তাহলে এটা অকাট্য প্রমাণ হবে না। কেননা স্বীকৃতি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে রুজুর কারণে সন্দেহ সৃষ্টি করল। জবরদস্তির স্বীকৃতি বাতিল। যেমন ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে,

ليس الرجل على نفسه بأمين أو جوعت أو خوفت أو أو لقت

"যদি ক্ষুধার্থ কিংবা ভীত কিংবা চাপিয়ে দেয়া হয় তখন মানুষ নিজের উপর আমীন থাকে না।"[৫৪] অর্থাৎ আত্মনির্ভরশীল থাকে না।

কেননা গৃহবন্দী, জেলে আটক, হুমকি ও মারধর করাটা জবরদস্তী, যেহেতু মৌখিক স্বীকৃতিটা সুনিশ্চিত প্রমাণ এজন্য যে, তাতে সত্যতার দিকটায় অগ্রাধিকার তথা প্রাধান্য থাকে। আর যখন স্বীকারোক্তি থেকে বিরত হয় তাতে কোন বস্তুকে নিশ্চিত করা। বাহ্যত হয় সে স্বীকৃত মিথ্যাবাদী হয়ে যায়। রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য উচিত চোরকে শিখিয়ে দেয়া যে, সে যেন চুরিকে অস্বীকার করে। কেননা নবী করীম (সা)-এর নিকট একজন চোরকে উপস্থিত করা হলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি চুরি করেছ? আমি ধারণা করছি যে, সে চুরি করে নাই। অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তুমি বল না।[৫৫]

গ. হলফ করা

যখন সম্পদের মালিকের চুরিকৃত সম্পদের জন্য কোন সাক্ষ্য থাকে না, আর চোরও স্বীকার করে না, তখন চোরের নিকট থেকে হলফ তলব করা হবে। অতঃপর সে হলফ থেকে বিমুখ হয়, তখন সম্পদের মালিকের নিকট থেকে হলফ তলব করা হবে, সে তার দাবীর পক্ষে শপথ করলে, তিনজন ইমামের নিকট চোরের হাত কাটা যাবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফে'য়ীর নিকট মালিকের উপর প্রত্যাখ্যাত হলফ দ্বারা চুরি সাব্যস্ত হবে। আর হাত ও কাটা যাবে। কিন্তু চুরিকৃত মাল তাদের সবার নিকট ঐকমত্যে প্রত্যাখ্যাত হলফ দ্বারা প্রমাণিত হবে।[৫৬] চুরির শর্তাবলী ও চুরির জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে, কিছু শর্ত চোরের ও কিছু শর্ত চুরিকৃত মালের মধ্যে আর কিছু শর্ত স্থানে রয়েছে। আর তাহলো-ইনসাফের স্থান ইসলামী রাষ্ট্র, দারুল হরব-শত্রুর দেশ নয়।

৬ চৌর্য্যবৃত্তি প্রতিরোধে ইসলামী আইন

চুরি নামক অপরাধটি সমাজ থেকে দূরীভুত করার জন্য একটি হিকমতপূর্ণ আইনের ব্যবস্থা করেছে ইসলাম, যা স্বয়ং মহান আল্লাহর তা'আলা নির্দেশিত। তবে চুরির ধরণ ও প্রকৃতির উপর বিবেচনা করে চুরির শাস্তি ভিন্ন হয়। আল কুরআন, আল হাদীস ও মুসলিম মুজতাহিদগনের মতামতে নির্ধারিত শর্তাবলী পাওয়া গেলে হুদুদ কার্যকর করা হবে আর না পাওয়া গেলে তাকে তা'জীরের আওতায় বিচার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে

বিচারক চোরের সার্বিক দিক ও সমাজের নীতি ও অতীতে ইসলামের ইতিহাসের বিচারকদের নীতি অনুসরণ করে বিচার করবে ।

এমন দিক বিবেচনা করে চৌর্য্যবৃত্তি প্রতিরোধে ইসলামী আইন দুই প্রকারের হয়ে থাকে।

১. হদ্দের অর্ন্তভূক্ত শাস্তি।

২. তা'জীর দণ্ডবীধির অর্ন্তভূক্ত শাস্তি।[৫৭]

আমরা আমাদের বিষয়ানুযায়ী কুরআনে বর্ণিত চৌর্য্যবৃত্তির শাস্তি নিয়ে আলোচনা করবো ।

❖ কুরআনের দৃষ্টিতে চৌর্য্যবৃত্তি প্রতিরোধ ইসলামী আইন

চৌর্য্যবৃত্তি প্রতিরোধ করতে ইসলামী আইন হলো চোরের হাত কর্তন করা। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত চুরির অপরাধ প্রমাণিত হলে চোরের শাস্তি হলো হাত কর্তন করা । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم

''পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হাট কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্দেশিত আদর্শ দণ্ড। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।''[৫৮]

অতএব মহান আল্লাহর আদেশ চৌর্য্যবৃত্তি প্রতিরোধ করতে ইসলামী আইন হলো চোরের হাত কর্তন করা। এটি একটি ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ বিধান এতে কোন যুলুম, সীমালংঘন অতিরঞ্জন নেই, নেই কোন অমর্যাদা।

❖ আল হাদীসের দৃষ্টিতে চৌর্য্যবৃত্তি প্রতিরোধ ইসলামী আইন

মহান আল্লাহ তা'আলার বাণীর বাস্তবায়নে মহানবী (সা.) নিজে চৌর্য্যবৃত্তি নামক অপরাধের জন্য হাত কর্তন নামক শাস্তির বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তার জীবনে এ আইনের বাস্তব প্রয়োগ করে গেছেন ।

চুরির শাস্তির আইনের ব্যাপারে 'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে,

عن عائشة أم المؤمنين أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ المَرْأَةُ المَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقالوا: مَن يُكَلِّمُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ، ومَن يَجْتَرِئُ عليه إلَّا أُسامَةُ بنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَلَّمَ رَسولَ اللَّهِ ﷺ، فَقالَ: أتَشْفَعُ في حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قامَ فَخَطَبَ، قالَ: يا أيُّها النّاسُ، إنَّما ضَلَّ مَن قَبْلَكُمْ، أنَّهُمْ كانُوا إذا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإذا سَرَقَ الضَّعِيفُ فيهم أقامُوا عليه الحَدَّ، وايْمُ اللَّهِ، لو أنَّ فاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ، سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَها.

''মাখযূমী সম্প্রদায়ের জনৈকা মহিলার চুরির বিষয়টি কুরাইশ বংশের লোকদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। সাহাবীগণ বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)এর সাথে কে কথা বলতে পারবে? আর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রিয় পাত্র উসামাহ (রা.) ছাড়া কেউ এ সাহস পাবে না। তখন উসামাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সঙ্গে কথা বললেন। এতে তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ তা'আলার দেয়া শাস্তির বিধানের ক্ষেত্রে সুপারিশ করছ?এরপর তিনি দাঁড়িয়ে বক্তৃতা প্রদান করলেন এবং বললেন হে মানব মন্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রথভ্রষ্ট হয়েছে। কেননা কোন সম্মানিত লোক যখন চুরি করতো যখন তারা তাকে ছেড়ে দিতো। আর যখন কোন দূর্বল লোক চুরি করতো যখন তার উপর শরী'আতের শাস্তি প্রয়েঅগ করতো। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ (সা,) এর মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে অবশ্যই মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর হাত কেটে দিবে।'' [৫৯]

উপর্যুক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, চুরির শাস্তি হাত কাটা। অনূরুপভাবে যে শাস্তির ব্যাপারে ইজমা'ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হাত কাটার পর চুরিকৃত মাল অথবা এর মূল্য ফেরত দিতে হবে কী-না সে সম্পর্কে ইসলামী আইনবিদগণ মতপার্থক্য করেছেন।

আহনাফদের মতে, 'হাত কাটার শাস্তি প্রয়োগের সাথে চুরিকৃত মালের উপর মালিকের সত্ত্ব রহিত হয়ে যায়। যার কারণে হাত কাটা শাস্তি ও ক্ষতিপূরণ একত্রিত করা যাবে না।' কিন্তু যদি চুরিকৃত মাল হারিয়ে যায়

কিংবা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে হানাফী আইনবিদদের মতে জরিমানা আদয় করতে হবে না।[৬০]তাঁদের দলীল হলো আল-কুরআনুল কারীমে চুরির শাস্তি শুধুমাত্র হাত কাটার উল্লেখ রয়েছে। অত:এব হাত কাটার সাথে অন্য কোন শাস্তি সংযুক্ত করা যাবে না।[৬১]

তাঁদের আরেকটি দলীল হলো ‘আবদুর রহমান ইবন ‘আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস, রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘চোরের উপর হাত কাটার হদ্দ কার্যকর হয়ে যাওয়ার পর তার থেকে আর কোন জরিমানা আদায় করা হবে না।’ [৬২] এ হাদীসের ভিত্তি সা‘ঈদ ইব্ন ইব্রাহীমের উপর। সা‘ঈদ আপন ভাই মিসওয়ার ইব্ন ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং মিসওয়ার স্বীয় দাদা ‘আব্দুর রহমান ইব্ন ‘আওফ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী (রহ.) বলেছেন সা‘ঈদ ইব্ন ইব্রাহীম মালহুল (অজ্ঞাত) এবং মিসওয়ার (রহ.) ‘আব্দুল রহান ইব্ন ‘আওফের (রা.) নাম উল্লেখ করেন নাই। দারাকুতনী (রহ.) আরো বলেন, এ হাদীসটি বিভিন্ন রূপে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কোন বর্ণনাই প্রমাণিত নয়। তবে ইব্ন হুমাম (রহ.) বলেছেন সা‘ঈদ ইবন ইব্রাহীম যহুরা গোত্রের লোক। তিনি মদীনার কাযী ছিলেন এবং নির্ভযোগ্য ব্যক্তি বর্গের অন্যতম।

ইমাম মালিক, শাফে‘য়ী ও আহমাদ (রহ.) এর মতে হাত কাটা দ্বারা চুরিকৃত মালের থেকে মালিকের স্বত্বাধিকার রহিত হয় না। সুতরাং তাঁদের মতে হাত কাটা ও জরিমানা একত্রিত হতে পারে। চুরিকৃত মাল যদি চোরের নিকট অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে তাহলে সকল আইনবিদদের মতে সে মাল মালিকের নিকট ফেরত দিতে হবে। হাত কাটার আগে হোক বা পরে।

শাফে‘য়ী ও হাম্বলীদের মতানুযায়ী চোরের কাছে যখন চুরি করা মাল নষ্ট হয় বা হরিয়ে যায়, তখন তাকে তার জরিমানা দিতে হবে এবং হাত কাটা হবে। কেননা জরিমানা মানুষের হক। আর হাত কাটা আল্লাহর হক। তাই আল্লাহর হক আদায়ে কেউ কাউকে বাধা দিতে পারে না। যেমন বাধা দিতে পারে না দিয়াত ও কাফ্ফারা দিতে।[৬৩] মালিকীদের মতে চোর স্বচ্ছল হলে জরিমানা দিবে নতুবা শুধু হাত কাটা হবে।[৬৪] চোরের হাতকাটার শাস্তির জরিমানা আরোপের বিষয়ে উল্লিতি অভিমতগুলোর মধ্যে জরিমানা গ্রহণ না করার মতটি অগ্রগণ্য। কেননা এ মতের স্বপক্ষে আছার বর্ণিত আছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুফাসসির ইব্ন জারীর আত্ -তাবারী (রহ.) এর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন

القياس ان عليه غرم ما استهلك ولكن تركنازلك اتباعا لاثرفى زالك

‘যা নষ্ট হয়েছে তার জরিমানা আদায় করা কিয়াসের দাবি। কিন্তু আছারের অনুসরণ করে আমরা জরিমানাকে পরিত্যাগ করেছি।’[৬৫]

পুণঃ পুণঃ চুরির শাস্তি

চুরির অপরাধে প্রথমবার চোরের ডান হাত কাটতে হবে। দ্বিতীয়বার সে চুরি করলে বাম পা কেটে ফেলতে হবে। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু এই চোর কর্তৃক যদি তৃতীয়বার ও চতুর্থবার চৌর্যকর্ম সম্পাদিত হয়, তালে তার শাস্তি সম্পর্কে আইনবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফী আইনবিদ ও আহমাদ (রহ.) এর এক মতে, ডান হাত ও বাম পা কাটার পরেও যদি কোন চোর আবার চুরি করে, তাহলে তার উপর চুরির হদ্দ তথা কর্তনের শাস্তি আর প্রযোজ্য হবে না। এমতাবস্থায় তাকে তা‘যীর এর আওতায় শাস্তি দেয়া হবে। তার নিকট থেকে চুরিকৃত মাল ফেরৎ নেয়া অথবা জরিমানা আদায় করা হবে এবং তাওবাহ করে সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে আটক করে রাখা হবে। তাঁদের দলীল হলো ‘আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ‘আলী (রা.) এর দরবারে হাত পা কাটা এক চোরকে আনা হলো। তখন আলী (রা.) উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করলেন এ ব্যক্তির সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি? তাঁরা বললেন হে আমীরুল মু‘মিনীন! তার অঙ্গ কর্তন করুন। উত্তরে ‘আলী (রা.) বললেন, তা করলে তো তাকে হত্যাই করে ফেললাম, সে কি দিয়ে খাদ্য খাবে, কি দিয়ে সালাতের অযু করবে, কি দিয়ে অপবিত্রতা থেকে গোসল করবে, কি দিয়ে তার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে? এরপর তাকে কয়েকদিন জেলে আটক রাখলেন। অতঃপর তাকে জেল থেকে বের করা হলো। ‘আলী (রা.) সাহাবীগণনের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁরা এ

বিষয়ে প্রথমবারের মত পরামর্শ দিলেন। 'আলী (রা.) তাঁদেরকে প্রথমবারের মত উত্তর দিলেন। অতঃপর তাকে কঠিনভাবে বেত্রাঘাত করলেন এবং ছেড়ে দিলেন।[৬৬] অন্য একটি বর্ণনায় 'আলী (রা.) বলেন, 'আমি আল্লাহ তা'আলার নিকটই লজ্জাবোধ করছি যে, তার একটি হাতও ছেড়ে দিবনা যে, সে তার দ্বারা কোন কিছু ধরতে পারে। আর একটি পাও কি রাখবো না যে, সে তা দ্বারা চলতে পারে।[৬৭]

মালিকী, শাফে'য়ী ও আহমাদ (রহ) এর অপর একটি বর্ণনানুসারে চোর তৃতীয়বার চুরি করলে বাম হাত, আর চতুর্থবার চুরি করলে ডান পা কেটে ফেলতে হবে। তারাও যদি চুরি করে, তাবে'ই তাকে তা'যীরের আওতায় কারগারে বন্দী করে রাখা হবে। তাঁদের দলীল হলো, রাসূল (সা.) বলেছেন,

إذا سَرَقَ السارِقُ فاقطَعوا يَدَه، فإن عادَ فاقطَعوا رِجْلَه، فإنْ عادَ فاقطَعوا يَدَه، فإنْ عادَ فاقطَعوا رِجْلَه

'যখন চোর চুরি করে তার হাত কেটে দাও, যদি পুনরায় চুরি করে তার পা কেটে দাও। যদি আবার চুরি করে তাহলে তার হাত কেটে দাও। তারপরেও যদি চুরি করে তবে তার পা কেটে দাও।'[৬৮]

হানাফীগণ এ হাদীসের জবাবে বলেন, মুসলিম খলীফাদের অনেকেই এ হাদীসের উপর আমল করেননি, তাঁরা তৃতীয়বার কেউ চুরি করলে তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখতেন। সম্ভবত: বর্ণনার বিভিন্নতার কারণে তাঁরা হাদীসটি গ্রহণ করেননি।[১৭৯] তাছাড়াও এই হাদীসের সনদ অত্যন্ত দূর্বল এবং সনদের মধ্যে ওয়াকিদী (রহ) নামক একজন রাবী আছেন, যাকে আহমাদ (রহ.) মিথ্যাবাদী বলেছেন।[৬৯] এ বিষয়ে উভয় পক্ষের মতামত ও যুক্তি প্রমাণ পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা বিষয়টি সাব্যস্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত হানাফী ও হাম্বলীদর অভিমতকে গ্রহণ করাই উত্তম বলে মনে হয়। কেননা তৃতীয়বার ও চতূর্থবার চুরির জন্য যদি হাত-পা কেটে ফেলা হয়, তাহলে জীবনে তার চলার ও বেঁচে থাকার আর কোন শক্তিই থাকবে না। এটি প্রকারান্তরে তাকে ধ্বংস করার নামান্তর। অথচ হদ্দ বিধিবদ্ধ হয়েছে শাসনের জন্য ও সংশোধনের জন্য, মানুষের ধ্বংস সাধনের জন্য নয়।[৭০]

তথ্যনির্দেশ

[১] ইবন মানযূর, মুহাম্মদ ইবন মানযূর আল-ইফকীরী, *লিসানুল আরব*, ১০ম খণ্ড (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ১৪১২ হি.), পৃ. ১৫৫-১৫৬।

[২] *আল-বুখারী,আস সহীহ, কিতাবুত তাফসীর* , বাব-৩, হাদীস নং - ৪৭৪৭, পৃ. ৪৬৪-৪৬৫ ।

[৩] সূরাহ আল- হিজর, ১৫: ১৮ ।

[৪] *লিসানুল আরব*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬।

[৫] আল্লামা আবু বকর বিন মাসউদ *আল-কাছানী আল-হানাফী ও বাদায়ি' আল-ছানায়িফি তারতীব আল-শারায়ি'*, ২য় সংস্করণ (বৈরূত: ৭ম খণ্ড, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪০২ হি.), পৃ. ৬৫।

[৬] *মুহাম্মদ বিন আবী বকর আল-রাজী ও মুখতার আল-সিহাহ* (বৈরূত: দারুল কুতুব), পৃ. ২৯৬।

[৭] সূরা আল-হিজর, ১৫ : ১৮।

[৮] আল-ইমাম জাকারিয়া আল-আনসারী, *তুকফাহাতুত্তুল্লাব*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: আল-মুয়াচ্ছাছা আল-আরাবীয়া, ২য় খণ্ড), পৃ. ৪৩২।

[৯] *লিসানুল আরব*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।

[১০] *Oxford Dictionary*, Edited by Oxford University Press. Oxford Learner's Favorite Dictionary' Edited by Prof. Raihan Kawars & Kahirul Alam Monir, Published by Chowdhury & Son's Dhaka: Banglabazar, 2006, P. 329.

[১১] Anwar Ahmed quodri: Islamic Jurisprudencse in the anodern world ,Tajcompany Newdelhe-1989, P-297.

[১২] আল-ইমাম আল-আল্লামা আল-শাইখ জাইনুদ্দীন আল-শাহীর নাজীম, *শারহ কানজ আল-দাক্কায়িক*, ৫ম খণ্ড (পাকিস্তান,কোয়েটা: আল-আরাবীয়া প্রেস, রশীদিয়া লাইব্রেরী, স্বারকী রোড), পৃ. ৪৯-৫০।

[১৩] *আল-বাহার আল-রায়িক*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০; *আল-মাবসূত*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩।

[১৪] আল্লামা আবু বকর বিন মাসউদ আল-কাছানী আল-হানাফী, *বাদায়ি' আল-ছানায়িফি তারতীব আল-শারায়ি'*, ৭ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪০২ হি.), পৃ. ৬৫।

[১৫] প্রাগুক্ত।

---

[১৬] শাইখুল ইসলাম বুরহানদ্দীন আবুল হাসান আলী, *আল-হিদায়াহ*, ১ম খণ্ড (দিল্লী: রশীদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.), পৃ. ৫৩৭।

[১৭] আল-শিরাজী, *মুহাজ্জাব*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল মারিফা, ১৩৭৯ হি.), পৃ.২৭৭; *শরহে ফাতহুল কাদীর*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৯০; আল-খারশী, *মাওয়াহিব আল-জ্বলীল*, ৮ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৩৯৮ হি.), পৃ. ৯১; *তিলকা হুদুদুল্লাহ*, পৃ. ২৪২-২৪৩; *দুররুল মুখতার*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮২; *শারহ আল জুরকানী*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১০৬; *আল-মুগনী*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯।

[১৮] *মুহাজ্জাব*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল মারিফা, ২য় সংস্করণ, ১৩৭৯ হি.), পৃ.২৭৭।

[১৯] *নাইল আল-আওতার*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১; *সহীহ আল-বুখারী*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯।

[২০] আল- সাইয়েদ সাবেক ঃ ফিকহ আস-সুন্নাহ, ২য় খন্ড বৈরূত ঃ দারুল ফিকর ১৪১২ হি. পৃ. ৪১১।

[২১] *বিদাইয়াতুল মুজতাহিদ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৬; *মাবসূত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩।

[২২] ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, *মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬), পৃ. ২১২।

[২৩] ইমাম আবু জোহরা, *ফালসাফাতুল উকুবাত ফি আল-ফিকহ আল-ইসলামী* (মিশর: আরবী শিক্ষা নিকেতনের উচ্চ আইন শিক্ষা উপলক্ষ্যে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ক্লাসের বক্তৃতা), পৃ. ১৫৩; *বাদায়ে ছানায়ে*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৮৪; *আসনা আল-মাতালিব*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫২; *বাহার আল-রায়েক*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০।

[২৪] সূরাহ আল ইমরান, ০৩ : ১৬১

[২৫] সূরাহ আল মুমতাহিনাহ, ৬০ : ১২

[২৬] সূরাহ আল মায়েদাহ, ০৫ : ৩৮ ।

[২৭] সহীহুল মুসলিম, হাদীস নং- ৫৪৮৭।

[২৮] *ফিকহুস সুন্নাহ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১২

[২৯] *রাওয়াইউল বায়ান*, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৯৫; প্রাগুক্ত।

[৩০] *আল-মুহায্যাব*, ৩য় খণ্ড, পৃ.৩৫৩।

[৩১] *আহকামুল আদ্দিআইল জিনাঈ*, পৃ. ৬৯।

[৩২] *ফিকহুস সুন্নাহ*, ২য় খণ্ড, পৃ.৩১৪

[৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮।

[৩৪] *আল মাবসূত*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪ ; *ফিকহুস সুন্নাহ*, ২য় খণ্ড, পৃ.৩১৪ ।

[৩৫] *ইসলামী শাস্তি আইন, পৃ. ৬২ ।*

[৩৬] ইমাম কুরতুবী, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরবী, ১৯৮৫ খি./১৪০৫ হি.*আল-মাবসূত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭ ; আত্- তাফসীরুল মাযহারী, ৩য় খণ্ড, পৃ.৯৯ ।*

[৩৭] *তাকমিলাতুল ফাতহুল মুলহিম*, ২য় খণ্ড, পৃ.২৮৯

[৩৮] কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইয়াহইয়া তুরাসিল আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), পৃ.৯৯-১০০;

[৩৯] *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৩য় খণ্ড, পৃ.১০০; *কিতাবুল হুদুদ*, হাদীস-৩৩৯৭, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

[৪০] *তাকমিলাতুল ফাতহুল মুলহিম*, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৮৭; *আল মুগনী*, ১০ম খণ্ড পৃ.২৩৭ ।

[৪১] *আল-বুখারী*, *আস-সহীহ*, কিতাবুল হুদুদ, বাব-৭, হাদীস-৬৭৮৩, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৫; *কিতাবুল মুলহিম*, হাদীস নং -৪২৭২, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮ ।

[৪২] *আল-জামিউ'লি আহকামিল কোরআন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫২০; ড. সাঈদ আর- মুসফির, *আল-হুদুদ কারীমাহ ফী মানা'ইল জারীমাহ* (রিয়াদ: আল মাকতুবাতুত তাওবাহ ১৪২০ হি.), পৃ. ৮৩ ।

[৪৩] *আল-বুখারী*, *আস-সহীহ*, কিতাবুল হুদুদ, বাব-১৩, হাদীস-৬৭৮৯, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৫; আত-তিরমিযী, *আস-সূনান*, কিতাবুল হুদুদ, বাব- ১৬, হাদীস-১৪৪৫, পৃ.৩৮৯ ।

[৪৪] *তাকমিলাতুল ফাতহুল মুলহিম*, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৯২।

[৪৫] *আত্- তাফসীরুল মাযহারী*, ৩য় খণ্ড, পৃ.১০০।

[৪৬] *আল-জামিউ'লি আহকামিল কোরআন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫২০।

[৪৭] *আল-বুখারী*, *আস সহীহ*, *কিতাবুল হুদুদ*, বাব-৭, হাদীস-৬৭৮৩; *ফাতহুল বারী*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৯৮; *ফিকহুস সুন্নাহ*, ২য় খণ্ড, পৃ.৩১৬।

[৪৮] আব্দুল কাদির 'আওদাহ, আত্-তাশরী'উল জিনাইল ইসলাম, ১ম খণ্ড, বৈরুত: দারুল কাতিব আল-আরাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৩; *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ৫ম খণ্ড, পৃ.৪৪৪ ।

[৪৯] আলাউদ্দীন আল-কাছানী: বাদাউইস সানাই' ফি তরতীবিশ শারায়ী, ২য সংস্করণ, ৭ম খণ্ড, বৈরূত: দারুল মারেফা, ১৪০২ হিজরী., ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৩।

[৫০] *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০২।

[৫১] *শারহুয যুরকানী' আলাল মুয়াত্তা'* কিতাবুল হুদূদ, বাব-৫৭৭, হাদীস নং-১৬১৭, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৯।

[৫২] ড. আহমদ আলী, ইসলামের শাস্তি আইন, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, ২০০৯. পৃ. ৬২
[৫৩] *বাদায়ি' আল-ছানায়ী*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৮১; আনসারী, *আসন আল মাতালিব*, ৪র্থ খণ্ড (মিশর ঃ ১৩১৩ হি.), পৃ. ১৫১।
[৫৪] মুহাম্মদ জুরকানী, *শারহ আল-জুরকানী আলা মুয়াত্তা ইবনে ইমাম মালেক*, ৮ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল মা'রিফা ১৩৭৮ হি.), পৃ. ১০৬; *শারহ আল-আজহার*, ৪র্থ খণ্ড প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪।
[৫৫] আমর বিন হাজম, *আল-মুহাল্লা*, ৮ম খণ্ড (মিশর : আল-জমহুরীয়া আল-আরাবীয়া লাইব্রেরী, দার আল-ইত্তেহাদ আল-আরবী প্রেস), পৃ. ২৫০; *মুহাজ্জাব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৪।
[৫৬] *আসনা আল-মাতালিব*, ৪র্থ খণ্ড (মিশর : ইসলামিয়া লাইব্রেরী, মাইনামা প্রেস, ১৩১৩ হিজরী), পৃ. ১৫০; *মুগনী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৮; *দুররুল মুখতার*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৭-৮৮, *মাবসুত*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৪২-১৪৫; *বাহার আল-রায়েক*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫১-৫২; শরহে ফতহুল কাদীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৯-১৬০।
[৫৭] *মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন*, পৃ. ২১২।
[৫৮] সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫ : ৩৮ ।
[৫৯] আল-বুখারী, *আস সহীহ*, কিতাবুল হুদুদ, বাব-১২, হাদীস-৬৭৮৮, ৩ য় খণ্ড, পৃ. ৩০৬।
[৬০] *বাদাই'উস সানাঈ'*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৮৪; *আহকামুল কুরআন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৯।
[৬১] *আল-জামি'লি আহকামিল কুরআন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫২৪।
[৬২] *আস-সুনান* কিতাবুল হুদূদ, হাদীস নং- ৩৩৬৪, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৯।
[৬৩] আল মুহায্যাব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৫।
[৬৪] *আল- জামি'উল আহকামিল কুরআন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮২।
[৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪।
[৬৬] *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৪-১০৫।
[৬৭] *আল-মুসনাদ*, তাহকীক, 'আমির আহমাদ হায়দার' ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫
[৬৮] *আদ-দারাকুতনী*, কিতাবুল হুদূদ, হাদীস নং- ৩৩৬৪, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৯।
[৬৯] ড. আহমদ আলী, ইসলামের শাস্তি আইন, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, ২০০৯. পৃ. ৬৯।
[৭০] বাদাই'উস সানাঈ' ৭ম খণ্ড, পৃ. ৮৬।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

আল কুরআনে বর্ণিত ফলজ উদ্ভিদ : পরিচিতি ও পর্যালোচনা
(Introduction and Review of the fruit plants narrated in the holy Quran)

মোহাঃ আহমাদুল্লাহ[*]

Abstract: Fruitplants and trees are the oldest forms of food known to mankind. There are many references to fruits and trees in ancient literature. According to the holy Quran, the fruits and trees like grape, date, fig, olive and pomegranate are gifts and heavenly fruits of God. Fresh and dry fruits are the natural staple food of man. They contain substantial quantities of essential nutrients in a rational proportion. Persons living on this natural diet will always enjoy good health. Moreover, fresh and dry fruits are thus not only a good food but also a good medicine. The holy Quran is one of the reference books describing the importance of plants used for different elements in various verses. This study also discusses a wide range of plants mentioned in the holy Quran to symbolize holy plants and fruits in Paradise such as; fig, olive, date palm, grape, banana and pomegranate. This study aims to document the knowledge and medicinal use and various purposes of plants for the human welfare.

ভূমিকা

প্রাচীন মানুষের সু-প্রাচীন খাদ্যের মধ্যে ফল অন্যতম। এ কারণে ফলজ উদ্ভিদের গুরুত্ব অপরিসীম। আদিম মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে কিংবা গিরি-গহ্বরে বাস করত, তখন সম্ভবত তাদের খাদ্য তালিকায় খেজুর, ডালিম, বেদানা, ডুমুর ও জয়তুন ফলের প্রচলন ছিল। এশিয়া মহাদেশকে মানুষের আদিম জন্মস্থান বলে ধরা হয়। সেহেতু এ অঞ্চলেই প্রথম ফলের চাষ হতো বলে ধারণা করা যেতে পারে। পরবর্তীতে মানুষের বিস্তার ও বিস্তৃতির সাথে সাথে ফলজ উদ্ভিদ ও বৃক্ষের বিস্তার নিশ্চিত হয়েছে। তাই আজ পৃথিবীর সব দেশেই ফলের চাষ দেখা যায়। অন্যদিকে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কুরআনুল কারীম এক জীবন্ত বিশ্বকোষ। এতে রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাহার। অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য,বিধি-বিধান থেকে শুরু করে বাদ যায়নি উদ্ভিদ,ফল,তরু-লতা ও গাছ-গাছালির বিবরণ। যেমন-আল্লাহ তা'আলা বলেন,[১]

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ - أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا - ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا - فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا - وَعِنَبًا وَقَضْبًا - وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا - وَحَدَائِقَ غُلْبًا - وَفَاكِهَةً وَأَبًّا - مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ -

'মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি। অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আংগুর, শাক-সব্জি, যয়তুন, খর্জুর, ঘন উদ্যান, ফল এবং ঘাস তোমাদের ও তোমাদের চতুস্পদ জন্তুদের উপকারার্থে আমিই আঙ্গুর, শাক-সবজি, জাইতুন, খেজুর, বহু বৃক্ষবিশিষ্ট বাগান, ফল ও গবাদি খাদ্য। এটা তোমাদের ও তোমাদের জীবজন্তুর ভোগের জন্য।' কুরআনের অন্যত্র প্রাকৃতিক বৈচিত্রের নয়নাভিরাম সাদৃশ্য ও কুদরতের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[২]

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -

'যিনি তোমাদের জন্য তা (পানি) দিয়ে শস্য, জাইতুন, খেজুরগাছ, আঙ্গুর ও সব ধরনের ফল ফলান। অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।'

---

[*] পিএইচ. ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এছাড়াও কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ফলজ উদ্ভিদ ও বৃক্ষের নাম ও শ্রেণি উল্লেখ করেছেন। কয়েকটি সূরার নামকরণও করা হয়েছে উদ্ভিদের নামে। আবার কোনো কিছুর প্রমাণ স্বরূপ কিংবা সাধারণ বর্ণনা হিসেবে এসেছে উদ্ভিদের নাম। গবেষকদের মতে, পবিত্র কুরআনে কম করে হলেও ৬১টি সূরায় উদ্ভিদ, ফল, তরু-লতা ও গাছ-গাছালির বিবরণ সংক্রান্ত আয়াত রয়েছে ২৪৭টি।[৩] অত্র আয়াত সমূহে আল্লাহ তা'আলা শুধু উদ্ভিদজগৎ না বরং প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশ, জীব ও উদ্ভিদের লিঙ্গভেদের রহস্য,বীজের অঙ্কুরোদগম,উদ্ভিদের বংশগতি ও অঙ্গজ-রূপান্তর,ফল বা উদ্ভিদ চাষাবাদ,ব্যবহার,পুষ্টি গুণাগুণ,কৃষিতত্ত্ব, প্রাকৃতিক পরিবেশ সহ উদ্ভিদের মূল, কান্ড,পাতা, ফুল, ফল ও বীজ,পুষ্পমঞ্জরী ও শাক-সবজি ইত্যাদি বিষয়ে সরাসরি ও ইঙ্গিত বর্ণনা করেছেন। কুরআন গবেষক ও বিজ্ঞানীদের মতে, এ পৃথিবীতে জন্মানো মহান আল্লাহ তায়ালার কোটি কোটি উদ্ভিদের মধ্যে প্রায় ১৪টি[৪]/১৯টি[৫]/২২টি[৬]/২৭টি[৭]/৩০টি মতান্তরে ৩১টি[৮] খাদ্যশস্য, ভেষজ, উদ্দীপক জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনকারী ফলজ উদ্ভিদ ও বৃক্ষের প্রতীকী নাম পবিত্র কুরআনে উল্লেখ পাওয়া যায়। নিম্নে কুরআনে বর্ণিত শুধুমাত্র ফলজ উদ্ভিদ ও বৃক্ষ সমূহের পরিচয় ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হলো।

১. খেজুরের বিবরণ

খেজুর (Date Palm) এক ধরনের তালজাতীয় শাখা বিহীন ফলজ উদ্ভিদ ও বৃক্ষ।[৯] এর ইংরেজি নাম- *palms, palm tree, date palms, date tree, dates* ইত্যাদি।[১০] আর বৈজ্ঞানিক নাম- Phoenix dactylifera বা Phoenix Sylvestris।[১১] মানব সভ্যতার ইতিহাসে সুমিষ্ট ফল হিসেবে এর গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ায় প্রাচীনকাল থেকেই চাষাবাদ হয়ে আসছে। এ গাছটি প্রধানত মরু এলাকায় ভাল জন্মে। খেজুর গাছের ফলকে সাধারণত খেজুর রূপে আখ্যায়িত করা হয়। খেজুর গাছের উচ্চতা ১৫ মিটার থেকে ২৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাতা গুলোর দৈর্ঘ্য ৩ থেকে ৫ মিটার পর্যন্ত হয়। পাতায় দৃশ্যমান পত্রদণ্ড রয়েছে। খেজুর ফলের ত্বক সাধারণত ৩টি স্তরে বিভক্ত থাকে। বাইরের স্তরটি খুবই পাতলা এবং মাঝের স্তরটি শ্বাসযুক্ত ও রসালো। আর ভিতরের ত্বকটি বেশ কঠিন। এ ফলের একটিমাত্র বীজ থাকে। একটি গর্ভপত্র নিয়ে গঠিত এরূপ ফলকে উদ্ভিদবিজ্ঞানের ভাষায় Drupe বলে। দু-জাতের খেজুর ফল দেখা যায়। যেমন: ক. আরবি খেজুর। খ. দেশী খেজুর। প্রথমটির জন্মস্থান আরব দেশ ও দ্বিতীয়টির জন্মস্থান ভারতীয় উপমহাদেশে।

পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে ৪০০ জাতেরও বেশি খেজুর পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, তরু-তাজা খেজুরকে رطب (*রাতবুন/রুতাব*)[১২] এবং শুকনো খেজুরকে تمر বা تمرة (*তমর ও তামারাহ*) বলে।[১৩] অন্যদিকে কেউ কেউ সাধারণ খেজুরকে قزبا '*কায্‌বা*' এবং ভালো ও উন্নতমানের খেজুরকে غلبا (*গুল্‌বা*) বা قِنْوَانٌ (*কেনওয়ানুন/কেলওয়াতুল*) নামে অভিহিত করেছেন।[১৪] খেজুর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ -

'এবং সমুন্নত খেজুর বৃক্ষ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর।[১৫] ইমাম বাগাভী (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে,জান্নাতের খেজুর গাছের কাণ্ড হবে সবুজ বর্ণের জমরূদ পাথরের,পাতা হবে লাল সোনার। আর সে ফলের আঁটি হবে না।'[১৬] পবিত্র কুরআনে খেজুরকে পবিত্র গাছ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং খেজুর বা খেজুরগাছ-সংক্রান্ত আলোচনা ১৬টি সূরায় ৮ বার একক ও ১২ বার বিভিন্ন উদ্ভিদের সাথে মোট ২০/২২/২৫ মতান্তরে ২৮ বার এসেছে।[১৭]

২. আঙ্গুরের পরিচয়

আঙ্গুর (Grape) অতি জনপ্রিয় একটি রসালো সবুজ ফলজ উদ্ভিদ ও বৃক্ষ। আর আঙ্গুর এক প্রকারের ফল যা লতা জাতীয় দ্রাক্ষালতা গাছে ফলে থাকে। আঙ্গুর Vitaceae গোত্রীয় কাষ্ঠল লতা জাতীয় উদ্ভিদ। এর আদিভূমি এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় কাসপিয়ান সমুদ্রাঞ্চল। এর বৈজ্ঞানিক নাম Vitaceae.[১৮] ফলগুলো একসাথে ৬ হতে ৩০০ টি থোক বেঁধে ধরে। অনেক দেশেই এর চাষ হচ্ছে। আমাদের দেশে মাত্র কয়েকটি

খামারে আঙ্গুর গাছের চাষাবাদ রয়েছে। আঙ্গুর গাছ খুব দীর্ঘজীবী ও এই গাছ সহজে মরে না। রাগিব আল-ইস্পাহানী (র.) বলেন, আঙ্গুর ফল এবং আঙ্গুর বৃক্ষ উভয়কেই ‘**عِنَبٌ**’ বলা হয়। এর একবচন ‘ইনাবাতুন **(عِنَبَةٌ)** বহুবচন আ‘নাবুন (أَعْنَابٌ)।[১৯] এর জাতভেদে নানা প্রকারের মনোজ্ঞ নাম রয়েছে। যথা-সম্পসন, সীডলেস, সুলতান, মাসকাড, বিউটি, পারলেট, ইন্ডিয়ান আরলি, খলিলি অন্যতম। আঙ্গুর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,[২০]

وَّعِنَبًا وَّ قَضْبًا -

“এবং আঙ্গুর ও শাক-সবজ্রি” আর পবিত্র কুরআনে আঙ্গুর সংক্রান্ত আলোচনা ১০ বার[২১] মতান্তরে ১১ বার[২২] এসেছে।

৩. জয়তুনের বিবরণ

ঐতিহাসিকদের মতে, জয়তুন বৃক্ষটি সর্বপ্রথম তূর পর্বতেই উৎপন্ন হয়েছিল। প্রায় ৫ হাজার বছরের পুরনো ফলজ উদ্ভিদ ও বৃক্ষ হিসেবে জয়তুন এখনো বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বেঁচে আছে। জয়তুন এক ধরনের ফল। যার বৈজ্ঞানিক নামঃ Olea europaea ।[২৩] জয়তুন গাছ একধরনের চিরহরিৎ বৃক্ষ। জয়তুন গাছ ৮-১৫ মিটার লম্বা হয়ে থাকে। এর পাতা ৪-১০ সে.মি. লম্বা ও ১-৩ সে.মি. প্রশস্ত হয়ে থাকে। জয়তুন ফল বেশ ছোট আকারের, লম্বায় মাত্র ১-১.২৫ সে.মি. লম্বা হয়ে থাকে। নুহ নবী (আ.) এর প্লাবনের পর পৃথিবীতে জন্মানো সর্বপ্রথম বৃক্ষটি হলো জয়তুন। যা আমরা বঙ্গদেশে সাধারণত জলপাই হিসেবে বলে থাকি। জায়তূন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,[২৪]

وَ التِّيْنِ وَ الزَّيْتُوْنِ -

“তীন এবং জয়তুনের কসম।” এছাড়াও জায়তূন সম্পর্কে যায়দ ইব্‌ন আকরাম (রা) বর্ণনা করেন,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَدَاوَى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ -

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে কুশতে বাহ্‌রী (চন্দন কাঠ) ও জায়তূনের তৈল দিয়ে নিউমোনিয়ার চিকিৎসা করার নির্দেশ দিয়েছেন।’[২৫] আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

كُلُوْا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ -

‘জায়তূন তৈল তোমরা খাদ্যেও ব্যবহার কর,গায়েও ব্যবহার কর। কারণ এটি হচ্ছে বরকত সম্পন্ন বৃক্ষের তেল।’[২৬] পবিত্র কুরআনে জায়তূন সংক্রান্ত আলোচনা ৬ বার মতান্তরে ৭বার এসেছে।[২৭]

৪. ডালিমের পরিচয়

বেদানা Punicaceae গোত্রীয় গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম Punica granatum[২৮] ইংরেজী নাম-Pomegranate. এটি এক রকমের রসাল ফল। হিন্দুস্তানি,ফার্সি ও পশতু ভাষায় একে আনার বলা হয়। কুর্দি ভাষা হিনার এবং আজারবাইজানি ভাষায় একে আনার বলা হয়। বেদানা গাছ গুল্ম জাতীয় ৫-৮ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। পাঁকা ফল দেখতে লাল রঙের হয়। ফলের খোসার ভিতরে স্ফটিকের মতো লাল রঙের দানা দানা থাকে সেগুলি খাওয়া হয়। ডালিমের বিশুদ্ধ নাম দাড়িম্ব। পবিত্র কুরআনে যতগুলো গাছের কথা সরাসরি উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে আনার ফলই সবচেয়ে সুন্দর ও শোভাযুক্ত। আনারের ফুল এমনকি এর বৃত্তিও হয় লাল টুকটুকে। ডালিমের আদি নিবাস ইরান ও ইরাক। ফলটি ইরানে অন্তত চার হাজার বছর আগে থেকে চাষ হয়ে আসছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের বেশির ভাগই মনে করেন, ডালিম গাছের আদি নিবাস হলো ইরান। বেদানা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,[২৯]

فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّ نَخْلٌ وَّ رُمَّان -

“সেখানে রয়েছে ফলমুল, খেজুর ও আনার।” আর আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেন,

الْجَنَّةَ فَإِذَا الرَّمَّانَةُ مِنْ رُمَّانِهَا مِثْلُ الْبَعِيْرِ الْمَقْتَبِ. (قَالَ نَظَرْتُ)

'আমি জান্নাতে তাকিয়ে দেখলাম যে, এর আনার সমূহের একটি আনারই বোঝাইকৃত উটের ন্যায়।'[৩০] পবিত্র কুরআনে বেদানা সংক্রান্ত আলোচনা ৩ বার এসেছে।

৫. যাক্কুমের পরিচয়

যাক্কুম এক ধরনের কণ্টকযুক্ত, ফলজউদ্ভিদ ও বৃক্ষ। আরবের তিহামা এলাকায় এ গাছ দেখা যায়। এর স্বাদ তিক্ত গন্ধযুক্ত। আল-মু'জামুল ওয়াফী অভিধানে যাক্কুম শব্দের অর্থ তিক্ত ফল বিশিষ্ট এক প্রকার কণ্টক বৃক্ষ।[৩১] এই গাছের ফল বিষাক্ত যা পাপীদের খাওয়ানো হবে। এটি ভাঙলে এর মধ্য থেকে দুধের মত সাদা পদার্থ বের হয়। আর এ পদার্থ যদি গায়ে লাগে তবে ফুলে ওঠে ও ফোস্কা পড়ে। আল কুরআনের বর্ণনা মতে, জাহান্নামীদের ক্ষুধা লাগলে যাক্কুম গাছের ফল খেতে দেয়া হবে।[৩২] অধিকাংশ গবেষক এবং তাফসিরবিদ মনে করেন, পৃথিবীর বুকে যাক্কুম গাছ নেই। আবার একটি অংশ মনে করেন, সুদান ও জর্ডানের কিছু অঞ্চলসহ মরুভূমিতে জন্ম নেওয়া ইউফরবিয়া আবিসসিনিকা নামক কাটাযুক্ত গাছই যাক্কুম গাছ। ভারতবর্ষে অতি পরিচিত ফণীমনসা গাছের সঙ্গে এই গাছের সাদৃশ্য রয়েছে।[৩৩] বিশ্রী মাথাবিশিষ্ট এ গুল্মের শাখা ও মোচাগুলো সাপের মাথার মতো হয়। হযরত ইবনে কুতাইবা (র.) এর মতে প্রতিবছরই যাক্কুমের মোচা ও শাখা বের হয়। কেউ কেউ এর মোচাকে তলউন নামেও অভিহিত করেন।[৩৪] ধর্মীয় চিন্তাবিদগণ এই গাছটিকে অভিশপ্ত গাছ হিসেবে মনে করেন।[৩৫] যাক্কুম গাছ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাবার তৈরি করে। দিনের বেলায় এদের পাতার রন্ধ্র বা stromata বন্ধ থাকে এবং রাতের বেলায় পাতার রন্ধ্র খোলা থাকে। Milk Barrel, Old Lady, Mother-in-law's chair, Prickly Pear, Torch thistle, Nipple Cactus সহ জাক্কুমের বিচিত্র নামের রয়েছে।[৩৬] যেমন-জাক্কুম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,[৩৭]

اَذٰلِکَ خَیۡرٌ نُّزُلًا اَمۡ شَجَرَۃُ الزَّقُّوۡمِ -

'আপ্যায়নের জন্য জাহান্নামীদের কাছে কতই না উত্তম কাঁটাযুক্ত জাক্কুম গাছ'। আর পবিত্র কুরআনে যাক্কুম সংক্রান্ত আলোচনা ৩ বার[৩৮] মতান্তরে [৪] বার[৩৯] এসেছে।

৬. কুল বা বরই

দক্ষিণ এশিয়ায় বহুল প্রচলিত কণ্টকপূর্ণ ফলজ উদ্ভিদ ও বৃক্ষের নাম হচ্ছে কুল বা বরই। বাংলাদেশের সর্বত্র,সর্বপ্রকার মাটিতেই বরই গাছ জন্মে। বর্ষাকালে এ গাছ মুকুলিত হয়। একটু ডিম্বাকৃতির বরইকে সচরাচর 'কুল' বলে অভিহিত করা হয়। বরই গাছ ছোট থেকে মাঝারি আকারের ঝোপাল প্রকৃতির বৃক্ষ। বরই গাছের স্বাভাবিক উচ্চতা ১২-১৩ মিটার। গাছের শাখা-প্রশাখায় কাঁটা থাকে। এর পাতাগুলি গোল ও ক্ষুদ্র। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ও ধর্মবেত্তা বলেন,"পরকালে কুল গাছের পাতা হাতির কানের সমান এবং এক একটি কুল একটি মটকার সমান।[৪০] কুল/বরই Rhamnaceae গোত্রীয় বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম- Ziziphus Mouritiana.।[৪১] ইংরেজীতে একে সচরাচর Jujube বা Chinese date আখ্যায়িত করা হয়। কোনো কোনো তাফসীরকারক কুল বা বরই গাছকে বদরিকা বৃক্ষ নামে অভিহিত করেন।[৪২] মহানবী (সা.) মি'রাজের সময় আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য সিদরাতুল মোনতাহা (কুল বা বরই গাছ) পর্যন্ত গিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।[৪৩] বিজ্ঞানীরা মনে করেন, দক্ষিণ ইউরোপ, ফিলিপাইন, ইন্দোচীন বা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কুলজাতীয় বৃক্ষের উদ্ভব হয়েছিল।[৪৪] কারো কারো মতে, ১০০০ বছর পূর্বেও চীনে কুল চাষাবাদ ছিল। আর কুল গাছের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فِیۡ سِدۡرٍ مَّخۡضُوۡدٍ 'তারা থাকবে কাঁটাবিহীন কুলগাছের নিচে'।[৪৫]

৭. কলার পরিচয়

মহান আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশতের নিয়ামতের বর্ণনায় যে সকল ফলজ উদ্ভিদ ও বৃক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে কলা অন্যতম। পবিত্র কুরআনে তিনি কাঁদি কাঁদি কলার কথা উল্লেখ করেছেন। কলা এক প্রকারের বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় ফল। সাধারণত উষ্ণ জলবায়ুসম্পন্ন দেশসমূহে কলা ভাল জন্মায়। তবে

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কলার উৎপত্তিস্থল হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত। বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বহুদেশে কলা অন্যতম প্রধান ফল। নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, ময়মনসিংহ, যশোর, বরিশাল, বগুড়া, রংপুর, জয়পুরহাট, কুমিল্লা, মেহেরপুর প্রভৃতি এলাকায় কলার চাষ হয়ে আসছে। বাংলাদেশে পার্বত্য এলাকায় বনকলা, বাংলাকলা, মামা কলাসহ বিভিন্ন ধরনের বুনোজাতের কলা চাষ হয়। কলম্বিয়া সহ ল্যাটিন আমেরিকান দেশ সমূহে কলা প্রধান অর্থকরী ফসল। শ্রী হরিমোহন মান্না-এর অভিমতে, বাংলাদেশে রামপালের কলা খুব প্রসিদ্ধ।[৪৬] কলার গাছ, পাতা, কাণ্ড সবই সবুজ। কাঁচাকলাও সবুজ, পেকে গেলে হলুদাভ বর্ণের হয়। কারো কারো মতে, কলা ভারতের নিজস্ব ফল। ভারত এবং ভারত মহাসাগরস্থ দ্বীপ এর স্বাভাবিক জন্মস্থান। তবে ইউরোপের জলবায়ুতে এ গাছ জন্মে না। কলা Musaceae পরিবারের একটি উদ্ভিদ।[৪৭] এর দুটি গুণ আছে যথা- Ensete ও Musa। Ensete গুণের মাত্র ৬-৭টি প্রজাতি আর Musa গুণের প্রায় ৪০টি প্রজাতি রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ১৯টি কলার জাত রয়েছে।[৪৮] আর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَّ طَلۡحٍ مَّنۡضُوۡدٍ 'আর কাঁদিপূর্ণ কলা গাছের নিচে'।[৪৯]

৮. তীন বা ডুমুরের পরিচয়

ডুমুর ফল বা গাছ ইসলামে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিবেচ্য বিষয়। পৃথিবীতে জান্নাতি ফলজ উদ্ভিদ ও বৃক্ষ হিসেবে যে কয়েকটি ফল গাছের বর্ণনা পবিত্র কুরআনে আছে তার মধ্যে ডুমুর অন্যতম। কুরআনে যে তীনের কথা উল্লেখ রয়েছে সেটির বৈজ্ঞানিক নাম- Ficus carica।[৫০] ফাইকাস দলভুক্ত ৮০০টি[৫১] বা ৮৫০টি[৫২] প্রজাতি রয়েছে। কুরআনে বর্ণিত তীন বা ডুমুর দেশীয় কাকডুমুর থেকে বড়। এ প্রজাতির গাছ, গুল্ম, লতা ইত্যাদি সম্মিলিতভাবে ডুমুর গাছ বা ডুমুর নামে পরিচিত। কুরআনে বর্ণিত তীন গাছ উচ্চতায় ১৫-১৬ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।[৫৩] ডুমুরের পাতা কর্কশ,গাঁয়ে লোমযুক্ত এবং এর কচি কাণ্ড খসখসে। তীন নরম ও মিষ্টিজাতীয় ফল। জনশ্রুতি আছে দার্শনিক প্লেটো ডুমুর ফল খুব পছন্দ করতেন।[৫৪] আর আরবীয়রা এটি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতো। ডুমুর ফলটি পশ্চিম এশিয়া, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে। ভোজ্যফল হিসাবে এখানে কমপক্ষে ৫০০০ বছর আগে থেকে ডুমুরের চাষ হয়ে আসছে।[৫৫] কেউ কেউ বলেছেন, জান্নাতে হযরত আদম (আ.)-কে ত্বীন ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল। আবার কারো মতে, পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বে জান্নাতে থাকা অবস্থায় আদম (আঃ) ত্বীন গাছের পাতা দ্বারা নিজের লজ্জাস্থান ঢেকে ছিলেন। আর কারো কারো মতে, নূহ (আঃ) এর প্লাবনের সময় তার নৌযানটি যে স্থানে আটকে গিয়েছিল সেই স্থানে যে সকল উদ্ভিদ জন্মেছিল তা ত্বীন নামে পরিচিত।[৫৬] তবে কুরআনে যে তীনের উল্লেখ রয়েছে তা আমাদের দেশে নেই।[৫৭]। আর ত্বীন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَالتِّيۡنِ و الزيتون 'কসম তীন (ডুমুর) ও জয়তুন এর।'[৫৮] পবিত্র কুরআনে ডুমুর সংক্রান্ত আলোচনা ১ বার[৫৯] এসেছে।

৯. মাকাল

মাকাল একটি Cucurbitaecae গোত্রীয় বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইংরেজীতে এটির নাম Colocynth, Cucumber। বৈজ্ঞানিক নাম- Citrullus colocynthis।[৬০] ফলটিকে আরবিতে হানজাল, সংস্কৃতে দেব দালিকা এবং হিন্দিতে ইন্দ্রায়ন বলা হয়। উদ্যানতত্ত্ববিদ উইলিয়াম মিথিউস মাকালকে অন্তঃসারশূন্য ফল বলে অভিহিত করেছেন। পৃথিবীতে এই জিনিসের বিয়াল্লিশটি প্রজাতি পাওয়া যায়। এর মধ্যে বাংলাদেশে দেখতে পাওয়া যেত প্রায় ১২টি প্রজাতি। বর্তমানে ৫ প্রজাতির দেখা মেলে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে মাকাল গাছে সাদা ধবধবে ফুল ধরে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল সম্পূর্ণ পরিপক্ক হয়। মাকাল ফল দেখতে গোলাকৃতির। কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ, কিছুদিন পর হলুদ ও ফলটি পাকার পরে লাল রং ধারণ করে । পবিত্র কুরআনে মাকাল ফল বা গাছকে নিকৃষ্ট ও অপবিত্র গাছ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।[৬১] একটি পরিপূর্ণ মাকাল গাছ লম্বায় ৩০ থেকে ৪০ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। মাকাল বৃক্ষটির জন্মস্থান তুর্কি।[৬২] তুর্কি থেকে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে এ গাছটি বিস্তার লাভ করে। আর মাকাল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ-

'আর অপবিত্র বাক্যের উপমা নিকৃষ্ট বৃক্ষের ন্যায়, যাকে মাটির উপর থেকে সমূলে উপড়ে ফেলা হয়েছে, যার কোনো স্থিতি নেই।[৬৩] পবিত্র কুরআনে মাকাল সংক্রান্ত আলোচনা ১ বার[৬৪] এসেছে।

১০. আপেলের বিবরণ

আপেল এক প্রকারের বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। এর উচ্চতা প্রায় ১২ মিটার। এটি Rosa ceae গোত্রের Malus domestica প্রজাতিভুক্ত। বৈজ্ঞানিক নাম Pyrusmalus[৬৫] অনেক সংস্কৃতিতে আপেলের ধর্মীয় এবং পৌরাণিক তাৎপর্য রয়েছে, এদের মধ্যে নর্স, গ্রীক এবং ইউরোপীয়ান খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্য অন্যতম। হাজার হাজার বছর ধরে এশিয়া এবং ইউরোপ জুড়ে আপেলের চাষ হয়ে আসছে। আপেলের আদি নিবাস মধ্য এশিয়া।[৬৬] কারোকারো মতে, আপেলের আদি বাসভূমি ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়া।[৬৭] এটি প্রায় ৩০০০ বছরেরও বেশি পুরনো ফল। জনশ্রুতি আছে রোমানরা ২২ প্রকার আপেল ব্যবহার করত। তবে আজকাল প্রায় ৬৫০০ রকমের আপেল উৎপাদিত হয়। আর আপেল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَ قُلْنَا يَادَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا - وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ -

'আর আমি বললাম, হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তা থেকে আহার কর স্বাচ্ছন্দ্যে, তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী এবং এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না,তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।[৬৮] পবিত্র কুরআনে আপেল সংক্রান্ত আলোচনা সূরা বাকারার ৩৫ নং আয়াতে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে ১ বার এসেছে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, মানুষের প্রাচীন খাদ্যের মধ্যে ফল অন্যতম। আর এই পৃথিবীতে বসবাসের জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যত নিয়ামত দান করেছেন তার মধ্যে এই ফলজ উদ্ভিদ ও বৃক্ষরাজী অন্যতম । আর প্রতিটি ফলজ উদ্ভিদ ও বৃক্ষের পুষ্টি মানুষের দৈহিক শক্তির মূল উৎস।[৬৯] পুষ্টিবিদগনের অভিমতে, উপরে আলোচিত প্রতিটি ফলজ উদ্ভিদেই প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও পুষ্টিমান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি, ভিটামিন-সি, ভিটামিন-ডি, ভিটামিন-কে, প্রোটিন, শর্করা, চর্বি, ক্যালসিয়াম, লৌহ অন্যতম প্রধান। এছাড়াও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ যেমন- পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, জিংক, কপার, ফ্যাট, আইরন, ম্যাঙ্গানিস ও এন্টিঅক্সিডেন্ট ইত্যাদিও রয়েছে প্রচুর পরিমানে। আর বহুমাত্রিক পুষ্টিমানের কারনে সারাবিশ্বে এসব উদ্ভিদ ও তার ফলের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। আল কুরআনের দৃষ্টিতে এসব ফলজ উদ্ভিদ ও বৃক্ষরাজীর গুরুত্ব ও উপকারিতা অপরিসীম এবং এ সবই আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত।

তথ্যনির্দেশ

[১]. সূরা 'আবাসা,আয়াত : ২৪-৩২।

[২]. সূরা নাহল, আয়াত : ১১ ।

[৩]. মোহাম্মদ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৫।

[৪]. তদেব , পৃঃ ১৬৬।

[৫]. Ashwini Kumar Dixit "*Plants in the Holy Quran: A look*" world journal of pharmacy and Pharmaceutical sciences, vol-4, Bilashpur, Guru Ghasidas Central University, India, 2015, page: 715.

[৬]. M. I. H. Farooqi, *Plants of the Quran* (Golagonj: Sidrah Publishers, 9th Edition), page: 1; 'Contributions of Medieval Arab Muslim Scientists to Botany and Agriculture', PHD Thesis Paper, Islamic Studies Department, Aligarh Muslim University, 2008, page: 4.

[৭]. Lytton John, Musselman "*Trees in the Quran and Bibel*" Unasylva, vol-54, Department of Biological Sciences, Old Dominion Unviersity, Verginia, 2003, page: 45.

[৮]. আতাউর রহমান খসরু, *আল কুরআনের ফল ও বৃক্ষগুলো*, Ourislam24.com, মার্চ ২৯, ২০১৭ খ্রি. পৃ. ১৩।

[৯]. ড. এস. এম. লুৎফর রহমান, *বাংলাদেশী লোক-চিকিৎসা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, জুন ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ২৭৯ ; গোলাম মুরশিদ, *বিবর্তন মূলক বাংলা অভিধান-১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৮ ।

[১০]. ড.রুহী বা'লাবাক্কী ও ড. মুনীর বা'লাবাক্কী, *আল-মাওরিদ,আরবী-ইংরেজি* (বৈরূত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৯৯ খৃ.), পৃ. ১১৬৩।

[১১]. ড. মুহাম্মদ ইকতেদার হোসেন ফারুকী, *বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে কুরআনে বর্ণিত উদ্ভিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯ ; প্রফেসর মোহা: ওয়াহিদুজ্জামান ও অন্যান্য, *স্নাতক উদ্ভিদবিজ্ঞান* -২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০ ; মোঃ আজহারুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

[১২]. আল-কুরআন, সূরা মারইয়াম, আয়াত ২৫।

[১৩]. মোঃ রেজাউল করীম, *আল-কুরআনে খাদ্য ও পানীয়*, অপ্রকাশিত পি-এইচ-ডি, অভিসন্দর্ভ, ২০১৩, খৃ. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, পৃ. ২১৪ ; আবু তাহের মেসবাহ, *আল-মানার* (ঢাকা: নিউ মোহাম্মদী কুতুবখানা, ২০১৫), পৃ. ২৮২ ; মো: রফিকুল ইসলাম, *পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে মুহাম্মদ (সাঃ)* (ঢাকা: পিস পাবলিকেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৬০-৬১।

[১৪]. আল্লামা জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন মোহাম্মদ আল মুহুল্লী, *তাফসীরে জালালাইন*, (সপ্তম খণ্ড),অনু: মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসুম (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, আগস্ট ২০১০),পৃ. ৩৩৮ ; ইমাদুদ্দিন ইব্ন কাছীর,*তাফসীরু ইব্ন কাছীর*,(৮,৯,১০, ১১ খন্ড), অনুবাদ ড. মুহাম্মদ মজীবুর রহমান (ঢাকা: হুসাইন আল মাদানী, ৩য় সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), পৃ.১৩১।

[১৫]. সূরা আল-কাফ, আয়াত : ১০।

[১৬]. মুহাম্মদ হুসাইন ইব্ন মাস'উদ আল-বাগাভী, *মা'আলিমুত্-তানযীল*, ৫ম খণ্ড (বৈরূত:দারুল-ফিক্র, ১ম সংস্করণ,১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৭৪।

[১৭]. মো. আনোয়ারুল ইসলাম, *আল-কুরআনে ফল-মূল ও শাকসবজি: একটি তাত্বিক বিশ্লেষন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২ ; ড. মুহাম্মদ ইকতেদার হোসেন ফারুকী, *বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে কুরআনে বর্ণিত উদ্ভিদ*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৮; মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬ ; ROHMA , *CONTRIBUTIONS OF MEDIEVAL ARAB-MUSLIM SCIENTISTS TO BOTANY AND AGRICULTURE*, Ibid, পৃঃ ৪৬ ।

[১৮]. আবুল কালাম আজাদ, *অর্থনৈতিক উদ্ভিদবিদ্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

[১৯]. মূল আরবী ভাষ্য- **اَلْعِنَبُ يُقَالُ لِثَمْرَةِ الْكِرْمِ، وَلِلْكَرْمِ نَفْسِهِ، اَلْوَاحِدَةُ عِنَبَةٌ وَجَمْعُهُ أَعْنَابٌ**
দ্র. রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাতা ফী গারীবিল কুর'আন* (মিশর: মাকতাবাতুল তাওফীকিয়্যাহ্, তা.বি.), পৃ. ৩৫২।

[২০]. সূরা 'আবাসা, আয়াত : ২৮।

[২১]. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

[২২]. M.I.H.Faooqi, *Plants of Quran* (India: Sidrah Publishers, 9th Edition, Date not identify), page: 1-2.

[২৩]. তদেব, পৃ. ১৪৬ ; https://bn.wikipedia.org/wiki/ জয়তুন তারিখ: ৩১/০৪/২০২১ খ্রি. ।

[২৪]. সূরা আত-ত্বীন,আয়াত : ১।

[২৫]. *জামি'উত্-তিরমিযী*, কিতাবুত্-তিব, বাবু মা জা'আ ফী দাওয়াই যাতিল-জানব, হাদীস নং ২০৭৯, পৃ. ৫৮৪।

[২৬]. *পূর্বোক্ত*, কিতাবুল আত'ইমাহ্, বাবু মা জা'আ ফী আকলিয্-যায়ত, হাদীস নং ১৮৫২, পৃ. ৫৩২।

[২৭]. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫ ; M.I.H.Faooqi, *Plants of Quran*, Ibid, page: 1-2.

[২৮]. https://bn.wikipedia.org/wiki/বেদানা তারিখ: ১১/০৫/২০২১ খ্রি. ।

[২৯]. সূরা আর-রহমান,আয়াত : ৬৮।

[৩০]. কাযী সানাউল্লাহ্ মুহাম্মাদ পানিপথি, *তাফসীরে মাযহারী*, ১০ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৪২৫ হি./২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৬৭৪।

[৩১]. ড. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফি* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.),পৃ. ৪৪৩।

[৩২]. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন*, ১২ তম খন্ড, অনু: হাফেজ মনির উদ্দিন আহম্মদ (ঢাকা: আল কুরআন একাডেমী লন্ডন, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.),পৃ. ২৬০ ; ইমাদুদ্দিন ইব্ন কাছীর, *তাফসীরু ইব্ন কাছীর*, ১৬তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

[৩৩]. কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত বৃক্ষরাজি, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি,২০২০ খ্রি.; তাফসীরে মারেফুল কোরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪৭।

[৩৪]. *তাফসীরে জালালাইন*, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১।

[৩৫]. আবূ আব্দিল্লাহ মোহাম্মদ বিন ইসমাইল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*-৫ম খণ্ড (বৈরুত: দারু তাওকুন নাজাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি), পৃ.৫৪।

[৩৬]. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

[৩৭]. সূরা আস-সাফফাত, আয়াত : ৬২।

[৩৮]. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

[৩৯]. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

[৪০]. আবুল কালাম আজাদ,*অর্থনৈতিক উদ্ভিদবিদ্যা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৯৮; https://bn.wikipedia.org/wiki/কুল_(ফল)তারিখ: ২১/৪/২১ খ্রি.।

[৪১]. *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, ২০তম খন্ড,প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯ ; *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২৬।

[৪২]. *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, উনিশ তম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫; আশরাফ আলী থানভী (রহ.) মিরাজ ও বিজ্ঞান, (ঢাকাঃ রশীদ বুকহাউজ, তাবি.) পৃ.১১৭।

[৪৩]. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২।

[৪৪]. সূরা আল-ওয়াকি'য়া,আয়াত : ২৮।

[৪৫]. দেবব্রত মিত্র ও অন্যান্য, *উদ্ভিদবিজ্ঞান ২য় খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪২; শ্রীহরিমোহন মান্না, *ফলের বাগান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬ ।

[৪৬]. ড.এস.এম. লুৎফর রহমান, *বাংলাদেশী লোক-চিকিৎসা*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৭।

[৪৭]. https://ubinig.org/index.php/nayakrishidetails/showPlantDetails/1071/bangla তা. বি.।

[৪৮]. সূরা আল-ওয়াকি'য়া,আয়াত ; ২৯।

[৪৯]. ড.এস.এম. লুৎফর রহমান, *বাংলাদেশী লোক-চিকিৎসা*,প্রাগুক্ত,পৃ.২৮০।

[৫০]. কুরআনে বর্ণিত তীন ফল : একটি ভ্রান্তির অপনোদন, দৈনিক অধিকার, ঢাকা, তারিখ: ০৫ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি.।

[৫১]. https://bn.wikipedia.org/wiki/ডুমুর তারিখ: ১৫/০৫/২০২১ খ্রি.।

[৫২]. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

[৫৩]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, *ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬।

[৫৪]. মুহাম্মদ আবু তালেব, *সাইন্স ফ্রম আল কুরআন*, (ঢাকা: র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স, ২০০৯খ্রি.) পৃ. ৩৮৭।

[৫৫]. *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, ২১তম খন্ড,প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৫; *তাফসীরে জালালাইন*, সপ্তম খন্ড,প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১২।

[৫৬]. কুরআনে বর্ণিত তীন ফল : একটি ভ্রান্তির অপনোদন, দৈনিক অধিকার, ঢাকা, তারিখ: ০৫ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি.।

[৫৭]. সূরা আত-ত্বীন, আয়াত : ১।

[৫৮]. মোঃ আজহারুল হক,*কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫; M.I.H.Faooqi, *Plants of Quran* ,Ibid, page: 1-2.

[৫৯]. অন্তঃসারশূন্য নয় মাকাল ফল, সাপ্তাহিক ২০০০, বর্ষ ১৭, ঢাকা, তা. বি.।

[৬০]. *তাফসীরে জালালাইন*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫।

[৬১]. অন্তঃসারশূন্য নয় মাকাল ফল, সাপ্তাহিক ২০০০, বর্ষ ১৭, ঢাকা, তা. বি.।

[৬২]. সূরা ইব্রাহিম, আয়াত : ২৬।

[৬৩]. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

[৬৪]. আবুল কালাম আজাদ,*অর্থনৈতিক উদ্ভিদবিদ্যা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৭৮; https://bn.wikipedia.org/wiki/, আপেল, তারিখ: ১৫/৫/২০২১ খ্রি.।

[৬৫]. https://www.kishorgonj.com/, আপেলের-জানা-অজানা-কাহিনী/ তারিখ: ১৩/১১/২০১০ খ্রি.।

[৬৬]. আবুল কালাম আজাদ, *অর্থনৈতিক উদ্ভিদবিদ্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

[৬৭]. সূরা বাকার,আয়াত : ৩৫।

[৬৮]. মাহমুদুল হাসান নিজামী, *সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিজ্ঞান* (ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ১০৮।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

Role of Bangabandhu Dissemination of Religion, Islamic Civilization & Culture

Gulshan Akter*

Abstract: Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was a true believer in Allah with a generous spirit. He was the real guardian of Islam in the country. Bangabandhu was always trying to make Bangladesh a country of peace for the people of all religions. Every step taken for the overall welfare of the country and the nation during the short reign of Bangabandhu was in accordance with the religious sentiments and values of the Muslim majority. He took practical and effective multifaceted measures to spread Islam. He is the great architect of an independent-sovereign state, as well as the architect of the propagation of Islam under government sponsorship in Bangladesh. The father of the nation never wanted to use religion for political purposes. He fought a lifelong struggle to ensure the right of all people to their own religion in the state. However, the outstanding contribution he has made in promoting and spreading Islam among the people of independent sovereign Bangladesh during his rule is rare even in the contemporary Muslim world. This article aimed at focusing the precious role of our father of the nation in advancement of religious values specially Islamic Civilization & Culture in Bangladesh.

Introduction

Islam is the only complete and perfect way of life chosen by Allah Ta'ala. It started with the first father of the human race, Hazrat Adam (AS) and reached its completion with the last and greatest Prophet and Messenger, Hazrat Muhammad (PBUH). Islam is the name of a unique way of life. Islam has a fair family, society, state, finance, national and international policies. Islam seeks to implement a peaceful, pure and balanced way of life. Islam does not in any way support giving too much importance to any aspect or aspect of human life and destroying the natural balance. Ibadat-Bandegi, ritual-behavior, conduct-morality, transaction-dealing, business-trade In a word, it is not at all acceptable to Islam to do anything at any level of life which harms faith and humanity. Islam is a religion of peace and harmony. Islam encourages us to love others as ourselves. Islam encourages people to play an active role and make sacrifices for the welfare of themselves, relatives, society, homeland and believers. That is why peace descends on the life of the people of the world and dispels turmoil, hatred and strife. The teaching of Islam is that there is no discrimination between people. Black and white, all people are servants of Allah. All mankind belongs to the same family. The Prophet (PBUH) said:

الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ

"All creation is like the family of God."[1]

Actually human race is like a body. Because we are all children of Adam and Eve. Allah Ta'ala declares,

---

* M. Phil. Fellow, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنَدَ خَدَهَ عَبَلِ اللَّهِ

> "Hey man! We created you from a male and a female, then divided you into different nations and tribes, so that you may know each other. Among you, the one who is the most trustworthy is the one who is more honorable in the sight of Allah. Surely Allah knows all things, knows all things." [2]

People need living and natural resources to live their daily life. Therefore, with the aim of peace and prosperity on earth, Islam has not only ordered to show kindness to humanity, but has also given importance to the care of animals, the proper use of natural resources and plants. Narrated by Hazrat Abdullah Ibn Amr (RA). The Holy Prophet (PBUH) said:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا اَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَ مَسَمُاء فَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو .

> "Allah the Merciful has mercy on those who show mercy. Be kind to the people of the earth, then the people of the sky (Allah) will be kind to you."[3]

Islam deals with all aspects and categories of human life. Islam is not just a faith-based religion. Rather, it is the practical expression of a balanced combination of faith and action. Therefore, Islamic education has immense importance, dignity, virtue and goals and objectives.

Definition of Islam

The word Islam is derived from the word silmun (سِلْمٌ), which is the Masdar of Baba Ifal.[4] Islam and Istislam means obedience.[5] The literal meaning is to submit,[6] obey, follow, return, surrender,[7] go to peace, compromise or avoid conflict.[8] Badruddin Al-Ayni (RA) said,

الْإِسْلَام فِي اللُّغَة النقياد والذعان

"The literal meaning of Islam is submission."[9]

Dr. Ruhi al-Ba'labaqi said,

الإِسْلاَمُ : خضوع, إنقياد, رجيع, استسلام.

"Islam is obedience, submission, return, surrender."[10]

In Shariah terms, Islam means obedience or obedience to Allah and complete submission to Him.[11]

In terms of Hadith, Islam is,

الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .

> "Islam is bearing witness that there is no god but Allah and that Muhammad is the Messenger of Allah, establishing prayer, giving zakat, fasting and performing Hajj for those who are able."[12]

Ibn Manjur Al-Ifriqi (R) (died 630 AH) said,

وَالإِسْلاَمُ مِنَ الشَّرِيْعَةِ اِظْهَارُ الْخُضُوْعِ وَإِظْهَارُ الشَّرِيْعَةِ وَإِلْتِزَامُ مَا أُتِىَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِذَالِكَ يُحْقَنُ الدَّمُ وَيُسْتَدْفَعُ بِهِ الْمَكْرُوْهُ .

"Islam in the terms of the Shari'ah is to express obedience, to openly observe the commandments of the Shari'ah and to hold on to what the Prophet (PBUH) has brought. And by this means his blood is preserved and saved from undesirable things."[13]

Muhammad Ali at-Tahanuvi (R) (died 1158 AH) said,

وَيُطْلَقُ فِيْ الشَّرْعِ عَلَى الإِنْقِيَادِ إِلى الأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ

"Islam is called observance of deeds in the terms of the Shari'ah." [14]

Because the Prophet (PBUH) said,

الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلاَتُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلواةَ اَلْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ.

"Islam is, 'You shall worship Allah, associate no partners with Him, establish obligatory prayers and observe the fast of Ramadan."[15]

Sayed Amir Ali said,

"Islam is not a mere creed. It is a life to be lived in the present, a religion of right doing, right thinking and right speaking, founded on divine love, universal charity and the equality of man in the sight of the lord."[16]

Sayyid Muhammad Rizvi said,

"Islam is a religion which guides its followers in every aspect of their lives, It is a way of life, Islam is the modern or latest version of the message sent by God through Adam, Noah, Abraham, Moses and Jesus, Islam was sent to mankind through prophet Muhammad. Islam is 'Modern' in the sense that is has come to complement the teachings which were introduced through Moses."[17]

The main point of this hadith is that Islam in the eye of Shari'ah is to observe the visible deeds, to perform all the obligatory deeds and to refrain from the forbidden deeds. In view of this meaning, Islam is the opposite of faith. Because real faith can be obtained through obedience of the heart apart from performance of actions.

Definition of Religion

Religion is the manifestation of the natural consciousness of the human mind, Which the great Creator has placed in their hearts as a deposit (الامانة). Every human mind seeks its Allah. Wants to solve every problem in life. Throughout the ages, Allah has sent revelations to awaken those consciousnesses to solve the problems of human life. The religion with which every prophet-messenger came into the world is called Islam. On the other hand, this word is also used as a special title of the religion of Hazrat Muhammad (sw). But Islam of the earlier Prophets was for a limited time and for a specific age. That Islam was still not acceptable to anyone except the ummah of that class. What the new prophet used to bring with him was the Islam of that time. There would be no fundamental change in it, only the branch rules would be different. There would be no fundamental change in it, only the branching rules would be different.

The last Prophet Muhammad was given Islam as a religion. This is unchanged, which will last till the Day of Resurrection. According to the aforesaid principle, all previous religions have been abolished since its advent.

The word Dharma is Bengali. English Synonym Religion.Arabic synonym Deen (دين).

The word Deen (Religion) has been used in eighty places in Al-Quranul Kareem.It means obedience, way of life, path-method, law, rules, etc.Here are some verses about the religion mentioned in Al-Quranul Kareem:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.

"And whoever bows his head before the command of Allah and follows the religion of Ibrahim (Abraham).Who has a better religion than the one who was devoted? And Allah has accepted Abraham as a good friend."[18]

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ.

"Say: I am commanded to serve Allah with sincere devotion."[19]

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

"If anyone wants to convert to a religion other than Islam, it will never be accepted and he will be among the losers in the Hereafter."[20]

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ.

"Surely Islam is the only religion (way of life) with Allah."[21]

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.

"Your religion (path and method) is yours, my religion (path and method) is mine."[22]

وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ.

"Do not let Allah's mercy affect you in carrying out His commandments."[23]

وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ.

"And the promise given to you is surely true. And surely the qiyamah is inevitable."[24]

"Deen, in terminology, is a divine driving force, through which the sages seek the good of the present and the welfare of the future."[25]

Rushdie Ilyan said that,

اَلدِّيْن هو توجيه الإنسان سلوكه، وفقًا لشعوره بصلة بين روحه وبين روح خفية، يعترف لها بالسلطان عليه وعلى سائر العالم، ويطيب له أن يشعر باتصاله بها.

"Deen is the instruction of human behavior, which he realizes through his association with his own soul and subtle soul, recognizing that the subtle soul has authority over all these worlds and enjoys the feeling of union with him."[26]

Dr. Muhammad Kamal Zafar said that,

إِنَّ الدِّيْن هُوَ الإِيْمَان بِذَاتِ إِلهية جديرة بالطاعة والعبادة والتصرف والسلوك بناءاً عَلَى مقتضيات هذا الإيمان فرديًا وَاجتماعيًا.

> "Deen is the name of faith in the divine entity suitable for obedience and worship, the individual and the group determines all their conduct according to the demands of faith."[27]

Dr. Mahmud Ibn Abdur Rahman said that,

اعتقاد إلهية ذات أو ذوات، ومجموعة السلوك الذي يدل على الخضوع لتلك الذات أو الذوات ذلاً وحبًا ورغبة ورهبَة.

> "Deen is the belief in one or more holiness and the names of some of the behaviors which express love, humility and hope, fear etc. towards that entity."[28]

In the end, religion is a combination of two things: 1. Belief in a divine being. 2. The reflection of that belief in all the activities of the individual and the community.

People are social creatures. All the activities that take place in the society have a profound effect on the human mind. If the society is left without any hindrance and without any guidance, then the social system will collapse. In this situation, it is possible to get all the unjust behaviors and bad practices and activities that take place in the society only through one day. Allah said that,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

> "He is the One who has sent His Messenger with the right guidance and the true religion, so that he may be able to conquer all other religions."[29]

Islamic Civilization & Culture

Islam originated and has developed in an Arab culture, other cultures which have adopted Islam have tended to be influenced by Arab customs. Thus Arab Muslim societies and other Muslims have cultural affinities, though every society has preserved its distinguishing characteristics. Islamic culture inherited an Arab culture born in the desert, simple but by no means simplistic. It has an oral tradition based on the transmission of culture through poetry and narrative. However, it has been the written record that has had the greatest impact on civilization. Islam civilization is based on the value of education, which both the Quran and the Prophet stressed.

Islamic culture and Muslim culture refer to cultural practices which are common to historically Islamic people. The early forms of Muslim culture, from the Rashidun Caliphate to the early Umayyad period and the early Abbasid period, were predominantly Arab, Byzantine, Persian and Levantine. With the rapid expansion of the Islamic empires, Muslim culture has influenced and assimilated much from the Persian, Egyptian, North Caucasian, Turkic, Mongol, Indian, Bangladeshi, Pakistani, Malay, Somali, Berber, Indonesian, and Moro cultures.

Islamic culture generally includes all of the practices which have developed around the religion of Islam. There are variations in the application of Islamic beliefs in different cultures and traditions.

Basically, Muslim Culture represents the unification of all the cultures influenced by common beliefs and practices. The guiding religious phenomena and cultural aspects bind its people historically. The religious practices and beliefs of Muslims are centered around the religion of Islam. The original Muslim literature is in Arabic, the

prophet's language. Most of the literature is religius in nature. It comprises communication and documentation of the belief system from the Quran, Sirat and Hadith.

Definition of Civilization

Civilization is a set of features including scientific, cultural, literary, and social advancement in a society or in similar communities. So, it is a sublime stage of human evolution.

The meaning of Islamic Civilization

The basic assumption that we can build, that civilization comes from the word adab which in this sense implies manners, behaviour or manners. Thus civilization is all the manners and manners that are manifested by Muslims from time to time both in other political, economic and social realities.

Literally Islamic Civilization is a translation of Arabic *al-khadlarah al-Islamiyah*, or *al-madaniyah al Islamiyah* or *al-tsaqofah al Islamiyah*,[30] which is often also translate into Islamic culture. In English this is called culture, there are those who call it civilization. In Indonesia, Arabic and the West there are still many who synonymize civilizations and cultures.

On other hand, the root word madana was born with a noun tamaddunwhich literally means civilization (civilization) which means also a city based on culture (city base culture) or city culture (cultural of the city). Among Arab writers, themselves. The word tamaddun is used ... if not mistaken ... for the first time by Jurji Zaydan in a book Title Tarikh *al-Tamaddan al-Islami* (History of Islamic Civilization), published in 1902-1906. Since then tamaddun's words have been used widely among Muslims.[31]

In the Malay Word *tamaddun* is used for understanding civilization. In Iran people are slightly different using the terms *tamaddun* and *madaniyat*. But in Turkey people use the roots of *Medina* or *Madana* or *Madaniyyah* using the terms *Medeniyet* and *Medeniyeti*. The Arabs themselves today use the word *hadharah* for civilization, but the word is not widely accepted by non-Arab Muslims who question the term *tamaddun*. On the Indo-Pakistani continent *tamaddun* is used only for culture, while civilization uses the term *tahdhib*.

The word civilization is often associated with culture,even many western writers identify the 'culture' and 'civilization' of Islam. Often times Islamic civilization is associated with Arab civilization, although actually between Arabic and Islam can still be distinguished. The difference between these cultures is the increase in civilization in the time of ignorance that originated from ignorance. This ultimately changed when Islam came brought by the Prophet Muhammad in Arabia. So that in his later days Islam developed into a civilization that merged with the Arabs, even growing rapidly in other parts of the world, Islam is not just a perfect religion but the source of Islamic civilization. Civilization is a culture associated with science and technology where the culture not only influences in the area of origin, but also affects other areas that make the culture develop.

By referring to the narrative above, it can be conceived that the History of Islamic Civilization is a product of the activities of the life of Muslims in the past that really

happened in aspects of politics, economics, and technology sourced from the values of Islamic teachings. Thus it can be said that Islamic civilization has been the identity of the Islamic ummah since the past.

The period of the advent of Islam was the period which formulated man inside the Arabian Peninsula, established the blocks of a new civilization that brought people out of darkness to light, and placed the bases for building man in Islam. Revelation was the core of formulating the creeds and ideas of an individual, purifying him, creating links, and establishing the building upon which the entire nation is based. Allah has said the truth when He said:

> يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
>
> "Indeed, there has come to you from Allâh a light (Prophet Muhammad peace be upon him) and a plain Book (this Qurân). Where with Allah guides all those who seek His Good Pleasure to ways of peace, and He brings them out of darkness by His Will unto light and guides them to a Straight Way (Islamic Monotheism)."[32]

Identity of Islamic Culture

In anthropology, culture is a form of expression about the deep passion of a society. While the manifestation of the mechanical progress of technology are thus more related to the conception of civilization. If culture is more reflected in art, literature, religion and morals, civilization is reflected in politics, economics and technology. Culture has three forms: First, Ideal being, which is a form of culture as an individual complex, ideas, values, norms, rules and so on.

Second, the manifestation of behavior, namely the manifestation of culture as a patterned behavior activity complex form humans in society.

Third, The form of objects, namely the manifestation of culture as objects of work.

Experts agree that culture is all the work, initiative and creativity of society. The work of society will produce material technology and culture that humans need to master the sorrounding environment, so that the strength and results can be enshrined for the needs of society. Karsa is the driving force (Drive) to motivate people to think of everything in front of them and their environment. Besides that, Karsa community can create norms and values that are very necessary for order in society. To deal with bad forces, humans are forced to protect themselves by creating rules that are essentially institutions on how to act apply and in social life.

Professor Dr. Ammad Muhammad Jamal Said,

> اَلثَّقَافَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ عَلَى أَسَاسِ أَنَّهَا الْمَفَاهِيْمُ الصَّحِيْحَةَ عَنِ اللهِ وَالْكَوْنِ وَالإِنْسَانِ وَالْحَيَاةِ.
>
> "Fundamentally, Islamic culture implies a correct understanding of Allah, the world, life and people."[33]

According to Dr. Abdur Rauf,

> "Islamic culture is an interpretation of the will of god as conveyed to humanity through the agency of the Prophets starting with Adam (a.s) and culmination in Muhammad (PBUH)."[34]

Culture in every nation or society consists of large elements and small elements which are part of a whole that cannot be separated According to Selo Soemarjan and Soelaiman cultural elements include: technological tools, economic systems, family and political power. While the elements of culture according to C. Kluckhon ... as quoted by koentjaraningrant ... are:

- Equipment and supplies for human life (clothing. houses, transportation equipment)
- Livelihoods and economic systems
- Community systems (kinship, organisational, political, legal systems)
- Language (oral and written)
- Art (fine art, sound art, and the art of motion)
- Knowledge system
- Religion (belief system).

Effat al-Sarqawi said that culture is a form of expression of deep inthusiasm from a value that is contained and ingrained in a society. While the manifestations of mechanical progress and technology are more related to civilization. Furthermore Sharqawi argues that culture is what we long for (ideal), while civilization is what we use (real). In other words, culture is reflected in art, literature, religion and morals.Where as civilization is reflected in politics, economics and technology.

In anthropology studies, we know the understanding of culture in particular and in general. According to special understanding, culture is a human product in the field of art and unique customs. Whereas culture in the general sense in the product of all aspects of human life which include: social, economic, political, philosophical, artistic and religious knowledge.

Tylor, a British scientist. formulates culture as a complex whole that include knowledge, art dogma, moral values, law, tradition, social and all human products in his position as members of society, including in this reality is religion.

The meaning of Islamic Culture is a way of thinking and feeling that Islam states itself in all aspects of life from a group of people who form social unity in a space and at this time integralistic. placing Islam as a source of value and motivation for the growth of Islamic culture. Thus what is meant by Islamic Culture History is a product description of the activities of the life of the Islamic ummah in the past that originated in Islamic values. It's just that in the various treatises of existing literary texts often the author gives his narrative in terms of politics. It is assumed that conceptually, from this political side, the source of Islamic culture revolves.

Role of Bangabandhu in Dissemination of Islamic Civilization & Culture

Politics with religion has caused a lot of bloodshed in human history. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's politics started on the basis of religion. So he had experience in politics. Hindus, Buddhists and Christians constitute 12% of the minorities in Bangladesh. If the state is based on religion, they will become second class citizens. Therefore, Sheikh Mujib included secularism in the constitution to strengthen national unity. Secularism does not mean to became irreligious but it neans that. Every community will be able to practice their religion freely. He adopted the

principle of secularism without bringing Islam, the religion of peace and tranquility, into politics.[35]

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was a very devout Muslim. He was always busy in establishing and upholding the Islamic ideology, creed and its civilijation & Culture. He sustained his life according to Islamic rules including regular prayers, fasting, recitation of Al-Quranul Kareem. There are no rules for killing people of different religions.

During the reign of Khwaja Nazimuddin, thousands of people were killed in a horrific communal riot in Punjab from the *anti-Ahmadiyya* or Qadiani movement. Bangabandhu's attitude and ability to interpret religion liberally in this regard proves that his knowledge of Islam was profound and he was very liberal in religious matters. He said that, Even unjust persecution of infidels is strictly forbidden in Islam.[36]

Bangabandhu had respect for all religions. In addition to his own religious leaders, he deeply respected great men of other religions.

Mazharul Islam writes about this, Islam was his favorite and Hazrat Muhammad (Sw) was his most revered great man, prophet. But he did not have any form of disrespect towards all other religions. He was a devoted human worshiper in the true sense of the word. He cherished in his heart the words of the poet of this country, 'Man above all, truth is not above him'. All religions want the welfare of the people-that welfare-he was a worshiper of that religion. Being a Muslim, one can become a worshiper of this welfare religion-he did not have any mental conflict in it.

Because, according to him, the human welfare consciousness of Islam is as bright as the sun. That's why he has never faced any controversy on the way to becoming a true Bengali and a Muslim. As he was proud of being a Bengali, also time he was no less proud of being a Muslim.[37]

Bangabandhu had immense knowledge about religion and Islam. He made a number of comments on religion and Islam in his speeches at various times, which are well-established in history. Below are some notable speeches:

1. He said in a speech given at Noakhali Maizdi:

> "Your religion belongs to you, my religion belongs to me, this is the secular state."[38]

In another such statement, he said,

> "Your religion is for you, my religion is for me and there is no oppression of religion."

No other scripture has preached this except the Quran. Bangabandhu respected religion. He hated bigotry in his heart. That's why he has tried to give priority to secularism from the very beginning of the political movement in this country. Resulted in the long bitter experience of the people of this country and the promise of Bangabandhu's strong conviction or by implementing it this nation has become a developed nation. In this regard, he said,

> "I am afraid of bigotry. Many fanatical philosophers have obstructed the emergence of Bangladesh. I have enough doubts about how much

> they can respect Bengali nationalism in Bangladesh. They need to be taken care of as well as in the past, present and future."

2. In response to a question on special rights in the Constituent Assembly, he said, Religion will not be allowed to be used in Bengal for political purposes.[39]
3. In his address to the National Assembly, he said,
   For 25 years we have seen gambling in the name of religion, theft, exploitation in the name of religion, dishonesty in the name of religion, oppression in the name of religion, murder in the name of religion, adultery in the name of religion - all these are going on in the land of Bangladesh. Religion is a very sacred thing. Sacred religion should not be used as a political tool. If anyone says that religious rights have been violated.
   > "would say that, religious rights have not been curtailed. We have made arrangements to protect the religious rights of seven and a half corer people."[40]
4. He added said that,
   > "I have no idea who will be killed for not agreeing, who doesn't like Islam and who is considered unjust."[41]
5. Elsewhere he said,
   > "People cannot be deceived with slogans in the name of Islam and Muslims. Devout Bengali Muslims love their religion; But in the name of religion, they will not allow the political work to be done by deception."[42]
6. He added that,
   > "Every human being has the right to practice religion. Muslims will perform religious acts, perform prayers, fast, what has not happened in the era of Pakistan ... In our era, we have sent at least 6,600 people on the first Hajj. You may recall that in the first 25 years, we sent 6,600 people to perform the Hajj."[43]
7. Speaking at the bi-annual conference of the Awami League, he said,
   > "The one who is God is the Lord of the worlds, not the Lord of the Muslims. Be it Hindu, be it Christian, be it Buddhist ... all people are equal to him."[44]
8. He said at a public meeting in Joydebpur in 1970,
   > "Some people want to create divisions among the people. All people, regardless of religion or caste, are equal before Almighty Allah. People belonging to the minority community have the same rights and entitlements as any other citizen of Pakistan. I call on the majority citizens to protect the security and rights of the minority community."[45]
9. In a radio-television speech before the 1970 general election, he said:
   > "Propaganda is being spread against us. We do not believe in Islam. Our clear speech in response to this, we don't believe in disguise Islam. We believe in the Islam of justice. Our Islam is the Islam of Hazrat Muhammad (SAW). That Islam has taught the people of the

> world the infallible spell of justice and fairness. Our struggle is against the hypocrites who have repeatedly patronized injustice, oppression, exploitation and deprivation on the soil of Pakistan under the guise of Islam. In a country where 95 percent of the population is Muslim, those who think anti-Islamic law can think, Those whose faith is fragile and who use Islam to subdue the world. Therefore, those of us who have fought for the oppressed servants of Allah are far from opposing Islam, but are hoping to establish justice in the society according to the provisions of Islam. And those who want to deceive the people are those who make a fuss about the danger of Islam."[46]

In this speech given on the eve of the general election, the morale of the Muslims was multiplied by the immense respect of Father of the Nation Bangabandhu for the provisions of Islam and his pledge not to pass any law contrary to the Sunnah of the Prophet (SAW). This will be a unique example of his faith and love of Islam.

10. He added said that,

> "During the election, a class of people shouted 'Islam is gone, Islam is gone'. The PDP, the Islamic Front and others are trying to find a way to win the elections. But after the election, did anyone forbid you to pray? Did you forbid you to fast? If not, shouldn't they be punished for these propaganda? ... Islam, Muslims, Hindus, Buddhists, Christians will all be in this country and so will Bangladesh."[47]

11. He added said that,

> "I call for the last time to refrain from spreading false propaganda that 6 points or our economic program is endangering Islam. Nothing can be contrary to Islam in the hope of ensuring the justice of the people in the region and in the people. We are firmly committed to this constitutional principle that no law contrary to the Islamic principles of the Qur'an and Sunnah can be passed or enforced in this country."[48]

12. He added said that,

> "They looted everything in Bengal for 25 years. On the way, I have finished my Bangladesh. On the way, I have finished my Bangladesh. No food around, no clothes, no oil, no medicine, just wailing. You have prayed for me, prayed in the mosque, mothers and sisters have fasted, prayed in the mosque. So I'm coming back from prison, from the grave. Today Bangladesh is an independent country, if God is elegant, the wealth of Bengalis and foreigners will not be able to loot."[49]

13. Returning from prison in Pakistan on January 10, 1972, declared in a loud voice at a large gathering in the history of Bengal at Suhrawardy Udyan.

> "Everyone should know that Bangladesh is now the second largest Muslim country in the world and Pakistsn ranks fourth. Indonesia is first and India is third. But the irony of fate is that the Pakistani army has killed the Muslims of this country in the name of Islam, humiliated our women. I don't want to insult Islam, I want to say in clear and unequivocal language, Bangladesh will be an ideal state. The foundation of the state will be democracy, socialism and secularism. Farmers, workers, Hindus and Muslims of this country will be happy and in peace." [50]

He added said that,

> "I am a Muslim, Muslims die once, Bangladesh is the second largest Muslim country in the world."

This speech of Bangabandhu put an end to many confusions. Well known politician, journalist and writer Abu Mansur Ahmed said,

> "Mujib's leadership put an end to the confusion of work in a short time after the confusion of thoughts was thus removed, the recitation of the Quran on radio and television, and the Alaihi of Alameen, Khuda Hafez were established. Weekly discussion on 'religion and life' based on Quran-Hadith has started again. Milad mahfil also started in government ceremonies."[51]

He added said that,

> "It is doubtful whether the people of a country where justice and fairness depend on lies can get real justice."

In this context, some observations can be made from the book of former Indian Foreign Secretary JN Dikshit. He wrote in one place in the chapter Person of Person of Sheikh Mujibur Rahman in his book,

> "He felt that it was the only way in which muslims of Bengal could eesure for themselvs a place under the sun. He was not a religious extremist but was deeply convreced of the sanctily and relevonci of the islamic identity of Bengali Muslims who he felt world not get a fair deal from Hindu dominated India."[52]

14. An example of Bangabandhu's adventure and foresight was his participation in the OIC Summit held in Lahore in 1974. Adventurous in the sense that he joined the conference, bypassing neighboring and friendly India. On the other hand, in the far-sighted sense, that relationship with the Muslim nation builds bridges for all kinds of prosperity, including spiritual and economic, for the future. In his speech, he said,

> "Man has now acquired greater power materially. We have seen the use of force for war, we have seen the oppression of the people. We have seen them deny their just rights. I have also seen them pushed into indescribable misery. And our Palestinian brothers are the symbol of these unspeakable sufferings. That's why there is a greater need today to use this power wisely than in the past. We have to work for the welfare of the people, not destruction, not creation, not

> war, not peace, not suffering. If we can inculcate in us the eternal values of human love and dignity preached by the Prophet, then the Muslim masses will be able to make a clear contribution to the solution of today's problems. Inspired by these values, we can build a new international tradition based on peace and justice. The great injustice done to the Arab brothers must come to an end. Unjustly occupied Arab lands must be abandoned We must establish our rights over the oppressors. By the grace of Allah, we can now consolidate our resources and energy in a way that brings peace and justice to all of us. To achieve this, seven and a half crore people of Bangladesh are committed to help in every possible way. May Allah Almighty make our joint efforts successful."[53]

In 1972, he sent a Hajj delegation to Saudi Arabia. The delegation was led by Maulana Abdul Rashid Tarkabagish. Moreover, at that time more than 6,000 Bangladeshi Muslims performed Hajj. This marks the beginning of a new era in relations with Saudi Arabia. Then in 1973, the broadcasting of Arabic programs for Arabs by Bangladesh Betar from abroad was another example of his foresight. His meeting with Saudi King Faisal took place in New York in October 1974, when he was attending the UN General Assembly. In December of the same year, he sent a Hajj delegation to Saudi Arabia. The then Egyptian ambassador instructed Amar Rahman to come to Saudi to assist the delegation. There they exchanged views with representatives of more than 40 Muslim countries. The delegation was the first to broadcast Bengali programs during the Hajj on Saudi radio. Shortly after the delegation returned, the then Foreign Minister Dr. Kamal Hossain visited Saudi Arabia. Bangabandhu of his government was scheduled to go for Hajj in 1975. Prior to that, Saudi Arabia officially recognized Bangladesh. Saudi Arabia recognized it, but did not go on the Hajj. He was preceded in death by his family on August 15, 1975 Bangabandhu was inspired by Islamic values and established communal harmony. Proper religion taught him to be respectful of all religions. He did not despise any other religion by any Muslim. He wrote in his unfinished autobiography "Oshomapto Attojiboni" about his non-sectarian position,

> "I sincerely believed that Muslims would not exist in a united India. Why are Hindu leaders angry against Pakistan? There will be Muslims in India and there will be Hindus in Pakistan."

Everyone will have equal rights. The Hindus of Pakistan will also live as independent citizens. Therefore, at no time in Bangabandhu's long life was there any expression of contempt or insult against other religions.

The Islamic Foundation Bangladesh was established by President Sheikh Mujibur Rahman on 28 March 1975 by issuing an ordinance on Baitul Mukarram Mosque with the sincere initiative and efforts of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman for the practice and research of Islam. Maulana Fazlul Karim was appointed the first director general of the Islamic Foundation.

Bangabandhu reorganized the Madrasa Board and appointed Maulana Abdul Rashid Tarkbagish as its Chairman. By appointing him as the Chairman of the Bangladesh

Madrasa Education Board and the Director General of the Islamic Foundation, he showed his respect and confidence in the scholars. He banned gambling, alcohol and other anti-social activities from the country and provided punishment. How much devotion and respect he had for Islam and Muslims is evident in the various speeches of Bangabandhu.

Bangabandhu never used Islam for political purposes. Always striving to build Bangladesh as a country of peace for all people of all religions. Bangabandhu's activities and outstanding contribution to the propagation of Islam are still a burning witness.

He is the great architect of an independent sovereign state, the architect of the spread of Islam in Bangladesh under the patronage of the government. These two unique common affiliations have endowed Bangabandhu's life with radiant glory. Just as he took economic, social and physical infrastructure steps for the overall welfare of the country and the nation, he also took practical steps to propagate true Islam keeping in mind the religious sentiments and values of the Muslim majority people of Bangladesh. After independence, it was rumored that madrasa education would be discontinued. Stopping means bringing Islamic education to zero. But that proved to be false. The reorganization of the Madrasah Education Board by Bangabandhu was a product of that zero. After the reorganization of the Madrasah Education Board by Bangabandhu, he addressed the annual conference of Dhaka Alia Madrasa as the chief guest. Former national professor and poet Syed Ali Ahsan wrote in his memoirs,

> "I found Bangabandhu's speech at the Alia Madrasa to be a uniquely ordinary speech. He said at one point in his speech that there had been a lot of anti-Islamic activities in our country during the Pakistan period. Gambling in the name of race was nationally recognized, you Alem Samaj never protested against it. Gambling was openly practiced in different parts of Dhaka city with the help of police, you did not make any movement to stop it. But he has repeatedly spoken of establishing an Islamic state. But he has repeatedly spoken of establishing an Islamic state. You knew that gambling and alcohol were forbidden in the management of the Islamic State, but you did not say anything about it. When I first came to power, I stopped horse racing, and told the police to be quick to break into gambling dens all over the city. I am talking about secularism, but secularism is not anti-religious. I'm Muslim, I love Islam. You help me, you will see that there will be no anti-Islamic activities in this country."[54]

Sirajuddin Ahmed said,

> "Sheikh Mujibur Rahman never indulged in injustice. He upheld the ideals of democracy. He was respectful of all religions. In his private life he was a true Muslim. He used to fast and pray. He used to end the public meeting by chanting Joybangla slogan and Khoda Hafiz. But for the secular policy of how many lies have been spread against him by religious and communal groups. Secularism is not irreligion,

> everyone has their own religion. Everyone in the country will practice their religion freely."[55]

Bangabandhu instructed to broadcast the recitation of the Holy Quran on radio and TV.

Provision of additional space for Kakrail Mosque, allocation of site for Bishwo ijtima in Tongi and provision of Turag shore site as a permanent settlement, exemption of travel tax for holy pilgrims, national level Sirat Majlis and Holy Eid Miladunnabi (sa), public holidays on the occasion of Shabe Qadr and Shabe Barat.The religious duty that he has fulfilled through proclamation etc. will be an example.

Dr. Syed Rezaul Haque Chandpuri said that,

> "Islam and Bangabandhu are inextricably linked. We know that no prophet or messenger has come to our country. Islam has spread in this country through the religion of Auliya Kiram and Buzurgan. The mainstream of Islam is the school of Oli Auliya Kiram, the school of Sufism. Bangabandhu himself was a member of the Sufi family. We all know his father, great-grandfather as the Sheikh family. We all know his father, great-grandfather as the Sheikh family. His ancestors came to this country from Arabia and Yemen to spread Islam. In fact, the sincerity and love of Bangabandhu for his immense service to Islam was the greatest example of Islam towards Muslims, haters and the motherland."[56]

Chief Whip of Bangladesh National Assembly A.S.M Feroze said that,

> "Bangabandhu was one of the great leaders of the world. Bangabandhu has worked for the establishment of equal rights in the same way that the Prophet (peace be upon him) spoke of equal rights for the people. Although there are many prohibitions in Islam, they were not accepted in Pakistan. But even if he talked about Bangabandhu's secularism, he stopped the things that were illegal in Islam. Wine, gambling, jatra, houji, nude dancing, horse racing on the racecourse ground are all things that Pakistan as a Muslim country could not do. Bangabandhu spoke of neutrality, not of irreligion; rather, he stopped the prohibitions of religion."[57]

Principal Minister for Religious Affairs Alhaj Matiur Rahman said that,

> "Every time I met Bangabandhu, the father of the nation, I felt that Bangabandhu was an Islam-loving man. He respected people of all religions. Since Islam is our religion, he had respect for Islam. He talked to the people with Tabligh Jamaat. There Bangabandhu was busy with state affairs. Even then, when the people of Tabligh Jamaat went to meet him, Bangabandhu took a tasbeeh from his pocket and said, Sir, I am busy with state work, then I often recite tasbeeh. In any case, keep praying that I become a Muslim in my heart so that I can serve Islam."[58]

Mahbubul Alam M.P said that,

> "In 1973, Bangabandhu called the then DG of BTV and said, "What can be heard in the house of a Muslim in the morning? He is scared. Bangabandhu said that, you have to listen to the words of Quran. Your TV has to start with recitation of Quran. Bangabandhu's religion was in his heart. He had deep respect for religion. These are his proofs."[59]

Alhaj Syed Najibul Bashar Maizbhandari MP said that,

> "During the Pakistan period, they slaughtered in the name of Islam, killed people and took the honor of their sisters. It is not recognized Islam. That's why the independence movement took place because Bangabandhu was in favor of true Islam and we got independence in such a short time because of the mercy of Allah. In fact, there is nothing to show fear of God, it is manifested through words. Moreover, you see, the mainstream work of true Islam is to establish peace, to oppose banditry and violence. He has taken a stand against injustice. The war of independence was a war of justice against injustice. Fighting for the oppressed and against the oppressors. This, of course, was in agreement with the Qur'an and Hadith."[60]

Evaluating the contribution of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, James Novak said that,

> What is remarkable about the rise of Bangali Nationalism is that Muslim feeling declined and Islam ultimately was put on the defensive. This change had been implicit in the founding of the Awami League, a party that while never anti-Muslim. had not countenanced communsm ...
>
> As for the sheikh, hard shaped his style, Indefatigable, he visited district and sub district towns, walked across fields from village to village, and mingled with people, sharing their tea, rice, dal and salt, remembering names, praying at mosques, sweating in fields, visiting flood sites, weeping at funerals and milads, services for the dead, intellectually lazy, he empathized mightily, intuited sympathetically and reached our and grimy hands ... by ever returning to the hustling, he impeded the people's feelings and aspiration, so that when away among from them he could gauge with superhuman accuracy their reactions to events. He knew what they believed because he could explain things not only in terms they, they believed he did not need to lie. They spoke to him honestly, as he spoke to them.[61]

Conclusion

Bangabandhu's outstanding contribution to the propagation of Islam in the minds of the people of independent and sovereign Bangladesh during his rule is rare in the contemporary Muslim world. In various speeches and discourses, Bangabandhu expressed his firm commitment to the noble teachings of Islam, injustice, oppression, deprivation and exploitation, Islam's uncompromising stance against fraud,

deception, theft, robbery, bribery and profiteering. He succeeded in creating a new political trend of non-communal thinking by conveying the essence of Islam to people of all religions.

Notes & References

[1] Ahmad ibn Husayn al-Bayhaqi, *Shu'abul Iman* (Hind: Maktabatur Rushd, 1st edition, 1423 AH/2003 AD), Hadith No. 7048.

[2] Surah Al-Hujurat, 49: 13.

[3] Sulayman ibn al-Ash'ash as-Sijistani, *Sunanu Abi Dawud* (Dimashq: Maktabatu Ibn Hajar, first edition, 1424 AH/2004 AD), Babu Rafi-Rahmati, Hadith No. 4941; Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi, *Jami'ut-Tirmidhi* (Dimashq: Maktabatu ibn Hajar, first edition, 1424 AH/2004 AD), Babu Majaa fi Ramtil Muslimeen, Hadith No. 1924.

[4] Muhammad Ala Uddin Al-Azhari, *Arabic Bengali Dictionary,* Vol. 2 (Dhaka: Bangla Academy, 1993 AD), p. 1466.

[5] Lewis Maloof, *Al-Munzid fil-Lughah wal Alam* (Beirut: Al-Maqtabatul Mashrikah, 13th ed., 1990 AD), p, 347.

[6] Ibn Manjur al-Afiriki, *Lisan al-Arab,* Vol. 6 (Beirut: Daru Ihyait-Turahil Arabi, 2nd ed., 1413 AH/1993 AD), p. 354; Al-Firuzabadi, *Al-Kamusul Muhiit,* Vol.1 (Beirut: Daru Ihyait-Turachal Arabic, T.B.), p. 195

[7] Badr al-Din al-Ayni, *Umdat al-Qari,* Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t. b.), p. 109.

[8] Dr. Ruhi al-Balabakki, *al-Mawirid* (Beirut: Dar al-Ilm lil Mala'in, 7th ed., 1995 AD), p. 107.

[9] Dr. Ibrahim Anis, *Al-Muzamul Wasit* (Deoband: Qutb Khana Husayniyyah, 1996 AD), p. 444: *Al-Munzid fil-Lughah wal Alam,* p, 347; Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, *Kitabul Ain,* Vol. 2 (1st ed., 1414 AH), p. 848. Badr al-Din al-Ayni, *Umdat al-Qari,* Vol. 1, p. 109.

[10] Dr. Ruhi al-Ba'la Baqi, *al-Mawirid* (Beirut: Darul Ilm lil Mala'in, 7th ed., 1995 AD), p. 107.

[11] Editing Council, *Islam in Everyday Life* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 5th ed., 2001 AD), p. 5: Edited by Sirajul Islam Kartak, *Banglapedia* (Dhaka: Bangladesh Asiatic Society, 2003 AD), p. 427.

[12] Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusayri, *Sahih Muslim* (Beirut: Daru Ibn Hazm, first edition, 1423 AH/2002 AD), Kitabul Iman, Babu Bayanil Iman Wal Islam Wal Ihsan, Hadith No. 8; Sulayman ibn al-Ash al-Sijistani, *Sunanu Abi Dawud,* Babu Fil Qadar, Hadith No. 4695; Ahmad Ibn Hanbal, *Musnadu Ahmad* (Beirut: Dar al-Fikr, T.B.), Hadith No. 367; Al-Bayhaqi, *As-Sunanul Kubra lil-Kubra lil Bayhaqi* (Beirut: Darul Fikr, T.B.), Hadith No. 8610.

[13] *Lisanul Arab,* Vol. 6, p. 354.

[14] Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih Bukhari,* Vol. 1 (Karachi: Nur Muhammad Asahul-Matabi, 1357 AH/1938 AD), p. 12.

[15] Muhammad Ali at-Tahanuwi, *Kashshaful Istilahatil Funun,* Vol. 2 (Beirut: Darul Qutubil Ilmiyyah, 1st ed., 1428 AH/1998 AD), p. 415.

[16] Sayed Amir Ali, *The Spirit of Islam* (Delhi: 1974), p. 178.

[17] Sayyid Muhammad Rizvi, *An Introducition to Islam,* hittp.//www.al-islam.prg/articles/anintroduction-to-islam .

[18] Al-Quran, Sura An-Nisa, 4 : 125.

[19] Sura Az-Zumar, 39 : 11.

[20] Sura Aal-e-Imran, 3 : 85.

[21] Sura Aal-e-Imran, 3 : 19.
[22] Sura Al-Kafiroon, 109 : 6.
[23] Sura An-Noor, 24 : 2.
[24] Sura A dh-Dhariyat, 51 : 5-6.
[25] Saikh Muhammad Ali At-Tahnavi, *Kashaful Istilahat Al-Funun,* V. 3 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah,1st edition,1428 H./1998 AD), p. 503; Editorial Board, *Daeratul Maarifil Islamiyah,* V. 9, p. 368.
[26] Dr. Rushdi Iliyan, *Al-Adiyan, Baghdad,* p. 23.
[27] Dr. Muhammad Kamal Jafar, *Al-Insanu Wal-Adiyan* (Qatar : Daru As-Sakafa, 1st edition,1406 H.), p. 21.
[28] Dr. Mahmud ibn Abdur Rahman, *Ilmu Dirasatil Adiyani Indal Muslimin,* Unpublished Manuscript, p. 12.
[29] Sura At-Taubah, 9: 33; Sura Al-Fath, 48 : 28; Sura As-Saff, 61: 9.
[30] Ahmad Syalabi, *Tarikh al Islamiyah al hadzarah al Islamiyah* (Kairo: cetakan ke IV, 1978), p.10.
[31] Yusri Abdul Ghani Abdulla, *Historiografi islam: dari klasik hingga modern* (Yakarta: Rajagrafindo, 2004), p.VII-IX.
[32] Sura Al-Ma'idah: 15-16.
[33] Professor Dr. Ammad Muhammad Jamal, *Muhadaratun fis Sakafatul Islamiyyah* (Jeddah: Jamaat Al-Malik Abdulaziz), p. 14.
[34] Dr. Abdur Rauf, *Renaissance of Islamic culture and civilization in Pakistan* (Lahor: M. Ashrafi Baz, 1956), p. 3.
[35] Siraj Uddin Ahmed, *Jatir Jonok Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman,* p. 334.
[36] Seikh Mujibur Rahman, *Asampta Atmajibanee,* Pp. 240-241.
[37] Muzharul Islam, *Bangabandhu Seikh Mujib,* p. 854.
[38] Speech given on 26th June, 1972 at Maijdi, Noakhali.
[39] In response to the question of special rights in the session of the Constituent Assembly on 11th April, 1972.
[40] Bangabandhu's speech during the presentation of the Constitution of Bangladesh in the Constituent Assembly on 4th November, 1972.
[41] Seikh Mujibur Rahman, *Asampta Atmajibanee,* p. 240.
[42] Ibid, p. 258.
[43] Speech given on 18th February, 1973 in Chandpur district.
[44] Speech given at the bi-annual conference of Awami League on 18th January, 1973.
[45] Speech at a large public meeting on 30th October, 1970 at Joydebpur, near Dhaka.
[46] Speech given by Bangabandhu on radio and television before the general election in November 1970.
[47] Speech given on 3 January, 1971 at a rally of 2 million people at Racecourse Maidan, Dhaka.
[48] Speech to the nation on radio and television before the 1970 general election.
[49] In a speech given on 19th February, 1973 in Bakerganj.
[50] Bangabandhu's historic speech at Suhrawardy Udyan on 10th January, 1972, Vajrakantha, Booklet published by the Ministry of Information, Government of Bangladesh, Dhaka, 1972.
[51] Abul Mansur Ahmed, *Amar Dekha Rajnitir Ponchash Bochor* (Dhaka : Nowroj Kitabistan,7th edition,1999 AD), p. 772.
[52] J. N. Dikkit, *Liberation and Beyond* (Dhaka: UPL, 1999), p. 220.

[53] Speech at the 1972 OIC Conference in Lahore.
[54] Syed Ali Ahsan, *Bangabandhu:Je Rakam Dekheci* (Dhaka : Bard Publications, 1996 AD), p. 16.
[55] Siraj Uddin Ahmed, *Bangabandhu Seikh Mujibur Rahman,* p. 964.
[56] Dr. Sayed Rezaul Hague Chadpuri, *"Bangabandhu, Bangladesher Sadhinata O Olamaye Keram,"* Agrapathik, Jatio Sophie Dibosh Sonkha, August 2015, p. 161.
[57] ASM Feroz, Chiep Whip, *"Bangabandhu, Bangladesh O Islam,"* Agrapathik, Jatio Sokh Dibosh Sonkha, August 2015, p. 162.
[58] Pricipal Alhaj Matiur Rahman, Minister of Religion, *"Bangabandhur Karmamai Jibon,"* Agrapathik, Jatio Sokh Dibosh Sonkha, August 2015, p. 139.
[59] Mahbubul Alam Hanif, MP, Bangladesh National Parliament, *"Bangabandhu, Bangladesh O Islam,"* Jatio Sokh Dibosh Sonkha, August 2015, p. 162.
[60] Ahaj Syed Najibul Bashar Maizbhandari, MP, *"Manabadhikar Pratisthai Bangabandhu,"* Jatio Sokh Dibosh Sonkha, August 2015, p. 157.
[61] Siraj Uddin Ahmed, *Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman,* Pp.1001-1002, *Siraj Uddin Ahmed, JatirJanak Bangabandhu Seikh Mujibur Rahman,* Pp. 320-321.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

ইসলামী শরীয়তে উশর-এর নিসাব : একটি পর্যালোচনা
(Nisab of Ushar in Islamic Shari'ah : A Review)

মো. আশরাফুল ইসলাম*

Abstract: Ushr is a social and economic provision similar to Zakat. As the economy gains momentum through Ushr, its importance in Islamic economics is immense. To this end, Islamic law requires the provision of Zakat on crops grown on land in the light of certain conditions. However, Ushr is not required on any amount of crop produced on the land; on the contrary, if the prescribed condition of Ushr exists in the crop produced, Zakat must be paid on it. And one of the conditions of Ushr is the amount of crop Nisab. However, there is disagreement among the jurists in determining the Nisab of fruits and crops. According to one group, Ushr should be levied on whatever is produced on the land, whether it is more or less. On the other hand, according to the other party, Zakat will not be obligatory on agricultural crops and fruits until the amount of five wasaks are reached. According to this view, the Nisab of Ushr is five wasaks or three hundred sa`. And in the context of Bangladesh, five wasaks are equal to about 25 maunds. Therefore, it is obligatory to pay one-tenth or one-twentieth Zakat on other crops if there are other conditions. Since Nisab is an important issue in the collection of Ushr, it is necessary for the land owner to be aware of the amount of Nisab. Therefore, in this article, an analytical discussion has been presented about the amount of Nisab by mentioning the brief introduction of Ushr.

ভূমিকা

ইসলাম একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।[১] যে জীবন ব্যবস্থায় মানুষের সার্বিক বিষয়াদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে। আর সার্বিক বিষয়াদির মধ্যে অর্থনৈতিক দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামে অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে যাকাত[২] ব্যবস্থা। সমাজের বিত্তবান ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উদ্বৃত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট একটি অংশ নিয়মিত আদায় করে দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকদের মধ্যে যথাযথ বণ্টন করাই এ বিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৈষম্য ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের প্রধান হাতিয়ার বিধায় এ বিধানকে ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ[৩] বা রুকন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে শুধু হজ্জ[৪] এবং যাকাত সম্পদশালীদের জন্য ফরয। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ মালের মালিক না হলে তার উপর যাকাত ফরয নয়। আর মালের নিসাবের ন্যায় ফসলের ক্ষেত্রেও যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নিসাব পরিমাণে পৌঁছা বাধ্যতামূলক। জমিতে উৎপাদিত ফসল অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অংশ বিধায় যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থায়ও এর গুরুত্ব অপরিসীম। আলোচ্য প্রবন্ধে উশরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখপূর্বক এর নিসাবের পরিমাণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

উশরের পরিচয়

উশর (عُشْر) শব্দটি আরবী। এটি একবচন, বহুবচনে عُشُوْر ও أَعْشَار।[৫] শব্দটি আরবী ‘আশারাতুন (عَشَرَةٌ) শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ দশ। উশর (عُشْر) শব্দটি আভিধানিক অর্থে দশ ভাগের এক ভাগ,[৬] এক-দশমাংশ, জমির উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ,[৭] খণ্ড, দশম অথবা নবম দিনে উটের পানি পান প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৮] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ, one tenth, tenth part, tithe,[৯] a tenth, one part of ten perts[১০] ইত্যাদি।

* পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আরবী উশর (عُشْر) শব্দটি আসিরীয় ভাষার ইশরুউ (Ish-ru-u) শব্দ এবং হিব্রু ভাষার 'মা'আশির' (Maasher) শব্দের অনুরূপ। ইশরুউ (Ish-ru-u) শব্দের অর্থ কর, যা জমিনে উৎপাদিত শস্য, খেজুর প্রভৃতি ফসল দ্বারা আদায় করা হয়। আর মা'আশির (Maasher) শব্দের অর্থ হচ্ছে এক-দশমাংশ কর, যা রাজাগণ কর্তৃক ধার্যকৃত মন্দির বা পবিত্র স্থানসমূহের প্রাপ্য ছিল।[১১] হাদীসে ফসলের যাকাতের ক্ষেত্রে সর্বদা উশর (عُشْر) বা এক-দশমাংশ ও নিসফুল উশর (نِصْفُ الْعُشْرِ) বা এক-দশমাংশের অর্ধেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[১২]

উশর (عُشْر) শব্দটির প্রকৃত অর্থ এক-দশমাংশ হলেও কখনো কখনো এটি ভূমির যাকাত ও ইবাদত অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া শব্দটি ভূমির খাজনা বা কর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ কারণেই ধন-সম্পদের যাকাত ও উশরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, ধন-সম্পদ ও স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত মূলত একটি ইবাদত; কিন্তু উশরের মধ্যে ইবাদত ও কর উভয় দিক বিদ্যমান থাকায় একে زَكَاةُ الْأَرْض বা ভূমির যাকাত নামেও অভিহিত করা হয়।[১৩] এতদ্ব্যতিত বিভিন্ন গ্রন্থে উশরকে সাদাকাহ (صَدَقَةٌ) ও যাকাত (زَكَاةٌ) নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং ফিক্‌হী গ্রন্থসমূহে একে যাকাতের পর্যায়ে গণ্য করত যাকাত অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত আলোচনা বিবৃত হয়েছে।[১৪]

পরিভাষায়, দরিদ্রদের সাহায্যার্থে মুসলমানদের জমিতে ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে উশর (عُشْر) বলা হয়।

'উমার ইব্‌ন 'আব্দিল 'আযীয (র) (৬১-১০১ হি.) বলেন,

فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ الْعُشْرُ[১৫]

-'জমি থেকে কমবেশি যা উৎপন্ন হয়, তার দশভাগের একভাগ যাকাত প্রদানকে উশর (عُشْر) বলে।'

ইব্‌নুল আছীর (র) (৫৪৪-৬০৬ হি.) বলেন,

هُوَ زَكَاةُ مَا سَقَتْه السَّمَاء[১৬]

-'আসমানের পানি দ্বারা উৎপাদিত শস্যের যাকাতকে উশর (عُشْر) বলে।'

ড. ইবরাহীম মাদকূর (১৯০২-১৯৯৬ খ্রি.) ও অন্যান্যরা বলেন,

مَا يُؤْخَذ من زَكَاة الأَرْض الَّتِي أسلم أَهلهَا عَلَيْهَا[১৭]

-'মুসলমানদের জমি থেকে উৎপন্ন ফসলে যে যাকাত আদায় করা হয় তাকে উশর (عُشْر) বলে।'

ড. মুহাম্মাহ রাওয়াস কাল'আজী বলেন,

مَا يُؤْخَذُ مِن زَكَاةِ الزُّرُوْعِ[১৮]

-'উৎপন্ন ফসলে যে যাকাত আদায় করা হয় তাকে উশর (عُشْر) বলে।'

Thomas Patrick Hughes বলেন,

'USHR. A tenth or tithe given to the Muslim State or *Baitu'l-Mal*.[১৯]

-'ইসলামী রাষ্ট্র অথবা বায়তুলমালে খাজনারূপে প্রদেয় এক-দশমাংশ বা দশভাগের একভাগ ফসলকে উশর (عُشْر) বলে।'

মোটকথা, মুসলমানদের জমিতে উৎপাদিত ফল-ফসলের যাকাতকে উশর (عُشْر) বলা হয়। উশর আরোপিত ভূমি দুভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ যে সকল ভূমির ফসল সেচের পানি দ্বারা উৎপাদন করা হয় সে সকল ফসলে উশর (عُشْر) বা এক-দশমাংশ আদায় করা ফরয, আর যে সকল ভূমির ফসল বৃষ্টি বা প্রবাহিত পানি দ্বারা উৎপাদন

করা হয় সে সকল ফসলে নিসফুল উশর (نِصْفُ الْعُشْرِ) বা বিশ ভাগের এক ভাগ আদায় করা ফরয।[২০] কিন্তু ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় উভয় শ্রেণির ভূমির ওপর আরোপিত যাকাতকেই উশর নামে অভিহিত করা হয়।[২১]

উশরের নিসাব

উৎপাদিত ফসলে উশর ফরয হওয়ার জন্য নিসাব তথা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হওয়াকে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে ফকীহগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ কতিপয়ের মতে, শরীয়ত নির্দেশিত নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ পাওয়া না গেলে উক্ত সম্পদের উপর উশর ফরয হবে না। আবার কতিপয়ের মতে, জমিতে যা উৎপাদিত হবে, তার পরিমাণ কম বা বেশি হোক না কেন, তাতেই উশর ফরয হবে। নিম্নে উশরের নিসাব সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে নিসাব (نِصَابٌ)-এর পরিচয় প্রদত্ত হলো।

নিসাব (نِصَابٌ)-এর পরিচয়

নিসাব (نِصَابٌ) শব্দটি আরবী। এটি একবচন, বহুবচনে نُصُبٌ।[২২] আভিধানিক অর্থে নিসাব (نِصَابٌ) শব্দটি মূল, প্রত্যাবর্তন,[২৩] আসল, প্রত্যেক জিনিসের শুরু, প্রত্যাবর্তনস্থল, তথ্যসূত্র, সূর্য অস্ত যাওয়ার স্থান, ছুরির বাঁট, হাতল, কোরাম প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২৪] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ, origin, beginning, minimum number or amount, quorum, knife handle ইত্যাদি।[২৫]

পরিভাষায়, যে পরিমাণ সম্পদ ব্যক্তির মালিকানায় বিদ্যমান থাকলে যাকাত ফরয হয়, তাকে নিসাব (نِصَابٌ) বলে। ইব্ন মানযূর আল-ইফরীকী (র) (৬৩০-৭১১ হি.) বলেন,

النِّصابُ مِنَ الْمَالِ: الْقَدْرُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذا بَلَغَه، نَحْوَ مائَتَيْ دِرْهَمٍ، وخَمْسٍ مِنَ الإِبلِ.[২৬]

-'সম্পদের ক্ষেত্রে নিসাব (نِصَابٌ) বলতে বুঝায় এ পরিমাণ সম্পদ বিদ্যমান থাকা, যাতে যাকাত ফরয হয়। যেমন- দুইশ দিরহাম এবং পাঁচটি উট বিদ্যমান থাকা।'

ড. ইবরাহীম মাদকূর ও অন্যান্যরা বলেন,

وَمِنَ الْمَالِ الْقَدْرِ الَّذِي عِنْدَهُ تَجِبُ الزَّكَاة[২৭]

-'যে পরিমাণ সম্পদ বিদ্যমান থাকলে যাকাত ফরয হয়, তাকে নিসাব (نِصَابٌ) বলে।'

মুফতী মুহাম্মাদ 'আমীমুল ইহসান (র) (১৩২৯-১৩৯৫ হি.) বলেন,

اَلنِّصَابُ شَرْعًا مَا لَا تَجِبُ فِيْمَا دُوْنَهُ زَكَاةً مِنْ مَالٍ[২৮]

-'পরিভাষায়, যা বিদ্যমান না থাকলে যাকাত ফরয হয় না, তাকে নিসাব (نِصَابٌ) বলে।'

ড. মুহাম্মাহ রাওয়াস কাল'আজী বলেন,

نِصَابُ الزَّكَاةِ: اَلْقَدْرُ الَّذِيْ تَجِبُ الزَّكَاة بِتوفرِهِ مَعَ شُرُوْطِهِ[২৯]

-'যাকাতের ক্ষেত্রে নিসাব (نِصَابٌ) হলো, শর্ত পূরণ সাপেক্ষে যে সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়।'

Thomas Patrick Hughes বলেন,

An estate or property for which *zakat*, or legal elms, must be paid.[৩০]

-'যাকাতের ক্ষেত্রে নিসাব হলো, যে পরিমাণ ভূসম্পত্তি বা সম্পদের জন্য যাকাত বা নির্ধারিত সম্পদ প্রদান করতে হয়।'

মোটকথা, যে পরিমাণ সম্পদ বিদ্যমান না থাকলে যাকাত ফরয হয় না, তাকে নিসাব (نِصَابٌ) বলে। নিম্নে উশরের নিসাবের পরিমাণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

উশরের নিসাবের পরিমাণ

ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে চিরদিনের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই কোনো যুগ বা দেশে এ অধিকার খর্ব করার অধিকার কারও নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ – لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾[৩১]

-'আর তাদের ধন-সম্পদে যাচঞাকারী ও বঞ্চিতের নির্ধারিত হক রয়েছে।'

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾[৩২]

-'আর তাদের ধন-সম্পদে যাচঞাকারী ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।'

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে যে, ধনীদের সম্পদে গরীবের একটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, ধনীরা যে দান-খয়রাত করে তা তাদের অনুগ্রহ নয়; বরং এটা গরীবের ন্যায্য অধিকার, যা আদায় করা তাদের কর্তব্য। এ অধিকার স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং কেউ নিজের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী তাতে কম-বেশি করতে পারবে না।[৩৩]

উশর আদায়ের ক্ষেত্রে নিসাব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য নিসাবের পরিমাণ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। নিসাবের পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে 'আলাউদ্দীন আল-কাসানী (র) (মৃ. ৫৮৭ হি.) বলেন, যাকাতের সম্পদ দুই প্রকার। সম্পদের যাকাত ও ফল-ফসলের যাকাত।[৩৪]

উশরও একপ্রকার যাকাত। তাই যাকাতের ন্যায় উশর প্রদানের নির্দেশও আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং তার নিসাব হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীসে উশর আদায়ের জন্য নিসাবের বিষয়টিকে শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু জমিতে উৎপাদিত পণ্যের নিসাবের ব্যাপারে ইমামগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র) (৮০-১৫০ হি.), মুজাহিদ (র) (২১-১০৪ হি.), হাম্মাদ (র) (মৃ. ১৬৭ হি.), 'উমার ইব্ন 'আব্দিল 'আযীয (র), ইব্ন হাজম (র) (৩৮৪-৪৫৬ হি.)-এর মতে, জমিতে যা উৎপাদিত হবে, তার পরিমাণ কম বা বেশি হোক না কেন, তাতেই উশর আদায় করতে হবে।[৩৫] অর্থাৎ উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট কোনো নিসাব থাকা শর্ত নয়। বরং উশরী ভূমিতে উৎপাদিত শস্য যা-ই হোক না কেন, উৎপন্ন ফসল কম হোক বা বেশি হোক, সংরক্ষণের উপযোগী হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় উশর আদায় করা ওয়াজিব।[৩৬] এ মতের স্বপক্ষে দলীল হলো:

এক. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾[৩৭]

-'হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো।'

দুই. অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾[৩৮]

-'যখন (বৃক্ষ) ফলন্ত হয় তখন এগুলোর ফল খাও এবং কর্তনের সময়ে হক দান করো। আর অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।'

তিন. রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ فَفِيهِ الْعُشْرُ[৩৯]

-'(উশরী) ভূমিতে যা উৎপাদিত হবে, তার উপরই উশর প্রদান করতে হবে।'

চার. সালিম ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) তাঁর পিতার সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ[৪০]

-'আকাশের পানিতে যা-ই সিক্ত হবে, তাতেই উশর ধার্য হবে।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ কথা সাধারণ অর্থবোধক। এজন্য ইমাম আবূ হানীফা (র) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার কোনো শর্তারোপ করেননি, তাই তার কোনো নিসাবও নেই।[৪১]

খ. সাহাবী, তাবি'ঈ ও অধিকাংশ আলিম যেমন- ইব্ন 'উমার (রা) (১০ হি.পূ.-৭৩ হি.), জাবির (রা) (১৫ হি.পূ.-৭৮ হি.), আবূ উমামা ইব্ন সাহ্ল (মৃ. ১০০ হি.), জাবির ইব্ন যায়দ (২১-৯৩ হি.), হাসান (২১-১১০ হি.), 'আতা (২৫-১১৫ খ্রি.), মাকহূল, হাকিম (৩২১-৪০৫ হি.), নাখ'ঈ (৪৭-৯৬ হি.), ছাওরী (৯৭-১৬১ হি.), আওযা'ঈ (৮৮-১৫৭ হি.), ইব্ন আবী লায়লা (১৭-৮৩ হি.), ইমাম মালিক (৯৩-১৭৯ হি.), ইমাম শাফি'ঈ (১৫০-২০৪ হি.), ইমাম আহমাদ (১৬৪-২৪১ হি.), ইমাম আবূ ইউসুফ (১১৩-১৮২ হি.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) (১৩২-১৮৯ হি.)-এর মতে, পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণে না পৌঁছা পর্যন্ত কৃষি ফসল ও ফল-ফাঁকড়ায় যাকাত ফরয হয় না।[৪২] তাঁরা আরও বলেছেন যে, জমি থেকে উৎপন্ন ফসলকে যখন খড় ও খোসা থেকে পৃথক করা হবে তখন এর নিসাব হলো পাঁচ ওয়াসাক। আর খোসা ছাড়ানো না হলে তার নিসাব দশ ওয়াসাক।[৪৩] নিম্নোক্ত হাদীসসমূহকে তাঁরা তাদের দলীল হিসেবে পেশ করেছেন,

এক. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ [৪৪]

-'পাঁচ যাওদ (পাঁচটি) উটের কম সংখ্যকের উপর যাকাত নেই, পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাক-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যে যাকাত নেই।'

দুই. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ[৪৫]

-'পাঁচ ওয়াসাক-এর কম পরিমাণ খেজুরে যাকাত নেই, পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যে যাকাত নেই এবং পাঁচটির কম উটের যাকাত নেই।'

তিন. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন,

لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ[৪৬]

-'শস্য ও খেজুর পূর্ণ পাঁচ ওয়াসাক না হলে তাতে কোনো যাকাত নেই, উটের সংখ্যা পাঁচের কম হলে তাতে যাকাত নেই এবং পাঁচ উকিয়ার কমে কোনো যাকাত নেই।'

চার. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ، وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ[৪৭]

-'খেজুর ও শস্য পাঁচ ওয়াসাক-এর কম হলে তাতে যাকাত ধার্য হয় না।'

পাঁচ. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ[৪৮]

-'পাঁচ ওয়াসাক-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যে যাকাত ফরয হয় না, পাঁচটি উটের কমেও যাকাত ফরয হয় না এবং পাঁচ উকিয়ার কমেও যাকাত ফরয হয় না।'

ছয়. জাবির ইব্ন 'আব্দিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ[৪৯]

-'রৌপ্য পরিমাণে পাঁচ উকিয়ার কম হলে তাতে কোনো যাকাত নেই, উটের সংখ্যা পাঁচের কম হলে তাতে কোনো যাকাত নেই, আর খেজুর পাঁচ ওয়াসাক-এর কম হলে তাতেও কোনো যাকাত নেই।'

গ. দাঊদ যাহিরী (র) (২০১-২৭০ হি.) মতে, পাত্র দ্বারা যা পরিমাপ করা যায়, তার পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাক পর্যন্ত না পৌঁছা পর্যন্ত তাতে উশর ফরয হবে না। তুলা, জাফরান ও সকল প্রকার শাক-সবজির পরিমাণ যাই হোক তাতে উশর ফরয হবে।[৫০] ড. ইউসুফ আল-কারযাভী (জন্ম ১৯২৬ খ্রি.) বলেন, মূলত এ মতে দুটি হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ একটি হাদীসে সাধারণভাবে সকল উৎপন্ন দ্রব্যের উপর যাকাত ফরয, আর অপরটিতে পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত ফরয না হওয়ার কথা বলা হয়েছে।[৫১]

ঘ. আল-বাকির ও আন্-নাসির-এর মতে, শুষ্ক খেজুর, কিশমিশ, গম ও যবে নিসাব ধার্য হবে। কেননা এটাই সাধারণ অভ্যাস। অতএব সেদিকেই ফিরতে হবে।[৫২]

ঙ. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব মোতাবেক জমির সর্বপ্রকারের উৎপাদনের উপর যাকাত ফরয হওয়ার মতকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি। কিন্তু তার নিসাব নির্ধারণ না করা ও উৎপাদিত ফল-ফসলের সকল পরিমাণের উপর যাকাত ধার্যকরণে আমরা তাঁর বিপরীত মত পোষণ করি। কেননা এই কথাটি সহীহ হাদীসের পরিপন্থী। সহীহ হাদীসে পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণে যাকাত ধার্য না করার কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এছাড়া যাকাত তো কেবল ধনী লোকদের উপরই আবশ্যক। সাধারণভাবে এটাই শরীয়তের বিধান। আর নিসাব হচ্ছে ধনীর সম্পদের নিম্নতম মাত্রা। এ কারণে যাকাত ফরয হয়েছে- এমন সব মালেরই একটা নিসাব নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছে।[৫৩]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জমহূর আলিমের মতের সাথে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতের যথেষ্ট বৈপরীত্ব বিদ্যমান। উভয় প্রকার মতের স্বপক্ষেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাই তাঁদের মতের স্বপক্ষের হাদীসসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। নিম্নে এ সম্পর্কে আলিমগণের কয়েকটি অভিমত তুলে ধরা হলো:

ক. ইমাম ইব্নুল কায়্যিম (৬৯১-৭৫১ হি.) (র) বলেন, দুটি হাদীস অনুযায়ীই আমল করতে হবে। তাই একটিকে অপরটির বিপরীত মনে করা অনুচিত। এছাড়া কোনো একটিকে বাদ দিয়ে চলাও সম্ভব নয়। কেননা দুটি হাদীসই রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত। এজন্য দুটি বিধান পালন করেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। আর এ আনুগত্য করা ফরয। মূলত হাদীস দুটির মধ্যে কোনো বৈপরীত্ব নেই। তার কয়েকটি কারণ স্পষ্ট। কেননা আকাশের পানি যাই সিক্ত করে তাতেই উশর- কথাটি দ্বারা কোন জমির ফসলে উশর ধার্য হবে এবং কোন জমিতে অর্ধ উশর ধার্য হবে তার মধ্যকার পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যাকাত পরিমাণের পার্থক্য নির্দেশ পর্যায়ে দুই প্রকারের জমি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নিসাবের পরিমাণটা কী হবে সে বিষয়ে এই হাদীসে কিছু বলা হয়নি। তা বলা হয়েছে অপর হাদীসে। সুতরাং অকাট্য, সুস্পষ্ট ও সহীহ দলীল এড়িয়ে তার পরিবর্তে অস্পষ্ট ও অপার্থক্য নির্দেশক কথা গ্রহণ করা উচিত নয়।[৫৪]

খ. ইব্‌ন কুদামাহ (৫৪১-৬২০ হি.) (র) বলেন, নবী করীম (সা)-এর বাণী, لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ -'পাঁচ ওয়াসাক-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যে যাকাত ফরয হয় না।' এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত ও সর্বসমর্থিত। এ কথাটি একটি বিশেষ নির্দেশক কথা। এজন্য এটিকে সাধারণ অর্থবোধক নির্দেশের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। যেমন- فِي سَائِمَةِ الْإِبِلِ الزَّكَاةُ -'প্রতিটি উন্মুক্তভাবে পালিত উটের যাকাত দিতে হবে'- এই সাধারণ কথার উপর لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ -'পাঁচ যাওদ (পাঁচটি উট)-এর কম সংখ্যকের উপর যাকাত নেই'- এই হাদীসটিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আর فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ -'প্রতি নগদ সম্পদেই এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ যাকাত।' এই কথাটির উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ -'পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণে যাকাত নেই'- এই কথাটিকে। কেননা এ পরিমাণ সম্পদের উপরই যাকাত ফরয হতে পারে, তার কমের উপর নয়। আর সর্বপ্রকার যাকাতযোগ্য মালের ক্ষেত্রেই এ নিয়ম প্রযোজ্য।[৫৫]

গ. ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ -'পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত নেই।' এটি সহীহ হাদীস। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র) এর গৃহীত ফসলের নিসাব নির্ধারণ সংক্রান্ত فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ -'আকাশের পানিতে যা-ই সিক্ত হয় তাতেই উশর ধার্য হবে' হাদীসের সমন্বয় সাধন করা উচিত। সুতরাং জমি থেকে কম-বেশি যা কিছুই উৎপন্ন হবে তা থেকেই উশর বা অর্ধ উশর আদায় করতে হবে। তবে আমরা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কথাকে এ ব্যাপারে দলীল হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না; বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করব। সুতরাং পাঁচ ওয়াসাকের নিচে ফসলের যাকাত প্রদান করার কোনো আবশ্যকতা নেই।[৫৬]

ঘ. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, উপর্যুক্ত দুটি হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। এ দুটি হাদীসের প্রথমটি বিশেষ এবং দ্বিতীয়টি সাধারণ পর্যায়ের। প্রথমটি দ্বিতীয়টির বিপরীত। আর দুটি দলীলের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গেলে যেটি অধিকতর সতর্কতা বিধায়ক অর্থাৎ সর্বপ্রকার জমির উৎপাদনের উপর যাকাত ধার্যকরণকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে- এরূপ বলা বাঞ্ছনীয় নয়; বরং বলতে হবে, দুটি হাদীস অনুযায়ীই আমল করতে হবে।[৫৭]

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উশরের নিসাব পাঁচ ওয়াসাক। কেননা অধিকাংশ ফকীহ এ মত পোষণ করেছেন এবং তাঁরা তাঁদের মতের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

ওয়াসাক পরিচিতি

ইসলামী শরীয়তে শস্য ও ফলের নিসাব ধার্য করা হয়েছে পাঁচ ওয়াসাক। কেননা সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, উশরের নিসাব পাঁচ ওয়াসাক। এজন্য ওয়াসাক-এর পরিচয় দানের নিমিত্তে অন্যান্য হাদীসে ওয়াসাক-এর ব্যাখ্যা উল্লিখিত হয়েছে। যেমন-

ক. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ، وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ مَخْتُومًا[৫৮]

-'পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত নেই। আর এক ওয়াসাক হচ্ছে ষাট সা'।'

খ. ইবরাহীম (র) (৪৭-৯৬ হি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

الْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا مَخْتُومًا بِالْحَجَّاجِيِّ[৫৯]

-'এক ওয়াসাক সমান ৬০ সা'। এটি আল-হাজ্জাজ কর্তৃক নির্ধারিত।'

গ. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী (র) (২০৯-২৭৯ হি.) বলেন,

وَالوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا، وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ: ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ[৬০]

-'এক ওয়াসাক সমান ৬০ সা'। সুতরাং ৫ ওয়াসাক সমান ৩০০ সা'।'

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, এক ওয়াসাক সমান ৬০ সা‘ । এছাড়া এ ব্যাপারে ইজমাও অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৬১] সুতরাং বলা যায় যে, এক ওয়াসাক সমান ৬০ সা‘ হলে পাঁচ ওয়াসাক সমান তিনশ সা‘ ।[৬২]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উশরের নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে ওয়াসাক দ্বারা, আর ওয়াসাকের পরিমাণ করা হয়েছে সা‘র দ্বারা। সুতরাং বলা যায় যে, ফসল ও ফলাদির নিসাব নিশ্চিতরূপে জানার জন্য সা‘র পরিচিতি প্রয়োজন।

লিসানুল ‘আরব অভিধান অনুযায়ী, সা‘ হলো তদানীন্তন মদীনাবাসীদের একটি পরিমাপ, যা চার মুদ পরিমাণ হয়। হাদীসে বলা হয়েছে, ‘নবী করীম (সা) এক সা‘ পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল সম্পন্ন করতেন এবং এক মুদ পানি দিয়ে ওযু সম্পন্ন করতেন।’ আর নবী করীম (সা)-এর সা‘ তখনকার সমাজে প্রচলিত চার মুদ দ্বারা পরিমাপ করা হতো। মুদও একটা বিশেষ মাপ, যা মধ্যম মানের ব্যক্তির পূর্ণ দুই অঞ্জলি ভর্তি পরিমাণের সমান। কামূস গ্রন্থকার বলেছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই কথাটিই বিশুদ্ধ পাওয়া গেছে।[৬৩] নবী করীম (সা) তাঁর উম্মতকে তদানীন্তন মদীনায় প্রচলিত ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থাকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- দিরহাম[৬৪] ও মিছকাল[৬৫] ছিল মক্কায় প্রচলিত পরিমাপ ব্যবস্থা। ইব্ন ‘উমার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন,

الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ[৬৬]

-‘পাত্র ছাড়া মাপ বা কায়ল চলবে মদীনাবাসীদের এবং দাড়িপাল্লায় ওজন চলবে মক্কাবাসীদের।’

এরূপ পার্থক্যকরণের একটা যৌক্তিকতাও রয়েছে। কেননা তদানীন্তন মদীনাবাসীরা কৃষিজীবী, ফল ও ফসল উৎপাদক ছিল বিধায় তারা পাত্রের মাপ চালু করেছিল। আর এ মাপটাই ছিল তাদের কাছে অধিক যথার্থ ও সংরক্ষিত। পক্ষান্তরে মক্কাবাসীরা ছিল ব্যবসায়ী। এ কারণে তারা দাড়িপাল্লার ওজনের মুখাপেক্ষী ছিল। যেমন- দিরহাম ও দীনার। এটার দ্বারাই তারা সঠিক হিসাব বের করত।[৬৭]

নবী করীম (সা) মদীনায় প্রচলিত পরিমাপ ব্যবস্থাকে মানদণ্ড রূপে ঘোষণা করে সেটিকেই অনুসরণ করতে বলেছেন। তাই স্বভাবতই আশা ছিল সকল মুসলমান মদীনায় প্রচলিত সা‘-এর পরিমাপে সম্পূর্ণ একমত হবেন; কিন্তু পরবর্তীতে সা‘-এর পরিমাণ নির্ণয়ে আলিমগণের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত আলোচনা উল্লেখ করা হলো:

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র), তাঁর অনুসারী ও ইরাকের অধিবাসীগণের মতে, এক সা‘ সমান আট রতল। এ রতল হচ্ছে বাগদাদী। এ মতের স্বপক্ষে দলীল হলো, ‘উমার (রা) (৪০ হি.পূ.-২৩ হি.)-এর ব্যবহৃত সা‘ । আর এ কথা প্রমাণিত যে, তাতে আট রতল হতো।[৬৮]

খ. ইমাম শাফি‘ঈ (র), ইমাম আহমাদ (র) ও হিজাযের অধিবাসীগণের মতে, এক সা‘ সমান পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল। এ মতের স্বপক্ষে দলীল হলো, পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতলই হলো মদীনায় প্রচলিত এক সা‘ । রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকেই তা পরম্পরানুযায়ী চালু হয়ে এসেছে। আর হাদীস অনুযায়ী পাত্র দিয়ে পরিমাপের মাদানী নিয়মই অনুসরণ করা কর্তব্য।[৬৯] এ মতের স্বপক্ষে আরও কতিপয় দলীল বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

এক. ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ইমাম মালিক (র)-কে সা‘-এর পরিমাণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এর পরিমাণ হচ্ছে, পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল। আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এটি আপনি কোথায় পেয়েছেন? ইমাম মালিক (র) তখন তাঁর শিষ্যদেরকে তাদের বাড়িতে সংরক্ষিত সা‘গুলো নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। অতঃপর তাঁর মাদানী শিষ্যগণ বাড়ি গিয়ে একটি করে সা‘ নিয়ে হাজির হন। তাঁদের প্রায় সকলেই ছিল আনসার ও মুহাজির সাহাবী পরিবারের সদস্য। ইমাম মালিক (র) বলেন, এ সা‘গুলো তাঁরা ঐতিহ্য সূত্রে তাদের পিতা, পিতামহ তথা সাহাবীগণের নিকট থেকে লাভ করেছেন। এসকল সা‘ সাধারণত আমাদের এখানে বহুল প্রচলিত। সুতরাং সা‘-এর এ পরিমাণ

অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। ফলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) সা' এর পরিমাণ বিষয়ে তাঁর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন।[৭০]

দুই. ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, আমি মদীনায় উপস্থিত হয়ে সা' সম্পর্কে জানতে চাইলাম। মদীনাবাসীরা বলল, আমাদের এই সা' রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যবহৃত সা'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তার প্রমাণ কী? তারা বলল, আগামীকাল প্রমাণ পেশ করা হবে। পরের দিন প্রায় পঞ্চাশজন বৃদ্ধ বয়সের লোক উপস্থিত হলেন। তাঁরা ছিলেন আনসার ও মুহাজিরগণের অধঃস্তন। তাঁদের প্রত্যেকের হাতে ছিল একটি করে সা'-এর পাত্র, যা চাদরের তলে রক্ষিত ছিল। প্রত্যেকেই তাঁদের পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সা' ব্যবহার করতেন। আমি তাকিয়ে দেখলাম পাত্রগুলো সমমানের। অতঃপর অনুমান করলাম সামান্য কমতিসহ সেগুলো পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল পরিমাণের হবে। আমার কাছে ব্যাপারটি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল। ফলে আমি সা'-এর ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত ত্যাগ করে মদীনাবাসীদের কথা গ্রহণ করলাম। এ ঘটনার বর্ণনাকারী হুসায়ন বলেন, আমি এ নিয়ে আরও অনেকের সাথে আলোচনা করেছি। ইমাম মালিক (র)-এর কাছেও জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, এ সা'-ই নবী করীম (সা) কর্তৃক ব্যবহৃত সা'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কত রতলের হবে? তিনি বললেন, এটা তো ওজন করা হয় না।[৭১]

তিন. ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আমি সা' ওজন করেছি, তা পাঁচ ও দুই-তৃতীয়াংশ রতল পরিমাণের সমান। তিনি আরও বলেন, আমি আবূ নযর থেকে সা' গ্রহণ করেছি। আবূ নযর বলেছেন, আমি আবূ যি'ব থেকে তা গ্রহণ করেছি। তিনি বলেছেন, এটাই নবী করীম (সা)-এর সা', যা তখনকার মদীনায় প্রচলিত ছিল। আমরা ওজন করে দেখেছি, তা পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল পরিমাণের সমান। আর আমার কাছে এটাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সা' বলে প্রমাণিত হয়েছে।[৭২]

ইমাম ইব্ন তায়মিয়্যা (র) (৬৬১-৭২৮ হি.) উপর্যুক্ত দুটি পরিমাণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বলেন, মূলত এখানে দুধরনের সা' প্রচলিত ছিল। একটি ছিল খাদ্য, শস্য প্রভৃতি পরিমাপ করার জন্য আর অপরটি ছিল পানি পরিমাপের জন্য। খাদ্য পরিমাপের সা' পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল পরিমাণ হতো। পক্ষান্তরে পানি পরিমাপের জন্য সা' ছিল আট রতলের। এ দুটি বিষয়েই সাহাবীগণের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। অতএব যাকাত, কাফফারা ও সাদকাতুল ফিতর-এর জন্য সেই সা' গণ্য হবে, যা গোসলের পানি পরিমাপের সা'-এর দুই-তৃতীয়াংশ। ইমাম আহমাদ (র)-এর সাথীদের একাংশও অনুরূপ মত গ্রহণ করেছেন। এ মত অনুযায়ী সকল রতল একই পরিমাণের হয়; কিন্তু দুই সা' ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে দাঁড়ায়।[৭৩]

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, হিজাযী ফকীহগণের অভিমত তথা এক সা' সমান পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল মতটিই অধিক বিশুদ্ধ এবং তা শক্তিশালী দলীল-প্রমাণে প্রসিদ্ধ। কেননা মদীনায় প্রচলিত নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ইমাম মালিক (র)-এর তুলনায় কেউ অধিক অবগত ছিল না। এছাড়া ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সাক্ষ্যও এ মতের পক্ষে বড় দলীল।[৭৪]

মনীষী রীস বলেন, হিজাযী ফকীহগণের মতের পক্ষে অকাট্য দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ ব্যাপারে আর কোনো সংশয় থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা বহু মনীষী ও মুজতাহিদ এই মত সমর্থন করেছেন।[৭৫]

উভয় মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কতিপয় হানাফী আলিম বলেছেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) সা' নির্ধারণ করতে গিয়ে তাকে পাঁচ ও দুই-তৃতীয়াংশ রতল (মদীনার রেওয়াজের মতো) পরিমাণে পেয়েছেন। আর এ পরিমাণটা বাগদাদী রতল অনুযায়ী আট রতল সমান হয়। ইমাম মুহাম্মাদ (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সাতে দ্বিমত করেননি।[৭৬]

আধুনিক পরিমাপে শস্য ও ফলের নিসাব

নিসাব নির্ধারিত হওয়ার ব্যাপারে ইব্ন কুদামাহ (র) বলেন, পাত্র পরিমাপের (كَيْل) দ্বারাই নিসাব নির্ধারিত হবে। কেননা ওয়াসাক তো পাত্র দ্বারা পরিমাপ পর্যায়ের জিনিস। তাকে ওজনে রূপান্তরিত করা হয়েছে সুসংবদ্ধকরণ, সংরক্ষণ ও অনুসরণের জন্য। এ কারণে পাত্র পরিমাপ অনুযায়ী যাকাত ধার্য করা হয়, পাল্লার ওজন হিসাবে নয়। আর পাত্রের মাপ ওজন হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই কতক জিনিস খুব ভারী হয়, যেমন- যব, ডাল ও মসুর। আর কতক জিনিস হয় হালকা, যেমন- বার্লি ও ক্ষুদ্র দানা। আর কতক জিনিস

হয় মধ্যম। ইমাম আহ্‌মদ (র) দৃঢ়তা সহকারে নির্ধারণ করেছেন যে, এক সা‘ পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল পরিমাণের গম।[৭৭]

উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের পরিমাপ ব্যবস্থায় পাঁচ ওয়াসাক-এর পরিমাণ সম্পর্কে আলিমগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

ক. মাওলানা আযীযুর রহমান তাঁর ফাতাওয়ার কিতাবে এক সা‘-এর তিনটি ওজন বর্ণনা করেছেন। যেমন- প্রায় এক সের দশ ছটাক, প্রায় তিন সের চৌদ্দ ছটাক এবং প্রায় সাড়ে তিন সের। তবে তিনি শেষ হিসাবটির ওপরই ফাতাওয়া প্রদান করেছেন।[৭৮]

খ. ফিকাহ মুহাম্মদী গ্রন্থে বলা হয়েছে, পাঁচ ওয়াসাক হলে ফসল মাড়াইয়ের দিন উশর বের করে দিতে হবে। ষাট সা‘ সমান এক ওয়াসাক। তাই এক সা‘ প্রায় পৌনে তিন সের ওজন হলে পাঁচ ওয়াসাকে প্রায় ২০ মণ ওজন হয়। সুতরাং ২০ মণ ফসল হলে তাতে উশর বের করতে হবে।[৭৯]

গ. ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুযায়ী ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী (জন্ম ১৯৩১ খ্রি.) বলেন, পাঁচ ওয়াসাক সমান প্রায় সাড়ে সতের মণ।[৮০]

ঘ. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী (র) বলেন, পাঁচ ওয়াসাক সমান ৬৫৩ কিলোগ্রাম প্রায়।[৮১]

ঙ. মাওলানা সায়্যিদ ‘উরূজ বলেন, পাঁচ ওয়াসাক সমান আঠার মণ ত্রিশ সের।[৮২]

চ. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (র) (১৯৬১-২০১৬ খ্রি.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারে এক সা‘ সমান ৩,২৯৬.৮ গ্রাম। সে হিসেবে এক ওয়াসাক সমান ৩,২৯৬.৮×৬০= ১৯৭৮০৮ গ্রাম এবং পাঁচ ওয়াসাক সমান ৯৮৯০৪০ গ্রাম বা প্রায় ৯৯০ কিলোগ্রাম। সুতরাং ৪০ কেজিতে মণ ধরলে উশরের নিসাব প্রায় ২৫ মণ। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র), ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফি‘ঈ (র) ও ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে, এক সা‘ সমান ২,১৭৫ গ্রাম। সে হিসেবে এক ওয়াসাক সমান ২,১৭৫×৬০= ১৩০৫০০ গ্রাম এবং পাঁচ ওয়াসাক সমান ৬৫২৫০০ গ্রাম বা প্রায় ৬৫৩ কিলোগ্রাম। সুতরাং ৪০ কেজিতে মণ ধরলে উশরের নিসাব প্রায় ১৭ মণ।[৮৩]

ছ. সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী বলেন, বাংলাদেশের ওজনে পাঁচ ওয়াসাক প্রায় ত্রিশ মণের বেশি হয় না। অতএব উশরের নিসাব ত্রিশ মণ। কোনো মৌসুমের যেকোনো ফসল ত্রিশ মণ হলে তাতে উশর দিতে হবে। এর কম হলে কোনো উশর নেই।[৮৪]

জ. কেউ কেউ বলেন, পাঁচ ওয়াসাক সমান উনিশ মণ।[৮৫]

ঝ. পাকিস্তানের আলিমগণ উশরের নিসাব সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, উশরের নিসাব হবে প্রায় সাড়ে ছাব্বিশ মণ। তাঁদের এ গবেষণা সঠিক বলা যায় এ কারণে যে, ইরাকে হানাফীগণের মতে এক সা‘ সমান ৩,২৯৬ গ্রাম এবং আরবী এক ওয়াসাক সমান ৬০ সা‘। অতএব ৬০ সা‘ সমান ৩,২৯৬×৬০=১,৯৭,৭৬০ গ্রাম। আর উশরের নিসাব হলো ৫ ওয়াসাক। সুতরাং ৫ ওয়াসাক সমান ১,৯৭,৭৬০×৫ = ৯,৮৮,৮০০ গ্রাম বা ৯৮৮.৮ কিলোগ্রাম। আর বাংলাদেশের মাপে ১,০০০ গ্রাম সমান ৮৬ তোলা। অতএব ৯৮৮.৮ কিলোগ্রাম সমান ২৬ মণ ২২ সের ১২ ছটাক। তাই নির্দ্বিধায় উশরের নিসাব সাড়ে ২৬ মণ সাব্যস্ত করা যায়। সে হিসাবে পাকিস্তানি আলিমগণের ইজমা অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।[৮৬]

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে যাকাতুল-ফিত্‌র ও অন্যান্য আহকামের সাথে সমন্বয় সাধন করে উশর তথা ফসলের যাকাত ৯৯০ কেজি নির্ধারণ করা উচিত। এ দেশের সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ৪০ কেজিতে মণ নির্ধারণের প্রচলন রয়েছে বিধায় ফল-ফসলের যাকাত তথা উশরের নিসাবকে ২৫ মণ সাব্যস্ত করা যায়।

পাত্র দিয়ে পরিমাপ করা হয় না এমন জিনিসের নিসাব

যে সকল ফসল পাত্র দিয়ে পরিমাপ করা হয় না, যেমন- তুলা, জাফরান প্রভৃতির নিসাব নির্ধারণে ফকীহ্‌গণ মতভেদ করেছেন। যেমন-

ক. ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, তাতে মূল্যের হিসাব করতে হবে। অর্থাৎ এসকল ফসলের মূল্য যদি পাঁচ ওয়াসাকের সমপরিমাণ শস্যের মূল্যের নিকটবর্তী হয়, তাহলে তাতে যাকাত ফরয হবে। কেননা হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী ওয়াসাকই হলো যাকাতের হিসাবের ভিত্তি।[৮৭]

খ. ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এ সকল ফসল যা দিয়ে মাপা হয় সেই জিনিসের উচ্চতার পাঁচ গুণ নিসাব ধরতে হবে। কেননা পাত্র দিয়ে পরিমাপের জিনিস ওয়াসাক দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে এজন্য যে, এ পর্যায়ে তা-ই হচ্ছে উচ্চতার মাপ।[৮৮] সুতরাং তুলার ক্ষেত্রে পরিমাণ ধরা হবে পাঁচটি গাঁট। প্রতি গাঁট হবে তিনশন মণ আর জাফরানের ক্ষেত্রে হবে পাঁচ মণ। কেননা ওয়াসাক দ্বারা পরিমাপের কারণ ছিল– তা ছিল ঐ জাতীয় দ্রব্যের মাপের সর্বোচ্চ পরিমাণ।[৮৯]

গ. ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে, যা পাত্র দিয়ে মাপা হয় না, তা ওজনে পরিমাপ করতে হবে। এ কারণে জাফরান, তুলা ও তার মতো অন্যান্য জিনিসকে এক হাজার সাতশত রতল দিয়ে ওজন ঠিক করতে হবে। কেননা তা পাত্র দিয়ে মাপা হয় না বলে তার ওজনটাই পাত্র মানের স্থলাভিষিক্ত হবে। যেহেতু শরীয়ত তার যে নিসাব পেশ করেছে তার পরিমাণ ওজন দিয়ে যাকাত দিতে হবে। আর তা হচ্ছে ৬৫৩ কিলোগ্রাম।[৯০]

ঘ. দাঊদ (র) (২০১-২৭০ হি.) বলেছেন, যা পাত্র দিয়ে পরিমাপ করা হয় না, তার পরিমাণ কম-বেশি যা-ই হোক না কেন, তার উপরই যাকাত ধার্য হবে।[৯১]

ঙ. কারো কারো মতে, এসকল জিনিসের নিসাব দুইশ দিরহাম নির্ধারণ করতে হবে। কেননা সে জিনিসের নিজের জন্য কোনো নিসাব নির্ধারিত না হওয়ায় অন্য জিনিসের নিসাবই তার জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে।[৯২]

ইব্ন কুদামাহ (র) বলেন, এসকল কথার মূলে এমন কোনো দলীল আছে বলে জানা যায় না, যার উপর নির্ভর করা যেতে পারে। এছাড়া নবী করীম (সা)-এর বাণী দ্বারা এসব মত বাতিল বলে গণ্য। নবী করীম (সা) বলেছেন,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ[৯৩]

-'পাঁচ ওয়াসাকের কমের উপর কোনো যাকাত নেই।'

আর কম বা বেশি যা-ই পরিমাণ হোক, তার উপর যাকাত ধার্যকরণ যাকাতে সর্বপ্রকার মালেরই বিরোধী।[৯৪]

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, আমাদের নিকট গৃহীত মত হচ্ছে, যা পাত্র দিয়ে মাপা বা ওজন করা হয় না তাতে মূল্যের হিসাবে নিসাব ঠিক করতে হবে। কিন্তু তা যাকাত দেয়ার মাল হতে হবে, যদিও তার নিসাব শরীয়তে উল্লেখ করা হয়নি। এজন্য তার নিসাব অন্য জিনিস দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে। আর অন্য জিনিস দ্বারা তার নিসাব নির্ধারণ যখন একান্তই অপরিহার্য, তখন যা ওয়াসাক হিসেবে ওজন করা যায় তার মূল্যকে গণ্য করতে হবে। কেননা এর স্বপক্ষে দলীল রয়েছে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)ও এ মত পোষণ করেছেন। কিন্তু তিনি গম বা চাল ইত্যাদি যা ওজন করা হয়, তার নিকটবর্তী মূল্য হিসাব করতে বলেছেন। এক্ষেত্রে আমি ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতের বিরোধিতা করছি। তাই এতে যদিও গরীব-মিসকীনদের ভাগে বেশি পড়বে; কিন্তু সেই সাথে মালের মালিকদের প্রতি অবিচার করা হবে। এ কারণে আমি মনে করি, প্রচলিত ধরনের পাত্র দিয়ে মাপার জিনিসগুলো যা ওজন করা যায় তার গড় পরিমাণ ধরতে হবে, এর থেকে কমও নয় আবার বেশিও নয়। ফলে তাতে ধনী ও গরীব উভয়ের স্বার্থই রক্ষিত হবে।[৯৫]

বিভিন্ন ফসল একত্রিত করে ওয়াসাক নির্ধারণ

জমিতে উৎপাদিত প্রতিটি ফসলে যাকাত নির্ধারিত হওয়ার জন্য এককভাবেই পাঁচ ওয়াসাক হওয়া প্রয়োজন, না বিভিন্ন ফসল একত্রিত করে পাঁচ ওয়াসাক হলেও যাকাত প্রদান করা যাবে? এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো:

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম শাফি'ঈ (র), ইমাম আহমাদ (র) ও সাহিবায়নের মতে, প্রত্যেক প্রকার ফসলের হিসাব পৃথকভাবে হিসাব করতে হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণির ফসল একত্রিত করে নিসাব নির্ধারণ করা যাবে না। যেমন- ধান, গম, যব, ভুট্টা, ছোলা, মশুর, মটর, খেরাম, কিশমিশ প্রভৃতি ফসল একটু একটু করে একত্রিত করে নিসাব নির্ধারণ করা যাবে না; বরং প্রত্যেক শ্রেণির ফসল

পৃথকভাবে পরিমাপ করার পর নিসাব পরিমাণ হলে তাতে উশর প্রদান করতে হবে, অন্যথায় নয়। তবে বিভিন্ন জাতের ধান, গম, যব, ভুট্টা, ছোলা, মশুর প্রভৃতি যদি একত্রিত করে নিসাব পরিমাণ হয়; যেমন- চার পাঁচ জাতের ধান একত্রিত করে নিসাব পরিমাণ হলে, তাতে উশর প্রদান করতে হবে।[৯৬]

খ. ইমাম আবূ ইউসুফ (র) অপর এক বর্ণনায় বলেন, যদি কোনো জমিতে আড়াই ওয়াসাক গম ও আড়াই ওয়াসাক যব উৎপন্ন হয়, অনুরূপভাবে যদি এক ওয়াসাক গম, এক ওয়াসাক যব, এক ওয়াসাক ধান, এক ওয়াসাক খেজুর এবং এক ওয়াসাক কিশমিশ উৎপাদিত হয় এবং এগুলো একত্রে পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হয়, তাহলে তাতে উশর প্রদান করতে হবে।[৯৭]

নিসাব হিসাব করার সময়

ফল-ফসলের নিসাব কখন নির্ধারণ করা হবে এ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি অভিমত তুলে ধরা হলো:

ক. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, ফল শুকানোর পর এবং কৃষি ফসলের খোসা পরিষ্কার করার পর নিসাবের হিসাব করতে হবে। অর্থাৎ কাঁচা খেজুর শুকিয়ে গেলে, আঙ্গুর শুকিয়ে কিশমিশ হলে এবং ধান, গম, যব ইত্যাদি মাড়িয়ে খড় ও আবর্জনা মুক্ত করার পর নিসাব হিসাব করতে হবে। ধানের চাল তৈরী করার প্রয়োজন হবে না। তবে যা খোসা সহই পেষা ও গুঁড়ো করা হয় তা খোসা সহকারেই হিসাব করতে হবে।[৯৮]

খ. সায়্যিদ সাবিক (র) (১৯১৫-২০০০ খ্রি.) বলেন, দানা যখন শক্ত ও ঝরে পড়তে আরম্ভ করে এবং ফলে যখন পক্কতা দৃষ্টিগোচর হয় তখন যাকাত ধার্য হয়। আর এটা চেনা যায় খেজুরের লাল হওয়া ও আঙ্গুরের মিষ্ট হওয়া দ্বারা। দানা আবর্জনামুক্ত হওয়া ও ফল শুকানোর পূর্বে যাকাত বের করা হবে না।[৯৯]

গ. ইমাম গাযালী (র) বলেন, যখন কিশমিশ বা শুকনো খেজুর হবে তখনই তার ওয়াসাক ওজন করা হবে। আর শস্যের ক্ষেত্রে ছাল বা খোসা পরিষ্কার করার পর ওয়াসাক ওজন করা হবে। তবে যা খোসাসহ পেষা ও গুড়ি বানানো হয় এবং যা কাঁচা রাখা হয়; শুকনো হয় না, তার কথা আলাদা। আর যা খোসা না ছাড়িয়ে জমা রাখা হয়, তার খোসা দূর করতে মালিকদের বাধ্য করা ঠিক হবে না। কেননা এতে তাদের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।[১০০]

ঘ. কতিপয় ফকীহ খোসা দূর করা জিনিসের দ্বিগুণকে নিসাব ধরেছেন। যেন খোসা দূর করার পর মূল্যের নিসাব যথার্থ হয়। তবে প্রত্যেক ধরনের শস্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে সে বিষয়ে জেনে নেয়া উত্তম। কেননা প্রত্যেক ধরনের কৃষি ফসলের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন।[১০১]

উপসংহার

উশর যাকাতের অনুরূপ একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধান। উশরের মাধ্যমে ইসলামী অর্থব্যবস্থা গতিশীলতা লাভ করে বিধায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। তবে জমিতে উৎপাদিত যেকোনো পরিমাণ ফসলের উপর উশর আবশ্যক নয়; বরং উৎপাদিত ফসলে উশরের নির্ধারিত শর্ত বিদ্যমান থাকলে তার উপর যাকাত প্রদান আবশ্যক। আর উশরের শর্তের মধ্যে অন্যতম একটি শর্ত হলো, ফসল নিসাব পরিমাণ হওয়া। ফল-ফসলের নিসাব নির্ধারণে অধিকাংশ ফকীহের মত হলো, পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণে না পৌঁছা পর্যন্ত কৃষি ফসল ও ফল-ফাঁকড়ায় যাকাত ফরয হবে না। এ মতানুযায়ী উশরের নিসাব হলো পাঁচ ওয়াসাক বা তিনশ সা'। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পাঁচ ওয়াসাক সমান প্রায় ২৫ মণ। সুতরাং উক্ত নিসাব পরিমাণ ফসলে অন্যান্য শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকলে অবস্থাভেদে এক-দশমাংশ বা এক-বিশমাংশ যাকাত আদায় করা ফরয। অর্থাৎ বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ব্যতিত উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসল থেকে উশর বা এক-দশমাংশ এবং সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসল থেকে অর্ধ উশর বা এক-বিশমাংশ আদায় করা ফরয।

তথ্যনির্দেশ

১ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

-'নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র কাছে ধর্ম হচ্ছে ইসলাম।' দ্র. আল-কুরআনুল কারীম, সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯।

২ **যাকাত:** যাকাত (زَكَاةٌ) শব্দটি আরবী। এটি একবচন, বহুবচনে زَكَوَاتٌ। আভিধানিক অর্থে যাকাত শব্দটি পবিত্রতা, প্রাচুর্য, অতিরিক্ত, বরকত, প্রশংসা, সংশোধন প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো, purification, purity, honesty, justification ইত্যাদি। দ্র. ইব্‌ন মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল-'আরব*, ১৪শ খণ্ড (বৈরূত: দারু সাদির, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৩৫৮; লুইস মা'লূফ, *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাতি ওয়াল-আদাবি ওয়াল-'উলূম* (বৈরূত: আল-মাতবা'আতুল-কাছূলীকিয়্যাহ, ১৯শ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ৩০৩; দ্র. হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন* (বৈরূত: দারুল কলম, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি.), পৃ. ৩৮০-৩৮১; ড. ইবরাহীম মাদকূর, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (মিসর: মাকতাবাতুশ্-শুরূক আদ্-দাওলিয়্যাহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৩৯৬-৩৯৭; Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of islam* (New Delhi: Rupa & Co, 3rd Impression, 1993), p. 699; Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: Spoken Language Services, Inc, Third Edition, 1976), p. 379.

পরিভাষায়, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে খুশি করার নিমিত্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদের একাংশ হাশেমী ও তাদের দাস-দাসী ব্যতিত নির্দিষ্ট শ্রেণির হকদারকে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়। দ্র. ইব্‌ন 'আবিদীন আদ্-দিমাশকী, *রাদ্দুল মুহতার 'আলাদ-দুররিল মুখতার*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, ৩য় সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ২৫৮; 'আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ আল-জুযায়রী, *আল-ফিক্‌হু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৫৩৬; বদরুদ্দীন আল-'আয়নী, *'উমদাতুল কারী শারহু সাহীহিল বুখারী*, ৮ম খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত্-তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ. ২৩৩; সায়্যিদ সাবিক (র) (মৃ. ১৪২০ হি.) বলেন,

اَلزَّكَاةُ اِسْمٌ لما يُخْرِجُهُ الْاِنْسَان مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ

-'আল্লাহ্ তা'আলার এমন প্রাপ্যকে যাকাত বলা হয়, যা অসহায়দেরকে প্রদান করা হয়।' দ্র. সায়্যিদ সাবিক, *ফিক্‌হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৩২৭।

৩ ইব্‌ন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

-'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। আল্লাহ্ ব্যতিত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল- এ কথার সাক্ষ্য দান, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ আদায় করা এবং রমযানের রোযা পালন করা।' দ্র. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল-বুখারী* (বৈরূত: দারু ইব্‌ন কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), কিতাবুল ঈমান, বাবু কাওলিন্-নাবিয়্যি (সা): বুনিয়াল ইসলামু 'আলা খামসিন, হাদীস নং ৮।

৪ **হজ্জ:** হজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা, সংকল্প করা, সাক্ষাৎ করা বা কোনো স্থানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গমন করা। দ্র. *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল-কুরআন*, পৃ. ১১৫; মুহাম্মাদ ইবনুল-হাসান আস্-সারাখ্‌সী, *আল-মাবসূত*, ৪র্থ খণ্ড (মিসর: আল-হাজ্জ মুহাম্মাদ আফিন্দী সাসী আল-মাগরাবী আত্-তানসী, ১৩২৪ হি.), পৃ. ২; খলীল আহমাদ সাহারানপুরী, *বাযলুল-মাজহূদ*, ৮ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, তা.বি.), পৃ. ২৯৭; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল-কাদীর*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.), পৃ. ৪০৫; ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, *ফাতহুল-বারী*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহ্ইয়াইত্-তুরাছিল 'আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪০২ হি.), পৃ. ৪০৫।

পরিভাষায়, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজের দ্বারা তা'যীমের জন্য বায়তুল-হারামের যিয়ারতের প্রতি সংকল্প পোষণ করাকে হজ্জ বলে। এ সম্পর্কে বদরুদ্দীন আল-'আয়নী (র) (মৃ. ৮৫৫ হি.) বলেন,

اَلْحَجُّ قَصْدٌ إِلَى زِيَارَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيْمِ بِأَفْعَالِ مَخْصُوْصَةٍ

-'নির্দিষ্ট কতিপয় কার্যাবলীর মাধ্যমে সম্মান জ্ঞাপনার্থে হারাম গৃহের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সংকল্প করাকে হজ্জ বলে।' দ্র. *'উমদাতুল কারী শারহু সাহীহিল বুখারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২১।

৫ *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাতি ওয়াল-আদাবি ওয়াল-'উলূম*, পৃ. ৫০৭; মুফতী মুহাম্মাদ 'আমীমুল ইহসান, *কাওয়া'ইদুল ফিক্‌হ* (করাচী: মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৩৭৯; *Dictionary of islam*, p. 655.

৬ *লিসানুল-'আরব*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭০; *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৬০২; ড. মুহাম্মাহ রাওয়াস কাল'আজী, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (বৈরূত: দারুন্-নাফাইস, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), পৃ. ৩১২; ড. সা'দী আবূ জীব, *আল-কামূসুল ফিক্‌হী লুগাতান ওয়া ইসতিলাহান* (দিমাশক: দারুল ফিক্‌র, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২৫১।

৭ সম্পাদনা পরিষদ, *আরবী-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৩৬৩।

৮ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১৪শ সংস্করণ, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৬৯৫।

৯ *Dictionary of islam*, p. 655; *A Dictionary of Modern Written Arabic*, p. 614.

---

১০ Edward William Lane, *An Arabic English Lexicon,* Vol. 5 (London: 1874), p. 205.

১১ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ১৫১।

১২ সালিম ইব্ন 'আব্দিল্লাহ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ

-'বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ব্যতিত উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের উপর উশর (এক-দশমাংশ) ফরয। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর অর্ধ উশর (এক-বিশমাংশ) ফরয।'

দ্র. *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবুল-'উশরি ফীমা ইয়ুসকা মিন মা-ইস্-সামাই ..., হাদীস নং ১৪৮৩; মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী, *সুনানুত্-তিরমিযী* (বৈরূত: দারুল গুরাবিল ইসলামী, ১৯৯৮ খ্রি.), আবওয়াবুয্-যাকাত, বাবু মা জাআ ফিস্-সাদাকাতি ফীমা ইয়ুসকা বিল-আনহারি ওয়া গায়রিহা, হাদীস নং ৬৪০।

১৩ মুফতী মুহাম্মাদ শফী, *জাওয়াহিরুল-ফিক্হ*, ২য় খণ্ড (দেওবন্দ: মাকতাবাতু তাফসীরিল-কুরআন 'আরিফ কোম্পানী, তা.বি.), পৃ. ২৪৫-২৪৬; ড. মীর মোঃ আনোয়ার হোসেন, *দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১৫০।

১৪ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫১।

১৫ আবুল হাসান নূরুদ্দীন মোল্লা আল-কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতিল মাসাবীহ*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ১২৮০; আবুল হাসান 'উবায়দুল্লাহ আল-মুবারকপুরী, *মির'আতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতিল মাসাবীহ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বানারাস আল-হিন্দ: ইদারাতুল বুহূছিল 'ইলমিয়্যাহ ওয়াদ্-দা'ওয়াত ওয়াল ইফতা, আল-জামি'আতুস সালাফিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৬৮।

১৬ ইব্নুল আছীর, *আন্-নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীছি ওয়াল আছার*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ২৩৯।

১৭ *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৪৭৯; *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ৬০২।

১৮ *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ৩১২।

১৯ *Dictionary of islam*, p. 655.

২০ বুরহান উদ্দীন 'আলী আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত্-তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ. ১০৮।

২১ *রাদ্দুল মুহতার 'আলাদ-দুররিল মুখতার*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৫।

২২ *লিসানুল-'আরব*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৬১; *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ৪৮০; *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাতি ওয়াল-আদাবি ওয়াল-'উলূম*, পৃ. ৮১১।

২৩ *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৯২৫।

২৪ *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ৪৮০; *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাতি ওয়াল-আদাবি ওয়াল-'উলূম*, পৃ. ৮১১; *আরবী-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪৪; *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, পৃ. ১০৬৮-১০৬৯।

২৫ *A Dictionary of Modern Written Arabic*, p. 969.

২৬ *লিসানুল-'আরব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬১।

২৭ *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৯২৫।

২৮ মুফতী মুহাম্মাদ 'আমীমুল ইহসান, *কাওয়া'ইদুল ফিক্হ* (করাচী: মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৫২৭।

২৯ *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ৪৮০।

৩০ *Dictionary of islam*, p. 434.

৩১ সূরা আল-মা'আরিজ, ৭০ : ২৪-২৫।

৩২ সূরা আয্-যারিয়াত, ৫১ : ১৯।

৩৩ মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৪৩৪।

৩৪ 'আলাউদ্দীন আল-কাসানী, *বাদাই'উস্-সানাই' ফী তারতীবিশ্-শারাই'*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২।

৩৫ *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭; *ফিক্হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫২; ইউসুফ আল-কারযাভী, *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ১৫০।

৩৬ ইব্ন কুদামাহ আল-মুকাদ্দিসী, *আল-মুগনী*, ৩য় খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুল কাহিরাহ, ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ৭; *ফিক্হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫২; কামালুদ্দীন ইব্নুল হুমাম, *ফাত্হুল-কাদীর*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, তা.বি.), পৃ. ২৪২।

৩৭ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৬৭।

৩৮ সূরা আল-আন'আম, ৬ : ১৪১।

৩৯ *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭; ড. ওয়াহবাহ আয্-যুহায়লী, *আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৩য় খণ্ড (দিমাশক: দারুল-ফিক্র, ৪র্থ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ২৪০।

৪০ সুলায়মান ইব্ন আহমাদ আত্-তাবারানী, *আল-মু'জামুস্-সগীর* (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, দারু 'আম্মার, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), বাবুল মীম, মান ইসমুহু মানসূর, হাদীস নং ১০৮৮।

৪১ *আল-মুগনী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭; *ফিক্হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫২।

৪২ *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭; *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১; *আল-মুগনী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭; *ফিক্‌হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫২; *ফাত্‌হুল-কাদীর*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪২; *আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯; ‘আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-জুযায়রী, *আল-ফিক্‌হু ‘আলাল মাযাহিবিল আরবা‘আহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৫৫৯।

৪৩ *ফিক্‌হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫২।

৪৪ *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুয্‌-যাকাত, বাবু যাকাতিল ওয়ারাকি, হাদীস নং ১৪৪৭; আহমাদ ইব্‌ন শু‘আয়ব আন্‌-নাসাঈ, *সুনানুন্‌-নাসাঈ* (বৈরূত: দারুল-ফিক্‌র, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫-১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), কিতাবুয্‌-যাকাত, বাবু যাকাতিল-ইবিলি, হাদীস নং ২৪৪৬।

৪৫ *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুয্‌-যাকাত, বাবু লায়সা ফীমা দূনা খামসি যাওদিন সাদাকাতুন, হাদীস নং ১৪৫৯; *সুনানুন্‌-নাসাঈ*, কিতাবুয্‌-যাকাত, বাবু যাকাতিল ওয়ারাকি, হাদীস নং ২৪৭৪।

৪৬ মুসলিম ইব্‌নুল-হাজ্জাজ আল-কুরায়শী আন্‌-নায়সাপুরী, *সহীহ মুসলিম* (বৈরূত: দারুল-ফিক্‌র, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), কিতাবুয্‌-যাকাত, বাবু মা ফীহিল ‘উশরু আও নিসফুল ‘উশরি, হাদীস নং ৫ (৯৭৯)।

৪৭ পূর্বোক্ত, কিতাবুয্‌-যাকাত, বাবু মা ফীহিল ‘উশরু আও নিসফুল ‘উশরি, হাদীস নং ৪ (৯৭৯)।

৪৮ *সুনানুন্‌-নাসাঈ*, কিতাবুয্‌-যাকাত, বাবু যাকাতিল ইবিলি, হাদীস নং ২৪৪৫।

৪৯ *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয্‌-যাকাত, বাবু তারকিস সালাতি ‘আলাল কাতিলি নাফসাহু, হাদীস নং ৬ (৯৮০)।

৫০ *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২।

৫১ পূর্বোক্ত।

৫২ পূর্বোক্ত।

৫৩ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২-৩৬৩।

৫৪ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৩।

৫৫ *ফিক্‌হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১০; *আল-মুগনী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭; *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৩।

৫৬ মুহাম্মাদ ইব্‌নুল হাসান আশ্‌-শায়বানী, *আল-হুজ্জাত ‘আলা আহ্‌লিল-মাদীনা*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: ‘আলামুল কুতুব, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৩ হি.), পৃ. ৪৯৭।

৫৭ *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৩।

৫৮ *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুয্‌-যাকাত, বাবু মা তাজিবু ফীহিয্‌-যাকাত, হাদীস নং ১৫৫৯।

৫৯ পূর্বোক্ত, কিতাবুয্‌-যাকাত, বাবু মা তাজিবু ফীহিয্‌-যাকাত, হাদীস নং ১৫৬০।

৬০ *সুনানুত্‌-তিরমিযী*, আবওয়াবুয্‌-যাকাত, বাবু মা জাআ ফী সাদাকাতিয্‌-যার‘ই ওয়াত্‌-তামরি ওয়াল-হুবূবি, হাদীস নং ৬২৮।

৬১ *ফিক্‌হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪।

৬২ আবূ ইউসুফ ইয়া‘কূব ইব্‌ন ইবরাহীম আল-আনসারী, *আল-খারাজ* (মিসর: আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ লিত্‌-তুরাছ, পরিমার্জিত সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ৬৪।

৬৩ *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫।

৬৪ মুফতী রশীদ আহমদ বলেন, ১ দিরহাম সমান ৩.৩৫১২ গ্রাম বা ২৭.৫৮১৭ রতি। দ্র. মুফতী রশীদ আহমদ, *আহ্‌সানুল-ফাতাওয়া*, ৪র্থ খণ্ড (পাকিস্তান: এইচ.এম সাঈদ কোম্পানী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪০৭ হি.), পৃ. ৩৮৪।

৬৫ মুফতী রশীদ আহমদ বলেন, ১ মিছকাল সমান ৪.৭৮৭৪ গ্রাম বা ৩৯.৪০২৫ রতি। দ্র. *আহ্‌সানুল-ফাতাওয়া*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮৪।

৬৬ *সুনানুত্‌-নাসাঈ*, কিতাবুয্‌-যাকাত, কামিস সা‘উ, হাদীস নং ২৫২০।

৬৭ *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫।

৬৮ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬।

৬৯ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৬; *আল-ফিক্‌হু ‘আলাল মাযাহিবিল আরবা‘আহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৯-৫৬০।

৭০ আবুল-ফযল কাযী ইয়ায ইব্‌ন মূসা, *তারতীবুল-মাদারিক ওয়া তারকীবুল-মাসালিক*, ২য় খণ্ড (বাগদাদ: মাতবা‘আতু ফাদালাতিল মুহাম্মাদিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৬-১৯৭০ খ্রি.), পৃ. ১২৪।

৭১ *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৬-৩৬৭।

৭২ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৮।

৭৩ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৯।

৭৪ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭০।

৭৫ পূর্বোক্ত।

৭৬ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৯।

৭৭ *আল-মুগনী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১; *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭১।

৭৮ *ফাতাওয়া দারুল ‘উলূম দেওবন্দ*, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬, ৩৭, ৩৯; *দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা*, পৃ. ১৬৭।

৭৯ *ফিকাহ মুহাম্মদী*, পৃ. ১১০; উদ্ধৃতি: অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, *কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উশর* (রাজশাহী: আল ইসলাহ প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১১।

৮০ *আল-খারাজ*, পৃ. ৬৪; অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন, *ইসলামের দৃষ্টিতে উশর : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত* (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩২; *দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা*, পৃ. ১৬৭।

[৮১] *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।

[৮২] *'উশর ওয়া যাকাত আওর সূদ কী চান্দ মাসাইল* (দিল্লী: মারকাযী মাকতাবাহ-ই-ইসলামী, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৯৫; *দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা*, পৃ. ১৬৭।

[৮৩] ড. খোন্দকার আ.ন.ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত গুরুত্ব ও প্রয়োগ* (ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২য় সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৬৬।

[৮৪] সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী, *'উশর* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার. তা.বি.), পৃ. ১৩।

[৮৫] *ইসলামের দৃষ্টিতে উশর : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, পৃ. ৩২; *দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা*, পৃ. ১৬৭।

[৮৬] *ইসলামের দৃষ্টিতে উশর : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, পৃ. ৩২-৩৩; *দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা*, পৃ. ১৬৮।

[৮৭] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮; *ফিক্‌হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩; *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।

[৮৮] *ফিক্‌হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৪; *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।

[৮৯] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮।

[৯০] *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪।

[৯১] *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪।

[৯২] পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪।

[৯৩] *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুয্‌-যাকাত, বাবু মা তাজিবু ফীহিয্‌-যাকাত, হাদীস নং ১৫৫৯।

[৯৪] *আল-মুগনী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১; *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪।

[৯৫] *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫।

[৯৬] *বাদাই'উস্‌-সানাই' ফী তারতীবিশ্‌-শারাই'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০; *আল-মাবসূত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৭; *ফিক্‌হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬০-৩৬১; *ফাতহুল-কাদীর*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪২; *ইসলামের দৃষ্টিতে উশর : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, পৃ. ৩৫।

[৯৭] *আল-খারাজ*, পৃ. ২২৫; *ইসলামের দৃষ্টিতে উশর : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, পৃ. ৩৫-৩৬।

[৯৮] *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫।

[৯৯] *ফিক্‌হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬১।

[১০০] *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫-৩৭৬।

[১০১] পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৬।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে মসজিদের আদব : একটি পর্যালোচনা
(Masjid Etiquette in the Light of the Qur'an and Sunnah : A Review)

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান*
ড. মোহা. আশরাফ উজ জামান*

Abstract: Mosque is an important place of worship in Islam. A mosque is not just a place of worship like the places of worship of other religions. Mosques have some differences and unique characteristics theoretically, practically and historically. A mosque is a sacred place of worship for an individual Muslim. Mosques have also played an important role in the history of the Muslim Ummah. The mosque is the main school of learning for Muslims. It is considered as a place of conducting social, religious and political activities. Any Muslim who builds a mosque will earn a special reward. Islam has greatly encouraged the construction and cultivation of mosques. Keeping the mosque alive through prayer and dhikr is basically building or planting a mosque. But it is a sad fact that the mosque no longer carries this importance in the Muslim society. The mosque has lost its historical importance. The main reason is a lack of proper understanding and knowledge about the position of the mosque in Islam, what role the mosque will play in the Muslim society, the rules and regulations of the mosque. There are many descriptions in the Quran and Sunnah about the adab or manners of the mosque. These issues have been reviewed in the discussion article.

ভূমিকা

মসজিদ মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে পৃথিবীর সর্বাধিক প্রিয় স্থান। মহান আল্লাহকে যারা ভালোবাসে তারা মসজিদকেও ভালোবাসে। মুমিনের সঙ্গে মসজিদের যেন আত্মার সম্পর্ক। কিয়ামতের ভয়ানক দিন, যে দিন আর কোনো ছায়া থাকবে না মুমিন বান্দাকে আশ্রয় দেয়ার, সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদের সঙ্গে থাকে সে সব বান্দাকে আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে থাকে সে আরশের ছায়ায় স্থান পাবে।" ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র স্থান বলে পরিগণিত মসজিদ মুসলমানদের ইবাদতের সর্বোত্তম জায়গা। এখানে আগতদের উদ্দেশ্য থাকে কেবল ইবাদত করা। এই ইবাদত পালনের পাশাপাশি মসজিদে প্রবেশ ও প্রস্থানের কিছু আদব রয়েছে। যেমন- আমরা অনেকেই যখন মসজিদে প্রবেশ করি কোন্ পা দিয়ে প্রবেশ করব, তা ভুলে যাই। মসজিদে প্রবেশের আদব হচ্ছে- সবসময় ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা। একইভাবে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়ও আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিক বলতে হয়। আমাদের অনেকেই মসজিদে প্রবেশ করে গল্প শুরু করে দেই। মসজিদ গল্পের স্থান নয়। মসজিদ নিছক ইবাদতের জায়গা। এছাড়াও মসজিদের বিশেষ কিছু আদব বা শিষ্টাচার রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে মসজিদের আদাব বা শিষ্টাচার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মসজিদ পরিচিতি

মসজিদ (مَسْجِد) শব্দটি আরবী।[১] এটি স্থানবাচক বিশেষ্য, س+ج+د শব্দমূল থেকে উদ্ভূত। মসজিদ শব্দের জীম বর্ণে যবর ও যের উভয় হরকত দিয়ে পঠিত হয়।[২] ইবনুল আরাবী (র) বলেন, মসজিদ শব্দের জীম বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত হয়, অর্থ গৃহের অভ্যন্তরের কুঠরি।[৩] কেউ কেউ "মসজিদ শব্দটির সীন বর্ণে সাকিন ও জীম বর্ণে যের দিয়ে পাঠ করেন।"[৪] মসজিদ শব্দটি একবচন, বহুবচনে মাসাজিদ (مَسَاجِد)। মসজিদের অর্থ

---

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সিজদা করার স্থান[৫], আল্লাহর প্রতি সম্মান ও ভক্তি জ্ঞাপনার্থে মস্তক বা মাথা ভূলুণ্ঠিত করার স্থান। ইবাদতকালে কপাল ও নাক মাটির উপর রাখা, মাটির উপরে কপাল ঠেকানো[৬], অনুনয় বিনয়ের সাথে অবনত হওয়া।[৭] অন্যান্য সেমিটিক ভাষায়ও এর সদৃশ শব্দ পাওয়া যায়, যে অ্যারামীয় ও নাবাতীয়তে মসজিদ অর্থ উপাসনালয় ও পবিত্র স্তম্ভ, ইথিওপিয়াতে 'মেসজাদ' অর্থ মন্দির, গির্জা।[৮] প্রাক ইসলামী যুগের মুআল্লাকাতে বিশেষ করে আমর ইব্‌ন কুলছুমের কবিতায় শব্দটি سَجَدَ 'সাজাদা' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[৯] আরবী ব্যাকরণে মসজিদ শব্দটি ظَرْفُ مَكَانٍ বা 'স্থানবাচক বিশেষ্য'। যার শাব্দিক অর্থ সিজদা করার স্থান।[১০] A place of prostration[১১] 'একত্রিত হওয়ার স্থান'[১২] অর্থাৎ যে স্থানে সিজদা দেওয়া হয় বা সিজদা করা হয় সে স্থানই মসজিদ। সীবাওয়াই (র) বলেন, وأما الْمَسْجِدُ فإنهم جعَلُوهُ اسْمًا لِلْبَيْتِ "মসজিদ একটি পৃথক শব্দ, যা পবিত্র ঘরের অর্থে ব্যবহৃত হয়।"[১৩]

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, মসজিদ বলা হয় আল্লাহ তা'আলার প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদশনার্থে মস্তক বা মাথা ভূলুণ্ঠিত করার স্থান। ইবাদতের উদ্দেশ্যে কপাল ও নাক মাটির উপরে রাখা, মাটির উপরে কপাল ঠেকানো এবং বিনীত বিনম্রভাবে অবনত হওয়ার স্থান।[১৪]

ইসলামী বিশেষজ্ঞ, পণ্ডিত, অভিধানবিদ ও Encyclopedia গ্রন্থসমূহে মসজিদের পরিচয় বিভিন্নভাবে প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি অভিমত প্রদান করা হলো:

১. ইব্‌ন মানযূর আল-ইফরীকী (র) (মৃত ৬৩০ হি.) আয্‌-যুজাজ (র)-এর মত উদ্ধৃত করে বলেন,

كُلُّ مَوْضِعٍ يَتَعَبَّدُ فِيْهِ فَهُوَ مَسْجِد، أَلاترى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: جُعِلَتْ لِيْ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوْراً.

"যে জায়গায় সিজদা করা হয় তাকে মসজিদ বলা হয়। কেননা নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, আমার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ এবং পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[১৫]

২. ইবনুল আরবী (র) (মৃত ৫৪৩ হি.) বলেন,

مُصَلَّى اَلْجَمَاعات مَسْجِد، وَالْمَسَاجِدُ أَيْضًا، الآرَاب الَّتِيْ يَسْجِدُ عَلَيْهَا وَالآراب السَّبْعَة مَسَاجِد.

"জামা'আত সহকারে নামায আদায়ের স্থানকে মসজিদ বলে। যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সিজদা করা হয় সেগুলোকে মসাজিদ বলা হয়। শরীরের সাতটি অঙ্গকে মাসাজিদ বলা হয়।"[১৬]

৩. ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্যরা বলেন,

الْمَسَاجِدُ مِنْ بدن الإِنْسَانُ: الأَعْضَاءِ الَّتِيْ يُسْجِدُ عَلَيْهَا، وَهِيَ: اَلْجبهة وَالأَنْفُ وَالْيَدَان وَالرُّكْبَتَان وَالْقَدَمَان.

"মানুষের শরীরের মাসাজিদ হচ্ছে যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ দ্বারা সিজদা করা হয়। সেগুলো হচ্ছে কপাল, নাক, হস্তদ্বয়, উভয় হাটু ও পদযুগল।"[১৭]

৪. ড. মুহাম্মাদ রাওয়াস কাল'আজী বলেন,

اَلْمَوْضِعُ الَّذِيْ يُسْجِدُ فِيْهِ. اَلْمَكَان الَّذِيْ أعِدَّ لِلصَّلاةِ فِيْهِ عَلَى الدَّوَام.

"আল-মসজিদ অর্থ হচ্ছে যে জায়গায় সিজদা করা হয় বা সিজদার স্থান। যে স্থানকে সার্বক্ষণিকভাবে নামায আদায়ের জন্য বরাদ্দ বা প্রস্তুত করা হয়েছে।"[১৮]

৫. মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন,

اَلْمَسْجِدُ إِصْطَلَاحًا الأَرْضُ الَّتِيْ جعلها اَلْمَالِكُ مَسْجِدُ بِقَوْلِهِ جَعَلْتُهُ مَسْجِداً وَافْرَزَ طَرِيْقه وَاذِنَ بِالصَّلوٰةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلَّى وَاحدٌ زَال ملكه.

"পরিভাষায় আল-মসজিদ বলা হয়, যে ভূমণ্ডলের মালিক তার ভূখণ্ডকে মসজিদ হিসেবে ঘোষণা করে যে, আমি এটিকে মসজিদ হিসেবে রেখে দিলাম। অতঃপর মসজিদের জন্য

পৃথকভাবে রাস্তা প্রস্তুত করে এবং তাতে নামায আদায়ের অনুমতি প্রদান করার পর একজন লোকও যদি নামায আদায় করে তাহলে তার মালিকানা বাতিল হয়ে গেল।"[১৯]

৬. Thomas Patrick Hughes বলেন,

MOSJID (مَسْجِد) The place of prostration. The Mosque or place of public prayer. Mosques are generally built of stone or brick in the form of square, in the center of which an open Court-Yard, Surrounded with cloisters for students.

"মাসজিদ হলো আল্লাহর নিকট অবনত হওয়ার স্থান। মানুষের প্রার্থনার জায়গা। ইট বা পাথর দিয়ে বর্গাকার ভাবে নির্মিত। মাঝখানে ইমাম দাড়ানোর জন্য এবং উভয় পার্শ্বে সাধারণ দাড়ানোর জায়গা।"[২০]

৭. The New Encyclopedia of Britannica গ্রন্থে বলা হয়েছে,

MASJID (Mosque) Arabic word. Any House or Open area of prayer in Islam. The Masjid JAMI or collective Mosque is the centre of Community worship. In the early centuries of Islam a city might have many mosques but only one collective mosque, where the Friday service were held.

"মসজিদ আরবী শব্দ। ইসলাম ধর্মমতে প্রার্থনার ঘর বা উন্মুক্ত জায়গা। একটি কমিউনিটির একটি জামে মসজিদ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে একটি কমিউনিটির জন্য এক বা একাধিক ওয়াক্তিয়া মসজিদ ও একটি জামে মসজিদ থাকত যেখানে শুক্রবারের নামায আদায় করা হতো।"[২১]

৮. The Encyclopedia of Americana গ্রন্থে বলা হয়েছে,

Mosque a place of public worship. A mosque is essentially a large covered area for the Muslim community of gathering to recite prayers and hear the Quran.

"মসজিদ মানুষের প্রার্থনা জায়গা। মুসলিম কমিউনিটির জন্য প্রয়োজন মাফিক বড় জায়গা যেখানে প্রার্থনা করার জন্য, কুরআন শোনার জন্য মানুষ একত্রিত হয়।"[২২]

অতএব মসজিদ বলতে বুঝায় আল্লাহর নিকট অবনত হওয়ার স্থানকে। যে স্থানে মানুষ সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ্ নিকট প্রার্থনা করে। যা ইট, পাথর বা অন্যকোনো বস্তু দ্বারা বর্গাকারে নির্মিত। সর্বাগ্রে মাধ্যখানে ইমাম দাঁড়ানোর জন্য এবং উভয় পার্শ্বে সাধারণদের দাঁড়ানোর জন্য জায়গা নির্ধারণ করা হয়। মসজিদকে বলা হয় *বায়তুল্লাহ্* তথা 'আল্লাহ্ ঘর'।

মসজিদ-এর আদব বা শিষ্টাচার

আদব (اَلْآدَابُ) শব্দটি আরবী। এর বাংলা প্রতিশব্দ শিষ্টাচার। আভিধানিক অর্থ- শিষ্টাচার, লৌকিকতা, নম্র আচরণ, ভদ্র ব্যবহার, সদাচরণ, সদ্ব্যবহার প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার।[২৩] পরিভাষায় সমাজে অবস্থানরত মানুষের সাথে চলাফেরার ক্ষেত্রে ব্যক্তির উত্তম বা ভদ্র আচার-ব্যবহারকে শিষ্টাচার বলা হয়।[২৪]

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আববাস (রা) বলেন,

أُطْلُبِ الْأَدَبَ فَإِنَّهُ زِيَادَةٌ فِي الْعَقْلِ، وَدَلِيلٌ عَلَى الْمُرُوْءَةِ، مُؤْنِسٌ فِي الْوَحْدَةِ، وَصَاحِبٌ فِي الْغُرْبَةِ، وَمَالٌ عِنْدَ الْقِلَّةِ

"তুমি শিষ্টাচার অন্বেষণ কর। কারণ শিষ্টাচার হলো বুদ্ধির পরিপূরক, ব্যক্তিত্বের দলীল, নিঃসঙ্গতায় ঘনিষ্ঠ সহচর, প্রবাসজীবনের সঙ্গী এবং অভাবের সময়ে সম্পদ।"

মসজিদ আল্লাহ তা'আলার নিকট পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় স্থান। মহান আল্লাহ্কে যারা ভালোবাসে তারা মসজিদকেও ভালোবাসে। ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র স্থান বলে পরিগণিত মসজিদ মুসলমানদের ইবাদতের সর্বোত্তম স্থান। মুসল্লিগণ মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ বিভিন্ন ইবাদতে মগ্ন থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا

"আর মসজিদগুলো কেবল আল্লাহরই জন্য, কাজেই তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে ডেকো না।"[২৫]

মসজিদের সঙ্গে মুমিনের যেন আত্মার সম্পর্ক। সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে প্রবেশ করলে বহু সময় পর্যন্ত অবস্থান করতেন। মুমিনের সঙ্গে মসজিদের যেন আত্মার সম্পর্ক। কিয়ামতের ভয়ানক দিন, যে দিন আর কোনো ছায়া থাকবে না মুমিন বান্দাকে আশ্রয় দেয়ার, সেদিন আল্লাহ তা'আলা মসজিদের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকে নিজের আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে থাকে সে আরশের ছায়ায় স্থান পাবে।"[২৬] মসজিদে প্রবেশের জন্য যেমন তাকিদ দেওয়া হয়েছে, তেমনি মসজিদের আদব ও শিষ্টাচার রক্ষা করার জন্যও হাদীসে তাকিদ এসেছে। পৃথিবীর কোনো রাজা-বাদশাহর দরবারে যেতে হলে যদি পূর্ণ আদব রক্ষা করতে হয় তাহলে যিনি সমস্ত পৃথিবীর বাদশাহ তার দরবারের আদব রক্ষা করা তো আরো বেশি জরুরি। হাদীস ও ফিক্হের গ্রন্থগুলোতে মসজিদে যাওয়ার পূর্বে, প্রবেশের পর থেকে বের হওয়া পর্যন্ত বেশ কিছু আদব বা শিষ্টাচার বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো রক্ষা করা আবশ্যক। যেমন- ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা, বিসমিল্লাহ ও দোয়া পাঠ করা, দুই রাকাত 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' নামায আদায় করা, আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাকা, মানুষের ইবাদত বিঘ্ন হয় এমন সব কাজ পরিহার করা, ইতিকাফের নিয়্যত করা, ইস্তিগফার ও দু'আ পড়তে পড়তে বের হওয়া, বাম পা দিয়ে বের হওয়া ইত্যাদি।[২৭] মসজিদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য নয় এমন কোনো কিছু মসজিদে করা উচিত নয়। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

خِصَالٌ لَا تَنْبَغِي فِي الْمَسْجِدِ: لَا يُتَّخَذُ طَرِيقًا، وَلَا يُشْهَرُ فِيهِ سِلَاحٌ، وَلَا يُنْبَضُ فِيهِ بِقَوْسٍ، وَلَا يُنْشَرُ فِيهِ نَبْلٌ، وَلَا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمٍ نِيِّءٍ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ حَدٌّ، وَلَا يُقْتَصُّ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، وَلَا يُتَّخَذُ سُوقًا

"মসজিদে যেসব কাজ অনুচিত তা হলো: মসজিদকে যাতায়াতের পথ বানাবে না, সেখানে অস্ত্র ছড়িয়ে দেবে না, ধনুক নড়াবে না, তীর বের করবে না, কাঁচা গোস্ত নিয়ে অতিক্রম করবে না, দণ্ডের শাস্তি প্রয়োগ করবে না, রক্তের প্রতিশোধ নেবে না এবং বাজার বানাবে না।"[২৮]

মোটকথা, মসজিদ আল্লাহ তা'আলার ঘর বিধায় পৃথিবীর অন্যান্য ঘরের তুলনায় মসজিদের সম্মান ও মর্যাদা বেশি। আর মসজিদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় মসজিদের আদবসমূহ যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট হওয়া উচিত। নিম্নে মসজিদের কতিপয় আদব উল্লেখ করা হলো:

১. মসজিদ আবাদ করা

মসজিদ ইবাদতের স্থান, ইবাদতকারীদের অবস্থান স্থল, আল্লাহর রহমত অবতীর্ণের জায়গা, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উত্তম স্থান। প্রত্যেক মুসলমানের নিকট মসজিদ অত্যন্ত প্রিয় স্থান। নামাযের সময়গুলোতে মসজিদে গমন করা, কাজ-কর্ম ও ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে দ্বীনের প্রতি ইখলাস এবং আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। যে ব্যক্তি শুধু নামাযের উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে মসজিদে গমন করে, এতে তার নামাযে অনেক সওয়াব লাভ হয়। তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় ও পাপ মার্জনা করা হয়। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.

"যে ব্যক্তি স্বীয় বাড়িতে পবিত্রতা অর্জন (ওযূ) করল, অতঃপর ফরয ইবাদত আদায়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘরে (মসজিদে) গমন করল, তার এক কদমের বিনিময়ে গুনাহ মার্জনা হবে এবং অপর কদমের বিনিময়ে মর্যদা বৃদ্ধি পাবে।"[২৯]

মসজিদে যেতে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে ঈমানদার হিসেবে সাক্ষ্য দিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশ দিয়েছেন। আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ

"যখন তোমরা দেখ কোনো ব্যক্তি মসজিদে যেতে অভ্যস্ত তখন তার জন্য ঈমানের সাক্ষ্য দাও।"[৩০]

অতঃপর তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

"তারাই হতে পারে আল্লাহর মসজিদের আবাদকারী (রক্ষাণাবেক্ষণকারী ও সেবক) যারা আল্লাহ ও পরকালকে মানে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। তাদেরই ব্যাপারে আশা করা যেতে পারে যে, তারা সঠিক পথে চলবে।"[৩১]

কোনো ব্যক্তি যখন মসজিদে গমন করে নামায আদায় করে অথবা যতক্ষণ সেখানে অবস্থান করে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতা তার জন্য এ বলে দু'আ করতে থাকে, "হে আল্লাহ! তার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, তার প্রতি মেহেরবানি করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামাযের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নামাযরত অবস্থায় থাকে।" বস্তুত মসজিদে গমনের মাধ্যমে আল্লাহ্র কালেমা বুলন্দ করা হয়, সত্যের আহ্বান প্রচার করা হয় এবং আল্লাহর বাণী প্রচারে সহযোগিতা করা হয়। মসজিদের আবাদ শুধু মসজিদ নির্মাণ নয়; বরং মসজিদে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে যাওয়া, মসজিদে গিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করা ও শিক্ষা দেওয়া, মসজিদের দারসে বসা প্রভৃতিও মসজিদ আবাদের মৌলিক উপকরণ।

২. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। মসজিদের ক্ষেত্রে তা আরো জরুরী। কেননা মসজিদ আল্লাহর ঘর ও ইবাদতের জায়গা এবং ইসলামের অন্যতম শিক্ষালয়। সুতরাং তা হবে পবিত্র ও সুগন্ধময়। মসজিদকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখা উত্তম কাজ। নিজের কফ, থুথু, নাকের ময়লা, হাঁচি-কাশির মাধ্যমে যেন কোনো প্রকার ময়লা মসজিদে না পড়ে সেদিকে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

"আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ।"[৩২]

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ

"রাসূলুল্লাহ (সা) মহল্লায় বা জনবসতিপূর্ণ স্থানে মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।"[৩৩]

মসজিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা মুসলিম সমাজের দায়িত্ব। আল্লাহ্র ঘর থেকে ময়লা পরিষ্কারকারীকে নবী করীম (সা) সুখবর দিয়েছেন। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

مَنْ أَخْرَجَ أَذًى مِنَ الْمَسْجِدِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি মসজিদের আবর্জনা পরিষ্কার করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরি করেন।"[৩৪]

সুতরাং মসজিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বিবেচনা করে এর জন্য আলাদা খাদেম রাখা উচিত। এক্ষেত্রে সকলের কর্তব্য মসজিদকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করা। এভাবে সকলেই মসজিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। আর সরাসরি অংশগ্রহণ তো আরো সৌভাগ্যের বিষয়। বড় বড় ক্ষেত্র না হয় বাদই, ছোট ছোটও এমন বহু ক্ষেত্র আছে যাতে স্বচ্ছন্দে সরাসরি অংশগ্রহণ করা যায়। যেমন- কাগজের টুকরা পড়ে আছে, সেটা নির্দিষ্টি জায়গায় রেখে দেওয়া। কার্পেট বা তার উপরের চাদর এলোমেলো হয়ে আছে, তা ঠিক করে দেওয়া ইত্যাদি। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, প্রত্যেকের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা যে, আমার দ্বারা যেন মসজিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ক্ষুণ্ন না হয়।

৩. পবিত্রতা অর্জন করা

মসজিদে প্রবেশের পূর্বে পবিত্রতা অর্জন করা আবশ্যক। সুন্দররূপে ওযূ করে পবিত্রতার সাথে মসজিদে প্রবেশ করা সুন্নাত। তাই ঘর থেকে ভালোভাবে ওযূ করে মসজিদে গমন করলে প্রতিটি কদমে সাওয়াব লাভ করা যায়। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً

"যে ব্যক্তি ভালোভাবে ওযূ করে মসজিদে রওয়ানা হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতিটি কদমের পরিবর্তে একটি নেকি দান করেন ও এক ধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার পাপসমূহ থেকে একটি করে পাপ ক্ষমা করে থাকেন।"[৩৫]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً

"যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে পাক-পবিত্র হয়ে অর্থাৎ ওযূ করে কোনো ফরয নামায আদায় করার জন্য হেঁটে আল্লাহর কোনো ঘরে অর্থাৎ কোনো মসজিদে গমন করে, তার প্রতিটি পদক্ষেপে একটি পাপ ঝরে পড়ে এবং একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।"[৩৬]

সালমান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَهُوَ زَائِرٌ لِلَّهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ

"যে ব্যক্তি স্বীয় বাড়িতে ওযূ করে মসজিদে আগমন করে, সে আল্লাহর যিয়ারতকারী। যার যিয়ারত করা হয় তার উপর ওয়াজিব হলো, যিয়ারতকারীর সম্মান করা।"[৩৭]

৪. উত্তম পোশাক ও সাজসজ্জা

সালাত আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী। বান্দা যখন আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াবে তখন তাকে অবশ্যই সুন্দর পোশাক ও সাজসজ্জা করা উচিত। তাই মসজিদে গমনের পূর্বে সাধ্যমত সুন্দর পোশাক পরিধান করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

"হে আদম সন্তান! তোমরা প্রতিটি নামাযের সময় সাজসজ্জা করে নাও। আর খাও ও পান করো, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।"[৩৮]

সুন্দর পোশাক ও জুতা পরিধানকারী এক ব্যক্তি সম্পর্কে নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে নবী করীম (সা) বলেন,

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ

"আল্লাহ্ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। অহঙ্কার হচ্ছে সত্যকে গোপন বা অস্বীকার এবং মানুষকে ঘৃণা করা।"[৩৯]

ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لَهُ.

"তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়াবে সে যেন (সুন্দর) পোশাক পরিধান করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর থেকে সজ্জিত করার হকদার।"[৪০]

৫. দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য ও পানাহার পরিহার

মুখে অথবা অন্য কোনোভাবে শরীরে দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা উচিত নয়। কেননা এতে অন্যান্য মুসল্লিদের কষ্ট হয়। তাই যে সকল খাদ্যদ্রব্য খাওয়ার কারণে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, মসজিদে যাওয়ার পূর্বে তা পরিহার করা আবশ্যক। কারণ বনী আদম যে বিষয়ে কষ্ট অনুভব করে ফেরেশতাগণও তা থেকে কষ্ট অনুভব করেন। এ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে কাঁচা পিঁয়াজ, রসুন, পান, সিগারেট, দুর্গন্ধযুক্ত ঔষধ, দুর্গন্ধযুক্ত কর্ম ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। জাবির ইব্‌ন আব্দিল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

"যে ব্যক্তি পিঁয়াজ, রসুন বা পিঁয়াজ জাতীয় সবজি খাবে সে যেন আমার মসজিদের কাছেও না আসে। কেননা মানুষ যেসব জিনিস দ্বারা কষ্ট পায় ফেরেশতাগণও সেসব জিনিস দ্বারা কষ্ট পায়।"[৪১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কোনো লোক যদি একান্তই পিঁয়াজ-রসুন খেতে চায় তবে সে যেন মুখকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে দুর্গন্ধ দূর করে নেয়ার পর মসজিদে যায়। উমার (রা) বলেন,

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ

"আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোনো লোকের কাছে পিঁয়াজ ও রসুনের দুর্গন্ধ পেতেন তাকে বাড়ি চলে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন।"[৪২]

৬. মসজিদে গমনের পথে দু'আ পড়া

মসজিদে গমনের পথে দু'আ পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে গমনের পথে দু'আ পড়তেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন,

فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَقُولُ: اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا.

"অতঃপর তিনি নামাযের জন্য বের হলেন। তখন তিনি এ দু'আ করছিলেন, "হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ে আলো (নূর) সৃষ্টি করে দাও, আমার কণ্ঠে নূর দাও, আমার শ্রবণ শক্তিতে নূর দাও, আমার দৃষ্টিশক্তিতে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার পিছন দিকে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার সামনের দিকে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার উপর দিক থেকে আলো সৃষ্টি করে দাও এবং আমার নীচের দিক থেকেও আলো সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! আমাকে নূর বা আলো দান করো।"[৪৩]

৭. গাম্ভীর্য ও ধীর-স্থিরভাবে মসজিদে যাওয়া

নামাযের জন্য মসজিদে গমনকালে তাড়াহুড়া না করে ধীরে-সুস্থে যাওয়া উত্তম। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন,

إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ، وَلاَ تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

"যখন তোমরা ইকামত শুনতে পাবে, তখন নামাযের দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে।"[৪৪]

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবী কাতাদা (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ

"নামাযের ইকামত হলে আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। তোমাদের জন্য আবশ্যক হলো স্থিরতা অবলম্বন করা।"[৪৫]

হাসান (র) থেকে বর্ণিত, আবূ বকর (রা) বর্ণনা করেন যে,

أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ، قَالَ: فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ.

"একদা আল্লাহর নবী রুকূতে থাকাবস্থায় তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি কাতারে না পৌঁছেই রুকূ করে নিলাম। নবী করীম (সা) (আমাকে) বললেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিন, তবে পুনরায় এরূপ করো না।"[৪৬]

৮. মসজিদে ডান পা দিয়ে প্রবেশ বাম পা দিয়ে বের হওয়া ও দু'আ পাঠ করা

মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা বাম পা দিয়ে বের হওয়া সুন্নাত। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى

"মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা সুন্নত। আর যখন মসজিদ থেকে বের হবে তখন প্রথমে বাম পা বাড়িয়ে দিবে।"[৪৭]

এ সময় দু'আ পড়তে হয়-

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"মহান আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তাঁরই সম্মানিত চেহারার বদৌলতে এবং তাঁরই চিরায়ত কর্তৃত্বের উসিলায় বিতাড়িত শয়তান হতে।"[৪৮]

যখন কেউ এ দু'আ পাঠ করে তখন শয়তান বলে উঠে, আমার থেকে সারাদিনের জন্য সে নিরাপদ হয়ে গেল।

মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় দু'আ পড়া সুন্নাত। আবূ উসায়দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

"তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন এই দু'আ পড়ে "আল্লাহুম্মাফতাহ্‌লী আবওয়া-বা রাহমাতিকা।" "হে আল্লাহ! তুমি আমার উপর তোমার রহমতের দরজাগুলো

খুলে দাও।" আর যখন বের হয় তখন বলবে, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিকা। "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি।"[৪৯]

মসজিদে প্রবেশকালে রহমত বা দয়ার প্রার্থনা এবং বহির্গমনকালে কল্যাণের প্রার্থনার কারণ হচ্ছে, মসজিদে প্রবেশকালে মানুষ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও বেহেশত চেয়ে থাকে। নামায, যিকির, দু'আ দিয়ে তাই সে সময় দয়ার প্রার্থনা করাটা সমীচীন, আর বহির্গমনের পর হালাল রিযিকের সন্ধানে নিমগ্ন হয় তাই সে সময় কল্যাণ বা মঙ্গলের প্রার্থনাটাই উপযোগী।

৯. তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা

মুমিন ব্যক্তি যখন ফরয নামায পড়ার জন্য ওযূ করে, পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে রুকূ, সেজদা করে, তখন সেই ওযূ, নামায তার বিগত দিনের গুনাহ্‌র কাফ্‌ফরা হিসেবে বিবেচিত হয়, তবে কবীরা গুনাহ ব্যতিত ওযূ করার পর সব সময় দুইরাকাত তাহিয়্যাতুল ওযূ ও দুই রাকাত 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' নফল নামায আদায় করা উত্তম। এই ভাল অভ্যাসের জন্যই নবী করীম (সা) স্বপ্নে জান্নাতে বেলাল (রা)-এর অগ্রিম পদশব্দ শুনেছিলেন। আবূ কাতাদা ইব্‌ন রিব'ঈ আল-আনসারী বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

"তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দুরাকাআত নামায আদায় করার পূর্বে বসবে না।"[৫০]

সহীহুল বুখারী, সহীহ ইব্‌ন হিব্বান ও মুসনাদু আহমাদের বর্ণনাটি আবূ কাতাদা (রা) থেকে। সুনানু ইব্‌ন মাজাহর বর্ণনাটি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এছাড়া আল-মু'জামুল আওসাত ও আস্-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকীতে উপর্যুক্ত দুজন রাবী থেকেই হাদীসটির বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি সকলের নিকট সহীহ হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

আবূ কাতাদা (রা) থেকে অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

"তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে সে যেন বসার পূর্বেই দুই রাকাআত নামায পড়ে নেয়।"[৫১]

নামায পড়া যে সময় নিষিদ্ধ সে সময়ে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলেও তাতে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় করতে হবে বলে ইমাম শাফি'ঈ, আহমদ, ইব্‌নুল কায়্যিম ও ইব্‌ন তায়মিয়া (র) অভিমত পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মালিক ও আহমদ (র)-এর অপর একমতে বলো হয়েছে, এ অবস্থায় তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়া যাবে না।[৫২]

আযান শুরু হলে তা সমাপ্ত হওয়ার পর তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়তে হবে। কোনো ব্যক্তি তাহিয়্যাতুল মাসজিদের নিয়ত করার পর যদি নামাযের একামত হয়ে যায় তবে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ত্যাগ করে নামাযের সাথে অংশগ্রহণ করবে। আর যদি নামাযের একামত না হয় কিন্তু ইমাম জুমু'আর খুতবা দিচ্ছেন, সে অবস্থায়তেও তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

"যখন কোনো লোক মসজিদে প্রবেশ করার পর দেখে যে, ইমাম জুমু'আর খুতবা দিচ্ছেন তখন সংক্ষিপ্ত সূরা দিয়ে দুরাকাআত নামায পড়ে নিবে।"[৫৩]

হানাফী মাযহাব মতে, নামায না পড়ার জন্য বলা হয়েছে; কারণ জুমু'আর খুতবা নামাযের অংশ। শেখ কাসিমীর কিতাব 'আফলাহুল মাসাজিদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে নামায না পড়া বাঞ্ছনীয়।

১০. আযানের পর মসজিদ থেকে বের না হওয়া

আযান হওয়ার পর বৈধ ওযর ব্যতিত মসজিদ থেকে বাহিরে যাওয়া জায়েয নেই। যে ব্যক্তি আযান হওয়ার পর মসজিদ থেকে বাহির হয় তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"নিশ্চয়ই এই লোকটি আবুল কাসিম [নবী করীম] (সা)-এর অবাধ্য হয়েছে।"[৫৪]

আযানের পর মসজিদ ত্যাগ করা মুনাফিকের চিহ্ন বলে নবী করীম (সা) অবহিত করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

لَا يَسْمَعُ النِّدَاءَ فِي مَسْجِدِي هَذَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ، إِلَّا لِحَاجَةٍ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا مُنَافِقٌ

"আমার এ মসজিদে আযান শুনার পর প্রয়োজন ব্যতিত কোনো লোক বাহিরে গিয়ে ফিরে না আসলে সে মুনাফিক।"[৫৫]

উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ، لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ، وَهُوَ لاَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ، فَهُوَ مُنَافِقٌ

"আযান শোনার পর যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে বিনা প্রয়োজনে বের হয় এবং পুনরায় মসজিদে ফিরে আসার তার ইচ্ছাও নাই সে মুনাফিক।"

সাহাবী ও তাঁদের পরবর্তীদের মতে, আযান হওয়ার পর মসজিদে থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত নয়। হ্যাঁ যদি ওযূ না থাকে কিংবা খুব জরুরী কাজ থাকে তবে ভিন্ন কথা। ইবরাহীম আন্-নাখ'ঈ (র) বলেন, يَخْرُجُ مَا لَمْ يَأْخُذِ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ "মুয়াযযিনের ইকামতের পূর্ব পর্যন্ত বের হওয়া জায়েয।" আবূ ঈসা আত্-তিরমিযী (র)-এর মতে, لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ فِي الْخُرُوجِ مِنْهُ "যার প্রয়োজন রয়েছে কেবল সে বের হতে পারে।"[৫৬] ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে, আযানের পর মসজিদের বাহিরে যাওয়া মাকরূহ।

১১. মুসল্লির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করা

মুসল্লির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা যখন মসজিদে গমন করি অথবা বের হই তখন দেখা যায় অধিকাংশ মানুষ মুসল্লির সালাতরত অবস্থায় তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করেন। যদিও অতিপ্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে সামনে কোনো উঁচু বস্তু বা কাষ্ঠ দিয়ে তারপর অতিক্রম করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসল্লিদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করে বলেন,

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لاَ أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

"যদি মুসল্লির সম্মুখ দিয়ে গমনকারী ব্যক্তির জানা থাকত যে, তার উপর কী পাপের বোঝা চেপেছে, তবে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকেও সে প্রাধান্য দিত। আবুন্ নাদর বলেন, আমি জানি না তিনি চল্লিশ দিন, মাস নাকি বছর বলেছেন।"[৫৭]

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

"তোমাদের কেউ নামায আদায় করতে চাইলে যেন সুৎরা সামনে রেখে নামায আদায় করে এবং এর নিকটবর্তী হয়। সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়। অতএব যদি কেউ সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কারণ সে একটা শয়তান।"[৫৮]

১২. ইতিকাফের নিয়্যতে অবস্থান করা

মসজিদে যতক্ষণ অবস্থান করবে ততক্ষণ ইতিকাফের নিয়্যতে অবস্থান করা মসজিদের আদবের অন্তর্গত। মসজিদে অবস্থান করা ব্যক্তিকে নামাযরত বলে গণ্য করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلاَةُ

"তোমাদের যেকোনো লোকের মসজিদে অপেক্ষা করাটা নামাযের মধ্যে বলে গণ্য হবে। কারণ সে নামাযের জন্য মসজিদে বসে আছে; নামায তার ঘরে যেতে বাধা হয়ে রয়েছে।"[৫৯]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ

"মানুষ যখন নামাযের স্থানে অপেক্ষা করে এবং দুনিয়াবী কোনো কথা না বলে তখন ফেরেশতাগণ তার জন্য দু'আ করতে থাকেন। হে আল্লাহ্! তার সমস্ত পাপ মোচন করে দিন এবং তার ওপর দয়া করুন।"[৬০]

ইতিকাফের মধ্য দিয়ে বান্দা যে একাগ্রচিত্তে তার প্রতিপালকের যিকির-ইবাদতে মশগুল থাকার সৌভাগ্য অর্জন করে সেটার কোনো তুলনা হয় না।

১৩. কণ্ঠস্বর উঁচু না করা

মসজিদ ইবাদতের স্থান। মসজিদে উঁচু আওয়াজে কথা বলে অন্যের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটানো অনুচিত। হাদীসে এসেছে, সাইব ইব্ন ইয়াজিদ (রা) বলেন, আমি মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় একজন

লোক আমার দিকে একটা কাঁকর নিক্ষেপ করল। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)। তিনি বলেন, যাও, এ দুজনকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাদের নিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তিনি বলেন, তোমরা কারা? তারা বলল, আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি বলেন, তোমরা যদি মদিনার অধিবাসী হতে, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা দুজনে আল্লাহর রাসূল (সা)-এর মসজিদে উচ্চঃস্বরে কথা বলছ!"[৬১] মসজিদ ইবাদতের স্থান। সেখানে উচ্চকণ্ঠে কথা বলা ঠিক নয়, যাতে অন্যের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُوْنَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِى الْقِرَاءَةِ. أَوْ قَالَ فِى الصَّلاَةِ.

"রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে ই'তিকাফকালে ছাহাবীদেরকে উচ্চঃস্বরে ক্বিরাআত পড়তে শুনে পর্দা সরিয়ে বললেন, জেনে রেখ! তোমাদের প্রত্যেকেই স্বীয় রবের সাথে গোপনে মুনাজাতে রত আছো। কাজেই তোমরা পরস্পরকে কষ্ট দিও না এবং পরস্পরের সামনে ক্বিরাআতে অথবা নামাযে আওয়ায উঁচু করো না।"[৬২]

ইব্ন উমর ও আব্দুল্লাহ ইব্ন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত,

خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَلْيَنْظُرْ مَا يُنَاجِيهِ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ

"রাসূলুল্লাহ (সা) একদল লোকের নিকট আগমন করলেন, সে সময় তারা নামায আদায় করছিল এবং উচ্চকণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করছিল। তা দেখে তিনি বললেন, নামায আদায়কারী নামাযরত অবস্থায় তার প্রতিপালকের সাথে মুনাজাত করে। তাই তার উচিত সে কিরূপে মুনাজাত করে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। অতএব একজনের কুরআন তেলাওয়াতের শব্দ অন্যজনের কানে যেন না পৌঁছে।"[৬৩]

অনুরূপভাবে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা, গল্প-গুজব, হৈচৈ থেকে বিরত থাকা জরুরী।

জামা'আত সমাপ্ত হওয়ার পর তাড়াহুড়া করে মসজিদ থেকে বের হতে গিয়ে যে শব্দ হয় তাও রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

"যখন জামা'আত আরম্ভ হয়ে যায় তা লাভ করার জন্য দৌঁড়িয়ে এসোনা বরং শান্তভাবে হেঁটে এসো, তারপর যতটুকু পাওয়া যায় তা জামা'আতে পড়বে এবং বাকী অংশটুকু পূর্ণ করে নিবে।"[৬৪]

১৪. মসজিদকে রাস্তা হিসাবে গ্রহণ না করা

তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার ও ইবাদত ব্যতিত কেবল চলাচলের জন্য মসজিদকে রাস্তা হিসাবে গ্রহণ করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করেছেন। সালিম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

لَا تَتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقًا إِلَّا لِذِكْرٍ أَوْ صَلَاةٍ

"তোমরা মসজিদকে রাস্তা হিসাবে গ্রহণ করো না। সেটা কেবল যিকির ও নামাযের জন্য।"[৬৫]

১৫. হারানো জিনিস খোঁজা ও ক্রয়-বিক্রয় না করা

সাধারণত গ্রামের মসজিদে দেখা যায়, ব্যক্তির কোনো কিছু হারিয়ে গেলে মসজিদের মাইকে ঘোষণা করা হয়। মসজিদের মুসল্লিদের হারানো বস্তুর কথা জানানো হয়। মসজিদে হারানো জিনিস খোঁজা ও ক্রয়-বিক্রয়

করা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন,

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا

"কেউ কোনো লোককে মসজিদের মধ্যে হারানো কোনো জিনিস খোঁজ করতে দেখলে যেন বলে, আল্লাহ করুন! তোমার জিনিস যেন তুমি না পাও। কারণ মসজিদ তো এ উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়নি।"[৬৬]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ

"তোমরা মসজিদের ভিতরে কোন লোককে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখলে বলবে, আল্লাহ তা'আলা যেন তোমার ব্যবসায় কোন লাভ প্রদান না করেন। আর মসজিদের মধ্যে কোন লোককে হারানো জিনিসের ঘোষণা দিতে দেখলে বলবে, তোমার হারানো জিনিসকে যেন আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিয়ে না দেন।"[৬৭]

ইমাম মালিক, শাফি'ঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র)-এর মতে, মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরূহ্। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর অন্য মতে, তা মাকরূহ্ নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ ও অনুমতিসিদ্ধ, তবে বিক্রয় পণ্য মসজিদে আনয়ন মাকরূহ্। তাবি'ঈগণের একদল মনীষী এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। ইব্ন বাত্তাখ (র) বলেন, মসজিদের মধ্যে যদি ক্রয়-বিক্রয়ের কোনো চুক্তি হয় তা ভঙ্গ করা জায়েয নেই। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করলে তা শুদ্ধ হবে না।

ইমাম কুরতুবী (র) বলেন,

أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَتَى عَلَى قَوْمٍ يَتَبَايَعُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ رِدَاءَهُ مِخْرَاقًا، ثُمَّ جَعَلَ يَسْعَى عَلَيْهِمْ ضَرْبًا وَيَقُولُ: يَا أَبْنَاءَ الْأَفَاعِي، اتَّخَذْتُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَسْوَاقًا هَذَا سُوقُ الْآخِرَةِ.

"ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) কোনো এক সম্প্রদায়কে মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখে নিজ হাতের মধ্যে কাপড় মুড়ে তাদেরকে পিটালেন এবং বলতে লাগলেন, কালো সাপের বাচ্চারা! (গালি হিসেবে বলেছেন এবং সাপকে আঘাত হিসেবে হাতে কাপড় জাড়িয়েছেন) আল্লাহ্র মসজিদকে বাজারে পরিণত করে নিয়েছ? এটা তো আখিরাতের বাজার।"[৬৮]

১৬. জুনুবী অবস্থায় মসজিদে অবস্থান না করা

জুনুব বলা হয় সে ব্যক্তিকে যার উপর গোসল ফরয হয়েছে। এটি স্ত্রী সহবাস অথবা স্বপ্নদোষের কারণে হয়ে থাকে। কোনো ব্যক্তি মসজিদের বাহিরে অবস্থান করা অবস্থায় যদি জুনুবী হয় তাহলে সে পবিত্র হওয়া ব্যতিত মসজিদে প্রবেশ করতে পারবেন। অনুরূপ হায়েয ও নেফাস অবস্থায় মহিলাদের মসজিদে প্রবেশ ও অবস্থান করা উচিত নয়। আল-আদাব গ্রন্থে বর্ণিত আছে, "হায়েয ও নেফাস অবস্থা থেকে মসজিদকে বাঁচিয়ে রাখা জরুরি। অনুরূপভাবে এমন মহিলাদের মসজিদের ভিতর দিয়ে না যাওয়াও সুন্নাত।"

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেন,

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

"হায়েয ও জুনুবী লোকের জন্য আমি মসজিদকে হালাল মনে করি না।"[৬৯]

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে তিনি বলেন,

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَتْ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ

"একদা নবী করীম (সা) আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে আমাকে মাদুরটি এনে দাও। আমি বললাম, আমি হায়েযা বা ঋতুবতী। তিনি বললেন, তোমার হায়েয তোমার হাতে নেই।"[৭০]

এ হাদীসে দেখা যায় যে, হায়েয অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা বৈধ। তবে উত্তম হলো প্রয়োজন ব্যতিত হায়েয অবস্থায় মসজিদে না যাওয়া, যদিও তা জায়েয আছে। মসজিদের লাইব্রেরী, বারান্দা ইত্যাদি মসজিদের অন্তর্গত।

১৭. মসজিদের ভেতর থুথু ও কফ না ফেলা

মসজিদের মধ্যে অবস্থানকালে থুথু, কফ বা নাক পরিষ্কারের নিমিত্তে এগুলো ফেলা গুনাহের কাজ বলে ইমাম আবূ হানীফা, আহমাদ, শাফি'ঈ (র) জানিয়েছেন। আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন,

وَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، لَا تُدْفَنُ

"মসজিদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত কফ পরিষ্কার না করা হলে মসজিদে অন্যায় কাজ হিসেবে দেখেছি।"[৭১]

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً، فَحَكَّهُ

"রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদের কিবলার দিকের দেওয়ালে শিকনী বা থুথু অথবা কফ লেগে থাকতে দেখে তা খুচিয়ে উঠালেন।"[৭২]

আনাস (রা) বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ. ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا.

"নবী করীম (সা) কিবলার দিকে নাকের শ্লেষ্মা পড়ে থাকতে দেখতে পান। এতে তিনি এত অসন্তুষ্ট হন যে তাঁর চেহারাতে তা প্রকাশ পায়। নবী করীম (সা) উঠে গিয়ে নিজ হাতে তা দূর করে দিলেন এবং বললেন, তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াও তার অর্থ আল্লাহ্র সাথে নির্জনে আলাপরত হও, আর আল্লাহ্র স্থান হচ্ছে নামাযী ও তার কিবলার মধ্যবর্তী জায়গা। তাই কোনো লোক কিবলার দিকে থুথু ফেলবে না, থুথু ফেলার দরকার হলে তা বামে পায়ের নীচে ফেলবে, তারপর তিনি নিজ চাদর নিয়ে তার কিনারে থুথু নিক্ষেপ করে তা মুড়িয়ে দিয়ে বললেন, এভাবে করবে।"[৭৩]

১৮. ইমামের অনুসরণ করা

মুসলমান হিসেবে মসজিদের সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। প্রতিদিন আমাদেরকে পাঁচবার মসজিদে নামাযের উদ্দেশ্যে যেতে হয়। মসজিদে গিয়ে মসজিদের শিষ্টাচার মেনে চলাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলাম হচ্ছে শৃঙ্খলা, নিয়মনীতি ও নেতার আনুগত্যের জীবন ব্যবস্থা। নামাযকে আল্লাহ্ তা'আলা এ সকল নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলার বাস্তব প্রশিক্ষণ হিসেবে দিয়েছেন। নামাযের আহ্বানকারী মুয়াজ্জিন যখন একই সময়ে এলাকার সকলকে একই সমাবেশ কেন্দ্রের দিকে ডাক দেয় তখন তারা সীসাঢালা প্রাচীরের মত শক্ত কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ায়। ফরয নামায আরম্ভ হলে তখন আর কোনো নামায পড়া হয় না। সকলেই এসে ইমামের পিছনে কাতারবন্দি হয়। ইমামের পূর্বে নামায আরম্ভ করার অনুমতি কারো নেই। তিনি পরিচালক, তিনিই কাতার ঠিক করেন ও সোজা করেন, তিনিই অনুসরণীয়। কোনো ব্যক্তি তাঁকে ডিঙ্গিয়ে কিছুই করে

না। মুক্তাদী সর্বদা ইমামের অনুসরণ করবে। কোনো কার্য ইমামের আগে অথবা একেবারে সাথে সাথে আদায় করবে না। আবার অনেক বিলম্বেও আদায় করবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا

"ইমাম দেয়া হয়েছে তার অনুসরণ করার জন্য। তিনি যখন রুকু‘ করবেন তোমরাও রুকু‘ করবে, তিনি যখন রুকু‘ থেকে উঠবেন তোমরাও উঠবে, তিনি যখন বসে নামায পড়েন তোমরাও বসে নামায পড়বে।"[৭৪]

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতেন,

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ

"হে লোক সকল! আমি তোমাদের ইমাম। রুকূ, সিজ্‌দা, দাঁড়ানো বা মসজিদ থেকে বের হওয়া কোনো বিষয়ে তোমরা আমার চেয়ে অগ্রগামী হবে না।"[৭৫]

ইমামের পূর্বে কোনো কাজ করা হারাম। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, মুহাম্মাদ (সা) বলেছেন,

أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

"ইমামের পূর্বে মাথা উঠাবার সময় কি তাদের এই ভয় হয় না, যে তার মাথাকে আল্লাহ্ তা‘আলা গাধায় রূপান্তরিত করে দিতে পারেন?"[৭৬] অথবা তার আকৃতিকে গাধার আকৃতি বানিয়ে দিবেন।"[৭৭]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাহাবায়ে কিরাম (রা) যখন নামায আদায় করতেন তখন রুকূ থেকে তারা মাথা উঠাতেন যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সিজ্‌দা করেছেন বলে দেখা যেতো তখনই তারা সিজ্‌দা করতেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস‘ঊদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন,

لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ

"তোমাদের মধ্যে বিচক্ষণ বয়ঃপ্রাপ্তগণ আমার কাছাকাছি থাকবে, অতঃপর থাকবে যারা তাদের কাছাকাছি, এরপর থাকবে তাদের কাছাকাছি লোকেরা। আর তোমরা বাজারের মতো শোরগোল করা থেকে সাবধান থাকবে।"[৭৮]

ইমামতির জন্য উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্যে যার কিরাআত বিশুদ্ধ এবং সুন্নাহ্ সম্পর্কে যিনি সর্বাধিক অভিজ্ঞ তাকেই নির্বাচন করবে। ইব্‌ন মাস‘ঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ.

"মানুষের ইমামতি করবে তাদের মধ্যে যিনি আল্লাহ্‌র কিতাবের তিলাওয়াত সবচেয়ে ভালো পড়েন। এতে সমান হলে সুন্নাহ্ সম্পর্কে যার জ্ঞান বেশি তিনি ইমাম হবেন।"[৭৯]

মসজিদ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বটে। আর নামায হচ্ছে শৃঙ্খলা শিক্ষার সর্বোত্তম ব্যবস্থা। এ শৃঙ্খলার কাজের মধ্যে মাসবূক (নামাযে পশ্চাদ্বর্তী) লোকও ইমামের সাথে যুক্ত হওয়ার পর নিজের নিয়ম বাদ রেখে ইমামের অনুকরণেই সবকিছু করবে, ইমামের সাথে শেষ বৈঠকে শেষ করার পর ইমাম যখন সালাম ফিরাবেন তখন তিনি উঠে গিয়ে নিজ বাকি নামায ক্রমানুসারে পড়ে নেবেন। নবী করীম (সা) বলেছেন,

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

"তোমরা যখন নামায পড়তে আসবে আমরা যদি তখন সিজদায় চলে গিয়ে থাকি তোমরাও আমাদের সাথে সিজদায় চলে যাবে, তবে যে রাকাতের সিজদা চলে গিয়েছে তার কিছুই হিসেবে নেবে না (অর্থাৎ এটি রাকাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না)। আর যে ব্যক্তি জামাতে এক রাকাআতও পেল সে নামায পেয়ে গেল।"[৮০]

বর্তমান সময়ে দেখা যায় শহর-গ্রাম অঞ্চলের প্রায় সকল মসজিদেই নামাযের জন্য ইমাম নির্ধারণ করা আছে। সে ক্ষেত্রে উক্ত ইমামই নামাযের ইমামতি করবেন। এ সম্পর্কে সায়্যিদ সাবিক (র) বলেন,

> "যে মসজিদের নির্দিষ্ট ইমাম রয়েছে সে মসজিদে নির্দিষ্ট ইমাম জামা'আত শুরু করার পূর্বে অন্য লোকের ইমামতি করা মালিকী ও হাম্বলী মাযহাব মতে হারাম। হানাফী ও শাফি'ঈ মতে মাকরূহ্। কারণ এতে মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরে এবং পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। জামা'আতের উদ্দেশ্য ঐক্য, ভালোবাসা, পরিচয় ও ভালো কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা ইত্যাদি ব্যাহত হয়।"[৮১]

১৯. অনর্থক ও দুনিয়াবি আলোচনা না করা

মসজিদে ইবাদত করতে হবে অথবা চুপকরে বসে থাকতে হবে। অন্যের ইবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এমন ধরনের অনর্থক কথাবার্তা বা দুনিয়াবি আলাপ-আলোচনা করা অনুচিত। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

> المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ
>
> "তোমাদের কেউ যখন নামায আদায় করে স্বস্থানে বসে থাকে ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা ও রহমতের দু'আ করতে থাকেন, যতক্ষণ না অপবিত্র হয় বা উঠে চলে যায়। ফেরেশতারা বলে, হে আল্লাহ্! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি তার উপর দয়া করুন।"[৮২]

হাসান আল-বসরী (র) থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

> يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ، فَلَا تُجالِسُوهُمْ، فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ
>
> "মানুষের মধ্যে এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ তাদের মসজিদসমূহে দুনিয়াবী কথাবার্তা আলোচনা করবে। তখন তোমরা তাদের সাথে বসো না। আর আল্লাহ্ তা'আলার এ ধরনের লোকের কোনো প্রয়োজন নেই।"[৮৩]

২০. মোবাইল ফোন বন্ধ রাখা

বর্তমান সময়ে মসজিদে শৃঙ্খলার অবনতির একটি বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে মোবাইল ফোন। এটির ব্যবহার এখন অসহনীয় ও অমার্জনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিশেষ করে নামাযের সময় মোবাইলের রিংটোনের কারণে ইবাদতের পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। অনেক সময় তা চরম বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করে। তাই মসজিদে প্রবেশের পূর্বে মোবাইল ফোন বন্ধ করা উচিত। ভুলবশত যদি মোবাইল খোলা থাকে আর নামাযরত অবস্থায় রিংটোন বেজে উঠে, তাহলে এক হাত ব্যবহার করে মোবাইল বন্ধ করে দিতে হবে।

উপসংহার

ইসলামের প্রতিটি বিধানে দুনিয়া-আখিরাতে অসংখ্য কল্যাণ নিহিত আছে। মুমিনের ঈমানের পর আবশ্যকীয় একটি বিধান হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। এর কল্যাণ ও সাওয়াব অপরিসীম। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের পদ্ধতিগত বিধান হচ্ছে জামা'আতে আদায় করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ে কয়েকগুণ সাওয়াবের ঘোষণা করেছেন। মুমিন বান্দারা মসজিদে নামায আদায় করেন, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করেন, যিক্র-আযকার, কুরআন তিলাওয়াত এবং আরও অন্যান্য ইবাদত করেন। এটা ঈমানের দাবীও বটে। মসজিদের কল্যাণ ও পবিত্রতা রক্ষার্থে মসজিদে প্রবেশ, অবস্থান, কার্যক্রম সবকিছুতেই নিয়ম রয়েছে। মসজিদে যাওয়া, আশা, অবস্থান করা, নামায আদায়সহ বিভিন্ন কার্যক্রম করার কিছু আদব বা শিষ্টাচার সম্পর্কে আলোচ্য প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। যা মেনে

চলা আমাদের সকল মুসলিম ব্যক্তির জন্য অতীব জরুরী। এতে ইবাদতে যেমন কল্যাণ বয়ে আনবে অনুরূপভাবে আখিরাতেও অনেক সাওয়াব লাভ করা যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে মসজিদের আদব বা শিষ্ঠাচার মেনে চলার তাওফীক দান করুন।

তথ্যনির্দেশ

১ Oxford Dictionary তে বলা হয়েছে, Mosjid the word comes from Arab, A Muslim Place of Worship. "মসজিদ শব্দটি আরবী শব্দ থেকে এসেছে। এটি মুসলমানদের প্রার্থনার স্থান।" Cf. *Shorter Oxford English Dictionary*, Vol. 1 (London: Oxford University Press, Fifth Edition), p. 1837.

২ ইব্‌ন মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল আরব*, ৭ম খণ্ড (বৈরূত: দারু-ইহ্ইয়াইত্-তুরাছিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৭৫; ইসমা'ঈল ইব্‌ন হাম্মাদ আল-জাওহারী, *আস্-সিহাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল-ফিক্‌হ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৪১৩।

৩ *লিসানুল আরব*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫।

৪ ড. মুহাম্মাহ রাওয়াস কাল'আজী বলেন, اَلْمَسْجِدُ: بِسُكُوْنُ السِّيْن وَكَسْرَ الْجِيْم

দ্র. ড. মুহাম্মাহ রাওয়াস কাল'আজী ও ড. মুহাম্মদ হামিদ সাদিক, *মু'জামু লুগাতিল-ফুকাহা* (পাকিস্তান: ইদারাতুল-কুরআন, তা.বি.), পৃ. ৪২৮।

৫ নাশওয়াদ বিন সা'ঈদ আল-হুমায়রী বলেন, موضع السجود من الأرض "জমিনে সিজদার স্থান।"

দ্র. নাশওয়াদ বিন সা'ঈদ আল-হুমায়রী, *শামসুল উলুম ওয়াদাউ কালামিল আরাব মিনাল কুলূম*, ৫ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ২৯৭৪।

৬ ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্যরা বলেন,.اَلْمَسْجَدُ: اَلْجَبْهَةُ حَيْثُ يَكُوْنُ نَدَبُ السُّجُوْد "আল-মাসজাদু অর্থ কপাল, কেননা কপাল দ্বারা সিজদা করা হয়।"

দ্র. ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (ইউ.পি: কুতুবখানায়ে হুসায়নিয়্যাহ্, তা.বি.), পৃ. ৪১৬।

৭ মুফতি মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, *কাওয়া'ইদুল ফিক্‌হ* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৩৯১ হি./১৯৬১ খ্রি.), পৃ. ৪৮৩-৪৮৪; সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ১৫৫; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৮শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৪৫৭; ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান, *ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১; আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দিক, *মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ১; মোঃ আব্দুল করিম, *ময়মনসিংহ জেলায় ইসলামী শিক্ষা ও দা'ওয়াহ-এর সম্প্রসারণ: প্রখ্যাত আলেমদের অবদান (১৯০৫-১৯৪৭)* (কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৮৬।

৮ *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫; ড. এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা* (ঢাকা: অধুনা প্রকাশন, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৩২-৩৩।

৯ অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মুসলিম শিল্পকলা ও স্থাপত্য* (ঢাকা: নভেলা পাবলিশিং ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৭; *বাংলাদেশের মসজিদ*, পৃ. ২।

১০ *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা*, পৃ. ৩২; *মুসলিম শিল্পকলা ও স্থাপত্য*, পৃ. ৩২-৩৩।

১১ *Chamber's Encyclopedia* (New York: Paragon Press, New Revised Edition,), p. 542.

১২ ইলিয়াস আনতুন, *কামূসুল ইলিয়াস* (বৈরূত: তাওযী দারুল জীল, তা.বি.), পৃ. ৪৮৫; মুনীর আল-বা'লাবাক্কী, *আল-মাওরীদ* (বৈরূত: দারূল-ইলম লিল মালা'ঈন, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৫৯৩।

১৩ *লিসানুল আরাব*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫।

১৪ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মসজিদের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১০৭; *ব্যক্তি সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা*, পৃ. ৬৭; *মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব*, পৃ. ১; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ৪৫৭; *কাওয়ায়িদুল ফিকহ*, পৃ. ৪৮৩-৪৮৪।

১৫ *লিসানুল আরাব*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫; *আস্-সিহাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৩।

১৬ *লিসানুল আরাব*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫।

১৭ *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৪১৬।

১৮ *মু'জামু লুগাতিল-ফুকাহা*, পৃ. ৪২৮।

১৯ *কাওয়া'ইদুল ফিক্‌হ*, পৃ. ৪৮৪।

২০ Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam* (Delhi: Rupa and co, Fourth Impression 1999), p. 323.

২১ *The New Encyclopeadia Britannica,* Vol. vii (London: Helen Hemingway Benton, 1973-1974), p. 329.

২২ *The Encyclopedia Americana,* Vol. 19 (Danbury: First Published, 1829), p. 495.

২৩ সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা একাডেমি ব্যবহার বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পরিমার্জিত সংস্করণ, ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৭ ব./২০১১ খ্রি.), পৃ. ১০৮২; শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (ঢাকা: সাহিত্য সংসদ, ৪র্থ সংস্করণ, অষ্টাদশ মুদ্রণ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৬৪৬; রাজশেখর বসু, *চলন্তিকা আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান* (কলিকাতা: এস.সি. সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ত্রয়োদশ সংস্করণ, নতুন মুদ্রণ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৬৫৫।

২৪ Oxford Advanced Learner's Dictionary গ্রন্থে বলা হয়েছে, Polite behaviour that shows respect for other people. cf. Edited by the *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (New York: Oxford University press, Eighth edition, 2010), p. 349; Ashu Tosh Dev বলেন, People in general, considered as living in relationship witn one another, cf. Ashu Tosh Dev, *Student's Favourite Dictionary* (Calcutta: Dev Shitya kutir Private Ltd., 30th edition, 1998), p. 915

ড. ইবরাহীম আনীস বলেন,

(الْأَدَب) رياضة النَّفس بالتعليم والتهذيب على مَا يَنْبَغِي وَجُمْلَة مَا يَنْبَغِي لذِي الصِّنَاعَة أَو الْفَنّ أَن يتَمَسَّك بِهِ كأدب القَاضِي وأدب الْكَاتِب والجميل من النّظم والنثر وكل مَا أنتجه الْعقل الإنساني من ضروب الْمعرفَة.

দ্র. *মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৯; ড. মুহাম্মদ রাওয়াস ও ড. হামিদ সাদিক বলেন,

الادب: مص أدب بكسر الدال وضمها، الجمع، ومنه سمي حسن الخلق أدبا لانه يجمع الناس على استحسانه * ما يستحب أن يكون في التصرف، يقال: آداب الصلاة اي مستحباتها Good manners الادبي: الاخلاقي.

দ্র. *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ৩০; Thomas Patrick Hughes বলেন,

ADAB (اَدَبْ) Discipline of the mind and manners; good education and good breeding; politeness; deportment; a mode of conduct or behaviour.

cf. *Dictionary of Islam*, p. 10.

২৫ সূরা আল-জীন, ৭২ : ১৮।

২৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল-বুখারী* (দারু তাওকিন-নাজ্জার, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি.), হাদীস নং ৬৬০; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম* (বৈরূত: দারু ইব্‌ন হায্‌ম, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), হাদীস নং ১০৩১।

২৭ *আহকামুল মাসাজিদ*, পৃ. ৪৩১-৩৫।

২৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনি, *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্‌* (মিশর: দারু ইয়াহ্‌ইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ্‌, তা.বি.), বাবু মা ইউকরাহু ফিল-মাসাজিদি, হাদীস নং ৭৪৮, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭।

২৯ *সহীহ মুসলিম*, বাবুল মাশই ইলাস্‌ সালাতি তুমহা বিহিল খাতাইয়া ওয়া তুরফা'উ বিহিদ্‌-দারাজাত, হাদীস নং ৬৬৬ (২৮২)।

৩০ মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত্‌-তিরমিযী, *জামি'উত্‌-তিরমিযী* (মিশর; মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি.), বাবুন ওয়া মিন সূরাতিত্‌-তাওবাহ্‌, হাদীস নং ৩০৯৩; আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ* (বৈরূত: মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), হাদীস নং ১১৬৫১, ১১৭২৫।

৩১ সূরা আত্‌-তাওবাহ: ৯: ১৮।

৩২ সূরা আল-বাকারা, ২ : ১২৫।

৩৩ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস্‌-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দা'ঊদ* (বৈরূত: আল-মাকতাতাবুল আসরিয়্যাহ্‌, তা.বি.), বাবু ইত্তিখাযিল মাসাজিদি ফিদ্‌-দূরি, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৫৫, পৃ. ১২৪; *জামি'উত্‌-তিরমিযী*, বাবু মা যুকিরা ফিত্‌ তাতয়ীবিল মাসাজিদি, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৫৯৪, পৃ. ৪৮৯; ; *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ*, হাদীস নং ৭৫৮; মুহাম্মদ ইব্‌ন হিব্বান, *সহীহ ইব্‌ন হিব্বান* (বৈরূত: মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), যিকরু আল-আমরি বিতানযীফিল মাসাজিদি ওয়া তাতয়ীবিহা, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ১৬৩৪, পৃ. ৫১৩।

৩৪ *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্‌*, বাবু তাতহীরিল মাসাজিদি ওয়া তাতবীবিহা, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭৭৫, পৃ. ২৫০।

৩৫ *সহীহ মুসলিম*, বাবু সালাতিল জামা'আমি মিন সুনানিল হুদা, হাদীস নং (৬৫৪) ২৫৭, পৃ. ৪৫৩।

৩৬ *সহীহ মুসলিম*, বাবুল মাশঈ ইলাস্‌ সলাতি তুমহা বিহিল খাতাইয়া ওয়া তুরফা'উ বিহিদ্‌ দারাজাতু, হাদীস নং (৬৬৬) ২৮২, পৃ. ৪৬২।

৩৭ সুলায়মান ইব্‌ন আহমাদ আত্‌-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর লিত্‌-তাবারী* (কাহিরা: মাকতাবাতু ইব্‌ন তায়মিয়াহ্‌, ২য় সংস্করণ, তা.বি.), হাদীস নং ৬১৩৯, ৬১৪৫; আবূ বকর ইব্‌ন আবী শায়বাহ্‌, *আল-মুসান্নাফে ইব্‌ন আবী শায়বা*, ৭ম খণ্ড (রিয়াদ: মাক্‌তাবাতুর রুশদ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭ হি.), হাদীস নং ৩৪৬১৬, ৩৪৬১৭, পৃ. ১১৫।

৩৮ সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ৩১।

৩৯ *সহীহ মুসলিম*, বাবু তাহ্‌রীমিল কিবরি ওয়া বায়ানিহি, হাদীস নং (৯১) ১৪৭, পৃ. ৯৩; *জামি'উত্‌ তিরমিযী*, বাবু মাজাআ ফিল কিব্‌রি, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ১৯৯৯, পৃ. ৩৬১।

৪০ সুলায়মান ইব্‌ন আহমাদ আত্‌-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, ৯ম খণ্ড (কায়রো: দারুল হারামাইন, তা.বি.), হাদীস নং ৯৩৬৮, পৃ. ১৪৪; আহমাদ ইবনুল হাসান আল-বায়হাকী, *আস্‌-সুনানুল কুবরা*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল

ইলমিয়্যাহ্, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), বাবু মা ইউসতাহাব্বু লির-রাজুলি আন ইউসাল্লিয়া ফীহি মিনহু ছাওয়াবি, হাদীস নং ৩২৭১, পৃ. ৩৩৩।

[৪১] *সহীহ মুসলিম*, বাবু নাহই মিন আক্লি ছুমান আও বাসালান আও কুররাছান আও নাহ্ওয়ান, হাদীস নং (৫৬৪) ৭৪, পৃ. ৩৯৫।

[৪২] *সহীহ মুসলিম*, বাবু নাহই মান আকালি ছুমান আও বাসালান আও কুর্রাছান আও নাহ্বুহা, হাদীস নং (৫৬৭) ৭৮, পৃ. ৩৯৬; *মুসনাদু আহমাদ*, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১৮৬, পৃ. ৩১৮।

[৪৩] *সহীহ মুসলিম*, বাবুদ্ দু'আই ফিস্ সালাতিল লায়লি ওয়া কিয়ামিহী, হাদীস নং (৭৬৩) ১৬১, পৃ. ৫৩০।

[৪৪] *সহীহুল-বুখারী*, বাবু লা ইয়াস'আ ইলাস্ সালাতি ওয়ালইয়াতি বিস্-সাকীনাতি ওয়াল-ওয়াকার, হাদীস নং ৬৩৬, পৃ. ১২৯; *মুসনাদু আহমাদ*, ১৬শ খণ্ড, হাদীস নং ১০৮৯৩, পৃ. ৫২৯; *আস্-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী*, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ৫১৪৫, পৃ. ১৩২।

[৪৫] *সহীহুল-বুখারী*, বাবুনঃ লা ইয়াস'আ ইলাস্ সালাতি মুসতাজিলান ওয়া-ইয়াকুম বিস্-সাকীনাতি ওয়াল-ওয়াকার, হাদীস নং ৬৩৮, পৃ. ১৩০।

[৪৬] *সুনানু আবী দা'উদ*, বাবুর রাজুলি ইয়ারকা'উ দূনাস সাফ্ফি, হাদীস নং ৬৮৩, পৃ. ১৮২; *সহীহ ইব্ন হিব্বান*, যিকরুল খাবারিল মুদহিযি কাওলা মান যা'আমা আন্না হাযাল খাবারা তাফার্রাদা বিহি, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ২১৯৫, পৃ. ৫৬৯; *আস্-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী*, বাবু মান জাওয়াযাস্ সালাতা দূনাস্ সাফ্ফি, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ৫২১৭, পৃ. ১৫০।

[৪৭] মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ আল-হাকিম আন্-নায়সাপূরী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস্ সহীহায়ন*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.), হাদীস নং ৭৯১, পৃ. ৩৩৮।

[৪৮] *সুনানু আবী দা'উদ*, বাবুন ফীমা ইয়াকূলুহুর রাজুলু ইনদা দুখূলিহিল মাসজিদ, হাদীস নং ৪৬৬, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৭।

[৪৯] *সহীহ মুসলিম*, বাবু কারাহাতিশ্ শুরূ'ঈ ফী নাফিলাতিন বা'দা শুরূ'ঈল মুওয়াযিন, হাদীস নং (৭১৩) ৬৮, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৪; *সুনানুন্ নাসাঈ*, বাবু আল-কাওলু ইনদা দুখুলিল মাসজিদি ওয়া ইন্দাল খুরূজি মিনহু, হাদীস নং ৭২৯, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩।

[৫০] *সহীহুল বুখারী*, বাবু মা জা'আ ফিত্-তাতাউ'ই মাছনা মাছনা, হাদীস নং ১১৭১, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭; *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, বাবু মান দাখালাল মাসজিদা ফালা ইয়াজলিস হাত্তা ইয়ারকা'আ, হাদীস নং ১০১২, পৃ. ৩২৩; *মুসনাদু আহমদ*, হাদীস নং ২২৬৫২, ৩৭শ খণ্ড, পৃ. ৩২৬; *সহীহ ইব্ন হিব্বান*, যিকরুয্‌যাজারি আনিল জুলূসি লিদ্-দাখিলিল মাসজিদা কাবলা আন ইউসাল্লিয়া রাক'আতায়ন, হাদীস নং ২৪৯৫, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪২।

[৫১] *সহীহুল বুখারী*, বাবু ইযা দাখালা আহাদুকুমুল মাসজিদা ফালইয়ারকা' রাকা'আতায়ন কাবলা আন ইয়াযলিসা, হাদীস নং ৪৪৪, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬; *সহীহ মুসলিম*, বাবু ইসতিহ্বাবি তাহিয়্যাতিল মাসজিদি বিরাকা'আতায়ন ..., হাদীস নং (৭১৪) ৬৯; পৃ. ৪৯৫; *জামি'উত্ তিরমিযী*, বাবু মা জা'আ ইযা দাখালা আহাদুকুমুল মাসজিদা ফালয়ারকা' রাকা'আতায়ন, হাদীস নং ৩১৬, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৯; *সুনানুন নাসাঈ*, বাবু আল-আমরু বিস্-সালাতি কাবলালুল জুলূসি ফীহি, হাদীস নং ৭৫৩, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩; *মুসনাদ আহমদ*, হাদীস নং ২২৫২৩, ২২৫৭৮; *সহীহ ইব্ন হিব্বান*, যিকরুল বায়ানি বিআন্নাল মার'আ ইন্নামা উমিরা বিরাক'আতায়ন, হাদীস নং ২৪৯৯, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৫।

[৫২] *আল-ইনসাফ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৮।

[৫৩] *সহীহ মুসলিম*, বাবুত্ তাহিয়্যাতু ওয়াল ইমামু ইয়াখতুবু, হাদীস নং (৫৭৫) ৫৯, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৭; *সুনানু আবী দা'উদ*, বাবু ইযা দাখালার রাজুলু ওয়াল ইমামু ইয়াখতুবু, হাদীস নং ১১১৭, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১।

[৫৪] *সহীহ মুসলিম*, বাবুন্ নাহই আনিল খুরূজি মিনাল মাসজিদি ইযা আয্যানাল মুআয্যিনু, ১ম খণ্ড, হাদীস নং (৬৫৫) ২৫৮, ২৫৯, পৃ. ৪৫৩; *সুনানু আবী দা'উদ*, বাবুল খুরূজি মিনাল মাসজিদি বা'দাল আযানি, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৩৬, পৃ. ১৪৭; *জামি'উত্-তিরমিযী*, বাবু মা জাআ ফী কারাহিয়াতিল খুরূজি মিনাল মাসজিদি বা'দাল আযান, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২০৪, পৃ. ৩৯৭; *সুনানুন-নাসাঈ*, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৬৮৩, পৃ. ২৯; *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, বাবু ইযা আয্যানা ওয়া আনতা ফিল-মাসজিদি ফালা তাখরুজ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭৩৩, পৃ. ৪৪২; *মুসনাদু আহমাদ*, ১৫শ খণ্ড, হাদীস নং ৯৩১৫, পৃ. ১৮১।

[৫৫] *আল-মু'জামুল আওসাত*, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ৩৮৪২, পৃ. ১৪৯।

[৫৬] *জামি'উত্-তিরমিযী*, বাবু মা জাআ ফী কারাহিয়াতিল খুরূজি মিনাল মাসজিদি বা'দাল আযান, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২০৪, পৃ. ৩৯৭।

[৫৭] *সহীহুল-বুখারী*, বাবু ইছমিল মাররি বায়না ইয়াদায়ি আল-মুসাল্লী, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১০৮, পৃ. ১৩২; *সহীহ মুসলিম*, বাবু মান'ইল মার্‌রি বায়ানা ইয়াদায়ি আল-মুসাল্লা, হাদীস নং (৫০৭) ২৬১, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৩; *সুনানু আবী দা'উদ*, বাবু মা ইউনহা আনহু মিনাল মুরূরি বায়াতা ইয়াদায়ি আল-মুসাল্লা, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭০১, পৃ. ১৮৬; *জামি'উত্ তিরমিযী*, বাবু মা জাআ ফী কারাহিয়াতিল মুরূরি বায়না ইয়াদায়ি আল-মুসাল্লাহ, হাদীস নং ৩৩৬, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮; *সুনানুন্ নাসাঈ*, আত্-তাশদীদু ফিল মুরূরি বায়না ইয়াদায়ি আল-মুসাল্লা ওয়া বায়না সুতরাতিহি, হাদীস নং, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫৬, পৃ. ৬৬; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ১৭৫৪৪০, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৮৩।

[৫৮] *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, বাবু আদরাআ মা ইসতা'তা, হাদীস নং ৯৫৪, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৭।

৫৯ *সহীহুল-বুখারী*, বাবু মান জালাসা ফিল মাসজিদি ইয়ানতাযিরুস্ সালাতি ওয়া ফাযলিল মাসাজিদি, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৬৫৯, পৃ. ১৩২; *সহীহ মুসলিম*, বাবু ফাযলি সালাতিল জামা'আতি ওয়া ইনতিযারিস্ সালাতি, হাদীস নং (৬৪৯) ২৭৫, পৃ. ৪৬০; *সুনানু আবী দা'উদ*, বাবুন ফী ফাযলিল কু'উদি ফিল মাসজিদি, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৭০, পৃ. ১২৭।

৬০ *সহীহুল-বুখারী*, বাবুল হাদাছি ফিল মাসজিদি, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৪৫, পৃ. ৯৬; *সহীহ মুসলিম*, বাবু ফাযলি সালাতিল জামা'আতি ওয়া ইনতিযারিস্ সালাতি, হাদীস নং (৬৪৯) ২৭৩, পৃ. ৪৫৯; *সুনানু আবী দা'উদ*, বাবুন ফী ফাযলিল কু'উদি ফিল মাসজিদি, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৬৯, পৃ. ১২৭।

৬১ *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ৪৭০।

৬২ *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ২৩৬১৮; মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-বানী, *সহীহ আত-তারগীব* (রিয়াদ: মাকাতাবাতুল মা'আরিফ, ৫ম সংস্করণ, তা.বি.), হাদীস নং ৬৮৮।

৬৩ *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ১৯০২২, ৩১শ খণ্ড, পৃ. ৬৬৩; *আস্-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী*, হাদীস নং ৪৭০৪, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭।

৬৪ *সহীহুল বুখারী*, বাবুল মাশই ইলাল জুমুআতি, হাদীস নং ৯০৮, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭; *সহীহ মুসলিম*, বাবু ইসতিহবাবি ইতইয়াতিস্ সালাতি বিওয়াকারিন ওয়া সাকীনাতিন ওয়ান্ নাহ্ই আন ইতইয়ানিহা সা'য়ান, হাদীস নং (৬৫১) ১৫১, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২০; *সুনানু আবী দা'উদ*, বাবুস্ সা'ই ইলাস্ সালাতি, হাদীস নং ৫২৭, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬; *জামি'উত্-তিরমিযী*, বাবু মা জাআ ফিল মাশই ইলাল মাসজিদি, হাদীস নং ৩২৭, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ৭৬৬২, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৯৬।

৬৫ *আল-মু'জামুল আওসাত লিত্-তাবরানী*, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩১, পৃ. ১৪; *আল-মু'জামুল কাবীর লিত্-তাবারী*, ১২শ খণ্ড, হাদীস নং ১৩২১৯, পৃ. ৩১৪; *মিশকাতুল মাসাবীহ্*, হাদীস নং ১৩৮৮।

৬৬ *সহীহ মুসলিম*, বাবুন্ নাহ্ই আন নাশদি-দাল্লাতি ফিল মাসজিদি ওয়া মা ইয়াকূলুহু মান সামি'আন্ নাশিদা, ১ম খণ্ড, হাদীস নং (৫৬৮) ৬৯, পৃ. ৩৯৭; *সুনানু আবী দা'উদ*, বাবুন ফী কারাহিয়াতি ইনশাদিদ্ দাল্লাতি ফিল মাসজিদি, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৭৩, পৃ. ১২৮; *মুসনাদু আহমাদ*, ১৪শ খণ্ড, হাদীস নং ৮৫৮৮, পৃ. ২৪৮; মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাহ্, *সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্*, বাবুল আমরি বিদ্-দু'আ আলা নাশিদিদ্ দালালাহ্ ফিল মাসহিদি ..., ২য় খণ্ড (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, তা.বি.), হাদীস নং ১৩০২, পৃ. ২৭৩।

৬৭ *জামি'উত্-তিরমিযী*, বাবুন্ নাহ্ই আনিল বায়'ই ফিল মাসজিদি, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৩২১, পৃ. ৬০২; *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন*, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ২৩৩৯, পৃ. ৬৫; *আস্-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী*, বাবু কারাহিয়াতি ইনশাদিদ্ দাল্লাতি ফিল মসজিদি ওয়া গায়রি যালিকা মিম্মা লা ইয়ালীকু বিল-মাসজিদি, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪৩৪৫, পৃ. ৬২৭।

৬৮ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহ্‌কামিল কুরআন*, ১২শ খণ্ড (কাহিরাহ: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ্, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ২৭০।

৬৯ *সুনানু আবী দা'উদ*, বাবুন ফিল-জুনুবী ইয়াদখুলুল মসজিদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৩২, পৃ. ৬০।

৭০ *সহীহ মুসলিম*, বাবু জাওয়াযি গুসলিল হাইযি রাসা যাওজিহা ..., ১ম খণ্ড, হাদীস নং (২৯৮) ১১, পৃ. ২৪৪; *সুনানু আবী দা'উদ*, বাবুন ফিল হাইযি তুনাভিলু মিনাল মাসজিদি, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৬১, পৃ. ৬৮; *জামি'উত্-তিরমিযী*, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১৩৪, পৃ. ২৪১; *সুনানুন্-নাসাঈ*, বাবু ইসতিখদামিল হাইযি, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৭১, পৃ. ১৪৬; *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্*, বাবুল হাইযি তাতানাওয়ালুশ্ শাইয়া মিনাল মাসজিদি, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৬৩২, পৃ. ২০৭।

৭১ *সহীহ মুসলিম*, বাবুন নাহ্ই আনিল বুসাকি ফিল মাসজিদি ফিস্ সালাতি ওয়া গায়রিহা, ১ম খণ্ড, হাদীস নং (৫৫৩) ৫৭, পৃ. ৩৯০; *মুসনাদু আহমাদ*, ৩৫শ খণ্ড, হাদীস নং ২১৫৪৯, পৃ. ৪৩৫; *আস্-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী*, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৩৫৯০, পৃ. ৪১৩।

৭২ *সহীহুল-বুখারী*, বাবু হাক্কিল বুযাকি বিল-ইয়াদি মিনাল মাসজিদি, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪০৭, পৃ. ৯০।

৭৩ *সহীহুল-বুখারী*, বাবু হাক্কিল বুযাকি বিল-ইয়াদি মিনাল মাসজিদি, হাদীস নং ৪০৫; *সহীহ মুসলিম*, বাবুন নাহ্ই আনিল বুসাকি ফিল মাসজিদি ফিস্ সালাতি ওয়া গায়রিহা, ১ম খণ্ড, হাদীস নং (৫৫৩) ৫৭, পৃ. ৩৯০; *মুসনাদু আহমাদ*, ৩৫শ খণ্ড, হাদীস নং ২১৫৪৯, পৃ. ৪৩৫; *আস্-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী*, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৩৫৯০, পৃ. ৪১৩।

৭৪ *সহীহুল-বুখারী*, বাবুন: ইন্নামা জু'ইলা আল-ইমামু লিইউতাম্মা বিহী, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৬৮৮, পৃ. ১৩৯; *সহীহ মুসলিম*, বাবু ই'তিমামিল মা'মূমি বিল-ইমামি, হাদীস নং (৪১২) ৮২, পৃ. ৩০৯; *সুনানু আবী দা'উদ*, বাবুল ইমামি ইউসাল্লী মিন কু'উদিন, হাদীস নং ৬০৫, পৃ. ১৬৫; *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ*, বাবু মা জাআ ফী ইন্নামা জু'ইলাল ইমামু লিইউ'তাম্মা বিহি, হাদীস নং ১২৩৭, পৃ. ৩৯২; *মুসনাদু আহমাদ*, ৪০শ খণ্ড, হাদীস নং ২৪২৫০, পৃ. ২৯৪।

৭৫ *সহীহ মুসলিম*, বাবুন্ নাহ্ই আন সাব্‌কিল ইমামি বির-রুকু'ই আও সুজূদিন ওয়া-নাহ্‌ভিহা, হাদীস নং (৪২৬) ১১২, পৃ. ৩০৯; *মুসনাদু আহমাদ*, ১৯শ খণ্ড, হাদীস নং ১১৯৯৭, পৃ. ৫৬; *আস্-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী*, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ২৫৯২, পৃ. ১৩১।

৭৬ *সহীহ মুসলিম*, বাবুন্ নাহ্ই আন সাবকিল ইমামি বিরুকূ'ই আও সুজূদিন ওয়া-নাহ্‌ভিহা, হাদীস নং (৪২৭) ১১৪, পৃ. ৩২০; *জামি'উত্-তিরমিযী*, বাবু মা জাআ ফিত্-তাশদীদি ফিল্লাযী ইয়ারফা'উ রা'সাহু কাবলাল ইমামি, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৫৮২, পৃ. ৪৭৫; *সহীহ ইব্‌ন হিব্বান*, যিকরুয্ যাজরি আন রাফ'ইল মুসাল্লী বাসরাহু ইলাস্ সামাই মাখাফাতা আন ইউলতামা'আ

বাসারুহু, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং ২২৮২, পৃ. ৫৯; *আল-মু'জামুল আওসাত*, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ৩৩০৬, পৃ. ৩২৮; *আস্-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী*, বাবু ইছমি মান রাফা'আ রা'সাহু কাবলাল ইমামি, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ২৫৯৯, পৃ. ১৩৩।

৭৭ *সুনানু আবী দা'ঊদ*, বাবুত্-তাশদীদি ফীমান ইয়ারফা'উ কাবলাল ইমামি আও ইয়াদা'উ কাবলাহু, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৬২৩, পৃ. ১৬৯।

৭৮ *জামি'উত্-তিরমিযী*, বাবু মা জাআ লিইয়ালীইন্নী মিনকুম ওলূল আহ্ লামি ওয়ান্-নুহায়, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২২৮, পৃ. ৪৪০; *সুনানুন্-নাসাঈ*, মাওকিফুল ইমামি ওয়াল-মা'মূমু সাবিউন, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৮০৭, পৃ. ৮৭; *সুনানু ইব্ন মাজাহ*, হাদীস নং ৯৭৬, পৃ. ৩১২; *মুসনাদু আহমাদ*, ৭ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৩৭৩, পৃ. ৩৮০; *সহীহ ইব্ন হিব্বান*, যিকরুল ইল্লাতিল্লাতি মিন আজলিহা উমিরা বিতাসভিয়াতিস্ সুফূফি, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ২১৭২, পৃ. ৫৪৫।

৭৯ *সহীহ মুসলিম*, বাবু মান আহাক্কু বিল-ইমামাতি, হাদীস নং (৬৭৩) ২৯০, পৃ. ৪৬৫; *জামি'উত্-তিরমিযী*, বাবু মান আহাক্কু বিল-ইমামাতি, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৩৫, পৃ. ৪৫৮; *সুনানুন্ নাসাঈ*, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৮০, পৃ. ৭৭; *মুসনাদু আহমাদ*, ৩৭শ খণ্ড, হাদীস নং ২২৩৪০, পৃ. ৩১; *সহীহ ইব্ন হিব্বান*, যিকরুল বায়ানি বিআন্নাল কাওমা ইয়াস-সাওঊ ফিল কিরা'আতি ..., ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ১২২৭, পৃ. ৫০০।

৮০ *সুনানু আবী দা'ঊদ*, বাবুন ফির-রাজুলি ইউদ্রিকুল ইমামা সাজিদান কায়ফা ইয়াসনা'উ? ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮৯৩, পৃ. ২৩৬; *সুনানুদ্-দারিমী*, বাবু মান আদরাকাল ইমামা কাবলা ইকামাতি সুলবিহি ফাকাদ আদরাকাস্ সালাতা, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১৩১৪, পৃ. ১৫৩; *সহীহ ইব্ন হিব্বান*, যিকরুয্ যাজরি আন রাফ'ইল মুসাল্লী বাসরাহু ইলাস্ সামাই মাখাফাতা আন ইউলতামা'আ বাসারুহু, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং ২২৮২, পৃ. ৫৯; *আল-মু'জামুল আওসাত*, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ৩৩০৬, পৃ. ৩২৮; *আস্-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী*, বাবু ইছমি মান রাফা'আ রা'সাহু কাবলাল ইমামি, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ২৫৯৯, পৃ. ১৩৩।

৮১ সাইয়্যেদ আস্-সাবিক, *ফিক্হুস্ সুন্নাহ্*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, তা.বি.),, পৃ. ২১০।

৮২ *সহীহুল-বুখারী*, বাবুল হাদাছি ফিল মাসজিদি, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৪৫, পৃ. ৯৬; *সহীহ মুসলিম*, বাবু ফাযলি সালাতিল জামা'আতি ওয়া ইনতিযারিস্ সালাতি, হাদীস নং (৬৪৯) ২৭৩, পৃ. ৪৫৯; *সুনানু আবী দা'ঊদ*, বাবুন ফী ফাযলিল কু'উদি ফিল মাসজিদি, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৬৯, পৃ. ১২৭।

৮৩ আহমাদ ইবনুল হাসান আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান* (হিন্দ: মাক্তাবাতুর রশীদ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), হাদীস নং ২৭০১, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮১; *মিশকাতুল মাসাবীহ্*, হাদীস নং ৭৪৩, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩১।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

তাকদীর ও অদৃষ্টবাদ : একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা
(*Taqdeer* and Fatalism : An Analyticl Overview)

ড. এফ এম এ এইচ তাকী*

Abstract: *Taqdeer* (تقدير) is an Arabic word. Its root is *Qadar* (قدر) or *Qudrat* (قدرة). *Qadar* means- amount, determined, respect, *and Taqdeer means* power or ability. Conventional meaning of *Taqdeer* is destiny, fortune or luck. If man's destiny is pre-determined (*qadr*) then man has no free agency; Allah is responsible for all good and bad actions of mankind; man has no guilt or accountability. On the other hand, if the word *Taqdeer* is applied in the sense of power (قدرة), then it will mean that Allah is the source of all creation or power and man acquires ability from Allah. Humans have free will to choose good or evil and Allah creates the work in man as he wills. For this freedom of will and action people will be honored or reviled in both worlds. This article analyzes the matter in the light of the arguments of Muslim theologians.

ভূমিকা
ইসলামের মৌলিক পঞ্চ স্তম্ভের প্রধানতম স্তম্ভ হলো ঈমান। আর *তাকদীরে*র ভাল-মন্দে বিশ্বাস ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। তাই স্বভাবতই এ বিষয়টি মুসলমানদের জীবন-ঘনিষ্ঠ ধর্মীয় আলোচনার কেন্দ্র-বিন্দু। *তাকদীর* যদি পূর্ব নির্ধারিত বিষয় হয় যেমনটি জাবরিয়াগণ মনে করেন, তাহলে মানুষের কর্মের কোন স্বাধীনতা থাকেনা। আবার মানুষের কর্মের স্বাধীনতা স্বীকার করলে তাকদীরের যথাযথ ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কাদরিয়াগণ কর্মের স্বাধীনতা স্বীকার করে বলেন, মানুষ জড় সাদৃশ নয়। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতে মানুষ শুধু ইচ্ছা ও কর্মে স্বাধীনই নয়; বরং মানুষ স্বীয় কর্মের স্রষ্টা। পক্ষান্তরে আশ'আরিয়া ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মে স্বাধীনতা আছে, তবে মানুষ কর্মের স্রষ্টা নয়; সে কর্ম অর্জন করে মাত্র। বিষয়টি অত্র নিবন্ধে সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

অদৃষ্টবাদের পটভূমি
প্রাক-ইসলামী যুগে আরবরা অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করতো। প্রকৃতির যাবতীয় ঘটনা অতিপ্রাকৃত শক্তি কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত এবং এ বিষয়ে মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, এমন বিশ্বাসের নাম অদৃষ্টবাদ।[১] তারা এতটা অদৃষ্টবাদী ছিল যে, বাড়ী থেকে বের হবার পূর্বে তীর বা বর্শা নিক্ষেপ করে ভাগ্য পরীক্ষা করে নিতো। ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ফলে অনারব জনপদ ইসলাম গ্রহণের পর তাদের অদৃষ্টবাদী ধ্যান-ধারণা ইসলামে প্রভাব বিস্তার করে। তাদের পূর্ব-চিন্তা-চেতনাকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সমন্বয় করতে সচেষ্ট হয়। এই প্রেক্ষাপটে তাবে'ঈ হাসান আল-বাসরী র. (জন্ম ২১/৬৪২ মৃ. ১১০/৭২৮) নবীর দৌহিত্র ইমাম হাসান ইবন আলী রা.- কে *তাকদীর* সম্পর্কে ব্যাখ্যা চেয়ে একটি পত্র লেখেন।[২] প্রাপ্ত উত্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে ইমাম হাসান আল-বাসরী র. তাঁর *রিসালায়* অভিমত ব্যক্ত করেন।[৩]

তাকদীর সম্পর্কে ব্যাখ্যার সূচনা
ইমাম হাসান আল-বাসরী র. মানুষের যাবতীয় কর্ম-পূর্বনির্ধারিত (*কাদার*) মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি মনে করেন, আল্লাহ ন্যায় বিচারক। মানুষের কর্ম পূর্ব নির্ধারিত হলে মানুষের কর্ম ও ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকেনা। মানুষের কর্ম ও ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকলে তাকে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া যায়না। আল্লাহ আসমান ও জমিন এবং এতদোভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সমূদয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা[৪]। ভাল-মন্দ, দোষ-গুণ, সৎ-অসৎ, সুন্দর-অসুন্দর যাবতীয় বিষয়ের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ এসবের জন্য দায়ী নন।

---
* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আল্লাহ ভাল কামনা করেন এবং মন্দ পরিহার করতে আদেশ করেছেন। ভাল-মন্দ মানুষ অর্জন (كسب) করে[৫] এবং এ অর্জনের ক্ষেত্রে তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। সে ভাল বা মন্দ যে কোনটি গ্রহণ বা বর্জনের ইচ্ছাধীকার (اختيار) রাখে।[৬] উল্লেখ্য মানুষ কোনটি গ্রহণ বা বর্জন করবে তা আল্লাহ পূর্ণ অবহিত আছেন। কেননা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আল্লাহর নিকট এক চিরন্তন বর্তমান। কাজেই ঘটিত, ঘটমান ও ঘটিতব্য যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহ সর্বজ্ঞানী (عليم)। এই বিচারে কেউ যদি বলে আল্লাহ মানুষের সকল কর্ম সম্পর্কে অবগত বিধায় মানুষের সকল কর্ম পূর্ব নির্ধারিত তাহলে এটি সঠিক ব্যাখ্যা হবে না; এটি সত্যের অপলাপ হবে মাত্র।

আল্লাহ কোন অশুভ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। আল্লাহ কর্তৃক মানুষের অশুভ কর্ম পূর্ব নির্ধারিত করার অর্থ হলো তাঁকে অনিচ্ছাকৃতভাবে অশুভ কর্ম সম্পাদনে বাধ্য করা যা আল্লাহর ন্যায় বিচারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তির উপর তার ক্ষমতা বহির্ভূত কোন কিছু আরোপ করেন না।'[৭] বরং কোন ব্যক্তি তার কাজের জন্য ততটুকু দায়ী যতটুকু সে অর্জন করে।[৮] আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি কর্ম মানুষ স্বাধীনভাবে গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার (اختيار) রাখে, তাই মানুষ ইচ্ছা ও কর্মে স্বাধীন। এই স্বাধীনতা অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবেনা, আবার শরী'আতের সীমারেখা লঙ্ঘনও করবেনা।

মু'য়াবিয়া রা. স্বীয় পুত্র ইয়াযিদকে খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দেয়ার প্রেক্ষিতে যখন সমালোচনার ঝড় ওঠে তখন তিনি 'আইশা সিদ্দীকা রা.-কে এক পত্রে অবহিত করেন যে, 'ইয়াযিদের খলীফা হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত (قدر من الاقدار) এবং এ বিষয়ে জনগণের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।'[৯] ইমাম হাসান আল-বাসরীর বিশিষ্ট শিষ্য মা'বাদ আল-যুহানী (মৃ: ৮০ হি.) বিষয়টি শুনার পর তাঁর শিক্ষকের নিকট আরও অভিযোগ করলেন যে, "হে আবূ সাঈদ, রাজপুত্রেরা মুসলিমদের রক্তপাত করছেন, সম্পত্তি আত্মসাৎ করছেন এবং বহুবিধ অপকর্ম করছেন আর বলছেন, 'আমাদের কাজকর্ম আল্লাহর *কাদার* অনুসারে সংঘটিত হচ্ছে।" হাসান আল-বাসরী র. উত্তরে বলেন, "আল্লাহর শত্রুরা মিথ্যা বলছে।"[১০] এটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নয়। বরং জনগণের স্বাধীনভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ যা জোর-জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতার নামান্তর এবং তারা যা করছে তা আল্লাহর ইচ্ছা নয়। আল্লাহ স্বেচ্ছাচারী নন। তিনি ন্যায় বিচারক। এ কথা প্রমাণের জন্য ইমাম হাসান আল-বসরী র. বলেন, আল্লাহ যাবতীয় কর্মের স্রষ্টা। তিনি মানুষকে কোন কাজে বাধ্য করেন না। মানুষ তার কর্ম অর্জন করে। আল্লাহ প্রদত্ত কর্ম গ্রহণ বা বর্জনের ইচ্ছাধীকার (اختيار) তার রয়েছে। সে ইচ্ছা করলে ভাল করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে মন্দ করতে পারে। ভাল কাজ করলে পুরস্কৃত হবে এবং মন্দ কাজ করলে শাস্তি পাবে।

ইমাম হাসান আল-বাসরী র. মানুষকে কর্মের কর্তা (خالق) স্বীকার করেননি। কর্মের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। মানুষ কর্ম অর্জন (كسب) করে মাত্র। ভাল বা মন্দ কর্ম গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা (اختيار) সম্পর্কে তাঁর *রিসালার*[১১] মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাঁর শিষ্য কতাদা বিন দিয়ামা (মৃ: ৭৩৫ খ্রী.) এর লিখুনীতেও এগুলো প্রকাশিত হয়েছে। হাসানের অর্জন (كسب) চিন্তাদর্শন শিষ্য ওয়াসিল বিন আতা, তাঁর শিষ্য দিরার তাঁর শিষ্য নাজ্জার এবং তাঁর শিষ্য আশ'আরীর মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।[১২]

জাবরিয়াদের অভিমত

প্রাক-ইসলামী যুগের অদৃষ্টবাদী চিন্তার পরিপোষকরা ইসলাম গ্রহণের পরও পূর্বচিন্তাধারা বিমুক্ত না হয়ে উমাইয়া যুগে জাবরিয়া মতবাদ প্রচার করেন। *জাবর* (جبر) শব্দের অর্থ বাধ্যবাধকতা, অক্ষমতা ও অধীনতা। এটি *কুদরাহ* (قدرة) শব্দের বিপরীত। যাঁরা নিজেদেরকে আল্লাহর ইচ্ছার নিকট সম্পূর্ণ অসহায় মনে করেন এবং ঘটমান সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব-নির্ধারণ অনুযায়ী সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস করেন তাঁরাই জাবরিয়া।[১৩] যেহেতু সকল বস্তুই আল্লাহর হুকমের অনুগত সেহেতু কোন কিছুই মানুষের ইচ্ছায় সংঘটিত হয়না। আল্লাহর নিকট অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এক চিরন্তনী বর্তমান (একক) এবং তিনি ঘটমান যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে পূর্ব-অবগত। কাজেই ঘটনার সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত আল্লাহর নিকট

নির্ধারিত হয়ে আছে; তাঁদের নিকট এর কোন বিকল্প নেই বলেই প্রতীয়মান হয়।[১৪] জাবরিয়াগণ নিজেদের মতের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি পেশ করে থাকেন।

আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।[১৫] তাঁর সার্বভৌমত্বের মধ্যে কারো হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। তিনি সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।[১৬] তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়।[১৭] মানুষের ইচ্ছা মূলত: আল্লাহর ইচ্ছা। মানুষের যেমন কোন কর্ম-স্বাধীনতা নেই, তেমনি তার ইচ্ছার স্বাতন্ত্র বা স্বাধীনতা নেই। মানুষের ভাল-মন্দ, ন্যায় অন্যায় সবকিছু মহান স্রষ্টার সৃষ্টি। আল-কুরআনে বর্ণিত আছে "আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা কর তা-ও সৃষ্টি করেছেন।"[১৮] মানুষ তাঁর হাতের ক্রীড়নক এবং তিনি যেভাবে চান মানুষ বাধ্য হয়েই তা সম্পন্ন করে। মানুষ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে। মানুষ জড় সাদৃশ।[১৯] জড়ের যেমন ইচ্ছা নেই, কর্ম নেই, কেউ তাকে না নড়ালে নড়তে পারেনা, তেমনি মানুষ আল্লাহর হাতের পুতুল।[২০] আল্লাহ যেমনি নাচায় তেমনি নাচে; পুতুলের কোন দোষ বা গুণ নেই। অতএব, উমাইয়া শাসকবৃন্দের বিষয়ে যা কিছু ঘটছে তা আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটছে, এ বিষয়ে মানুষের কোন করণীয় নেই।

জাবরিয়াগণ মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা সামগ্রিকভাবে অস্বীকার করেন। সব কাজ আল্লাহর হুকমে তাঁরই পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়। মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা কোনটিই নেই। মানুষ আল্লাহ ইচ্ছার নিকট শুধু অসহায় নয়, বরং তা পরিপালনে বাধ্য। কাজেই মানুষ তার কর্ম কাণ্ডের জন্য দায়ী নয়।[২১] মানুষের পুরস্কার বা শাস্তি আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার অধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা পুরস্কৃত করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন।[২২] জাহম বিন সাফওয়ান (মৃ: ৭৪৫ খ্রী.) এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

কাদরিয়াদের অভিমত

উমাইয়া শাসকবৃন্দের নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে তাদের যাবতীয় কর্মের বৈধতা দিতে জাবরিয়া সম্প্রদায় কুরআন ও হাদীস থেকে যুক্তি তর্কে যখন পঞ্চমুখ, ঠিক তখনই কাদরিয়া সম্প্রদায় কুরআন ও হাদীসের আলোকে *জবরতত্ত্ব* খণ্ডনের জন্য আবির্ভূত হয়। ইমাম হাসান আল-বাসরী *কাদার* শব্দের ব্যাখ্যা দিলেও তিনি কোন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নন। তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের একজন যুগ শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ছিলেন। তাঁর বিশিষ্ট শিষ্যবৃন্দ পরবর্তীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

কাদরিয়া সম্প্রদায় মনে করে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শক্তি (قدرة) দিয়েছেন, ইচ্ছা (ارادة) দিয়েছেন এবং স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা (اختيار) দিয়েছেন। অতএব মানুষ তার ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীনভাবে কর্ম করে।[২৩] মানুষ স্বীয় কর্মের জন্য দায়ী এবং তার সকল (ভাল-মন্দ) কর্মের জন্য মহান আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা করতে হবে। মানুষের মন্দ কাজের দায়ভার আল্লাহর উপর বর্তায় না।[২৪]

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মধ্যে যেমন অদৃষ্টবাদী-চিন্তা কাজ করছিল, তেমনি কর্মবাদী চিন্তাও মানুষকে আন্দোলিত করেছিল। ইবন তাইমিয়া র.-এর মতে ইরাকে প্রথম বসরার অধিবাসী অগ্নিপূজক বংশোদ্ভূত সীসওয়াই এ মতবাদের সূচনা করেন। আল্লামা আত-তূফী সুসান (سوسن) নামক জনৈক ব্যক্তিকে এ মতবাদের উদ্ভাবক উল্লেখ করেছেন। সিয়ারুল উয়ূন গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইরাকের জনৈক খ্রীষ্টান এ মতবাদের সূচনা করে এবং ঐ সময় সে ইসলাম গ্রহণ করে পরে পুনরায় খ্রীষ্টান হয়ে যায়। আল-মিলাল ওয়ান নিহাল গ্রন্থের টীকায় দেখা যায় বসরাবাসী আসভিরা নামক প্রাচীন সম্প্রদায়ের জনৈক খ্রীষ্টান يونس الاسوارى লকব سيبويه (আবূ ইউনুস সান্‌সাওয়াহ বা সুসান) থেকে মা'বাদ ইবন খালিদ আল-জুহানী (মৃ. ৮০ হি.) এ মতবাদ গ্রহণ করেছেন।[২৫] প্রকৃতপক্ষে মা'বাদ আল-জুহানী ইমাম হাসান আল-বাসরী র.-এর শিষ্য ছিলেন। আর ইমাম হাসান আল-বাসরী র. প্রথম *তাকদীর* বিষয়ক আলোচনার সুত্রপাত করেন।[২৬]

প্রাচীনকাল থেকেই আরব্য কবিরা *কাদা* (قضاء) ও *কাদার* (قدر) শব্দ দুটি অদৃষ্ট অর্থে ব্যবহার করতেন। ওমাইয়া শাসকগোষ্ঠী ও জাবরিয়াগণ তা অনুসরণ করেন। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের আলোকে শব্দ দু'টির সঠিক ব্যাখ্যা ইমাম হাসান আল-বাসরী র. উপস্থাপন করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কর্মের ক্ষমতা (استطاعة বা قدرة) আল্লাহর এবং মানুষ তা অর্জন (كسب) করে মাত্র। মানুষ যখন ভাল কাজের ইচ্ছা করে

তখন ভাল করার সামর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়। আবার যখন মন্দ কাজের ইচ্ছা করে তখন মন্দ করার সামর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয় এবং তদানুযায়ী কার্যটির সিদ্ধান্ত হওয়ার নাম *কাদা* (قضاء), আর বাস্তব রূপ লাভ করার নাম সৃষ্টি (خلق)। নির্বাচন ও অর্জনের ইচ্ছাধিকার বা স্বাধীনতা ব্যক্তির একান্তই নিজস্ব। এ কারণেই মানুষ শাস্তি ও পুরস্কারযোগ্য। "আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তিনি সকলকেই সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারতেন এবং তারা কখনই মুর্খদের দলভুক্ত হতোনা।"[২৭] যেহেতু আল্লাহ জোর-জবরদস্তি করেননা সেহেতু এটি প্রমাণ করে যে, মানুষের ভাল বা মন্দ গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীন ইচ্ছাধিকার রয়েছে। কিন্তু মা'বাদ আল-জুহানী *কাদার* (قدر) শব্দটি *কুদরত* (قدرة) তথা শক্তি-সামর্থ অর্থে ব্যবহার করেন।[২৮] অর্থাৎ মানুষের নিজস্ব কার্যক্ষমতা রয়েছে এবং মানুষের কর্মের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। মানুষ স্বীয় ভাল-মন্দ কর্মের জন্য দায়ী, আল্লাহ মানুষের কর্মসমূহ পূর্বেই নির্ধারণ করেন না।[২৯] এ কারণে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালেক মা'বাদ আল-জুহানীকে হত্যা করেন। পরবর্তীতে তাঁর শিষ্য গায়লান আল-দিমাস্কী এ মতবাদের প্রচার ও প্রসারে যুক্ত করেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো, 'ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ নিষেধ করা।' ফলে খলীফা হিশাম তাঁকে হত্যা করেন।[৩০] এ ভাবেই কাদারিয়াদের অবসান ঘটে।

মা'বাদ মানুষের কর্মের পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আল্লাহ শুধু ভাল কাজের ইচ্ছা করেন, মন্দ কাজের ইচ্ছা করেন না। "তোমাদের নিকট ভাল যা কিছু পৌঁছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর মন্দ যা কিছু পৌঁছে তা তোমাদের নিজের পক্ষ থেকে।"[৩১] এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ মন্দ কাজের কর্তা নন এবং মন্দ কাজের ইচ্ছাও করেন না। তাহলে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন না তাও সংঘটিত হয়। তাঁদের মতে এর জবাব হলো, আল্লাহ শুধু সম্মতি দেন (Vouchsafe)। কাজেই আল্লাহর উপর মন্দ কাজের দায়ভার বর্তায় না।[৩২]

গায়লানের মতে, মানুষের ইচ্ছাই আল্লাহর ইচ্ছা। মানুষের স্বেচ্ছায় কৃত কর্ম অস্তিত্ব লাভের পূর্বে আল্লাহ ঐ বিষয়ে ইচ্ছা করেন। আনুগত্যের বিষয় হলেও ইচ্ছা করেন; অমান্যের বিষয় হলেও আল্লাহ তা প্রতিরোধ করেন না (Vouchsafe)। আল্লাহর ইচ্ছা ও মানুষের কর্ম যুগপৎ। তিনি আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার সঙ্গে অশুভ কর্মের অসম্পৃক্ততার সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস চালিয়েছেন। তিনি আল্লাহর ইচ্ছাকে তাঁর হুকমের (امر) সঙ্গে নয় বরং কর্মের (فعل) সঙ্গে একীভূত করেছেন। আল্লাহর হুকম (امر) হলো ভাল গ্রহণ ও মন্দ বর্জন।[৩৩] কিন্তু তাঁর কর্ম (فعل) হলো মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী ভাল বা মন্দ কাজে বাধা না দিয়ে বরং কর্মটি সৃষ্টি করা। আর মানুষের কর্মক্ষমতা (استطاعة) তার দৈহিক সামর্থ ও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। মানুষ যদি ইচ্ছা করে কিন্তু ঐ বিষয়ে তার সামর্থ না থাকে তাহলে কার্য সম্পাদিত হয়না, অনুরূপভাবে মানুষের সামর্থ আছে কিন্তু ঐ বিষয়ে তার কোন ইচ্ছা নেই তাহলেও কর্ম সম্পাদিত হবেনা। ব্যক্তির কোন কাজে ইচ্ছা ও সামর্থ থাকলে আল্লাহ ঐ কাজ সৃষ্টি করেন। মোট কথা জাবরিয়াগণ মানুষের ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতাকে অস্বীকার করেছেন; পক্ষান্তরে কাদরিয়াগণ বলেন, মানুষের ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা রয়েছে।

মু'তাযিলাদের অভিমত

কাদারিয়াদের যুক্তি অনুসরণ করে ওয়াসিল বিন আতা মু'তাযিলা মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৪] ওয়াসিল ইমাম হাসান বাসরীর প্রতিভাধর শিষ্য ছিলেন। শিক্ষকের সঙ্গে এক প্রশ্নে মত পার্থক্য হওয়ায় তিনি পৃথকভাবে মু'তাযিলা মতবাদ ব্যক্ত করেন। মু'তাযিলারা ছিলেন অতিবুদ্ধিবাদী সম্প্রদায়।[৩৫] তাঁরা ওহীর ওপর প্রজ্ঞাকে প্রাধান্য দিতেন। প্রজ্ঞানির্ভর যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তাঁদের মতবাদ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন।[৩৬] এ জন্য তাঁদেরকে দার্শনিক শ্রেণীর প্রতিভূ বলে অভিহিত করা হয়। ওয়াসিল বিন আতা (মৃ: ১২৮ হি./৭৪৮ খ্রী.) ও আমর বিন উবায়দ (মৃ: ১৪৫ হি./৭৬২ খ্রী.) উভয়েই ইমাম হাসান আল-বাসরীর শিষ্য[৩৭] হিসেবে শিক্ষকের অনুরূপ ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা মু'তাযিলা হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর শিক্ষকের অনেক শিক্ষার সঙ্গে একমত না হয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে, মানুষ স্বীয় কর্মের

আবিস্কারক, উদ্ভাবক এবং স্রষ্টা। অর্থাৎ মানুষ কোন কিছু অস্তিত্বহীন থেকে স্বীয় ইচ্ছা ও কর্ম দ্বারা অস্তিত্বশীল করে যা সৃষ্টিরই নামান্তর।[৩৮] কাদরিয়াগণ মানুষের ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা স্বীকার করলেও তাঁরা মানুষকে কর্মের স্রষ্টা বলেননা। কিন্তু মু'তাযিলাগণ মানুষকে স্বীয় কর্মের স্রষ্টা বলেন এবং পরকালে আল্লাহ কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দিতে বাধ্য মনে করেন, যা ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়।

আশ'আরিয়াদের অভিমত

আশ'আরিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আবুল হাসান আলী ইবন ইসমাঈল আল-আশ'আরী (মৃঃ ৩৩০ হি./ ৯৪১ খ্রী.), আবু মনসুর মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ আল-মাতুরিদী (২৩৮/৮৫৩-৩৩৩/৯৪৪), ইমাম তাহাভী (২২৯/৮৪৩-৩২১/৯৩৩) প্রমুখ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারীগণ মু'তাযিলা মতবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। মানুষ যদি স্বীয় কর্মের স্রষ্টা হয়, তাহলে তাকে ঐ কর্মের বিস্তারিত জ্ঞান থাকতে হবে। প্রকৃত পক্ষে তা থাকে না। যেমন কোন ব্যক্তির হাঁটা কর্মে কতবার পদ সঞ্চালিত হবে, কতবার মাংশপেশী স্ফীত হবে, কোথায় গতি মন্থর হবে, কোথায় গতি দ্রুত হবে, কোথায় গতি বাধাপ্রাপ্ত হবে এসব বিষয়ে তার কোন জ্ঞানই থাকেনা। তাহলে সে হাটা কর্মের স্রষ্টা হয় কিভাবে? [৩৯] আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্মসমূহ।"[৪০] মানুষের আবিস্কার ও উদ্ভাবন সবই এই কর্মের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার সমকক্ষ হতে পারেন যে সৃষ্টি করেনা।[৪১] কাজেই মানুষ কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারেনা; আল্লাহ সকল কর্মের সৃষ্টিকর্তা। মানুষকে তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করলে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা হয় যা থেকে আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র।

মু'তাযিলাদের যুক্তি ও আশ'আরিয়াদের জবাব

মু'তাযিলাগণ বলেন, আল্লাহ যদি মানুষের যাবতীয় কর্মের কর্তা হন, তাহলে ব্যক্তির চুরিকার্য, ব্যাভিচার কার্য প্রভৃতি অপকর্মের সাথে আল্লাহ সম্পৃক্ত হয়ে যান।[৪২] আশ'আরিয়াগণ জবাব দেন, আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তিকে কালো, কোন ব্যক্তিকে সাদা বর্ণে সৃষ্টি করেছেন। সেজন্য তো আল্লাহ সাদা বা কালো নন। বরং সাদা বা কালো যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেই কালো বা সাদা গুণে গুণান্বিত।[৪৩] কোন শিল্পী কোন বস্তুতে কালো বা সাদা রং করার কারণে তাকে সাদা বা কালো বলা হয়না; বরং যে বস্তু সাদা বা কালো রঙ ধারণ করে সেই কালো বা সাদা গুণে গুনান্বিত হয়। আল্লাহ ভাল ও মন্দ যাবতীয় কর্মের স্রষ্টা। যে ভাল অর্জন বা গ্রহণ করবে সে ভাল এবং যে মন্দ অর্জন বা গ্রহণ করবে সে মন্দ।

মু'তাযিলারা বলেন, "আল্লাহ তাবারক তা'আলা সৃষ্টিকারীদের মধ্যে উত্তম সৃষ্টিকারী।"[৪৪] এখানে আল্লাহ ছাড়াও আরও সৃষ্টিকারী রয়েছে। জবাবে বলা হয়েছে, এখানে সৃষ্টি (خلق) অর্থ নয়, বরং تقدير অর্থ। অর্থাৎ কোন বস্তুর আকৃতি গঠন করা।[৪৫] মু'তাযিলারা যুক্তি দেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)- কে মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি সৃষ্টির নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখানে সৃষ্টি (تخلق) শব্দ ঈসা (আ.)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে। যদি মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতা না থাকে তাহলে আল্লাহ ঈসা (আ.)-কে এ নির্দেশ দিতেন না।[৪৬] উত্তরে বলা হয়েছে, এখানে সৃষ্টি করার জন্য আদেশ দেয়া হয়নি; বরং একটি আকৃতি (تصوير) গঠন করার আদেশ দেয়া হয়েছিল।[৪৭] আর আল্লাহর নির্দেশে তার মধ্যে আত্মা প্রবিষ্ট হয়েছিল। ফলে জীবন্ত পাখি হয়ে ওড়ে গিয়েছিল। এখানে আল্লাহ সৃষ্টিকারী।[৪৮]

আশ'আরিয়া তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে মানুষের কর্মের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা আছে, যে কারণে সে পুরস্কার ও শাস্তির যোগ্য হয়। আল্লাহ একমাত্র কর্মের স্রষ্টা, আর মানুষ কর্ম অর্জনকারী।[৪৯] ব্যক্তি স্বীয় ক্ষমতা ও ইচ্ছাকে কাজে নিয়োজিত করার নাম *কসব* (كسب); এরপর আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ঐ কাজকে বাস্তব রূপ দেয়ার নাম *খালক* (خلق)। সৃষ্টির (خلق) জন্য কোন উপকরণ (آلة) প্রয়োজন হয়না; কিন্তু অর্জনের (كسب) জন্য উপকরণ (اسباب) প্রয়োজন হয়।[৫০] অথচ এই উপকরণগুলো আল্লাহ প্রদত্ত।[৫১] যেমন একজন কাঠমিস্ত্রীর একটি খাট বানানোর জন্য প্রয়োজন হয় কাঠ, হাতুড়ী, করাত প্রভৃতি আনুষঙ্গিক

উপকরণের। এগুলো তার নিজস্ব নয়; এগুলো আল্লাহর প্রাকৃতিক দান। এগুলো কোন মিস্ত্রী সংগ্রহ (كسب) করে খাট নির্মাণ করে। এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত উপকরণ সংগ্রহ বা অর্জন (كسب) করে কোন কাজ সম্পন্ন করার অর্থ ঐ কাজটি আল্লাহর সৃষ্টির নামান্তর। অর্থনীতির ভাষায় মানুষ কোন কিছু সৃষ্টি করেনা। মানুষ শুধু ব্যবহার উপযোগী করে বা উপযোগ সৃষ্টি করে। সৃষ্টিশক্তির উৎস আল্লাহ হলেও তা অর্জন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছাধিকার আছে। এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির কারণেই ব্যক্তি পুরস্কৃত অথবা লাঞ্ছিত হয়।

উপসংহার

জাবরিয়া সম্প্রদায়ের মতে মানুষের ভাল, মন্দ, সৎ-অসৎ, যাবতীয় কর্মের কর্তা আল্লাহ। মানুষ স্বীয় কর্মের জন্য দায়ী নয়। তাঁরা অদৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। ইমাম হাসান আল-বসরী র. বলেন, আল্লাহ যাবতীয় কর্মের স্রষ্টা। তিনি মানুষকে কোন কাজে বাধ্য করেন না। মানুষ তার কর্ম অর্জন করে। কাদারিয়াদের মতে আল্লাহ সর্বজ্ঞানী (عليم)। মানুষ ভাল করবে, না মন্দ করবে সে বিষয়ে আল্লাহ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই অবহিত। আল্লাহ মানুষের ভাল কাজের ইচ্ছা করেন, মন্দ কাজের ইচ্ছা করেন না। তথাপি মানুষ মন্দ কাজ করলে আল্লাহ বাধা দেননা। তাঁরা জাবরিয়াদের অদৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে কর্মবাদ প্রচার করেন। তাঁরা *তাকদীর*কে ভাগ্য অর্থে ব্যবহার না করে শক্তি (قدرة) অর্থে ব্যবহার করেন।

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, মানুষ স্বীয় কর্মের স্রষ্টা। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে শক্তি-সামর্থ (استطاعة/قدرة) দিয়েছেন। মানুষ ইচ্ছা ও কর্মে স্বাধীন। মানুষ যদি স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করে সেজন্য আল্লাহ তাকে পুরস্কার দিতে বাধ্য এবং মানুষ যদি স্বেচ্ছায় মন্দ কাজ করে সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিতে বাধ্য। কারণ আল্লাহ ন্যায় বিচারক। আশ'আরী, মাতুরিদী, তাহাভী তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মু'তাযিলাদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে বলেন, আল্লাহ ন্যায় বিচারক, কিন্তু আল্লাহ কোন কাজে বাধ্য নন। ব্যক্তি স্বীয় কর্মের স্রষ্টা নয় ; ব্যক্তি স্বীয় ক্ষমতা ও ইচ্ছাকে কাজে নিয়োজিত করার নাম অর্জন (كسب); এরপর আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ঐ কাজকে বাস্তব রূপ দেয়ার নাম সৃষ্টি (خلق)। সৃষ্টির (خلق) জন্য কোন উপকরণ প্রয়োজন হয়না; কেননা আল্লাহ 'কুন' বললেই তা হয়ে যায়। কিন্তু অর্জনের (كسب) জন্য যেসব উপকরণ (اسباب/الة) প্রয়োজন হয় তা মানুষের ব্যক্তিগত নয়, আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ মানুষের জন্য অসংখ্য উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে এই উপকরণসমূহ অর্জন (كسب) করে যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কল্যাণ সাধনে সদা তৎপর হতে হবে। আলস্যভরে তাকদীরের উপর নির্ভর করে হাত পা গুটে বসে থাকা যাবেনা। মানুষ সাধ্যমত চেষ্টা চালাবে এবং তার প্রচেষ্টা যে ডিগ্রীতে পৌঁছাবে সেখানেই তার *তাকদীর* নির্ধারিত বলে মেনে নিতে হবে। সবার প্রচেষ্টা এক সমান নয়। আমার চেষ্টার মান সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত অর্থাৎ আল্লাহর নিকট নির্ধারিত। কিন্তু আমি অবহিত নই। তার অর্থ আমার নিকট তকদীর অনির্ধারিত। এজন্যই আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা তৎক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজের অবস্থার উন্নয়ন ঘটায়।" মানুষ শুধু চেষ্টা করবে (লাইসা লিল ইনসানে ইল্লা মা সাআ)। ফল আল্লাহর হাতে (ওমা তাশাউনা ইল্লা আঁই ইয়াশা আল্লাহ)।

তথ্যনির্দেশ

১ **Fatalism:** The belief that all events are decided in advance by supernatural power and humans have no control over them. Cf. Compact Oxford Dictionary Thesaurus and Wordpower Guide (New York: Oxford University Press Inc. 2006), p. 324.

২ روى انه كتب الحسن البصرى إلى الحسن بن على رضى الله تعلى عنهم يسأله عن القضاء و القدر فكتب اليه الحسن بن على من لم يؤمن بقضاء الله وقدره خيره و شره فقد كفر ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجر الخ

দ্র: আলী বিন সুলতান মুহাম্মদ আল-কারী, *মিরকাতুল মাফাতিহ*, ১ম খণ্ড (মুলতান: মাজলিস ইশআতুল মা'আরিফ, ১৩৮৬ হি./১৯৬৬ খ্রী.), পৃ. ৫৯। এটি হাসান বিন আলী (রা.)-এর পত্রের বিস্তারিত বিবরণ।

[৩] ইমাম হাসান আল-বাসরী র.-এর অনেকগুলো *রিসালাহ* রয়েছে। তন্মধ্যে *রিসালাহ ফীল কাদার* নামে একটি *রিসালাহ* সম্পর্কে ইবন নাদীমের *ফিহ্‌রিশত* গ্রন্থের ৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। তুরস্কের 'আয়া সোফিয়া' লাইব্রেরীতে এর একটি পাণ্ডুলিপি এখনও বিদ্যমান রয়েছে বলে জানা যায়। প্রখ্যাত জার্মান লেখক হেলমুট রিটার ১৯৩৩ সালে *ডের ইসলাম* পত্রিকায় এটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। হেলমুট রিটার "স্টাডিয়েস চ্যুর গেসচিক্‌টে ডের ইসলামিসেন ফ্রমিগকেট-১" *ডের ইসলাম*, ভল্যুম-২১, ১৯৩৩। দ্রষ্টব্য: ড. মো: বদিউর রহমান, *মুসলিম দর্শনের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ৬০, ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

[৪] এ বিষয়ে আল-কুরআনে অনেক আয়াত বিদ্যমান।

[৫] হাসান আল বাসরী, *রিসালা*, হেলমুট রিটার সম্পাদিত, পৃ. ৭৯-৮১; জে, শ্যাকট, "নিউ সোর্সেস ফর দ্যা হিস্ট্রি অব মোহামেদান থেওলজী", *স্টাডিয়া ইসলামিকা*, ১ম খণ্ড, ১৯৫৩ খ্রী., পৃ. ৩০; এম.এম. ব্রাডম্যান, "হিরোইক মোটিভস ইন আরলী এ্যারাবিক লিটারেচার", *ডের ইসলাম*, ৩৬ খণ্ড, ১৯৬০/৬১, পৃ. ২২।

[৬] হাসান আল-বাসরী, *রিসালা*, হেলমুট রিটার সম্পাদিত, পৃ. ৭২।

[৭] সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৬।

[৮] তদেব।

[৯] M. Saeed Sheikh, *Studies in Muslim Philosophy* (Lahore: Pakistan Philosophical Congress, 1962), p. 3; এম.এ. রউফ, "দি কুরআন এ্যান্ড ফ্রি উইল", *দি মুসলিম ওয়ার্ল্ড*, সংখ্যা ২০, নম্বর ৪, ১৯৭০, পৃ. ২৯০।

[১০] এইচ.এইচ. শেইডার, "হাসান আল-বাসরী", *ডের ইসলাম*, ভল্যুম-১৪, ১৯২৭ খ্রী., পৃ. ৫৯; M. Saeed, Sheikh, p. 3.

[১১] আল হাসান আল-বাসরী, *রিসালাহ*, হেলমুট রিটার সম্পাদিত, পৃ. ১-৮৩।

[১২] W.M. Watt, *Free Will and Preedestanation in Early Islam* (Edinburgh: Luzac and Company, 1984), pp. 104-106.

[১৩] শাহরাস্তানী, *আল-মিলাল ওয়া আল-নিহাল*, ১ম খণ্ড (মিশর: ১৯৭৬ খ্রী.), পৃ. ১১২।

[১৪] মুহাম্মদ আবূ যাহরাহ, *তারীখ আল-মাযাহিব আল-ইসলামিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড (মিশর: দারুল ফিকর আল-আরাবী, ১৯৮৭ খ্রী.), পৃ. ১০২।

[১৫] قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء দ্র: সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ২৬।

[১৬] وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ দ্র: সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১৮৯।

[১৭] সূরা হুদ, আয়াত: ১০৭।

[১৮] সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৯৬; Syedur Rahman, *An Introduction to Islamic Culture and Philosophy* (Dacca: Mullick Brothers, 1970), p. 16. (P-2).

[১৯] ড. আবুল খায়ের মুহাম্মদ আইয়ুব আলী, *আকীদাতুল ইসলাম ওয়াল ইমাম আল-মাতুরীদী* (ঢাকা: আল-মুওয়াসাসা আল-ইসলামিয়্যাহ বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ. ৩৮৫।

[২০] Kazi Ayub Ali, *An Introduction to Islamic Culture* (Barisal: Al-Beruni Library, 1958), p. 55 (P-2).

[২১] *Ibid*, p. 53. (P-2).

[২২] সূরা আল-ফাতাহ, আয়াত: ১৪।

[২৩] Syedur Rahman, p. 15, (P-2).

[২৪] M. Saeed Sheikh, p. 3.

[২৫] *আল-মিলাল ওয়া আল-নিহাল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১; *তারীখুল মাযাহিবুল ইসলামিয়্যাহ*, পৃ. ১১০; মাওলানা মোহা: হেয়ায়েত উদ্দীন, *ইসলামী আকীদাহ ও ভ্রান্ত মতবাদ*, পৃ. ২৬৮।

[২৬] মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে, মা'বাদ আল জুহানী তাকদীর সম্পর্কে প্রথম আলোচনার সূত্রপাত করেন। এর অর্থ তিনি কাদরিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা এবং এ বিষয়ে প্রথম প্রবক্তা। কিন্তু হাসান আল-বাসরী কোন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না। তিনি একজন মুজতাহিদ ও ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকেই তাকদীর সম্পর্কে কম-বেশী আলোচনা ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় হাসান বাসরীও বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছেন। মা'বাদ আল-জুহানী প্রথম বিষয়টিকে মতবাদ হিসেবে আলোচনা করেন।

[২৭] সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৩৫।

[২৮] Kazi Ayub Ali, p. 54, (P-2).

[২৯] M.M Sharif, *Muslim Thoughts: Its Origin and Achievements* (Lahore: Book House, 1951), p. 58.

---

[৩০] M. Saeed Sheikh, p. 3; Kazi Ayub Ali, p. 54, (P-2).

[৩১] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭৯।

[৩২] M. Saeed Sheikh, p. 3.

[৩৩] كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ দ্র: সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১০।

[৩৪] W.M. Watt, *Islamic Philosophy and Theology* (Edinburgh: The University Press, 1962), p. 67.

[৩৫] Syedur Rahman, p. 17, (P-2)

[৩৬] M. Saeed Sheikh, pp. 4-6; M.M Sharif, p. 58

[৩৭] M. Saeed Sheikh, p. 4.

[৩৮] আল্লামা তাফতাযানী, *শরহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যাহ* (ঢাকা: আরাফাত পাবলিকেশনস, ১৯৮৮), পৃ. ১।

[৩৯] তদেব, পৃ. ৩; *আকীদাতুল ইসলাম ওয়া ইমাম আল-মাতুরীদী*, পৃ. ৩৮৮।

[৪০] وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ দ্র: সূরা আস-সফ্‌ফাত, আয়াত: ৯৬।

[৪১] أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ দ্র: সূরা নাহাল, আয়াত: ১৭।

[৪২] নাসাফী, পৃ. ৭।

[৪৩] নাসাফী, পৃ. ৭।

[৪৪] সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ১৪।

[৪৫] নাসাফী, পৃ. ৭।

[৪৬] নাসাফী, পৃ. ৭।

[৪৭] নাসাফী, পৃ. ৭।

[৪৮] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৪৯।

[৪৯] "তাকদীরে বিশ্বাস হলো, আল্লাহর জ্ঞানে পরিবৃত্ত বিষয় যেখান থেকে সৃষ্টজীব (মানুষ) সৃষ্টি অর্জন করে এবং তার নির্দিষ্ট যাবতীয় বিষয় প্রকাশ পায়; এবং সৃষ্টি করে তার জন্য ভাল ও মন্দ।" দ্রষ্টব্য: আবূ বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী, *আল-ই'তিকাদ 'আলা মাযহাবিল সালফি আহলি সুন্নাতি ওয়াল জামা'আত* (বৈরূত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রী.), পৃ. ৬৮; M. Saeed Sheikh, p. 26; "The responsibility of man, as well as the holiness of God, who is incapable of directly causing man's sinful actions, had to be saved by asserting the freedom of the will. Man must therefore be lord of his actions; but he is lord of these only, for few entertained any doubt that the energy which confers ability to act at all, and the power of doing either a good or a bad action come to man from God." Cf. Dr. T.J. Boer, The History of Philosophy in Islam (London: Luzac and Co. Ltd. 1961), p. 45.

[৫০] আবুল হাসান আল-আশ'আরী, *মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লিন*, ২য় খণ্ড (আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ১৪২৬ হি./ ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ৩৯৩।

[৫১] নাসাফী, পৃ. ১৪-১৫।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান (৭৫০-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ)
Muslim Contribution to Medical Science (750-1258 AD)

ড. আবুল বাশার মোহাম্মাদ সরোয়ার আলম*

Abstract: Medical science is one of the broad branches of science. It has started since the creation of man. Advances in medical science have accelerated by various civilizations and nations in prehistoric and ancient times. Different methods and types of treatment have been invented and known as primitive treatment methods. At the advent of Islam, the way of practicing medicine was limited. Beginning of Islam in the seventh century paved the way for the practice of medical science. With the inspiration of the Holy Quran and Hadith, Muslims focused on the practice of medical science. After the Holy Prophet (SM), the spread of medicine continued during the Khulafa-i-Rashedin and Umayyad periods. During the Abbasid regime, the development of medical science under state patronage entered a new era. The Abbasid period is called the golden age of knowledge. In Spain (711-1492 A.D.) Muslim efforts led to the development of medical science. After the establishment of Fatimid Empire in Tunissia in Ad 909,medical advances continued in North Africa, Egypt and Syria. With the establishment of the Ottoman Empire in Egypt in 1517 AD, the way to practice medicine like other branches of science was blocked. The rise of knowledge and sciencs took place in Europe and paved the way of modern medical science.

ভূমিকা

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই চিকিৎসার সূচনা হয়েছে। বিভিন্ন সভ্যতার সংস্পর্শে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমৃদ্ধ ঘটেছে একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। প্রাচীনকালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষ অগ্রগতি সূচিত হলেও মধ্যযুগের প্রারম্ভে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসার বাধাগ্রস্থ হয়। ইসলাম আগমনের পর চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিকাশ নবযুগে প্রবেশ করে। ইসলামের অনুপ্রেরণা এবং খলিফাদের প্রচেষ্টায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের চর্চা নব উদ্যোগে বিকশিত হতে থাকে। আব্বাসীয় খলিফাগণ বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেন। বাইতুল হিকমার অনুকুলে গ্রন্থ অনুবাদ, স্বাধীন পর্যবেক্ষণ ও মৌলিক গ্রন্থ রচনার কাজ সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে। স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিকাশ এবং অসংখ্য ক্ষণজন্মা মুসলিম চিকিৎসাবিদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাদের অসাধারণ প্রতিভার উপর নির্ভর করে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সূচনা হয়। চিকিৎসায় মুসলিমদের অভূতপূর্ব অবদান ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হলেও একটি বিশেষ গোষ্ঠীসহ আধুনিক যুগের পণ্ডিতগণ মুসলিম অবদানকে স্বীকার করতে চায় না। এমতাবস্থায় চিকিৎসা চর্চায় মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনসহ উচ্চতর গবেষণা হওয়া অতিব জরুরী। এ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা সম্পাদিত হলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন দ্বার উম্মোচিত হবে। মুলতঃ এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে 'চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান (৭৫০-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ)' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হলো।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিচিত

চিকিৎসা বিজ্ঞান দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। চিকিৎসার ইংরেজি মেডিসিন (Medicine) যা ল্যাটিন শব্দ Ars Medicina শব্দ থেকে উৎকলিত হয়েছে। অর্থ হলো চিকিৎসা কলা (The Medical art)। আরবী প্রতিশব্দ আত-তিব্ব (الطب) এর অর্থ হচ্ছে চিকিৎসা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমষ্টিগত আরবী প্রতিশব্দ ইলমুত তিব্ব (علمالطب) এবং ইংরেজি Medical Science। চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখায় প্রাণিদেহের রোগ, নিরাময় ও প্রতিষেধক নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে। A.S Hornby বলেন, Medicine the Study andtreatment of diseases and Injuries.[১] চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিচয় প্রসঙ্গে ইবন আল কায়্যিম বলেন, রোগ উপশমের কলা বা শৈলীকে ইলমুত তিব্ব বলে।[২] ইবন মানযুর বলেন, দেহ ও আত্মার চিকিৎসাকে ইলমুত তিব্ব বলা হয়।[৩] আহমাদ ফুয়াদ পাশা বলেন, الطب هو أحد العلوم الطبيعية التي تـعنى على الأصحاء عن طريق : الوقاية من الأمراض، أو برد الصحة إلى المرضى عن طريق العلاج بالأدوية والأغذية[8]فروعه المختلفة بحفظ الصحة দাউদ ইবন উমর ইলমুত তিব্ব-এর তিনটি সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। যেমন, ইবন রুশদ বলেন, ইলমুত তিব্ব এমন একটি বিজ্ঞান যার মাধ্যমে মানবদেহের সুস্থতা ও অসুস্থতার পরিস্থিতি জানা যায়। জালিউনুস বলেন, এটা এমন একটি বিজ্ঞান যার মাধ্যমে শরীরের অবস্থা জেনে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও ক্ষত পুনরুদ্ধার করা যায়। ইবন সিনা বলেন, ইহা এমন একটি বিজ্ঞান যা থেকে মানুষের দেহের সঠিক দিকটি জানা যায় এবং স্বাস্থ্য রক্ষা ও পুনরুদ্ধার করার জন্য দেহ থেকে রোগ দূরিভূত করা হয়।[৫]

ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান

ইসলামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে নানা দিক-নির্দেশনা রয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের জন্য রহস্য, স্বাস্থ্য, রোগ, ঔষধ প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা বর্ণিত হয়েছে। এ সকল বিষয় বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন পার্থিব জীবনে প্রতিরক্ষামূলক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে রোগের প্রতিষেধক হিসেবে মধুর কথা বলা হয়েছে। মৌমাছি বিভিন্ন প্রকারের ফুল থেকে ফুলের রস আহরণ করে এবং নিজের শরীরের ভিতরে মধু তৈরির পর তা মোমের কোষে জমা করে। অতঃপর সেখান থেকে মধু সংগ্রহ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ "মৌমাছির পেট থেকে বিবিধ রংয়ের পানীয় বের হয় যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগমুক্তি"।[৬] মহানবী (সা.) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ: الْعَسَلِ، وَالْقُرْآنِ "তোমাদের জন্য অবশ্যই দু'টি ঔষধ রয়েছে, একটি হচ্ছে কুরআন আর অপরটি মধু"।[৭] খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে মধু এবং আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআন হচ্ছে সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ চিকিৎসা। অপর একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الكَيِّ "তোমাদের চিকিৎসাগুলোর মধ্যে উত্তম চিকিৎসা হচ্ছে শিঙ্গা লাগানো, মধুপান কিংবা আগুন দ্বারা দাগ দেয়া। তবে আগুন দ্বারা দাগ দেয়া আমি পছন্দ করি না"।[৮] আল-কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মধু হচ্ছে মানুষের স্বাস্থ্যের ও দৈহিক রোগ-ব্যাধির নিরাময়ে এক অব্যর্থ মহৌষধ। আল্লামা সুয়ূতী মধুকে খাদ্যসমূহের খাদ্য, পানীয় সমূহের পানীয় এবং ঔষধসমূহের ঔষধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনু আল কায়্যিম বলেন, খাদ্য হিসেবে, ঔষধ হিসেবে, ঔষধের সংরক্ষণে ও পাকস্থলির শক্তি বৃদ্ধিতে মধুর চেয়ে উপকারী আর কিছুই নাই। মধুর মধ্যে অনেক রোগের ঔষধি গুণাগুণ রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন স্তরের গবেষণা থেকে সর্বশেষ এই প্রাকৃতিক পানীয়টির নানাবিধ সুবিধা বা গুণাগুণ আবিষ্কৃত হয়েছে। মধুতে ২৮টি মিনারেল, ২২টি অ্যামিনো এসিড, ১১টি কার্বোহাইড্রেট, ১৪টি ফ্যাটি এসিড, ১১টি এনজাইমও এ.বি.সিসহ মোট ১১টি ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ রয়েছে। এছাড়াও গ্লুকোজ, ফ্রক্টোজ, ডেক্সট্রিন, জাইলস প্রভৃতি উপাদান রয়েছে। মধুর ক্যালরিক মান ৩১৯।[৯] আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত যে, মধু ঠাণ্ডা, কাশি, হাপানী, ব্যথা,

পেটের পীড়া, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ, পানি শূন্যতা, শারীরিক দুর্বলতা, চর্ম প্রভৃতি রোগের মহৌষধ হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এটা মৃদু অ্যানটিসেপটিক হিসেবেও কাজ করে।[১০] Encyclopaedia of Islamic Science and Scientists গ্রন্থে বলা হয়েছে, Honey Seems to Possess Immense medicinal value for various diseases. It is extremelyeffective and useful for heart diseases and Provides top-grade, readymade glucose for body weaknesses. It is also very useful for the eyes.[১১] মধুর উৎস ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাকৃত জ্ঞান মাত্র কয়েক শতক পূর্বে উদঘাটিত হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান এটা গবেষণা করে অনেক নতুন নতুন তথ্য মানব কল্যাণে আবিস্কার করছে এবং এ গবেষণা চলমান রয়েছে। পবিত্র কুরআনের ২৪১টির অধিক আয়াতে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা দেয়া হয়েছে। একইভাবে হাদীসের গ্রন্থ বুখারী শরীফে 'তিব্বুন নব্বী' শিরোনামে ৮০টি পরিচ্ছেদে রোগ ও তার নিরাময় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, In fact the whole science of Medicine is closely related to Quranic studies and the Islamic faith. It is also related to the Injunctions of the Holy Quran and Hadith of the Holy Prophet concerning hygiene, better and healty living.[১২] এভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান সুক্ষ্মভাবে গবেষণা করলে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের সাথে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের যোগসূত্র রচিত হবে বলে আশা করা যায়।

মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিকাশ

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই চিকিৎসার প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ ঝাড় ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসার সূচনা করেছে। অতঃপর ঔষধ হিসেবে লতা-পাতা গাছ-গাছড়ার ব্যবহার শুরু হয়েছে। নব্য প্রস্তরযুগ পর্যন্ত এ চিকিৎসা পদ্ধতি অব্যাহত থাকে। ব্যাবিলনীয় সভ্যতা চিকিৎসা বিজ্ঞানে নব উদ্ভাবনের সূচনা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। মেসোপটেমিয়া ও মিসরীয় সভ্যতায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারতবর্ষে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত হয়। চীন সভ্যতায় চিকিৎসা বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। পরবর্তীকালে গ্রীক ও রোমানরা চিকিৎসা বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করে। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা অনেকটা স্থবির হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় সাত শতকে আরবে ইসলামের আগমন ঘটে। মহানবী (সা.) অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন, জন্ম রহস্য, স্বাস্থ্যবিধি, রোগের কারণ ও নিরাময়, শল্যচিকিৎসা, সংক্রামকব্যাধি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি জ্ঞানগর্ভ দিক-নির্দেশনা দান করেছেন। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর সময় হারিস বিন কালদা একজন বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তাকেই মুসলিম চিকিৎসা জগতের সর্বপ্রথম চিকিৎসক বলা হয়।[১৩] মহানবী (সা.)-এর পরবর্তী তথা খোলাফায়ে রাশিদীন ও উমাইয়া আমলে চিকিৎসার প্রসার অব্যাহত থাকে। উমাইয়া আমলে অনেক গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়। বিশেষ করে উমাইয়া বংশের দ্বিতীয় খলিফার পুত্র খালিদ বিন ইয়াজিদ একজন বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন এবং তিনিই প্রথম গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা ও রসায়ন বিষয়ক গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন।[১৪] উমাইয়াযুগে মূলত চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় আব্বাসীয় আমলে। চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে বাগদাদে বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৫] আব্বাসীয় শাসনামলের ৭৫০-৯০০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালকে সাধারণত অনুবাদের যুগ বলা হয়। খলীফা আল মানসুরের আমলে গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থ দ্রুততার সাথে আরবীতে অনূদিত হয়। তিনি জুন্দিশাপুরের বিখ্যাত চিকিৎসক জুরজিস বিন বখ্‌তকে তাঁর দরবারে নিয়ে আসেন। এই পরিবারই আরবে প্রথম ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেন এবং ঔষধের কারখানা স্থাপন করেন।[১৬] এছাড়া আবু ইয়াহিয়া ইবন আল বাতরিক খলিফার নির্দেশে গ্যালেন ও হিপোক্রেটিসের গ্রন্থগুলো অনুবাদ করেন। খলিফা আল মামুনের আমলে অনুবাদের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়। খৃষ্টান চিকিৎসক হুনায়ন ইবন ইসহাককে তিনি বাগদাদের

অনুবাদ স্কুলের দায়িত্ব প্রদান করেন।[১৭] হুনায়নের নেতৃত্বে গ্রীক ও সিরীয় ভাষার অনেক চিকিৎসা গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়। খলিফা আল মুতাওয়াক্কিলের আমল পর্যন্ত অনুবাদের ধারা অব্যাহত থাকে। তিনি তৎকালীন বিখ্যাত মুসলিম অমুসলিম পণ্ডিতকে অনুবাদের জন্য নিয়োগ দেন। এ সময়ের অসংখ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানী তাদের মৌলিক গবেষণা দ্বারা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে।

অনুবাদের পরবর্তী ৯০০-১১০০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালকে স্বাধীন পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার যুগ বলা হয়। এ সময়ের চিকিৎসাবিদরা অনুবাদের চেয়ে মৌলিক গবেষণা ও স্বাধীন পর্যবেক্ষণের প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠেন। মূলত এ সময়কালকে মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ বলা হয়।[১৮] অনুবাদ যুগের পরবর্তী সময়ে চিকিৎসাবিদ্যার উপর মৌলিক গ্রন্থ রচনা করে সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করেছিলেন, আলী ইবন রাব্বান, আর রাযী, আলী ইবন আব্বাস আল মাজুসী, ইবন সিনা প্রমুখ।[১৯] তাদের অনবদ্য অবদানের ফলে গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তৃত হতে থাকে। মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগের পর ১২৫০-১৬৪০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পতন ও পশ্চিম এশিয়ায় ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উত্থানের যুগ বলা হয়। বারো শতক বিশেষ করে ইমাম গাজ্জালির সময় থেকে চিকিৎসা গবেষণায় অস্থিরতা দেখা যায়। কারণ বিজ্ঞানচর্চা বিশ্বজগত ও সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস নষ্ট করে দিচ্ছে বলে একদল পণ্ডিত অভিযোগ করেন। Tomas Arnold বলেন, We may say that, from the time of the famous religious teacher al Gazali on words, this tolerance gave place to persecution of these studies because they lead to loss of belief in the origin of the world an in the creation.[২০] মূলত এ মনোভাবের ফলে স্বাধীন পর্যবেক্ষণে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। ফলে চিকিৎসা চর্চার পতন অব্যাহত থাকে। অন্যদিকে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা মুসলমানদের চিকিৎসাশাস্ত্রসমূহ ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ অব্যাহত রাখে। তারা স্বাধীন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানবদেহের অনেক যন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চিকিৎসা জগতে উপস্থাপন করে।[২১] এভাবেই আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর ইউরোপীয়দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলিম অবদান

ইসলাম আগমনের পর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূচনা হয় এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে পনের শতক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ সময়ে অসংখ্য মুসলিম চিকিৎসাবিদ চিকিৎসাশাস্ত্রে অভূতপূর্ব অবদান রাখেন। দেড়শ এর অধীক চিকিৎসাবিদ চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধশালী করেছে। নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসকের অবদান তুলে ধরা হলো।

আল কিন্দি (৮০১-৮৭৩ খ্রি.)

মধ্যযুগের বিশ্বখ্যাত দার্শনিক আল কিন্দির প্রকৃতনাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবন ইসহাক আল কিন্দি।[২২] তিনি ল্যাটিন ভাষায় আল কিন্দাস (Alkindus) নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।[২৩] আল কিন্দি আরব জগতের প্রথম প্রখ্যাত দার্শনিক হলেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ২৭০টির অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে ২৭টি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বর্তমান 'কিতাবু ফি কিমিয়া আল ইতর ওয়াত তাসিদাত' ও 'আকরাবাদিন' শিরোনামে দুটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে।[২৪] প্রথম গ্রন্থটিতে সুগন্ধি, তৈল, মলম, আতর প্রভৃতি তৈরীর কৌশল ও পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া মূল্যবান ঔষধ সস্তা মালমশলায় তৈরী করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।[২৫] আকরাবাদিন গ্রন্থে রোগ ও রোগের ঔষধের ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। অধ্যাপক লেভী ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থটির অনুবাদ করেন। সেখানে ২২৬টি চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৬] সেগুলোর মধ্যে ঠাণ্ডা, সর্দি, বাত, কালপিত্ত, স্নায়বিক দুর্বলতা, যকৃত ও পেটের পীড়া, পেট ও প্লীহা, ফোঁড়া, আগুনে পুড়া,ভগন্দরের ঔষধ এবং কাজল তৈরীর পদ্ধতি অন্যতম।[২৭] তিনি এ সকল রোগের ঔষধ তৈরীর জন্য ভেষজ উদ্ভিদ ও মশলা জাতীয় উপকরণ ব্যবহার এবং ঔষধ তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। আল কিন্দি ঔষধ তৈরীতে গণিতের ব্যবহার এবং নির্দিষ্ট রোগের নিরাময়ে সঙ্গীত ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। আল

কিন্দি ঔষধের শক্তি পরিমাণ নির্ধারণের জন্য গাণিতিক স্কেল আবিষ্কার করেন, যা একজন চিকিৎসককে রোগীর অসুস্থতার সবচেয়ে জটিল দিনগুলো আগেই নির্ধারণে সহযোগিতা করে। এটি চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরিমাণ নির্ধারণের প্রথম প্রচেষ্টা ছিল।

আলী বিন রাব্বান (জন্ম. ৮১০ খ্রি.)

নবম শতকের খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদ ইবন রাব্বান-এর প্রকৃতনাম আবুল হাসান আলী ইবন সাহল ইবন রাব্বান আলতাবারী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি ৫টির অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর অনবদ্য রচনা হলো, 'ফিরদাউস আল হিকমা'। ইবন রাব্বান কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত ফিরদাউস আল হিকমা গ্রন্থটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের আকর হিসেবে সমাদৃত। তিনি গ্রন্থটি রচনার কাজ ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে শুরু করেন এবং দীর্ঘ ২০ বছর কঠোর পরিশ্রমের পর ৮৫০ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত করেন।[২৮] ফিরদাউস আল হিকমা গ্রন্থটি ৭ খণ্ডে, ৩০টি অধ্যায়ে ৩৬০টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।[২৯] এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে দার্শনিক মতবাদসহ মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের গুণাগুণ, ক্রিয়া-বিক্রিয়া, জীবজন্তুর সৃষ্টি ধ্বংস, দ্বিতীয় খণ্ডে ভ্রুণ-গর্ভাধানের লক্ষণ, প্রসব, ঋতু, মননবিদ্যা, আবেগ, শিশুপালন চিকিৎসাব্যবস্থা, তৃতীয় খণ্ডে ক্ষুধার কারণ বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ ও ফলাফল, চতুর্থ খণ্ডে মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগ নির্ণয়, পঞ্চম খণ্ডে বস্তুর স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণের ভিন্নতা ও শরীরের উপর এসবের প্রভাব, ৬ষ্ঠ খণ্ডে উদ্ভিদ, ফল, বীজ, গোশত, মাংস প্রভৃতির গুণাগুণ এবং ৭ম খণ্ডে আবহাওয়া, পানি ও ঋতুর সাথে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক নিরূপণ ও ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে আলোচান করা হয়েছে।[৩০] ইবন রাব্বান শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চিকিৎসার জন্য ৫টি সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করেছেন। যেমনঃ (১) রোগে আক্রান্ত অঙ্গকে সাধারণ মিযাজে ফিরে আনা, (২) রোগ শরীরের উপরের অংশ থেকে নীচের অংশে, ডান থেকে বাম পাশে এবং বাম থেকে ডান পাশে, প্রধান অঙ্গ থেকে আনুষঙ্গিক অঙ্গে নেয়া, (৩) প্রধান অঙ্গ এবং সংবেদনশীল অঙ্গের চিকিৎসা অন্য অঙ্গের চিকিৎসা থেকে পৃথক ভাবে করা, (৪) শরীরের বাইরের এবং ফাঁপা অঙ্গের বেলায় স্বল্পতেজ বিশিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করা, (৫) সহজ পদ্ধতিতে অতিরিক্ত বস্তুগুলো শরীর থেকে বের করে দেয়া।[৩১] ইবন রাব্বান-এর ফিরদাউস আল হিকমা গ্রন্থকে চিকিৎসাবিদ ও ঐতিহাসিকগণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বপ্রথম বিশ্বকোষ বলে অভিহিত করেছেন।

সাবিত ইবন কোরা (৮২৬-৯০১ খ্রি.)

সাবিত ইবন কোরার প্রকৃত পরিচয় আবু হাসান ছাবিত ইবন কোরা ইবন মারওয়ান আল হাররানি। জন্মভূমির দিকে নিসবত করে তাকে আল হাররানি বলে সম্মোধন করা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণের করে, অংক, দর্শন,জ্যোতি, পদার্থ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে ১০৬ মতান্তরে ১২৮টি গ্রন্থ রচনা করেন।[৩২] মধ্যযুগের মুসলিম বিজ্ঞানের প্রতিনিধি সাবিত ইবন কোরা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিলো। এলগুড বলেন– Judging from his recorded works, which are many and his existing which are few. It is difficult to say in which branch of learning shabit excelled.[৩৩] বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হলেও সাবিত ইবন কোরা চিকিৎসাবিদ হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। চিকিৎসা বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মৌলিক রচনা স্বাস্থ্য, চিকিৎসা পেশার মহত্ব, বসন্ত, হাম, পাখির এনাটমি প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত। চিকিৎসা বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হলো 'আল-জাখিরতু ফি ইলমু তিব্ব'। গ্রন্থটি ৩১টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ১ম পরিচ্ছেদে স্বাস্থ্য ও প্রফাইলেক্সিস, ২য় পরিচ্ছেদে গুপ্ত রোগ, ৩য় পরিচ্ছেদে চুল সম্পর্কে, ৪র্থ পরিচ্ছেদে প্রসাধনী, মলম, তৈল, ৫ম থেকে ১৯শ পরিচ্ছেদে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও স্ত্রীরোগ, ২০-২৬'শ পরিচ্ছেদে নানা প্রকার রোগের বর্ণনা, ২৭'শ পরিচ্ছেদে প্লেগ রোগ, ২৮'শ পরিচ্ছেদে হাড়ভাঙ্গা, ২৯-৩০'শ পরিচ্ছেদে, দুধ ও মদ এবং ৩১'শ পরিচ্ছেদে যৌন রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[৩৪] তিনি চোখের রোগ ও তার প্রতিকার এবং অপারেশন ব্যাপারে জ্ঞানগর্ভ

আলোচনা করেছেন। তিনি নিজেই অপারেশন করতেন। সাবিত ইবন কোরা চিকিৎসা জগতে সুপ্ত প্রতিভার অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন।

আল রাযী (৮৫৪-৯০৩ খ্রি.)

মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ আর রাযী-এর পূর্ণনাম আবু বকর মোহাম্মদ ইবন যাকারিয়া আর রাযী। পাশ্চাত্য জগতে রাজেস (Rhazes) নামে পরিচিত।[৩৫]আর রাযী প্রায় ছোট বড়-দু'শো গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ হলো একশো। 'কিতাব আল হাবী' ও 'কিতাব আল মনসুরী' তাঁর চিকিৎসা বিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আবু বকর আর রাযী নবম শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ ছিলেন। তিনি ৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কিতাব আল মনসুরী রচনা করে সিজিস্তানের শাসক মনসুর ইবন ইসহাক আল সামানীর নামে উৎসর্গ করেন।[৩৬] শারীরবিদ্যা বিষয়ক এ গ্রন্থটি ১০ ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে এনাটমি ও ফিজিওলোজী, দ্বিতীয়ভাগে মেজাজ সম্পর্কে, তৃতীয়ভাগে পণ্য ও সাধারণ ঔষধ সম্পর্কে, চতুর্থভাগে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি নিষেধ, পঞ্চমভাগে চর্মরোগ ও প্রসাধন দ্রব্যাধি সম্পর্কে, ষষ্ঠভাগে বিদেশ ভ্রমণের সময়ে খাদ্যাদি, সপ্তমভাগে শল্যচিকিৎসা সম্বন্ধে, অষ্টমভাগে বিষ সম্পর্কে, নবমভাগে সমগ্র শরীরের রোগ সম্পর্কে এবং দশমভাগে জ্বর নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।[৩৭] আর রাযীর সর্ববৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ হচ্ছে 'কিতাব আল হাবী'। গ্রন্থটি তৎকালীন সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ হিসেবে সুপরিচিত ছিল।[৩৮] এ গ্রন্থটি ২৫ খণ্ডে বা ৩৭ খণ্ডে বিভক্ত। ইবন খাল্লিকানের মতে, ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত। আলহাবীতে চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি, রোগের উপসর্গ, ঔষধ ও পথ্য সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে।[৩৯] গ্রন্থটি ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্য হিসেবে নির্দিষ্ট ছিল। মূলত এ বইটি ইউরোপীয় জগতে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। বসন্ত ও হাম রোগ সম্পর্কে আর রাযী 'আল জুদারী ওয়াল হাসবাহ' গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি বসন্ত ও হামের সংক্রমণ, উপসর্গ ও নিরাময় বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত সমাধান প্রদান করেছেন।[৪০] একইভাবে 'তিব্ব রুহানী' গ্রন্থে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি তৎকালীন সময়ে শল্যচিকিৎসার জনক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।[৪১]

আল যাহরাবী (৯৩৬-১০১৩ খ্রি.)

শল্যচিকিৎসার অগ্রপথিক আল যাহরাবীর প্রকৃতনাম আবুল কাশেম খলফ ইবন আব্বাস আল যাহরাবী। পশ্চিমা বিশ্বে তিনি আবুল কাসিস বা আলবু কাসিস নামে পরিচিত। জন্মস্থানের দিকে নিসবত করে আল যাহরাবী বলা হয়।[৪২] তিনি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ আত তাসরিফসহ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্জন আল যাহরাবী সর্বপ্রথম অস্ত্রপাচারবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার অবতারণা করেন। এজন্য তাঁকে আধুনিক শল্যচিকিৎসার জনক বলা হয়। আল যাহরাবী কর্তৃক রচিত 'কিতাব আত তাসরিফ লেমান আজিযা আনিল তাআলিফ' গ্রন্থটি শল্যচিকিৎসার এক অনবদ্য সৃষ্টি। কিতাব আত তাসরিফ গ্রন্থটি দু'খণ্ডে বিভক্ত এবং ৩০টি অধ্যায়ে সমাপ্ত।[৪৩] প্রথম খণ্ডে তাত্ত্বিক বিষয় তথা এনাটমি, ফিজিওলজি ও ডায়েবেটিকস এবং দ্বিতীয় খণ্ডে প্রায়োগিক বা সার্জারী সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি অস্ত্রচিকিৎসার প্রণালী, উপযুক্ত অস্ত্রপচার ও সার্জিকাল যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। শল্যচিকিৎসার প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তিনি নিজেই প্রস্তুত করেছেন এবং সেগুলোর চিত্রসম্বলিত উদাহরণ কিতাবুত তাসরিফ গ্রন্থে সংযোজন করেছেন।[৪৪] সার্জারী অংশকে ৩টি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ছ্যাঁকা দেয়ার প্রথা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিয়োট্রিটি, লিথোটমি, এমপুটেশন, চক্ষু ও দন্ত চিকিৎসা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে হাড়ভাঙ্গা ও প্যারালাইসিস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[৪৫] আল যাহরাবী কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে ২০০ প্রকারের সার্জারীর যন্ত্রপাতির চিত্র ও নমুনা সংযোজন করা হয়েছে।[৪৬] পরবর্তীকালে ইউরোপে নমুনা হিসেবে এগুলোই ব্যবহার হতো। গ্রন্থটি ইউরোপে সমাদৃত হবার কারণে পরপর পাঁচবার ল্যাটিনে অনূদিত হয়েছে।[৪৭] আল যাহরাবীর

কিতাবুত তাসরিফ গ্রন্থকে জর্জ সার্টনসহ অনেকে 'মেডিকেল বিশ্বকোষ' এবং ডা. কাম্পবল একে সর্বপ্রথম স্বাধীন সচিত্র গ্রন্থ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৪৮]

আল মাজুসী (মৃ. ৯৯৪ খ্রি.)

ইসলামী স্বর্ণযুগের অন্যতম চিকিৎসাবিদ আল মাজুসীর প্রকৃতনাম আলী ইবন আব্বাস আল মাজুসী আল আহওয়াজী। ইউরোপে তিনি হালি আব্বাস (Haly Abbas) বা আলী আব্বাস নামে পরিচিত।[৪৯] আল মাজুসী কিতাব আল মালিকি গ্রন্থ প্রণয়নের মাধ্যমে চিকিৎসা জগতে ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করেন। কিতাবুল মালিকি (The Royal Book) গ্রন্থটি ২০ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম ১০ খণ্ডে তত্ত্বীয় বিজ্ঞান এবং শেষ ১০ খণ্ডে ব্যবহারিক বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে প্রসূতি বিদ্যা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে এনাটমি, ৫ম খণ্ডে গর্ভাধান ও সন্তান-সন্ততি, সপ্তম খণ্ডে ঔষধ ও ঔষধের প্রয়োগবিধি এবং উনিশ খণ্ডে সার্জারী নিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।[৫০]গ্রন্থটির ভূমিকাকে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এ গ্রন্থে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছে এবং বিভিন্ন রোগ ও তার নিরাময়ে যুক্তিযুক্ত আলোচনা বর্ণিত হয়েছে।

ইবন আল হায়সাম (৯৬৫-১০৩৯ খ্রি.)

মুসলিম দৃষ্টিবিজ্ঞানী ইবন হায়সাম এর পুরোনাম আবু আলী আল হাসান ইবনুল হাসান ইবন আল হায়সাম। পশ্চিমা বিশ্বে তিনি আল হাজেন নামে সুপরিচিত।[৫১] ইবন হায়সাম এর দৃষ্টিবিজ্ঞানের মৌলিক গ্রন্থ কিতাব আল মানাযির তাঁকে অমর করে রেখেছে। আধুনিক বিশ্ব সভ্যতা তাকে অপটিক (চক্ষু চিকিৎসা)-এর জনক বলে অভিহিত করেছে।[৫২] তাঁর গ্রন্থ কিতাব আলমানাযির ৭ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে দৃষ্টি, দ্বিতীয় খণ্ডে চোখে কিভাবে দেখা যায়, তৃতীয় খণ্ডে দৃষ্টিভ্রমের কারণ, চতুর্থ খণ্ডে পালিশ করা বস্তু থেকে প্রতিফলন, পঞ্চম খণ্ডে প্রতিবিম্বের অবস্থা, ষষ্ঠ খণ্ডে প্রতিফলনে সৃষ্ট বিভ্রম এবং ৭ম খণ্ডে স্বচ্ছ বস্তু থেকে প্রতিসরণ পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে।[৫৩] তিনি পদার্থ ও গণিতের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যবহারের পদ্ধতি আলোচনাসহ চোখের এনাটমি পর্যবেক্ষণ করে কর্ণিয়া আইরিশ, গ্লোকমা প্রভৃতির পার্থক্য নির্ধারণ করেন। চোখের রেটিনা, অপটিক নার্ভ-এর কাজ, চোখের দুই রসের জলীয় ও স্বচ্ছ কাজ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আরবী আদাসা থেকে বর্তমানে ইংরেজি Lens শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ইবন হায়সাম চোখের পরকলার জন্য আদাসা বা লেন্স ব্যবহার করেছেন।তিনি চোখের গঠন, অধ্যাসদৃষ্টি, বাইনোকুলারদৃষ্টি, বর্হিদৃষ্টি, ছায়া ও বর্ণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।[৫৪]

আল বেরুনী (৯৭৩-১০৪৮ খ্রি.)

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ভূগোল ও চিকিৎসাবিদ আল বেরুনীর পূর্ণনাম আবু রায়হান মুহাম্মাদ ইবন আহমদ আল বেরুনী।[৫৫] ল্যাটিন ভাষায় তিনি আল বারুনিয়াস নামে পরিচিত।[৫৬] মধ্যযুগের বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ও গবেষক আহমদ আল বেরুনী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। তিনি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ 'কিতাবুস সায়দানা' রচনা করেন।[৫৭] গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়গুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমভাগে ভূমিকাসহ ঔষধ প্রস্তুত করার কৌশল, ফার্মাকোলজী, মেডিক্যাল থেরাপি, প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্য, ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ভাগে মেটেরিয়া মেডিকার বিষয়গুলোকে নামের বর্ণনানুসারে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৮] তিনি ঔষধের নামের বুৎপত্তি, পরিচিতি ও বিভিন্ন প্রজাতির গুণাগুণ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। ফার্মাসিস্টদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আল বেরুনী এ গ্রন্থে ঔষধের আরবী নামের সঙ্গে গ্রীক, সিরিয়া, ফার্সী, হিন্দী, সিগজী, জাবুলী, তিরমিজী ও খারিজমী ভাষার নাম বা প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন। কারণ ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান যেন সহজে ও সঠিকভাবে ঔষধ চিনতে পারে।[৫৯]

ইবন সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.)

ইবনে সিনার প্রকৃত নাম আবু আলী আল হুসাইন ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে আলী ইবনে সিনা আল-বুখারী।[৬০] তিনি ল্যাটিন ভাষায় আভিসিনা (Avicenna) এবং হিব্রুতে আভিনসিনা Avensina নামে পরিচিতি।[৬১] তবে বিদ্বান মহলে তিনি ইবনে সিনা নামেই প্রসিদ্ধ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ইবনে সিনার আল-কানূন ফিত তিব্ব ও আশ-শিফা গ্রন্থ দুটি চিকিৎসা ও দর্শনশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।ইবনে সিনা গ্রীক, রোমক, ভারতীয় ও চৈনিক চিকিৎসা পদ্ধতির তথ্য সংগ্রহ করে القانون في الطب (চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূত্রাবলী) রচনা করেন। এছাড়াও তিনি 'ফি আহকামিল আদবিয়াতিল কালবিয়াত'সহ কয়েকটি চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁর 'কানূন' গ্রন্থটিই সবচেয়ে সুশৃঙ্খল ও গোছানো। ইবনে সিনার কানূন গ্রন্থটি পাঁচখণ্ডে বিভক্ত। ইবনে সিনা তাঁর কানূন গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে শারীরবিদ্যা (Physiology), রোগের কারণ ও লক্ষণাবলি এবং স্বাস্থ্যবিধি (Hygeine)-এর সাধারণ মূলনীতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।[৬২] দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি প্রাণী উদ্ভিদ ও খনি থেকে আহরিত নানারকম ঔষধের মিযাজ নির্ণয়, ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী, কার্যকারিতা, রোগের প্রকৃতি ও কঠোরতা অনুসারে ঔষুধের গুণগত এবং পরিমাণগত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৬৩] এ খণ্ডটি ৮০০টি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। এতে আরবী 'আবজাদ' (বর্ণনাক্রম) প্রণালী অনুসারে ৭৬০টি[৬৪] মতান্তরে ৭৮৫টি ঔষুধির বিবরণ রয়েছে।[৬৫] তৃতীয় খণ্ডে মাথা থেকে পা পর্যন্ত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল অঙ্গের রোগ এবং সেগুলোর উপসর্গ (Symptom), রোগ নির্ণয় (Diagnosis), পূর্বাভাস (Prognosis), চিকিৎসা (Treatment) এবং রোগের কারণ (Etiology) নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৬৬] এতে মাথার রোগ যেমন- মাথাধরা, মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক তাপ, মৃগী, অবশতা, চোখ, কান, নাক, গলা ও দাঁতের রোগ, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের রোগ, জননেন্দ্রিয় সংক্রান্তরোগ, গর্ভধারণ ও স্ত্রীরোগ ছাড়াও পেশী, সন্ধিস্থান সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।[৬৭] চতুর্থ খণ্ডে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন রোগের কথা আলোচনা করেছেন।[৬৮] এ খণ্ডটি ৪ ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নানা ধরনের জ্বরের সাধারণ বর্ণনা ও কারণ, কৌষ্ঠবদ্ধতা, ডায়রিয়া, ক্রোধ, ভয়, বেদনা, প্রদাহ পচন, মহামারী জ্বর, বসন্ত, বমি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে ফোঁড়া, ফোলা, কুষ্ঠ, ঘা, আলসার, হাড়ভাঙ্গা প্রভৃতির আলোচনা ও তাঁর চিকিৎসা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে খনিজ, উদ্ভিজ এবং জান্তব পদার্থ থেকে বিষক্রিয়া, মানুষ এবং জন্তুর কামড় থেকে বিষক্রিয়া ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ ভাগে সৌন্দর্য, প্রসাধনী, স্থূলতা, চুল, নখ এবং গাত্রচর্ম, বসন্তের চিহ্ন, ধবল প্রভৃতির চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৫ম খণ্ডে বিভিন্ন রোগের জন্য ঔষুধের ব্যবস্থাপত্র, বড়ি, পাউডার, সিরাপ ইত্যাদির তৈরী কৌশল নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে।[৬৯] এছাড়াও তিনি এ গ্রন্থে চিকিৎসকের দায়িত্ব-কর্তব্য, রোগ নির্ণয় পদ্ধতি, ডায়াবেটিক, চক্ষু চিকিৎসা, ক্যান্সার, হৃদরোগ, শারীরিতত্ত্ব, মানব ভ্রূণ, দন্ত চিকিৎসা ও ধাত্রিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করেন। একাদশ শতক হতে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত গ্রন্থটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেলে পাঠ্যসূচী ছিল।[৭০] চিকিৎসাশাস্ত্রে অনবদ্য অবদানের জন্য তিনি পশ্চিমে The Princess of Physicians নামে পরিচিতি লাভ করেন। আর কানূন গ্রন্থটি চিকিৎসা জগতে মেডিকেল বাইবেল (Medical Bible) হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। উইলিয়াম ওসলার বলেন, 'It has remained a Medical Bible for a longer period that any other work'.[৭১] চিকিৎসাশাস্ত্রে অভূতপূর্ব অবদানের জন্য তাঁকে 'মুসলিম গ্যালন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কলিন বলেন, 'Ibn Sina sometimes been called, the Galen of Islam because of his encyclopedic qanun of medicine'.[৭২]

আম্মার ইবন আলী

এগারো শতকের প্রখ্যাত আরব মুসলিম চক্ষুবিদ আম্মার ইবন আলী কিতাবুল মুনতাখাব ফি এলাজিল আইন গ্রন্থে চোখের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা ও চোখের অপারেশন সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা উপস্থাপন

করেছেন। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থ প্রণয়নের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। অতঃপর গ্রন্থে ছয় প্রকার ছানি, চোখের পাতার পীড়া, চোখের কোণের পীড়া, চোখের ঝিল্লি, কর্ণিয়া, এলবুমেন ও চোখের শিরার পীড়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও চোখের এনাটমি ও প্যাথলজিক্যাল আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। তিনি শোষণ করে চোখের নরম ছানি তুলে ফেলার এক নতুন প্রথা প্রবর্তন করেন। চোখের পশ্চাদবর্তী চেম্বারে কোন ছিদ্র ছাড়াই ফাঁপা সূচ স্কেলেরোটিকের মধ্যে ঢুকিয়ে শোষণ করে লেন্স তুলে নিতেন। তাঁর এ প্রবর্তন প্রাচ্যে সাদরে গৃহীত হয়।[৭৩] তিনি মূলত কর্মের জন্য মুসলিম জগতের সর্বপ্রথম মৌলিক চিকিৎসাবিদ হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। অধ্যাপক সারটন তাকে The most original of muslim occulist বলে অভিহিত করেন।[৭৪] তাঁর রচিত গ্রন্থ চক্ষু চিকিৎসাবিদ্যায় আকর হিসেবে বিবেচিত।

ইবন যুহর (১০৯১-১১৬১ খ্রি.)

স্পেনের শ্রেষ্ঠ মুসলিম চিকিৎসাবিদ ইবন-যুহর এর প্রকৃত নাম আবু মারওয়ান আব্দুল মালিক ইবন আবি আল আলি ইবন যুহর। পাশ্চাত্যে তিনি Abhomeron বা Avenzoar নামে সর্বাধিক খ্যাত। ইবন যুহর চিকিৎসা সংক্রান্তছয়টি গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন, যার মধ্যে ‘কিতাবুল ইকতিসাদ’, ‘কিতাবুল আগজিয়া’ ও ‘কিতাবুত তাইসির’ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।[৭৫] ইবন যুহর কিতাবুল ইকতিসাদ ফি ইসলাইন নফুস ওয়াল আসজাদ গ্রন্থটি ১১২১-১১২২ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। অতঃপর গ্রন্থটি আল মুরাবিত-এর বাদশা ইউসুফ বিন তাশফিনের পুত্র ইব্রাহিমের জন্য উৎসর্গ করেন।[৭৬] এ গ্রন্থে বিভিন্ন রোগ, থেরাপি ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এমনকি বড় নাক ও আঁকা বাঁকা দাতের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের জন্য প্লাস্টিক সার্জারীর পরামর্শ দিয়েছেন। আল ইকতিসাদ গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ। এতে ১৫টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। সম্ভবত গ্রন্থকার আরো ১৫টি পরিচ্ছেদ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। এ গ্রন্থে দেহ ও আত্মার সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা ছিল এবং গ্রন্থের প্রারম্ভে মনোবিজ্ঞানের একটা সংক্ষিপ্তসার ছিল।[৭৭] চিকিৎসা বিষয়ে ইবন যুহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা হলো কিতাবুত তাইসির ফিল মুদওয়াতেত তাদবির। তাঁর বন্ধু ও অনুরাগী ইবন রুশদের অনুরোধে রুশদের লেখা কুল্লিয়াত-এর আলোকে তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন।[৭৮] গ্রন্থটি ৩০টি অধ্যায়ে সমাপ্ত।এ গ্রন্থের প্রারম্ভে একটি ভূমিকা উপস্থাপনের পর চিকিৎসকদের কর্তব্য আলোচনা করেছেন। চিকিৎসকদের অনুমানের পথ পরিহার করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পথকেই গ্রহণ ও মূল্যায়ন করতে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি ঔষধ ও পথ্য তৈরীর পন্থা বর্ণনা করেছেন। তাইসির গ্রন্থে ক্যান্সার, টিউমার, অন্ত্রেরপীড়া, শ্বাস-নালীর পক্ষাঘাত, মধ্যকর্ণের স্ফীতি, খোস-পাঁচড়া, ফোঁড়া, চোখ, মূত্রাশয়ে পাথুরী প্রভৃতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ট্রাকিওটমি, অন্ননালী ও মলদ্বারে কৃত্রিম উপায়ে খাবার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। শ্বাসনালীর অস্ত্রপচার বিষয়ে সে সময় বিতর্ক ছিল। তিনি বিতর্কের অবসানের জন্য একটি ছাগলের উপর অস্ত্রপচার করেন এবং সফলতা পান। তাইসির গ্রন্থে ঔষধ ও পথ্য ছাড়াও প্যাথলজিক্যালি নিয়ম কানুনের বিস্তারিত আলোচনা এবং পরিশিষ্ঠে রোগের একটা প্রতিষেধক তালিকাও সংযুক্ত ছিল যাকে জামি বলা হতো।[৭৯] গ্রন্থটি ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

ইবন রুশদ (১১২৬-১১৯৮ খ্রি.)

পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইবন রুশদ এর নাম আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদ ইবন আহমদ ইবন রুশদ। এছাড়া ল্যাটিন ভাষায় তিনি অ্যাভোরোজ (Averroes) নামে প্রসিদ্ধ।[৮০] মধ্যযুগীয় ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষক ইবন রুশদ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে ২০টি গ্রন্থ রচনা করেন।[৮১] চিকিৎসা বিষয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হলো কিতাবুল কুল্লিয়াত ফিত্তিব। এই গ্রন্থটির রচনাবলী ১১৫৩ খ্রিস্টাব্দে আরম্ভ হয়ে ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়েছে। গ্রন্থটি ৭ (সাত) খণ্ডে বিভক্ত। এই খণ্ডসমূহে যথাক্রমে শরীরবিদ্যা, দেহতত্ত্ব, সাধারণ রোগবিদ্যা, রোগ নির্ণয়বিদ্যা, ব্যবহারিক ঔষধবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিধি ও আরোগ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[৮২] ইবন রুশদ মুসলিমদের উদ্ভাবিত ঔষধ প্রস্তুত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে ঔষধ সংগ্রহ করে তার প্রয়োগ সম্পর্কে পরীক্ষা করতঃ অনেক ঔষধ আবিষ্কার করেন।[৮৩] আল কুল্লিয়াত গ্রন্থে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একইভাবে নাড়ীর গতি, রোগের লক্ষণ, প্রসাব, জ্বর, প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থের কয়েকটি পরিচ্ছেদে পথ্য, ঔষধ, বিষ, গোসল, ব্যায়াম পেশীমালিশ ও রোগের চিকিৎসা প্রণালী আলোচিত হয়েছে। ইবন রুশদ কুল্লিয়াত গ্রন্থে সার্জারী তথা ফোঁড়া, রক্তরোধক পদার্থ দিয়ে রক্ত বন্ধ করা, ছ্যাঁকা দেয়া, বন্ধনী, হাড়ভাঙ্গা, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।[৮৪] চোখের রোগের আলোচনায় তিনি রেটিনার কাজ সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ মতামত দিয়েছেন।

আল বাগদাদী (১১৬২-১২৩১ খ্রি.)

আব্দুল লতিফ আল বাগদাদী একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, ঐতিহাসিক ও পর্যটক ছিলেন। তিনি মিসরের ইতিহাস ও প্রাকৃতিক বিষয়ে 'কিতাবুল ইফাদত ওয়াল ইতিবার' গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মিসরের ভয়াবহ প্লেগ রোগের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। আব্দুল লতিফ নিঃসন্দেহে একজন জ্ঞান অনুসন্ধানী ছিলেন। মিসরে অবস্থানকালে তিনি অনেকগুলো নরকঙ্কাল পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তিনি গ্যালেনের চোয়াল ও স্যাক্রামের হাড় গঠনের চিন্তাধারার সংশোধন করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, নীচের চোয়ালে মাত্র এক খানা হাড় রয়েছে। একইভাবে স্যাক্রামে সাধারণত ছয়খানা হাড় থাকেনা। তিনি এভাবে নানা পরীক্ষা করে মাত্র ২৮ বছর বয়সে এনাটমির একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[৮৫] তিনি মানবদেহের তত্ত্বীয় জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা মানব দেহে অনুসন্ধান ছাড়া পুঁতিগত বিদ্যা সঠিক তথ্য দিতে পারেনা। আব্দুল লফিত বাগদাদীর অন্য একটি রচনা হলো 'আল মুখতারাত ফাই আল তিব্ব'। এ গ্রন্থটি আল বাগদাদীর হিরোডোথেরাপির অন্যতম প্রাথমিক কাজ ছিল। তিনি শল্যবিদ্যায় রোগ নিরাময়ের জন্য জোঁকের ব্যবহার প্রবর্তন করেন।

ইবন আল বায়তার (১১৯৭-১২৪৮ খ্রি.)

স্পেনের প্রখ্যাত উদ্ভিদ ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ইবন আল বায়তার এর পূর্ণনাম আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন আহমদ জিয়াউদ্দীন ইবন আল বায়তার আল মালিকি আননাবাতী। পশ্চিমা বিশ্বে তিনি Ibn Beitharis নামে পরিচিত।[৮৬]মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ ফার্মাসিস্ট ও উদ্ভিদবিদ ইবন আল বায়তারের চিকিৎসা বিষয়ক সবচেয়ে বড় ও বহুল পঠিত গ্রন্থ হলো, 'কিতাবুল জামেয়ে মুফরাদাতিল আদবিয়াতে ওয়াল আগজিয়াত'। ইবন আল বায়তার বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত লব্ধজ্ঞানের ভিত্তিতে সমস্ত প্রকার ঔষধির বিস্তারিত বিবরণ এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রতিটি ঔষধির ক্ষেত্রে নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্যদের মতামত সুষ্ঠুভাবে বিশ্লেষণ করত: সুন্দর ও পরিপাটি করে সাজিয়ে গুছিয়ে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।[৮৭] তের শতকে এমন বৈজ্ঞানিক পরিবেশনা সত্যিই বিস্ময়কর। এ গ্রন্থে তিনি নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ১৪০০টি ঔষধী, প্রাণী, শাক-সবজি এবং খনিজ দ্রব্যের বর্ণনাক্রমিক তালিকা প্রদান করেছেন। তাঁর ১৪০০ ঔষধির মধ্যে ৩০০টি সম্পূর্ণ নতুন। এই ৩০০টির মধ্যে ২০০টি উদ্ভিদের বিবরণও রয়েছে। এছাড়া উক্ত গ্রন্থে তিনি প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী আল রাযী, ইবন সিনা, আল ইদ্রিসী, আল গাফিকীসহ ১৫০ জনের অধিক বিশেষজ্ঞের পর্যবেক্ষণের বিবরণ দিয়েছেন। এদের মধ্যে ২০ জন পূর্বতন গ্রীক বিজ্ঞানী ছিলেন।[৮৮] ইবন আল বায়তার তাঁর গ্রন্থে আরব জগতে ব্যবহৃত ঔষধের একটি তালিকা প্রদান করেছেন। আরবী ঔষধির নামের সঙ্গে গ্রীক, ল্যাটিন ও ফার্সী নামও ব্যবহার করেছেন। বস্তুত গ্রীক বিজ্ঞানী ডিসকোরাইডিসের পর থেকে ষোল শতক পর্যন্ত এরকম কোন গ্রন্থ পৃথিবীর অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি। তাঁর আরেকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো 'কিতাবুল মুগনী ফিল আদাবিয়াতিল মুফরাদাত।' এ গ্রন্থটি ২০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ১ম অধ্যায়ে মাথাধরা ঔষধের বিবরণ, ২য় অধ্যায়ে কানের রোগের ও তৃতীয় অধ্যায়ে চোখের রোগের ঔষধের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এভাবে একেকটি অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন রোগের ঔষধের আলোচনা করা হয়েছে। ১৭'শ অধ্যায়ে কসমেটিকস, ১৮'শ অধ্যায়ে জ্বরের ঔষধ, ১৯'শ অধ্যায়ে বিষের ঔষধ এবং ২০'শ অধ্যায়ে সাধারণ প্রচলিত ঔষধ সম্পর্কে আলোকপাত

করা হয়েছে।[৮৯] তিনি ব্যবহারিক ঔষধ বিজ্ঞানে (Materia medica) আল ইদ্রিসী ও আল গাফিকীর গ্রন্থ থেকে সাহায্যে নিয়ে গ্রন্থটিকে অধিক বিশুদ্ধ ও তথ্যবহুল করেছেন।

ইবনুন নাফিস (১২০৮-১২৮৮ খ্রি.)

মধ্যযুগের বিশ্বখ্যাত মুসলিম চিকিৎসাবিদ ইবনুন নাফিসমানবদেহে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি, ফুসফুসের সঠিক গঠন, শ্বাসনালী, হৃৎপিণ্ড, শরীরের শিরা-উপশিরার বায়ু ও রক্তের প্রবাহ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে চিকিৎসাবিদ্যার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি সম্ভবত ৬টি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের ভাষ্য ও দুটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করে চিকিৎসা জগতে অমর হয়ে আছেন। ইবনুন নাফিসের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বৃহৎ গ্রন্থ হলো 'কিতাবুল শামিল ফিল সিনায়াত তিব্বিয়া।' চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে গ্রন্থটি এক অনবদ্য সৃষ্টি। তিনি এ গ্রন্থটিকে ৩শ' খণ্ডের একটি বিশ্বকোষে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গ্রন্থকার মাত্র ৮০ খণ্ডের কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হন।[৯০] বর্তমানে নাফিসের নিজের হাতের লেখা সম্বলিত ৪টি খণ্ড কালিফোনিয়ার স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। এ গ্রন্থে এনাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথলজি ও খাদ্য গ্রহণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে।[৯১] ইবনুন নাফিসের আরেকটি রচনা হলো 'কিতাবু মুযিজুল কানুন'। এ গ্রন্থটি ইবন সিনার 'কানুন' গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। গ্রন্থাখানা ৪ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদ ও চিকিৎসা পদ্ধতি, দ্বিতীয় খণ্ডে মিশ্রিত ও অমিশ্রিত ঔষধ ও খাদ্যসামগ্রী, তৃতীয় খণ্ডে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের রোগ ও চতুর্থ খণ্ডে রোগের কারণ, লক্ষণ ও তার নিরাময় পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি চিকিৎসা জগতে এতটাই ফলদায়ক ছিল যে, ৮ বারের অধিক সময়ে এর ভাষ্য, প্রতিভাষ্য, এবং ল্যাটিন, হিব্রু ও তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি ইবন সিনার কানুন গ্রন্থের এনাটমি অংশের ভাষ্য 'শারহে তাসরিহে ইবন সিনা' শিরোনামে রচনা করেন। হৃৎপিণ্ডে ও ফুসফুসে রক্ত সঞ্চালনে ইবন সিনা ও গ্যালেনের মতবাদ পরিশুদ্ধ করে নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এ মতবাদই তাকে চিকিৎসা জগতে অমর করে রেখেছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী পালমনারি সঞ্চালন অর্থ হলো হৃদযন্ত্রের ডান প্রকোষ্ঠ থেকে শিরার মাধ্যমে ফুসফুসে রক্ত চলাচল করা এবং ফুসফুসে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্রহণের পর শিরার মধ্যদিয়ে হৃদযন্ত্রের বাম প্রকোষ্ঠ পুনরায় রক্ত ফিরে যাওয়া। হৃদযন্ত্রে রক্ত প্রবাহের এ আবিস্কার হচ্ছে ইবনুন নাফিসের অমর সৃষ্টি।[৯২] ইবনুন নাফিসের চক্ষু বিষয়ক রচনা হলো 'আল কিতাবুল মুহাজজিব ফিল কুহল'। এটি চক্ষুরোগ সম্পর্কিত বিশদ রচনা। চক্ষুরোগ সম্পর্কে আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব এ গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

খলিফা ইবন আবিল মহসিন

তের শতকের শ্রেষ্ঠ চক্ষু বিশেষজ্ঞ খলিফা ইবন আবিল মহসিন আল হালাবী আলেপ্পের অধিবাসী ছিলেন। তিনি চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও ব্যাখ্যাতা হিসেবে অমর হয়ে আছেন। চক্ষু বিষয়ক তাঁর মূল্যবান রচনা হলো 'কিতাবুল কাফি ফিল কুহল'।[৯৩] দুই খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে চোখের এনাটমি ও দ্বিতীয় খণ্ডে চোখের রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম খণ্ড আবার ছয়টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। এ সকল পরিচ্ছেদে চোখের সংজ্ঞা ও বর্ণ, চোখের ঝিল্লি, তরল পদার্থ, দৃষ্টি শক্তি, নার্ভ, চোখের পাতা ও ভুরুর পেশী নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। অপরদিকে দ্বিতীয় খণ্ডের ছয়টি পরিচ্ছেদে চোখের সাধারণ রোগ, চোখের স্বাস্থ্য, চোখে ঔষধ ব্যবহার পদ্ধতি, চক্ষু শলাকার ব্যবহার ও কাজল ব্যবহারের যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসকের পোশাক নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও চক্ষু রোগের সংক্ষিপ্ত তালিকা, চিকিৎসা এবং ৩৬০ ধরনের যন্ত্রপাতির ছবি অঙ্কিত রয়েছে।[৯৪] খলিফা ইবন আবিল মহসিন শল্যচিকিৎসায় নিজের দক্ষতা সম্পর্কে এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, এক চোখওয়ালা ব্যক্তির ছানি অপারেশন করতেও কোন দ্বিধা করেননি।[৯৫] মধ্যযুগে উল্লিখিত চিকিৎসাবিদ ছাড়াও চক্ষু চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবুল হাসান আহমদ বিন মোহাম্মদ আততাবারী, চিকিৎসা ও রসায়নবিদ আবু মনসুর মুওয়াফাক, আবু সাঈদ আল তামিমী, ইবনুল কিফতী, নাসিরউদ্দিন তুসী, যাদুল মুসাফিরের লেখক ইবন জাযার, শল্য চিকিৎসাবিদ আল কিরমানী, বাগদাদের

প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ইবন আত তাইয়েব, কিতাবু খালকিন এনসান গ্রন্থের লেখক সাঈদ ইবন হিব্বাতুল্লাহ, পারস্যের বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ ইসমাইল আল জুরজানী, কর্ডোভার উদ্ভিদবিদ আল গাফিকী, প্রখ্যাত মুফাসসির ফখরুদ্দীন আল রাযী, সমরখন্দের বিখ্যাত চিকিৎসক নাজির উদ্দীন আস-সমরকান্দি, কুতুর উদ্দীন শিরাজী, মোহাম্মাদ আল মাহদী, হাজী পাশা প্রমুখসহ অসংখ্য ইয়াহুদী ও খৃষ্টান চিকিৎসা বিজ্ঞানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

উপসংহার

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলিম অবদান আলোচনা করলে প্রতিভাত হয় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের পরেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটে এবং চিকিৎসা চর্চায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। ইসলামের অনুপ্রেরণায় চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চার পথ প্রশস্ত হয় এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও উমাইয়া শাসনামলে তা অব্যাহত থাকে। আব্বাসীয় যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়। বাগদাদ কেন্দ্রিক চিকিৎসা চর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে মুসলিম শাসনাধীন স্পেনে (৭১১-১৪৯২ খ্রি.) জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ন্যায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিকাশ অব্যাহত থাকে। একইভাবে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল বিশেষকরে উত্তর আফ্রিকা, মিসর ও সিরিয়া কেন্দ্রিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে। সমগ্র মুসলিম শাসিত অঞ্চলে অসংখ্য চিকিৎসাবিদ জন্ম নেয়। তাদের প্রচেষ্টা এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিকাশ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। ষোল শতকের প্রারম্ভে মুসলিম বিজ্ঞানের সংস্পর্শে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পথ সুগম হয়।

তথ্যনির্দেশ

১ AS Hornby, *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English* (England: Oxford University Press, 2001, A.D.), p. 796.

২ ইবন আল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, *আত-তিব্বুন নববী* (মিসর: দার আল গাদ আল জাদিদ, ২০১৩ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১০।

৩ ইবন আল মানযুর, *লিসানুল আরব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৩।

৪ আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যি লিল হাদারাতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া মাকানাতুহু ফী তারিখ আল ইলম ওয়াল হাদারাতি* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৮০।

৫ দাউদ ইবন উমর আল আনতাকী, *আন-নুযহাতুল মুবহিজা ফি তাশহিজিল আযহান ওয়া তা'দিলিল আমজিযা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪-৩৫।

৬ সূরাহ আল নাহল, আয়াত: ৬৯।

৭ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ আল-কাযভিনি, *সুনানু ইবন মাজাহ* (দারু এহইয়ায়িল কুতুবিল আরাবি, তা.বি), ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৪২।

৮ *আল-জামি' আল-মুসনাদ আস-সহিহ আল-মুখতাসার মিন উমুরি রাসুলিল্লাহি (সা.)ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়্যামিহি*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১২২।

৯ ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, *আল কুরআন ও হাদীসে বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা* (ঢাকা: উদয়ন প্রকাশন, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ২১৪।

১০ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার (সম্পা.), *স্বাস্থ্য শিক্ষা ও ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৪৩; মাওলানা ইউসুফ আলী খলিফা (সম্পা.), *ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র* (ঢাকা: ইমন প্রকাশনী, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৭৮।

১১ M. Zaki Kirmani, N.K. Singh (Edited) *Encyclopaedia of Islamic Science and Scientis* (New Delhi: Global Vision Publishing House, 2005 A.D.), vol. 3. p. 674.

১২ *Ibid*, vol. 3, p. 670.

১৩ A.M.A. Shushtery, *Outline of Islamic culture* (Lahor: 1966 A.D.), p. 126; Board of Researchers, *Muslim Contribution to Science and Technology* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2012 A.D.), p. 222.

১৪ Edward G. Browne, *Arabian Medicine* (London: Cambridge University Press, 1912 A.D.), p. 15; *Encyclopaedia of Islamic Science and Scientists*, vol. 3, p. 685.

১৫ Roshdi Rashed and Regis Morelon (ed), *Encyclopaedia of the History of Arabic Science*(NewYork: 1996 A.D), Vol. 3, p. 910.

১৬ *Arabian Medicine*, p. 23; Thomas Arnold & Alfred, *The Legacy of Islam* (London: Oxford University Press, 1931 A.D), p. 315.

[১৭] *The Legacy of Islam*, p. 316; Muzaffor Iqbal, *Science and Islam* (London: Greenwood Press, 2007, A.D.), p. 25; Seyyed Hossein Nasr, *Science and Civilization in Islam* (ABC International Group, Inc. 2001 A.D), p. 194-195.

[১৮] *The Legacy of Islam*, p. 322.

[১৯] P.K. Hitti, *History of the Arabs* (New York: Macmillan Press, 2001 A.D), p. 365; *The Legacy of Islam*, p. 322; *Arabian Medicine*, p. 33.

[২০] *The Legacy of Islam*, p. 337.

[২১] অধ্যাপক কে আলী, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস* (ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ২৪০.

[২২] ইবন জুলজুল, *তাবাকাতুল আতিব্বা ওয়াল হুকামা* (কায়রো: মাতবায়াতুল মাহাদিল ইলমী, ১৯৫৫ খ্রি.), পৃ. ৭৩।

[২৩] সাহাদত হোসেন খান, *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার* (ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ২৩০.

[২৪] এম আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান* (ঢাকা: মালিক লাইব্রেরী, ১৯৮১ খ্রি.), ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৬।

[২৫] *Muslim Contribution to Science and Technology*, p. 238.

[২৬] মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান* (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৬৫।

[২৭] *Muslim Contribution to Science and Technology*, p. 238-239.

[২৮] George Sarton, *Introduction to the history of Science*(Baltimore: Carnegie Institution of Washington, 1953 A.D.*)*, vol. 1, p. 574;*History of the Arabs*, p. 365;

[২৯] ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াত আল-আইয়ান*(বৈরূত: দারুইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯; *আল-ফিহরিস্ত*, পৃ. ৩৫৮।

[৩০] *Arabian Medicine*, p. 42; *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১২৭-১২৯।

[৩১] *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

[৩২] *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৫৯।

[৩৩] Dr. Cyril Elgood, *A Medical History of Persiaand the Eastern Caliphate* (London: Cambridge at the University Press, 1951 A.D), p. 124.

[৩৪] জহির উদ্দীন আল বায়হাকী, *তারিখ হুকামা আল ইসলাম*(দামেস্ক: মাতবাতুত তারাক্কী, ১৯৪৬ খ্রি.), পৃ. ২১; *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪-২৫৬।

[৩৫] ড. মুহাম্মদ সাউদ, *ইসলাম এবং বিজ্ঞানের বিবর্তন*, ড. সিরাজুল ইসলাম অনূদিত (কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৭৮।

[৩৬] ড. মোহাম্মদ সাদিক আফিফি, *তাতাওভুরুল ফিকরিল ইলমী ইনদাল মুসলিমীন* (কায়রো: মাকতাবাতুল খানজী, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৯২।

[৩৭] ইবন নাদিম, আল-ফিহরিস্ত (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৪৮০; *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩-১৫৫; *আরবের ইতিহাস*, পৃ. ২৭০।

[৩৮] *Muslim Contribution to Science and Technology*, p. 243.

[৩৯] ড. বাদাবি তাবানা ও অন্যান্য, *আল মুতলা'আ আল আরাবিয়্যাহ* (সৌদি আরব: ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৫৪-৫৫; *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৬৪।

[৪০] ইবন আবী উসাইবিয়া, ড. আমের আল নাজ্জার অনূদিত, *উয়ুনিল আনবা ফী তাবাকত আল আতিব্বা* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৬ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০; *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যি লিল হাদারাতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া মাকানাতুহু ফী তারিখ আল ইলম ওয়াল হাদারাতি*, পৃ. ১৬৯।

[৪১] *History of the Arabs*, p. 365.

[৪২] *Arabian Medicine*, p. 97; *Science and Civilization in Islam*, p. 214.

[৪৩] M.M. Sharif, *A History of Muslim Philosophy*(Pakistan: Pakistan Philosophical Congress, 1966 A.D), Vol. 2, p. 1342.

[৪৪] *The Legacy of Islam*, p. 330; *মুসলিম মনীষা*, পৃ. ৭৯-৮০।

[৪৫] *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২-৩৪৪।

[৪৬] সেলিম টি এম আল হাসসানী, *আলফু ইখতিরাইন ওয়া ইখতিরাউত তুরাসিল ইসলামী ফী আলামিনা* (ইউ. কে: ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স টেকনোলজি এ্যান্ড সিভিলাইজেশন, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১৬০-১৬২।

[৪৭] *আলফু ইখতিরাইন ওয়া ইখতিরাউত তুরাসিল ইসলামী ফী আলামিন*, পৃ. ১৯১।

[৪৮] *Encyclopaedia of Islamic Science and Scientists*, vol.4, p. 1139.

[৪৯] *The Legacy of Islam*, p. 329; *A History of Muslim Philosophy*, p. 1341.

[৫০] *Introduction to the history of Scienc,*Vol. 1, p. 677; *Arabian Medicine*, p. 55.

[৫১] *তাতাওভুরুল ফিকরিল ইলমী ইনদাল মুসলিমীন*, পৃ. ১৫০; ড. আলী ইবন আব্দুল্লাহ দাফ্‌ফা,*রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল উলূম*, পৃ. ১৮৪।

[৫২] Syed Ashraf Ali, *Men of Letters Men of Science* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2004. A.D), p. 133.

[৫৩] জিলহজ আলী, *সেরা মুসলিম বিজ্ঞানী* (ঢাকা: সুহৃদ প্রকাশন, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৬৩।

[৫৪] *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যি লিল হাদারাতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া মাকানাতুহু ফী তারিখ আল ইলম ওয়াল হাদারাতি*, পৃ. ৮১-৮৩; আহমাদ ফুয়াদ পাশা,*আল-উলূম ওয়াল হান্দাসা ফিল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা* (কুয়েত: ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১০২-১০৭।

[৫৫] শারিল হালু, *মাওসূ'আতু আ'লামিল ফালসাফাহ* (বৈরূত: দারূল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯২ খ্রি.), ১ম খণ্ড,পৃ. ২৯৯।

[৫৬] *বিশ্বসেরা মুসলিম বিজ্ঞানী*, পৃ.৫৬; *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১১৫।

[৫৭] *Men of Letters Men of Science*, p. 35.

[৫৮] *Muslim Contribution to Science and Technology*, p. 264-265.

[৫৯] *Encyclopaedia of Islamic Science and Scientists*, vol.1, p. 159.

[৬০] ইবনে সিনা, *আল-কানূন ফিত তিব্ব*, (বৈরূত: দারূল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯ খ্রি.), ১ম খণ্ড,পৃ. ৫; বুতরুস আল-বুসতানী, *দা'য়িরাতুল মা'আরিফ* (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, তা.বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৫।

[৬১] George Sarton, *Introduction to the History of Science* (USA: Baltimore, 1927 A.D.), Vol. 1. p. 709.

[৬২] M. Ullmann, *Islamic Survey II, Islamic Medicine* (New york: Edinburgh University press, 1978 A.D.), p. 46; *Muslim Contribution to Science and Technology,* p. 268.

[৬৩] *আল-কানূন ফিত তিব্ব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০।

[৬৪] তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১-৩৭২।

[৬৫] *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪১১; আবু কায়সার, *ইবনে সিনা* (ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ২৪।

[৬৬] *আল-কানূন ফিত তিব্ব*, ১ম খণ্ড, পৃ.১০; *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪১১।

[৬৭] *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, পৃ. ৭০।

[৬৮] *আল-কানূন ফিত তিব্ব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০।

[৬৯] *তাতাওভুরুল ফিকরিল ইলমী ইনদাল মুসলিমীন*, পৃ. ১৯৯।

[৭০] R.M. Savory (Edited), *Introduction to Islamic Civilization* (Cambridge University press, 1977 A.D.). p. 116.

[৭১] William Osler, *The Evolution of Modern Medicine* (New Haven, 1922 A.D.), p. 98.

[৭২] Colin A. Ronan, *The Cambridge illustrated History of the worlds Science* (USA: Cambridge University press, 1984 A.D.), p. 236.

[৭৩] *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৭২-৩৭৩।

[৭৪] *Introduction to the history of science*, vol. 1, p. 729.

[৭৫] *তাতাওভুরুল ফিকরিল ইলমী ইনদাল মুসলিমীন*, পৃ. ২০১-২০২।

[৭৬] *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৮২; *ইসলাম এবং বিজ্ঞানের বিবর্তন*, পৃ. ৯০।

[৭৭] *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৩; *ইসলাম এবং বিজ্ঞানের বিবর্তন*, পৃ. ৯০।

[৭৮] *তাতাওভুরুল ফিকরিল ইলমী ইনদাল মুসলিমীন*, পৃ. ২০১।

[৭৯] *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৮০; *ইসলাম এবং বিজ্ঞানের বিবর্তন*, পৃ. ৯১।

[৮০] *তাতাওভুরুল ফিকরিল ইলমী ইনদাল মুসলিমীন*, পৃ. ২০২।

[৮১] Dr. W. Hazmy, *et. al*, *Biography Muslim Scholars and Scientists* (Malayasia: Islamic Medical Asociation, n.d), p. 107;

[৮২] *তাতাওভুরুল ফিকরিল ইলমী ইনদাল মুসলিমীন*, পৃ. ২০৪-২০৫।

[৮৩] *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, পৃ. ২৩৯।

[৮৪] *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৩০-৫৩১।

[৮৫] *The Legacy of Islam*, p. 338; *Encyclopaedia of the History of Arabic Science*, Vol. 3, p. 951.

[৮৬] *Muslim Contribution to Science and Technology*, p. 288.

[৮৭] *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬১৯।

[৮৮] *The Legacy of Islam*, p. 339; *History of the Arabs*, p. 576; *Muslim Contribution toScience and Technology*, p. 288.

[৮৯] *Introduction to the history of Science*, part. II, Vol. 2, p. 663-664.

[৯০] *তাতাওভুরুল ফিকরিল ইলমী ইনদাল মুসলিমীন*, পৃ. ২০৭।

[৯১] *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৫৯; *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১৫৫।

[৯২] *আলফু ইখতিরাইন ওয়া ইখতিরাউত তুরাসিল ইসলামী ফী আলামিনা*, পৃ. ১৬৯।

[৯৩] *History of the Arabs*, p. 686.

[৯৪] *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৮-৬৬৯;*বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, পৃ. ৮২।

[৯৫] *History of the Arabs*, p. 686.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

আল-কুরআনে বর্ণিত মহানবীর (সা.) প্রতি জিজ্ঞাসা : একটি পর্যালোচনা
(Questions to the Holy Prophet as Narrated in the Qur'an : A Review)

হাবিবুল্লাহ*

Abstract: Questions are the way to uncover knowledge. Usually the Question is to find out something or to embarrass someone or to get the attention of the answerer. Prophet Muhammad (s.m) was the teacher of the world humanity. And his teacher was Almighty Allah. When the Holy Prophet began to preach Islam, the new Muslims used to ask him many questions. On the other hand, some unbelievers used to question the Holy Prophet to embarrass him. The Holy Prophet would answer their questions directly, and sometimes Allah would answer their questions on behalf of the Prophet. Al Qur'an mentions 17 to 20 such questions. An attempt has been made to discuss those issues in this article.

ভূমিকা

‘জিজ্ঞাসা’ জ্ঞান আহরণের অন্যতম উৎস। জিজ্ঞাসাকে বলা হয় জ্ঞান আহরণের প্রথম সোপান। যুগে যুগে অজানা বিষয়ের উন্মোচন হয়েছে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে। ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি জ্ঞান আহরণের উপরে স্থাপিত। মানবতার মহান শিক্ষক ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন, আর মানুষের মাঝে এগুলো বিতরণ করতেন। সাহাবায়ে কেরাম তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে করে তাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করতেন। অবশ্য এক্ষেত্রে মহানবীর (সা.) নবুয়তের দাবির পরবর্তী পর্যায়ে কাফেরদের পক্ষ থেকে উপর্যপুরি বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন। এ সকল প্রশ্নের অবতারণা হয়েছে মহানবীর নবুওয়াতের দাবিকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য। মহানবী কখনো সে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন, কখনো বা নীরব থেকেছেন। হাদিসের কিতাবসমূহে এ ধরনের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে দেখা যায় মহানবীকে। তবে আল কুরআনে এ সকল প্রশ্নের খুব বেশি অবতারণা করা হয়নি। গবেষণায় দেখা গেছে এধরনের ১৭ থেকে ২০টি প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে। যে সকল প্রশ্নের উত্থাপনকারী ছিল সাহাবায়ে কেরাম ও মুষ্টিময় কিছু কাফের সম্প্রদায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সকল প্রশ্নের উত্তর নিজের পক্ষ থেকে দান করেছেন। তিনি একদিকে কাফেরদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে তাদের নাস্তিকতার শিকড়ের মূলোৎপাটন করেছেন, অন্যদিকে সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের গতিকে নির্দেশ করেছেন উত্তর প্রদানের মাধ্যমে। মানবতার কল্যাণ নিহিত বিষয়গুলোই উত্তর হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদব সন্নিবেশিত হওয়ার পাশাপাশি পরবর্তীতে আল্লাহ তা‘আলা কিভাবে উত্তর প্রদান করে ঐ সকল প্রশ্নের অবসান ঘটিয়েছেন তার হিকমত আলোচিত হয়েছে অত্র নিবন্ধে।

জিজ্ঞাসার সংজ্ঞা : জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন শব্দের আরবী প্রতিশব্দ السؤال। পবিত্র কুরআনে শব্দটি একাধিক সীগাহ বা শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো বাবে فتح يفتح এর মাসদার হিসেবে যেমন, قال قد اوتيت سؤلك يامو سى। কখনো বাবে تفاعل এর ক্রিয়া হিসেবে যেমন, عم يتسائلون। এখানে শব্দের তারতম্যের ভিত্তিতে অর্থেরও তারতম্য বিদ্যমান। এছাড়া অভিধানসমূহে ‘প্রশ্ন’ শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আক্ষরিক অর্থে জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান, চাওয়া, প্রার্থনা ইত্যাদি। সাধারণ অর্থে তথ্য অনুসন্ধানে কাউকে জিজ্ঞাসা করা। ব্যবহারিক অর্থে লিখিত বা মৌখিক বা ইঙ্গিতসূচক বাক্যে কোনো অজানা বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাকে প্রশ্ন বলে।

---

* পিএইচ. ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামী পরিভাষায় : কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিষয় সংশ্লিষ্ট ও বিষয় সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট অনুরোধ করা। সাধারণত প্রশ্ন ব্যবহার হয়- জ্ঞান আহরণে, তথ্য অনুসন্ধানে, অভিযোগ উত্থাপনে, কাউকে পরীক্ষা করতে ও দায়িত্ব সনাক্তকরণে। আব্দুর রউফ আল মানাভী (রহ.) বলেন,

السوال : هو طلب الأدنى من الأعلى. وهو أسلوب يستخدم للحصول على المعلومات، أو البيانات، أو المعرفة

'প্রশ্ন হচ্ছে সর্বোচ্চস্তর থেকে সর্বনিম্নস্তরে কোন কিছু জানতে চাওয়া। এটি তথ্য উপাত্ত বা জ্ঞানার্জনের জন্য ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি।'[১]

উইলকিনসন এবং ব্যান্ডারকার এর মতে, A sentence in an intrrogative form, addressed to someone in order to get information in reply. 'একটি প্রশ্নবোধক বাক্য, যার উত্তরে তথ্য পাওয়ার জন্য কাউকে সম্ভোধন করা হয়।'[২]

ইসলামে প্রশ্ন করার গুরুত্ব : ইসলামে জ্ঞান অন্বেষণ করা আবশ্যক। আর এ জ্ঞানলাভের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে জিজ্ঞাসা। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون 'তোমরা যদি না জানো তাহলে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস কর।'[৩]

সুন্দর প্রশ্ন জ্ঞানের অর্ধেক : একটি ভালোমানের প্রশ্নের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অর্ধেক জ্ঞান নিহিত থাকে। ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,ان حسن السوال نصف العلم 'নিশ্চয় ভালোমানের প্রশ্ন জ্ঞানের অর্ধেক।[৪]' ইবনে মুনির রহ. একটি মানসম্পন্ন প্রশ্নকে 'জ্ঞান' ও 'শিক্ষা' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

'জিজ্ঞাসা' জ্ঞান-বিজ্ঞানের চাবি :আহলে ইল্‌ম' দের মতে, ان العلم خزائن ومفاتيحها السوال 'জ্ঞান হলো একটি ভাণ্ডার আর সেই ভাণ্ডারের চাবি হলো 'জিজ্ঞাসা'।[৫] ইবনে আবি মুলাইকা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়শা (রা.) কোনো বিষয় শোনার পর যদি তা না বুঝতেন, তাহলে তিনি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করতেন।

ইলম অর্জনের পূর্বশর্ত :ইমানের পর আমলের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। বিশুদ্ধ আমলের পূর্বশর্ত হলো বিশুদ্ধ ইলম যা অর্জিত হয় জিজ্ঞাসার মাধ্যমে।

উত্থান-পতনের কারণ :জিজ্ঞাসা মানব চরিত্রের প্রকাশক। এম মাধ্যমে কারোর ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় আবার কারোর বিনয়। আল্লাহর বাণী, قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين 'তোমাদের পূর্বে এমন জাতিও ছিল যারা অনাকাঙ্খিত জিজ্ঞাসার কারণে কাফের হয়ে গেছে।'[৬]

জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য : মহান আল্লাহ তা'আলা একাধিক কারণে ফেরেস্তা ও মানবজাতীর সামনে প্রশ্ন রেখেছেন। যেমন,

ক. অজানা বিষয় জানা : জিজ্ঞাসরা মাধ্যমে অজ্ঞতা দূর হয়। আল্লাহর বাণী, তোমরা যদি না জানো তাহলে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস কর।'[৭]

খ.পরীক্ষা করা : সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ তা'আলা রূহ জগতে মানবজাতির পরীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি সমস্ত রূহকে এ মর্মে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ؟ الست بربكم আমি কী তোমাদের প্রভু নই ? সকল রূহ সমস্বরে উত্তর দিয়েছিলো, হ্যাঁ, আপনিই আমাদের প্রভু।[৮]

গ. মনোভাব বোঝা : আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তার খলিফা হিসেবে মানুষ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এক্ষেত্রে ফেরেস্তাদের মনোভাব যাচাইয়ের জন্য তিনি তাদের সামনে প্রশ্ন রাখলেন, 'আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা নিযুক্ত করতে চাই। তখন ফেরেস্তারা আল্লাহর কাছে প্রশ্ন রেখে বললো, কী দরকার আছে মানব সৃষ্টি করার ? اتجعل فيها من يسفك الدماء 'আপনি তাদেকে সৃষ্টি করবেন ? যারা রক্তপাত ঘটাবে। আমরাইতো আপনার তাসবীহ পাঠ করি।[৯]

ঘ. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ : প্রশ্নের মাধ্যমে কখনো শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। যেমন, وما ادرك ما ليلة القدر 'তুমি কী জান মহিমান্বত রজনী কী ?[১০] মহিমান্বিত রাত হলো, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

ঙ. ভীতি সঞ্চালন : জাহান্নামের লেলিহান আগুণের উত্তপ্ত শিখার প্রতি ভীতি সঞ্চালনার জন্য তিনি মানবজাতীর সামনে প্রশ্ন রেখেছেন। যেমন, وما ادرك ما الحطمة ؟ 'আপনি কী জানেন হুতামাহ কী যা প্রজ্জলিত উত্তপ্ত লেলিহান আগুন।[১১]

চ. বিভ্রান্তির সৃষ্টি : জনসমাবেশে বিব্রতকর প্রশ্ন তুলে ব্রিভ্রান্তির পরিবেশ সৃষ্টি।

প্রশ্ন করার ইসলামী আদব : 'জিজ্ঞাসা' জ্ঞানলাভের মাধ্যম। তবে সব ধরনের জিজ্ঞাসাকে ইসলাম সমর্থন করে না। কেবল উপকারীপ্রশ্ন তৈরীকেই ইসলামে বৈধতা দান করা হয়েছে। কোন ধরনের জিজ্ঞসা উপকারী ও মানবকল্যান নির্ভর আর কোন ধরনের জিজ্ঞাসা অনর্থক ও ক্ষতিকর তার নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে। নিম্নে সাহাবীদের প্রশ্ন করার কিছু নমূনা উপস্থাপিত হলো,

১. জান্নাত প্রাপ্তির আমল সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা : হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন এক আমলের তথ্য দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে। রাসূল (সা.) বললেন, তুমি অনেক বড় মাপের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছো। এটি তার জন্যই সহজ হবে যার জন্য তিনি সহজ করতে চান। সুতরাং তুমি আল্লাহর ইবাদত কর, তার সাথে কোনো অংশীদার সাব্যস্ত করো না, নামায পড়ো, যাকাত দাও, হজ করো ও রমযানের রোজা রাখো।[১২]

২. সর্বোত্তম আমল সংক্রান্ত বিষয়ের জিজ্ঞাসা : যেমন হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সর্বোত্তম আমল কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ইমান আনা। প্রশ্ন করা হলো-তারপর কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো-এরপর কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন, হজে মাবরুর তথা মকবুল হজ।[১৩]

৩. সর্বোত্তম মানুষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা : হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) কে বলা হলো, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম ? তিনি বললেন, যে মুমিন নিজের জান ও মালের মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে।[১৪]

৪. কবিরাহ গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন গুনাহ সবচেয়ে বড় ? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা।[১৫]

জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বর্জণীয় বিষয় ঃ মানসম্মত প্রশ্ন করার পূর্বে যেসমস্ত বিষয় ও দিক প্রশ্নকারীকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। তাহলো,

১. উদ্ভট ধরনের প্রশ্ন এড়িয়ে চলা : এমন প্রশ্ন না করা যার উত্তর শুনলে নিজেকেই লজ্জিত হতে হয়। এমন অনর্থক প্রশ্ন করতে মহান আল্লাহ তা'আলাও নিষেধ করেছেন। তিনি এরশাদ করেন, يا ايها الذين امنوا لا تسئلوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم'হে মুমিনগণ! এমন প্রশ্ন করো না যার উত্তর শুনলে তোমাদের মন খারাপ হয়ে যাবে।'[১৬]

২. আহলে কিতাবদের নীতি বর্জন করা :আল্লাহর বাণী, 'তোমরা কী তোমাদের রাসূল কে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও, যেরূপ নবী মুসা (আ.) কে করা হয়েছিল। যে প্রশ্ন বিশ্বাসের পরিবর্তে কুফুরির আশংকা তৈরী করে নিশ্চিতভাবে তা সঠিক পথ হারায়।[১৭]

৩. উস্কানীমূলক প্রশ্ন এড়িয়ে চলা : যে প্রশ্ন মানুষের মাঝে উত্তেজনা বৃদ্ধি করে বিশৃঙ্খলার রূপ দেয় এমন ধরনের উস্কানীমূলক প্রশ্ন পরিতাজ্য।

৪. মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্ন বর্জন করা : মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্ন বিরক্তির কারণ হয়। অনেক সময় এটিই তার ধ্বংস ডেকে আনে। পূর্বের বহুজাতী অতিরিক্ত প্রশ্নবন্যার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.)

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ অধিক প্রশ্ন এবং নবীদের ব্যাপারে মতভেদের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।[১৮]

৫. যে জিজ্ঞাসায় কোনো কল্যাণ নিহিত নেই তা পরিতাজ্য। রাসূল (সা.) বলেন, 'এটাও ইসলামের সৌন্দর্য যে, অযথা ও অনর্থক আচারণ ছেড়ে দেয়া।[১৯]

৬. প্রশ্নের ভাষায় অশ্লীলতা পরিহার করা। রাসূল (স.) বলেছেন, অশ্লীল ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। [২০]

আল-কুরআনে বর্ণিত রাসূল (সা.) এর নিকট জিজ্ঞাসা :

মক্কা ও মদীনার বিভিন্ন পেশাজীবীর মানুষের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.) বিভিন্ন ইস্যুতে অসংখ্যবার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। এসব প্রশ্নের সঠিক পরিসংখ্যান কত ? সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় বলা দুরূহ ব্যাপার। কারণ এসব প্রশ্নের অধিকাংশই বর্ণিত হয়েছে হাদীসে আর কিছু আল-কুরআনে। তবে আল-কুরআনে বর্ণিত মহানবীর প্রতি জিজ্ঞাসার সংখ্যা বর্ণনায় মুফতি শফী কাসেমী (রহ.) বলেন, এর সংখ্যা সতেরোটি।[২১] আবু তাহের মুহাম্মদ ফিরোজাবাদী এর গবেষণা মতে, এর সংখ্যা বিশটি।[২২]তন্মধ্যে ছয়টি প্রশ্ন এসেছে কাফেরদের পক্ষ থেকে আর অবশিষ্টগুলো সাহাবীদের পক্ষ থেকে। এসব প্রশ্ন পর্যালোচনা করলে মৌলিকভাবে চারটি বিষয় ফুটে ওঠে। নিম্নে চারটি বিষয়ের সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলী ও তার পেক্ষাপট উপস্থাপিত হলো-

(ক) আকাইদ সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা : আল-কুরআনে আকাইদ এর সাথে সম্পৃক্ত তিনটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

১. আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা : মহান আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব কেমন ? তিনি কি বান্দার অনেক কাছে নাকি দূরে ? এমন কৌতূহলী প্রশ্নের উদয় হয়েছিলো সাহাবীদের মনে। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে তাদের প্রশ্ন উল্লেখপূর্বক চমৎকার ভঙ্গিতে উত্তর প্রদান করেছেন। তিনি এরশাদ করেন, واذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان 'যখন আমার বান্দা আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে চায় তখন আপনি বলুন, আমি তাদের অতি নিকটে অবস্থান করি।'[২৩] আয়াতটির প্রেক্ষপট বর্ণনায় ইবনে আবি হাতিম (রহ.) হযরত সলত্ বিন হাকীম এর সূত্রে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো। হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কি আমাদের নিকটে অবস্থান করেন, নাকি দূরে? যাতে আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পারি। রাসূল (সা.) তাদের প্রশ্ন শুনে চুপ থাকলেন এবং ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। কিছুক্ষণ পর আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

২. রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা : পবিত্র কুরআনে রূহ সম্পর্কে একটি জিজ্ঞাসা বর্ণিত হয়েছে। এটি ছিল ইয়াহুদীদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন, يسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربى 'তারা তোমাকে জিজ্ঞাসার করবে রূহ সম্পর্কে, তুমি বলে দাও রূহ[২৪] হলো, আমার প্রভুর নির্দেশ মাত্র।'[২৫] হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াহুদীদের পরামর্শের ভিত্তিতে কুরাইশগণ মহানবী (সা.) কে তিনটি প্রশ্ন করেছিল। ঐ প্রশ্নের মধ্যে একটি ছিল রূহ সম্পর্কে।[২৬]আল্লামা ইবনে কাছির (রহ.) এর মতে, উক্ত আয়াতে রূহ দ্বারা উদ্দেশ্য, নফছ।[২৭]

৩. কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা : কিয়ামত সম্পর্কে তিন ধরনের জিজ্ঞাসা বর্ণিত হয়েছে।[২৮] তাদের জিজ্ঞস ছিল, يسئلك الناس عن الساعة 'মানুষ আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে।' ইমাম আবু জা'ফর (রহ.) বলেন, কোনো এক ক্বওম এর কিয়ামত সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ন হয়। উক্ত আয়াতে الساعة শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত এখানে দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এক. কিয়ামতের সময় সংক্রান্ত বিষয়। দুই. কিয়ামত সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর ধারণার অথবা কিয়ামতের ভয়াবহতা প্রদর্শন।

(খ) শরীয়তের বিধান সম্পর্কিত বিষয়ে জিজ্ঞাসা ঃ শরীয়তের বিধান সম্পর্কিত সাত প্রকার মাসআলাহ রাসূল (সা.) এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

১. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কীত : আনফাল শব্দটি নফল শব্দের বহুবচন। পবিত্র আল-কুরআনে আনফালকে গণিমতের সম্পদ বলা হয়েছে। আল্লাহর বাণী,يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول ‘আপনাকে তারা আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বলুন, এ সম্পদ আল্লাহ ও রাসূলের।’[২৯] আয়াতটি অবতীর্ন হয়, ঐ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে যারা গণিমতের বিধান সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল এবং তারা তাতে অংশ দাবি করেছিল। অতঃপর আল্লাহ বলে দিলেন যে, গণিমতের মাল কেবল আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর জন্য উৎসর্গকৃত।[৩০]

২. নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা প্রসঙ্গে : আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করার বিধান সম্পর্কে। আল্লাহর বাণী, يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله ‘তারা আপনার কাছে জানতে চাইবে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা প্রসঙ্গে। আপনি বলুন! নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা অন্যায়। আল্লাহর নিকট এর চেয়ে আরো বড় অন্যায় হলো, মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় বাধাগ্রস্থ করা, কুফরী করা, মসজিদে হারাম থেকে তার অধিবাসীদের বের করে দেয়া।’[৩১] উক্ত আয়াতের প্রশ্নকারী ব্যক্তি হলেন, একজন সাহাবী।

৩. মদ ও জুয়া প্রসঙ্গে : মদ ও জুয়ার বিধান সম্পর্কে তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে। তখন আপনি বলুন! উভয়ের মধ্যে মানুষের জন্য কিছু লাভ রয়েছে বটে কিন্তু ক্ষতির দিকটিও বিদ্যমান। তবে লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণটা বেশি।[৩২] মূলত মদ জুয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান বর্ণিত না থাকায় মুমিনগণের মনে বারংবার প্রশ্ন উকি দিয়েছে যে, তারা কী করবে ? এ পরিপ্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।[৩৩]

৪. অতিরিক্ত খরচ প্রসঙ্গে : পবিত্র কুরআনে انفاق শব্দটি প্রশ্নবাক্যের মাধ্যমে দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে। ১মবার,... يسئلونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والقربين واليتامى ‘আাপনাকে তারা জিজ্ঞেস করবে, তারা কী দান করবে ? বলুন, উত্তম দান হলো, পিতা-মাতা, আত্নীয়স্বজন, ইয়াতিম ইত্যাদির মাঝে বন্টন করা। ২য়বার,ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو ‘তারা জিজ্ঞেস করবে, কী দান করবে, বলুন, অতিরিক্ত।[৩৪] প্রথম আয়াতে তারা জানতে চেয়েছে, দানের অস্তিত্ব, পরিচয় ও দানের খাতসমূহ ইত্যাদি। আল্লাহ তা‘আলা চমৎকার ভঙ্গিমায় তার উত্তর দিয়েছেন । আর দ্বিতীয় আয়াতে নফল দান কে করবে, কি পরিমাণ করবে এবং তা কারা পাবে ? এমন সংশয় থেকে মুসলিমগণ রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। ‘তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, অতিরিক্ত দান কাদেরকে দিবে এবং কী পরিমাণ দিবে। আপনি বলুন! তোমরা যা-ই দান করো তা যেন পায় তোমার পিতা-মাতা ও আত্নীয়স্বজন।[৩৫] অন্য আয়াতে বর্ণিত, يسئلومك ماذا ينفقون قل العفو ‘আপনাকে তারা জিজ্ঞেস করবে সে কী পরিমাণ দান করবে।’[৩৬]

৫. ইয়াতিমদের অধিকার সম্পর্কে : যখন ইয়াতিমগণ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত তখন তারা তাদের অধিকার ফিরে পেতে আপনার কাছে জিজ্ঞেস করবে। আল্লাহর বাণী, يسئلونك عن اليتامى قل المفسد من المصلح اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم‘তখন আপনি তাদেরকে বলুন! তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক তবে তারাতো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ জানেন তোমাদের মধ্যে কে হিতকারী আর কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। বস্তুত আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।[৩৭]

৬. মাসিককালীন স্ত্রী মিলন প্রসঙ্গে : ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা হালাল না হারাম। এ বিষয়টি সম্পর্কে ঐশী নির্দেশনা জানা যখন আবশ্যিক হয়ে পড়লো তখন সাহাবীরা রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। হে নবী ! আপনি বলুন, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা মাসিক চলাকালীন স্ত্রী সঙ্গম করবে না এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে মেলামেশা বন্ধ রাখবে। যখন তারা পবিত্রতা অর্জন করবে তখন তোমরা তাদের কাছে গমন করো যেমনভাবে আল্লাহ তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন।[৩৮]

৭. হালাল-হারাম প্রসঙ্গে : খাবারের মধ্যে কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম তা সুনির্দিষ্ট হওয়া যখন আবশ্যিক হয়ে পড়লো তখন মুসলিমগণ রাসূল (সা.) এর কাছে প্রশ্ন করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নবী (সা.) কে উত্তর দিতে নির্দেশ করে বলেন, يسئلونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات 'তারা আপনাকে খাবারের হালালের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আপনি বলে দিন যে, তোমাদের জন্য তিনি হালাল প্রাণী ও বস্তুকে হালাল করেছেন।[৩৯]

(গ) বিভিন্ন ঘটনা বিষয়ক জিজ্ঞাসা : পবিত্র কুরআনে বর্ণিত চারটি ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা রাসূল (সা.) কর্তৃক বিবৃত হয়েছে।

১. যুলকার নাইন বাদশাহ এর খবর : বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন নবুওয়াতের দাবিদার তখন খ্রিষ্টানগণ ইয়াহুদিদের শিখানুযায়ী তাকে পরীক্ষা করার জন্য চারটি প্রশ্ন করেছিল, তারমধ্যে একটি হলো, যুলকারনাইন বাদশাহ সম্পর্কে কী জান ? বিস্তারিত বল। মহান আল্লাহ তাদের প্রশ্নোত্তরে নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। ويسئلونك عن ذى القرنينقل سأتلو عليكم منه ذكرا 'তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যুলকারনাইন বাদশাহ সম্পর্কে। আপনি বলুন, অতিসত্ত্বর আমি তার সম্পর্কে তোমাদের জানাবো।[৪০]

২. কিয়ামতের দিন পাহাড়ের অবস্থা : যখন কিয়ামত সংগঠিত হবে তখন পাহাড়ের অবস্থা কেমন হবে ? এ বিষয় জানতে তারা আপনাকে প্রশ্ন করবে। ويسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا'এবং তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। আপনি বলুন, আমার প্রভু তা সমূলে মুলোৎপাটন করবে।[৪১] উক্ত আয়াতে তাদের প্রশ্নোত্তরে আল্লাহ তা'আলাفقل শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে কেবল قلশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, উক্ত আয়াতটিতে শর্তের অর্থ বিদ্যমান। যদি তারা প্রশ্ন করে তাহলে আপনি তাদের উত্তর দিবেন। আর মহান আল্লাহ জানেন যে, তারা অবশ্যই প্রশ্ন করবে।[৪২]

৩. নতুন চাঁদ সম্পর্কে : নতুন চাঁদকে আল কুরআনে 'আহিল্লাহ' এবং হাদীসে 'হেলাল' বলা হয়েছে। প্রাক-ইসলাম যুগে মানুষ চাঁদ দেখে সময়ের গণনা করতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর মানুষ কীভাবে সময়ের হিসেব করবে ? এমন জটিলতার কারণেই তৎকালীন মুসলিমগণ রাসূল (সা.) এর কাছে নতুন চাঁদ ভিত্তিক সময় গণনার বিধান জানতে চাইলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ন করেন। يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج' তারা আপনার কাছে জানতে চাইবে আহিল্লাহ সম্পর্কে, আপনি তাদের বলে দিন ইহা মানুষ ও হজের জন্য সময় নির্দেশক।'[৪৩] হযরত আবুল আলিয়্যাহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কাছে এই সংবাদ পৌছায় যে, সাহাবীরা রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আহিল্লাহ কী ? তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। তিনি বলেন, আল্লাহ চাঁদকে রোজা, ইফতার, মহিলাদের ইদ্দত, দ্বীনের বিধান ও হজের সময় কে 'আহিল্লাহর' উপর সোপর্দ করেছেন। অতএব তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং ভেঙ্গে ফেলো। যদি চাঁদ কখনো মেঘাচ্ছন্ন হয় তাহলে ত্রিশদিন পূর্ণ করো।[৪৪]

৪. কাফিরদের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা : কাফিরদের সামনে যখন রাসূল (সা.) জাহান্নামের শাস্তির ধরন বর্ণনা করতেন তখন তারা ঠাট্টা করে বলতো, কে শাস্তি পাঠাবে ? এবং কাদের উপর শাস্তি পাঠানো হবে ? তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ন করেন। سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع'এক ব্যক্তি জানতে চাইল সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত। কাফিরদের জন্য এটি প্রতিরোধ করার কেউ নেই।'[৪৫]

(ঘ) আবেদন বিষয়ক জিজ্ঞাসা : তাওরাতের অনুসারীগণ রাসূল (সা.) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এই মর্মে আবেদন করতো যে, আসমান থেকে যেন তাদের জন্য একটি কিতাব অবতীর্ন করা হয়, হয় তাদের জামাতের উপর, না হয় তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ওপর। তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। يسئلك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء 'আহলে কিতাবগণ তোমার কাছে আবেদন করে বলবে যে, তাদের ওপর যেন আসমানী কোনো কিতাব অবতীর্ণ করা হয়।'[৪৬]

আল্লাহর উত্তর প্রদান : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম ও অমুসলিমের প্রশ্নোত্তরে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন ও পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন। মূলত প্রশ্নকারীর কল্যান ও হেদায়েতের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আল্লাহ তা'আলা উত্তর প্রদান করেছেন।[৪৭] তিনি কেন এমন দর্শন গ্রহণ করেছেন তার সঠিক ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে আল-কুরআনের নীতিমালায়। আল্লাহর বাণী, ولقد صرفنا فى هذا القران ليذكروا 'আমি এ কুরআনে অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যাতে তারা ফিরত আসে।[৪৮] অন্য আয়াতে বর্ণিত, انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون 'লক্ষ্য কর! আমি কীভাবে নিদর্শনসমূহ পরিবর্তন করি।[৪৯] আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীমায় উত্তর প্রদানের মূল কারণ, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে ও তাদের মাঝে ভাবান্তর হয়। আল্লামা ইবন্ আছির (রহ.) বলেন, পবিত্র কুরআনে দুই ধরনের প্রশ্নের পাশাপাশি যথাযথ উত্তর বর্ণিত হয়েছে। কখনো প্রশ্নমাফিক আবার কখনো কল্যাণ নির্ভর। এক. মানব কল্যাণ নিহিত প্রয়োজনীয় প্রশ্ন। ইসলামী শরীয়তে এই ধরনের প্রশ্নের বিধান মুস্তাহাব, মুবাহ বা আবশ্যক পর্যায়ের। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ কখনো সরাসরি আবার কখনো প্রশ্নকারীর চাহিদা অনুযায়ী প্রদান করেছেন।

দুই. ঔদ্ধত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যা মূলত ঠাট্টাবিদ্রুপ, হঠকারিতা, বিব্রতবোধ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এমন ধরনের প্রশ্ন হারাম, মাকরূহ এবং নিষিদ্ধ।[৫০] সাধারণত এধরনের প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা একাধিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো,

ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা : কাফির-মুশরিকগণ তাঁর প্রেরিত নবী কিংবা রাসূলের সাথে কোনো বিদ্রুপমূলক আচারণ করলে মহান আল্লাহ বিদ্রুপের মাধ্যমেই উত্তর দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী, الله يستهزء بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون'আল্লাহ তা'আলা তাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপের প্রতিউত্তর ঠাট্টা-বিদ্রুপের মাধমেই দিয়ে থাকেন।'[৫১] অন্য আয়াতে বর্ণিত, ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين'তারা আল্লাহকে ধোকা দেয় (তাদের ধারণায়) বরং আল্লাহ তাদের ধোকাবাজির সঠিক উত্তর দিয়ে থাকেন।[৫২]

ওয়ীদ বর্ণনা : যুগে যুগে বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট মানুষেরা তাদের নিকট প্রেরিত দূতের সাথে খারাপ ব্যবহার ও ধৃষ্টতা মূলক আচরণ দিয়ে তাদেরকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার হীন প্রয়াস চালিয়ে আল্লাহর ধমকির সম্মুখীন হয়েছে। আল্লাহর বাণী,كل كذب الرسل فحق وعيد 'তারা রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ধমকির সম্মুখীন হয়েছে।[৫৩]অন্য আয়াতে বর্ণিত, وصرفناه فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا'মুসলিম পণ্ডিতগণ উক্ত আয়াতের 'ওয়ীদ'এর ব্যাখ্যায় বলেন, ওয়ীদ' আল্লাহর 'অসন্তুষ্টি প্রকাশের বিশেষ মাধ্যম। যাতে রয়েছে অপরাধীকে শাসানোর একাধিক পদ্ধতি। যেমন, তাহদীদ (ধমক), তাখয়িফ (ভীতি প্রদর্শন), আযাব (যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি)। এছাড়াও উপদেশ, নে'মাতের স্বরণ ও তাকওয়ার প্রতি আহবানের মাধ্যমে তাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপের উত্তর দেয়া হয়েছে। আবার কখনো তাদের জিজ্ঞাসাকে মূল্যহীন বুঝানোর জন্য উত্তরে নীরবতা পালন করেছেন। আবার কখনো প্রশ্নের উত্তরে মোড় ঘুড়িয়ে ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন।

মুসলিমদের প্রশ্নের উত্তরে কুরআনিক নীতি : মুসলিমদের প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা যেসমস্ত দর্শন গ্রহণ করেছেন তাহলো-প্রতিশ্রুতি রক্ষা, মহান আল্লাহ অসংখ্য আয়াতে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ان الله لا يخلف الميعاد 'নিশ্চয় আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।'[৫৪] তিনি তাঁর বান্দার প্রতিশ্রুতি কীভাবে রক্ষা করেন তার বর্ণনা খোদ কুরআনে এসেছে একাধিক উপায়ে। যেমন, জিজ্ঞাসানুযায়ী উত্তর প্রদান। যেমন, يسئلونك عن المجيض قل هو اذى 'আপনাকে তারা মেয়েদের মাসিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আপনি বলুন, তা অপবিত্র।[৫৫] অন্য আয়াতে জিজ্ঞাসা করা হলো, কী দান করবে ? তিনি বলে দিলেন, অতিরিক্ত সম্পদ থেকে ইত্যাদি। এছাড়াও সরাসরি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে প্রশ্নের আলোকে প্রশ্নকারীর যা প্রয়োজন তাই বলে দিয়েছেন। এটি কখনো তারগীব (উৎসাহ) আকারে, কখনো মাওয়ায়েজে হাসানাহ (উপদেশ বাণী), কখনো বারাহিন (দলিলাদী) ভিত্তিক আবার কখনো প্রশংসা বাণী ও জান্নাতের সুসংবাদরূপে ইত্যাদি।

উপসংহার :

মহানবী (সা.) ছিলেন জ্ঞানের শহর। তাঁর জ্ঞান বিতরনের দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত ছিলো। প্রশ্নকারীগণ তাঁর সান্নিধ্যে এসে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তাদের উত্তর লাভ করেছেন। কোনো কোনো উত্তরদাতা তার কাঙ্খিত উত্তর পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। আবার কোনো কোনো প্রশ্নকারীর প্রশ্ন শুনে তিনি নিজেই বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন। মানসম্মত প্রশ্নের উত্তর তিনি তাৎক্ষণাৎ দিতেন অথবা ওহীর অপেক্ষা করতেন। যেসব ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) অমুসলমানদের অবান্তর প্রশ্নবাণে বিব্রত বোধ করেছেন অথবা মুসলিমদের কিছু অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন সেক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.) কে ওই বিব্রতর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেই উত্তর প্রদান করেছেন। 'আল-কোরআনে বর্ণিত মহানবীর প্রতি জিজ্ঞাসা' শীর্ষক উর্পযুক্ত প্রবন্ধ শিরোনামের আলোকে মহানবীর (সা.) প্রতি ছুঁড়ে দেওয়া বিশটি প্রশ্ন নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রশ্ন করার আদব, প্রশ্নের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। সর্বপোরি আল-কুরআনে বর্ণিত মহানবীর (সা.) এর প্রতি বিশটি প্রশ্নোত্তরের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অত্র নিবন্ধের স্বার্থক রূপায়ন।

তথ্যনির্দেশ

১ আব্দুর রউফ বিন আলী বিন যায়নুল আবেদীন মানাভী, *আত-তাওকীফু আলা মুহিম্মাতিত তাআরিফ* (কায়রো : আলামুল কুতুব, ১ম সংস্করণ, ১৪১০ হি.), পৃ. ১৯৯; আবুল বাকা আইয়ুব বিন মূসা আল কুফী, *আল-কুল্লিয়াত* (বৈরূত : দারু মুআসসাসাতুল রিসালাহ, তা.বি), পৃ. ৫০১.

২ Wilkinson and Bhandarkar, *Methodology and Techniques of Sosial Recearch* (Bombay : Himalaya Publishing House, 1999), p. 213;Goode, William J., and Hatt, Paul K., *Methods in Social Recearch* (McGraw- Hill Inc, 1952), p.133 .

৩ সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত, ০৭।

৪ ইবনু হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী লিশারহি সাহীহিল বুখারী* (বৈরূত: দারুর রিসালাতিল আলামিয়্যাহ, ১৪৩৪ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭২।

৫ *ফাতহুল বারী লিশারহি সাহীহিল বুখারী*, তদেব, ৩ খণ্ড, পৃ. ৯৫।

৬ সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত, ১০২।

৭ সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত, ০৭।

৮ সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত, ১৭২।

৯ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত, ৩০।

১০ সূরা আল-কদর, আয়াত।

১১ সূরা আল- হুমাযাহ, আয়াত, ৫।

১২ আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী, *জামে তিরমিযী* (ইণ্ডিয়া : আশরাফী বুক ডিপু, দেওবন্দ, তা.বি.), হাদীস-২৬১৭।

১৩ মুসলিন ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম* (ইণ্ডিয়া : আশরাফী বুক ডিপু, দেওবন্দ, তা.বি.), হাদিস- ৮৩।

১৪ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী* (ইণ্ডিয়াঃ আশরাফী বুক ডিপু, দেওবন্দ, তা.বি.), হাদিস-২৫১৮; মুসলিম, হাদীস-২৬০.

১৫ বুখারী, হাদীস-২৩২৮; মুসলিম, হাদীস- ২১২০।

১৬ সূরা আল-মায়দাহ, আয়াত, ১০১।

১৭ সূরা বাকারাহ, আয়াত, ১০৮।

১৮ *সহীহ মুসলিম*, হাদীস-১৩৩৭।

১৯ *সুনান আত তিরমিযি*, হাদীস-১৪৮৯।

২০ শিব্বির আহমাদ উসমানী, *ফাতহুল মুলহিম*, (লেবাননঃ দারু ইহইয়াউত তুরাসিল গারবি, ১৪২৬ হি.), হাদীস-৭০৯।

২১ মুফতি মুহাম্মাদ শফী, *তাফসিরে মাআ'রিফুল কুরআন* (অনু. মাও. মুহিউদ্দিন খান) (রিয়াদঃ বাদশা ফাহাদ পাবলিকেশান, ১৪১৩ হি.), পৃ. ১০৯।

২২ আবু তাহের মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব ফিরোজাবাদী, *বাসায়িরু যাবিত তাময়িয ফি লাতায়িফিল কিতাবিল আজিজ* (কাহেরা : লাজনাতু এহইয়াউত তুরাসিল ইসলামী,১৩৯৩, হি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৭।

[২৩] সূরা আল-বাকারাহ্, আয়াত, ১৮৬।

[২৪] আল-কুরআনে ‘রূহ’ শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃ হয়েছে। যথা-১.ওহী : আল্লাহর বাণী, وكذالك اوحينا اليك روحا من امرنا ২.দৃঢ়তা ও শক্তি : আল্লাহর বাণী, وايدهم بروح منه ৩. জিবরাইল (আ.) : আল্লাহর বাণী, نزل به الروح الامين ৪. হযরত ঈসা মাসীহ (আ.) : আল্লাহর বাণী, وكلمته القاها الى مريم وروح منه (দ্র.ইবনুল কাইয়্যুম, *আর-রূহ* (বৈরূত : মাকতাবাতুল মাআরিফ,১৪১০ হি.),পৃ. ২১৩।

[২৫] সূরা ইসরা, আয়াত, ৮৫।

[২৬] তিনটি প্রশ্ন হলো, ১. ঐ যুবকদের সম্পর্কে তুমি কী জান ?যারা ইমান রক্ষা করার জন্য গুহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।রাসূল (সা.) উত্তর দিলেন, ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا ২. ঐ বাদশাহ সম্পর্কে কী জান যে, উত্তর থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত তথা সর্বত্র তার শাসনকার্য পরিচালনা করেছে ? قل ساتلو عليكم منه ذكرا ৩. রূহ’ সম্পর্কে তুমি কী জান ? قل الروح من امر ربى ।

[২৭] আবুল ফিদা ইসমাইল বিন কাছির দামেশকী, *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ৫ম খণ্ড (বৈরূত : মাকতাবাতুল মাআরিফ,১৪১০ হি.), পৃ. ১১৬।

[২৮] তিনটি হলো, ক. তারমধ্যে ইয়াহুদী, মুশরিক ও কুরাইশগণের প্রশ্নের ধরণ ছিল একই রকম। যা সূরা আল-আ’রাফ ও আন নাযিআতে বর্ণিত হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, يسئلونك عن الساعة ايان مرساها খ. কাফেরদের প্রশ্ন যা সূরা যারি্রয়াতে বর্ণিত হয়েছে, يسئلون ايان يوم الدين গ. সাধারণ মুসলমানদে প্রশ্ন যা বর্ণিত হয়েছে, সূরা আহযাবে, يسئلك الناس عن الساعة

[২৯] সূরা আল-আনফাল, আয়াত, ০১।

[৩০] আবু জা’ফর মুহাম্মদ বিন জারির আত ত্ববারী, *জামিউল বয়ান আন তাবিলে আইল কুরআন* (বৈরুত : শিরকাতু দারিল আরকাম বিন আবিল আরকাম, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি.), ১৩ শ খণ্ড, পৃ.৩৭৯।

[৩১] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত, ২১৭।

[৩২] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত, ২১৯।

[৩৩] আবুল ফিদা ইসমাইল বিন কাছির দামেশকী, *তাফসীরল্ক কুরআনিল আযীম* (বৈরূতঃ দারুত তায়্যিবাহ, ১৪২০ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৯।

[৩৪] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত, ২১৫।

[৩৫] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত, ২১৫।

[৩৬] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত, ২১৯।

[৩৭] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত, ২২০।

[৩৮] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত, ২২২।

[৩৯] সূরা আল-মায়েদা, আয়াত, ০৪।

[৪০] সূরা আল-কাহফ, আয়াত, ৮৩।

[৪১] সূরা আত-ত্বহা, আয়াত, ১০৫।

[৪২] মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আবুস সাউদ উমাদী, *ইরশাদুল আকলিস সালিম* (বৈরূত : দারু ইয়াহউত তুরাসিল আরবী, তাবি), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪২।

[৪৩] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত, ২৮৯।

[৪৪] ইসমাইল বিন ওমর বিন কাছির দামেশকী, *তাফসীরে ইবনে কাছির* (দামেশকঃ দারুন নাশার, ১৪৩১ হি.), পৃ. ২৯।

[৪৫] সূরা আল-মা’আরিজ, আয়াত, ১-২।

[৪৬] সূরা আন-নিছা, আয়াত, ১৫৩।

[৪৭] জালালুদ্দীন সুয়ুতী, *আল ইতকানু ফি উলুমুল করআন* (সাউদি : ওযারাতুল আওকাফ, ২০১৪ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭২।

[৪৮] সূরা কাহাফ, আয়াত-৫৪।

[৪৯] সূরা আনআম, আয়াত-৬৫।

[৫০] ইবনুল আছিল জাযরী, *আন নিহায়াহ ফী গরীবিল হাদীস ওয়াল আছার* (বৈরূত : আল মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯ হি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৮।

[৫১] সূরা আল-বাকারা, আয়াত-১৫।

[৫২] সূরা আলে ইসরান, আয়াত-৫৪।

[৫৩] সূরা ক্বাফ, আয়াত, ১৪।

[৫৪] সূরা আলে ইমরান, আয়াত, ০৯।

[৫৫] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত, ২২২।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী : জীবন ও রচনাবলী
(Anwar Shah Kashmiri : Life and Works)

ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান*

Abstract: This research aims to highlight the approach of Anwar *Shah* Kashmiri in his commentary on the *Hadith*, *Tafsir*, *Fikah*, *History*, *Literature* and *Theology*. Anwar *Shah* Kasmiri (d. 1933) was one of the most distinguished Islamic scholars of the Indo-Pak Subcontinent. He was recognized as an authority on *'Ilm al-Hadith* (the science of *Hadith*). His works on *Hadith* won him the title of *Shaykh al- Hadith* (an expert in the field of *Hadith*) and was also acclaimed as a *Muhaddith* (scholar of *Hadith*). He dedicated his life in serving the *Hadith* scholarship; he excelled in the subject and its branches such as study of the reporters of *Hadith* and hidden defects in *Hadith*. His own scholarly considerations, opinions and positions on the subject lead us to research his approach to the interpretation of *Hadith* by studying his lectures and writings on the subject.

ভূমিকা

আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী ছিলেন পাক-ভারত উপমহাদেশের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ। ভারতের ইতিহাসে যে সকল মুহাদ্দিস ও মুফাসসির কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন, চর্চা ও প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে বর্তমান ভারত শাসিত জম্মু-কাশ্মিরের লুবাব উপত্যকার অধিবাসী আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী শীর্ষস্থানীয় ও ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব। শৈশবেই তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য দেওবন্দ গমন করেন। দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদরাসায় অধ্যয়ন করে তিনি হাদীস সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীস বিশারদ, হাদীসের ব্যাখ্যাকার ও হাদীসের শিক্ষক। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর যোগ্যতা প্রবাদপ্রতীম। তিনি ছিলেন ফিকহ ও হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন-শাস্ত্রের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের অন্যতম। এছাড়া তিনি কুরআন, ফিকহ, 'উলূমুল কুরআন ও ইসলামী সাহিত্যে সমানভাবে পারদর্শী ছিলেন। তিনি অসামান্য প্রতিভা আর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন মহান আধ্যাত্মিক সাধক ও খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি তৎকালীন অশিক্ষিত ও কুসংস্কারে জর্জরিত জনগোষ্ঠীকে ইসলামী শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা ছাড়াও কুসংস্কারমুক্তকরণে অনন্য অবদান রেখে গেছেন। কুরআন-হাদীসে তাঁর গবেষণা ও পারদর্শীতা তাকে অন্যান্য মুসলিম পণ্ডিতদের সাথে ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন বিষয়ে তীব্র বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করে। হাদীসের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল এবং তিনি আজীবন সিহাহ সিত্তাহ (হাদীসের ছয়টি প্রামাণিক সংগ্রহ) শিক্ষাদানে অতিবাহিত করেন। তৎকালীন সময়ে তিনি যে প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করতেন তথায় ছাত্রদের আগমন ঘটতো। এ ছাড়া তাঁর অধীনে পড়াশোনা করা একটি সম্মান ও বিশেষত্ব হিসেবে শিক্ষার্থীদের নিকট বিবেচিত হতো। বিশেষকরে হাদীসের ক্ষেত্রে আনোয়ার শাহ কাশ্মিরীর অবদান আজও 'আলিম ও ছাত্র সমাজ সমানভাবে উপকৃত হচ্ছে এবং অব্যাহত রয়েছে। নিম্নে এ মহান 'আলিমের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

১. আনোয়ার শাহ কাশ্মিরীর পরিচয়

১.১ বংশ পরিচয়

ভারত উপমহাদেশের '*কাশ্মির*' অপরূপ দৃষ্টিনন্দন এক উপত্যকার নাম। হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমে এর অবস্থান। নৈসর্গিক সৌন্দর্য, মনোহর রূপ-লাবণ্য ও প্রাণোচ্ছল সবুজ-শ্যামলিমার কারণে উপত্যকাটির খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী। শ্রীনগর, ইসলামাবাদ, কাজিকুণ্ড, বারমুলা, হিন্দওয়ারা, কুপওয়ারা কাশ্মিরের বিখ্যাত

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

শহর। তবে কাশ্মিরের সবচেয়ে মনোরম ভূখণ্ড হলো লুবাব উপত্যকা। এ লুবাব নগরেই জন্মগ্রহণ করেন জগদ্বিখ্যাত হাদীসতত্ত্ববিদ, যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানতাপস এবং বিরল মেধা ও স্মরণশক্তির অধিকারী আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.)।

আনোয়ার শাহ কাশ্মিরীর পূর্বপুরুষেরা বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। এককালে এ বাগদাদ নগরী ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সূতিকাগার ছিল। 'আলিম-'উলামা, পীর-মাশায়েখ ও সূফী-দরবেশদের ব্যাপক পদচারণায় শহরটি এক সময় মুসলিম জগতের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠে। প্রায় দু'শ পঞ্চাশ বছর পূর্বে এখান থেকে কাশ্মিরীর পূর্বপুরুষগণ ভারত উপমহাদেশে আগমন করেন। শেষ পর্যন্ত কাশ্মিরে বসতি স্থাপনের পূর্বে মুলতানসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, তার পূর্বপুরুষেরা প্রায় সকলেই ছিলেন খোদাভীরু ও দ্বীনদারী। কাশ্মিরীর প্রপিতামহ শায়খ মাস'উদ নারুরী (রহ.) ছিলেন স্বনামখ্যাত অলি-আল্লাহ। শায়খ মাস'উদ নারুরী (রহ.) শ্রীনগরের এক সাধারণ পল্লী নারুরায় বসবাস করতেন। তিনি একজন দক্ষ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তাকে '*বণিকসম্রাট*' বলা হতো। ১৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তার দাদা কাশ্মিরে বসবাসকারী শাহ কিরমান আবুল ফায়াদের হাতে নকশবন্দি সূফী তরিকায় বায়'আত গ্রহণ করেন এবং '*রাইসুল আউলিয়া*' নামে পরিচিত হন।[১]

কাশ্মিরীর বংশধারা নু'মান ইবন সাবিত (১৫০/৭৭৩) থেকে পাওয়া যায়, যিনি ইমাম আবু হানিফা নামে পরিচিত ছিলেন।[২] তার বংশতালিকাটি মাওলানা কাশ্মিরীর দু'টি গ্রন্থে পাওয়া যায়। যথা: ১. *নাইলুল ফারকাদায়েন* (নামাযে হাত তোলার প্রশ্নে স্পষ্টতা) এবং ২. *কাশফুল সতর* (বিতর নামাযের প্রশ্ন থেকে পর্দা উঠানো)। আনোয়ার শাহ কাশ্মিরীর পিতা শায়খ মোয়াজ্জম শাহ ইবন শাহ 'আবদুল কাবির ইবন শাহ 'আবদুল খালেক ইবন শাহ মুহাম্মদ আকবর ইবন শাহ মুহাম্মদ 'আরিফ ইবন শাহ হায়দার ইবন শাহ 'আলী ইবন শায়খ 'আবদুল্লাহ ইবন শায়খ মাস'উদ নারুরী কাশ্মিরী (রহ.) ছিলেন মুজাফফর নগর জেলার কিরনাউ নামক স্থানের অধিবাসী।[৩] তিনিও একজন সূফী ছিলেন এবং সোহরাওয়ার্দী সিলসিলার অনুসারী ছিলেন। কাশ্মিরের অনেক বাসিন্দা মাওলানা কাশ্মিরীর পিতার নিকট থেকে আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা প্রাপ্ত হন। তিনি ১১৫ বছর বয়সে মারা যান এবং কাশ্মিরের উইরনুতে সমাহিত হন।[৪]

১.২ জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা

আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী কুপওয়ারা জেলার নিকটবর্তী '*ওয়াদওয়ান*' নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ২৭ শাওয়াল, ১২৯২ হিজরি মোতাবেক ১৬ অক্টোবর ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে শনিবার সকালে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পিতা তাকে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শেখান এবং সাত বছর বয়সে তিনি তাকে *ফারসি* (ফারসি ভাষা) শিক্ষা দেন। ফারসি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের পর তিনি মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ রাসুনিপুরার অধীনে *আরবি ব্যাকরণ*, *ফিকহ* (ইসলামী আইনশাস্ত্র) এবং *উসূলুল ফিকহ* (ইসলামী আইনশাস্ত্রের মূলনীতি) অধ্যয়ন করেন। কাশ্মিরী বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনায় এতটাই উৎসাহী ছিলেন যে দু'বছরের মধ্যে তিনি এ বিষয়গুলোতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। জীবনের প্রথম দিকেই তাঁর অস্বাভাবিক প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তির প্রকাশ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, তার পিতা বলেছিলেন যে তার ছেলে যখন *মুখতাসারুল কুদুরী* (ইসলামী আইনশাস্ত্রের হানাফী ফিকহের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ) অধ্যয়ন করছিলেন, তখন তিনি তাকে ফিকহ সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন। ফলে তিনি ছেলের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশ্নের কৌতুহল মেটানোর জন্য অন্যান্য বিশিষ্ট ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদদের সাথে পরামর্শ করতে বাধ্য হন।[৫]

১.৩ উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণে বিদেশ ভ্রমন

১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে মাওলানা কাশ্মিরী প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার সন্ধানে হাজারায় গমন করেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। তাই পিতামাতার কাছ থেকে শারীরিক বিচ্ছেদ তাঁর এবং তার পিতামাতার জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। সে সময় হাজারায় কয়েকজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস কুরআন-হাদীস শিক্ষাদানে রত ছিলেন। ফলে হাজারাকে একটি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হতো

এবং শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে এ কেন্দ্রটি সবার উন্মুক্ত ছিল। মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী এখানে তিন বছর অধ্যয়ন করেন। কিন্তু এ অধ্যয়ন তাঁর জ্ঞান পিপাসা মেটাতে পারেনি। এভাবে একবার তার শিক্ষকগণ তাকে দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদরাসা সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি সেখানে তার পড়াশুনা আরও এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি হাজারা থেকে দেওবন্দে আসেন। এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকে ছাত্রদের জন্য কোন থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। এ শহরে মাওলানা কাশ্মিরীর কোন পরিচিতও ছিল না। তাই তিনি বাধ্য হয়ে দারুল 'উলূম মাদরাসার সন্নিকটস্থ মসজিদে কাবীতে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করেন। এখানে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি এবং এর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ও এর সাধারণ বিষয়গুলো দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় মসজিদের একজন ট্রাস্টি কাজী আহমাদ হুসাইন তাকে মাওলানা মাহমুদ হাসানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এভাবেই তিনি এ খ্যাতিমান মুসলিম পণ্ডিতের ছাত্র হন, যিনি নিজেও তৎকালীন দু'জন বিশিষ্ট 'আলিম মাওলানা কাসিম নানুতুবী এবং মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহীর অধীনে অধ্যয়ন করেছিলেন। মাওলানা মাহমুদ হাসানের অধীনে অধ্যয়ন করার পাশাপাশি তিনি মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারাপনপূরী[৬], মাওলানা ইসহাক অমৃতসরী এবং মাওলানা গোলাম রাসূল[৭]-এর কাছেও অধ্যয়ন করেন। যাইহোক, মাওলানা কাশ্মিরী ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে হাদীস সাহিত্যের মূল্যবান কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন, ইমাম বুখারীর আল-জামি' আস-সহীহ, সুনানু তিরমিযী এবং তাফসিরে জালালাইন-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এ গ্রন্থগুলো পরবর্তীতে বিভিন্ন ক্লাসের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেন শিক্ষার্থীগণ ইসলামের মূল উৎস সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি পেতে সক্ষম হন। দারুল 'উলূম মাদরাসায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের পর মাওলানা কাশ্মিরী গাঙ্গুহে গমন করে মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহীর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং তার নিকট থেকে আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা লাভ করেন। তাঁর ছাত্র মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী বলেন, আমি শায়খকে বলতে শুনেছি: আমি ফিকহ ও আরবি ব্যাকরণ অধ্যয়নকালে কাশ্মিরের মানুষকে ফতোয়া দিতাম। তখন আমার বয়স ছিল ১২ বছর।[৮]

১.৪ হাদীস গ্রন্থ অধ্যয়নে ব্যস্ততা

কাশ্মিরী সহীহ হাদীস সংক্রান্ত সিহাহ সিত্তাহসহ অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তাঁর সংগ্রহে হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: *মুসনাদ আল-দারিমি*, *মুসনাদ আহমাদ*, *মুনকাতা ইবনু আল-জারুদ*, *সুনানু আল-দারাকুতনী*, *মুসান্নাফ ইবন আবি শায়বাহ*, *মাজমাউল জাওয়াইদ*, *আস-সাগীর*, *কিনজুল 'আমল*। ভারতবর্ষে যেসকল হাদীস গ্রন্থের প্রকাশনা ও পাণ্ডুলিপি পাওয়া যেত, সবই তাঁর সংগ্রহে ছিল।[৯] তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র সাইয়্যিদ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী বলেন, মাওলানা কাশ্মিরী ভূমিকাসহ দু'শতাধিক হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থ পড়েছেন। এ ছাড়া তিনি বদরুদ্দীন আইনীর ১১ খণ্ডে রচিত *উমদাতুল কারী* এবং আল-কাসতালানীর ১০ খণ্ডে রচিত *ইরশাদ আল-সারী* পাঠ করেন। তিনি হাফিজ ইবন হাজার আসকালানীর ১৩ খণ্ডে রচিত *ফতহুল বারী* শিক্ষার্জনকালে পাঠ করেন।[১০]

১.৫ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা

কাশ্মিরী শিক্ষা জীবন শেষ করে কিছুদিন *মাদরাসা আবদুর রব*-এ অধ্যাপনা করেন। অত:পর ১৩১৩ হিজরি/১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দিল্লীর উপকণ্ঠে সুনাহরি মসজিদে (গোল্ডেন মসজিদ) অবস্থিত *আমিনিয়া মাদরাসা*-এ পাঠদান আরম্ভ করেন। মাদরাসাটি ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে মাওলানা আমিনুদ্দীন[১১] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বিধায় এটিকে *আমিনিয়া মাদরাসা* নামে নামকরণ করা হয়েছে।

তিনি ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে মাতার ইন্তিকালের সংবাদ পেয়ে কাশ্মিরে ফিরে আসেন। কাশ্মিরে এসে তিনি এখানকার মুসলমানদের ধর্মবিমুখতা ও পথভ্রষ্টতার করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। ফলে তিনি কাশ্মিরে বসতি স্থাপন করার এবং নিজ জন্মস্থানে বসবাসকারী মুসলমানদের মাঝে ইসলামের খেদমত করার মানসিকতা তৈরি করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি বারমুলার *ফয়জে আম মাদরাসা*-এ শিক্ষক পদে যোগদান করেন। এখানে

তিন বছর অধ্যাপনার পর তিনি ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে হজ পালনের উদ্দেশ্যে মুসলিমদের একটি বৃহৎ কাফেলার সাথে হিজাজ গমন করেন। পবিত্র মক্কা-মদীনায় অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। তিনি এখানকার বিশিষ্ট পণ্ডিত আল্লামা শায়খ হাসান তারাবুলসীর মতো উল্লেখযোগ্য 'আলিমদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

অত:পর ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে মাওলানা কাশ্মিরী মদীনায় স্থায়ীভাবে হিজরত করার মানসে দারুল উলূম দেওবন্দে তাঁর শিক্ষক মাওলানা মাহমুদ হাসানের অনুমতি ও আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। অবশ্য মাহমুদ হাসান তাকে মদীনায় হিজরত করতে নিরুৎসাহিত করেন। বরং তিনি তাকে কাশ্মির ছেড়ে দেওবন্দে বসতি স্থাপন করার পরামর্শ দেন। আর তিনি তাকে দারুল 'উলূম মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদানের প্রস্তাবও দেন। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে তিনি অনিচ্ছায় এ পদটি গ্রহণ করেন। দারুল 'উলূমে শিক্ষক হিসেবে সিহাহ সিত্তাহর জামি' আস-সহীহ, সুনানু নাসায়ী ও সুনানু ইবন মাজাহ-এর দারসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কাশ্মিরী দারুল 'উলূম দেওবন্দে শিক্ষকতা শুরুর কয়েক মাসের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মাওলানা মাহমুদ হাসান জড়িয়ে পড়েন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনীতিতে মাওলানা মাহমুদ হাসানের জড়িত থাকার কারণে তিনি ব্রিটিশদের শত্রুতার শিকার হন এবং দেশ ত্যাগ করেন। ফলে মাহমুদ হাসানের অনুপস্থিতিতে দারুল 'উলূম মাদরাসার কর্তৃপক্ষ মাওলানা কাশ্মিরীকে শায়খুল হাদীস হিসেবে নির্বাচিত করেন। আর তাকে ইমাম বুখারীর জামি' আস-সহীহ ও ইমাম তিরমিযীর সুনানু আত-তিরমিযীর শিক্ষাদানের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর শিক্ষাদানের উদ্ভাবনী পদ্ধতি ভারতের সর্বত্রই বিপুল সংখ্যক ছাত্রকে আকৃষ্ট করেছিল। একই বছর (১৯০৮) তিনি বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রী গাঙ্গুহের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য ছিলেন।[১২] প্রায় আঠার বছর তিনি দারুল 'উলূম মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে কিছু বিশিষ্ট 'আলিম তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর অধীনে প্রায় ২০০০ ছাত্র শিক্ষার্জন করেন। তাদের মধ্যে মাওলানা আবদুল কাদির রায়পূরী, মুফতি মুহাম্মদ শফী 'উসমানী, মাওলানা মানাযির আহসান জিলানী, মাওলানা ইদরিস কান্দালবী, মাওলানা বদরে 'আলম মিরাঠী, মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী, মুফতি আতিকুর রহমান, মাওলানা মানযুর নু'মানী এবং কারী মুহাম্মদ তাইয়্যিব প্রমুখ।

কাশ্মিরী শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাঁর কিছু সময় ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত করেন। তিনি জনসমক্ষে ইসলামের ভাষণ দেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিরক্ষায় কিছু সাহিত্যকর্মও রচনা করেন। তাঁর রচনাগুলো এ গবেষণা প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে দারুল 'উলূম মাদরাসা প্রশাসনিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। এর প্রতিষ্ঠাতাগণ এটিকে আস্থায় রাখা জাতীয় সম্পদের পরিবর্তে পারিবারিক সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করেন। এতে কাশ্মিরী খুবই কষ্ট পান। এভাবে তিনিসহ মাওলানা শাব্বির আহমাদ 'উসমানী (মৃত্যু ১৯৪৯), মাওলানা বদরে 'আলম মিরাঠী (মৃত্যু ১৯৬৫), মাওলানা সিরাজ আহমাদ, মাওলানা সাইফুর রহমান প্রমুখ দেওবন্দ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং গুজরাটের ডাভেলে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১৩]

মুহাম্মদ ইবন মুসা মিয়া আফ্রিকী ডাভেলের দারুল 'উলূম মাদরাসায় শিক্ষকতার পদে যোগদানের জন্য মাওলানা কাশ্মিরীর সম্মতি গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মাওলানা কাশ্মিরী ডাভেলের দারুল 'উলূমে যোগদানের পর সারা বিশ্ব থেকে শিক্ষার্থীগণ ডাভেলে আসতে শুরু করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এটি উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ডাভেলে আসার পর তিনি দেখেন এখানকার মুসলমানরা এমন কিছু অনুশীলনে নিয়োজিত যা তাওহীদের (আল্লাহর একত্ব) ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এভাবে তিনি তার অবসর সময় সাধারণ মুসলমানদের শিক্ষিত করতে এবং তাদের নবী করীম (সা.)-এর সুন্নাহ সম্পর্কে আলোকিত করতে ব্যয় করেন।

১.৬ ওফাত

ডাভেলে পাঁচ বছর অধ্যাপনা করার পর তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে তিনি অনুপস্থিতির ছুটি নিয়ে দেওবন্দে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। ইস্টার্ন মেডিসেনের হাকিম এবং এলোপ্যাথিক ডাক্তার মুখতার আহমাদ আনসারী উভয়েই তাঁর চিকিৎসা করেন। অত:পর রবিবার ২ সফর ১৩৫২ হিজরি/২৭ মে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আসর নামাযের পর কারী মুহাম্মদ তাইয়্যিব এবং একদল ছাত্র অসুস্থ মাওলানা কাশ্মিরীকে তার বাড়িতে দেখতে যান। ছাত্রগণ তাঁর কাছ থেকে শেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। অনেক বিষয় তাকে প্রশ্ন করা হয়। তিনি তাদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেন। কিন্তু সেই দিনের মধ্যরাতে তার অবস্থার অবনতি হয় এবং তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

কাশ্মিরীর ইন্তিকালের সংবাদ সারা ভারতে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। পরের দিন সকালে দারুল ‘উলূম দেওবন্দের শিক্ষক মাওলানা ‘আবদুল আহাদ এবং হাফিজ মুহাম্মদ শরীফ তাকে আনুষ্ঠানিক গোসল দেন এবং যোহরের নামাযের পর তার জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আসগর হুসাইন (মৃত্যু ১৯৪৫) জানাজার নামায পড়ান। তাঁকে দেওবন্দের উপকণ্ঠে ঈদগাহ নিকটস্থ একটি বাগানে সমাহিত করা হয়। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ কার্যত সমস্ত প্রধান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্ব থেকে শোক প্রকাশ করা হয়।[১৪]

১.৭ চারিত্রিক গুণাবলি

মানুষের পরিচয় তার চরিত্রে। উত্তম নৈতিকতা মানুষকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়। আবার নৈতিকতার অবক্ষয় মানুষকে করে তোলে হিংস্র। একজন মানুষের জীবনে রূপ-লাবণ্যের চেয়ে উত্তম গুণাবলির সমাবেশ অধিক কাম্য। মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরীর জীবনেও ছিল তুলনাহীন বহু গুণের সমাবেশ। আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহারসহ তার প্রতিটি কাজকর্ম গড়ে উঠেছিল সুন্নত অনুযায়ী।

কাশ্মিরী ছিলেন মাঝারি উচ্চতার এবং শক্তভাবে নির্মিত দেহ বিশিষ্ট ব্যক্তি। তার একটি প্রশস্ত কপাল এবং ঘন দাড়ি ছিল যা তার পুরো মুখ ঢেকে রেখেছিল। সামগ্রিকভাবে তার মনোরম দৈহিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ছিলেন আচার-ব্যবহারে একেবারেই সরল এবং আচরণে সৎ। তিনি অত্যন্ত বাকপটু এবং উষ্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর সংস্পর্শে আসা প্রত্যেকের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। সর্বস্তরের মানুষ তাকে ভাল বাসতো এবং শ্রদ্ধা করতো। সারা জীবন তিনি নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষাকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করেছেন। মাওলানা কারী মুহাম্মদ তাইয়্যিব উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সা.)-এর অনেক সুন্নাতের বাস্তব প্রয়োগ তার সেগুলোকে বাস্তব প্রয়োগ করার পরই অনুমান করা যায়।

তিনি দারুল ‘উলূমে বহু বছর ধরে শিক্ষামূলক পরিষেবার জন্য অধ্যক্ষের বাড়িতে তৈরি এবং তাঁর কাছে পাঠানো দু’মিল খাবারের জন্য অর্থ প্রদান করতেন। তিনি কখনই খাবারের বিষয়ে অভিযোগ করেননি বা কোনও বিশেষ খাবারের জন্য অনুরোধও করেননি। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ও নম্র জীবনযাপন করতেন।[১৫] তিনি ধনী ও দরিদ্রকে সমানভাবে বিবেচনা করতেন। তিনি নেতৃত্বের কোন পদই গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। যদিও তিনি বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তবুও তিনি সকল প্রকার অহংকার বর্জিত ছিলেন। কোন আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করেই সবাই তাঁর সাথে দেখা করতে পারতেন। তাঁর সমসাময়িকরা প্রায়শই কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় সমস্যা সমাধানের দিকনির্দেশনার জন্য তার কাছে ফিরে আসতেন। যদিও এটা সত্য যে একজন ব্যক্তির খ্যাতি তার মহৎ গুণাবলীর উপর নির্ভর করে। মাওলানা কাশ্মিরীর খ্যাতি মূলত জ্ঞান ও সাহিত্যকর্মের প্রতি তাঁর নিবেদনের উপর নির্ভর করে। তিনি ইমাম আল-রাজী, ইবনুল ‘আরাবী, ইমাম আল-বুখারী এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবীসহ অন্যান্য অনেক ধ্রুপদী মুসলিম পণ্ডিতের ন্যায় ইতিহাসের পাতায় তাঁর নামটি খোদাই করে রেখেছেন। তিনি সর্বদা ইসলামী গ্রন্থ এবং ধর্মীয় সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করতেন। মাত্র সাত বছর বয়স থেকেই তিনি প্রথমে অযু না করে কোন

গ্রন্থ স্পর্শ করেননি।[১৬] সকল শিক্ষকের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন যে তিনি নিজেকে সেই ব্যক্তির দাস বলে মনে করতেন যিনি তাকে কিছু শিখিয়েছিলেন। এমনকি যদি তা শুধুমাত্র একটি শব্দই হয়।[১৭]

১.৮ সমকালীন পণ্ডিতদের অভিমত

আতাউল্লাহ শাহ বুখারী তার সম্পর্কে সর্বোত্তম প্রশংসা করেন। আর তিনি মন্তব্য করেন যে নবী (সা.)-এর সাহাবীদের কাফেলা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এবং মাওলানা কাশ্মিরী পিছনে পড়ে গেছেন। এভাবে ইঙ্গিত করা হয় যে তিনি ধার্মিক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন।[১৮]

হাসান 'আলী নকশবন্দী বলেন, আমি মাওলানা কাশ্মিরীর অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য, 'ইলমী গভীরতা, অবাক করা স্মৃতিশক্তি, হাদীসশাস্ত্রে তার পূর্ণ ব্যুৎপত্তিসহ তার বিস্ময়কর দূরদৃষ্টি সম্পর্কে শুধু জ্ঞাতই না; বরং তার প্রতি আস্থাশীল। তাঁর মতে, কেউ যদি হাদীসে পারদর্শী হতে চায় তবে সেই ব্যক্তিকে মাওলানা কাশ্মিরীর ছাত্র হিসেবে ভর্তি হতে হবে।[১৯]

সাইয়্যিদ আহমাদ বিযনুরী বলেন, মাওলানা শাব্বির আহমাদ 'উসমানী তাঁর জ্ঞান থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন। তার মতে, মাওলানা শাব্বির আহমাদ 'উসমানী যে তাফসির (পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা) লিখেছেন তা কাশ্মিরীর মতামতে পরিপূর্ণ।[২০]

মাওলনা আশরাফ 'আলী থানবী (মৃত্যু ১৯৩৫) উল্লেখ করেন যে, তিনি মাওলানা কাশ্মিরীর একটি বক্তৃতা শোনার পর তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে প্রতিটি বাক্যে বই সংকলিত হতে পারে। বয়সে বড় হলেও মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী দেওবন্দ আসলে তার বক্তৃতায় অংশ নিতেন। তিনি মাওলানা কাশ্মিরীর ব্যক্তিত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, সত্যিই তিনি শুধু একজন প্রকৃত 'আলিমই নন; বরং 'আমলদার 'আলিম ছিলেন।[২১]

মাহমুদ হাসান যখন কোন মজলিসে মাওলানা কাশ্মিরীকে দেখতেন তখন তিনি তাকে নিজের পাশে বসতে বলতেন। আর শ্রোতাদের কিছু প্রশ্ন থাকলে তার নিকট উপস্থাপনের নির্দেশ দিতেন অথবা তিনি তাকে প্রশ্নের উত্তরগুলো যাচাই করতে অনুরোধ করতেন। শায়খুল হিন্দের ন্যায় মহান ব্যক্তির মাওলানা কাশ্মিরীর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা তার 'ইলমী শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি। এ কারণে কাশ্মিরীকে হাদীসের সনদ দেওয়ার সময় শায়খুল হিন্দের লেখনী থেকে বেরিয়ে এসেছে বিভিন্ন প্রশংসামূলক শব্দ। তার দেওয়া সনদে লেখা ছিল, আল্লাহ তায়ালা তার মধ্যে জ্ঞান 'আমল, অনুপম চরিত্র, সুন্দর অবয়ব, তাকওয়া, দুনিয়াবিমুখতা, সঠিক অভিজ্ঞান ও দীপ্তিময় ধীশক্তি দান করেছেন।[২২] মাওলানা আবদুর কাদির রায়পূরী বলেন, যদিও তিনি তার অধীনে মাত্র কয়েকদিন অধ্যয়ন করেছিলেন তবুও তিনি তাকে আল্লাহর একটি আয়াত (আল্লাহর নিদর্শন) হিসেবে দেখতেন।[২৩]

১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে যখন মিশরের কায়রোর বিখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেক্টর আল্লামা রশিদ রিযা ভারতের উত্তর প্রদেশের লখনৌতে অবস্থিত *নদওয়াতুল 'উলামা* পরিদর্শন করেন তখন তাকে দেওবন্দের দারুল উলূম মাদরাসা পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং দেওবন্দে কিছু দিন অবস্থানের পর কায়রো ফিরে যান। সেখানে তিনি তার সম্পাদিত আরবি সাময়িকী *আল-মানার*-এ লেখেন যে, মাওলানা কাশ্মিরীর চেয়ে বড় হাদীস পণ্ডিতের সাথে তার আগে কখনো দেখা হয়নি।[২৪]

সহীহাইন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)-এর একজন হাফিজ (স্মরণকারী) আল্লামা মুহাদ্দিস 'আলী হাম্বলী আল-মিশরী যখন দেওবন্দ সফর করেন, তখন তিনি মাওলানা কাশ্মিরীর সহীহ বুখারীর উপর বক্তৃতা চলাকালীন তাঁর নিকট থেকে অনেক বিষয়ে ব্যাখ্যা চাইতেন। মাওলানা কাশ্মিরী তৎক্ষণাৎ আরবি ভাষায় তার প্রশ্নের উত্তর দিতেন। বক্তৃতা শেষে তিনি মন্তব্য করেন যে আমি সমগ্র আরব বিশ্বে এবং মিশরে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছি এবং আমি নিজেই দশ বছর ধরে সহীহ বুখারী শিক্ষা করেছি, কিন্তু মাওলানা

কাশ্মিরীর আদর্শের কোন হাদীস পণ্ডিতের সাথে আমার দেখা হয়নি। তিনি আরও বলেন, তিনি তাকে কিছু কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে তার জ্ঞান পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তার বিশাল জ্ঞানের অধিকারী দেখে অবাক হন।[২৫]

শাব্বির আহমাদ 'উসমানী বলেন, যদি কেউ তাকে জিজ্ঞেস করেন যে তিনি 'আল্লামা তাকীউদ্দীন ইবন দাকীকুদ্দীনকে দেখেছেন অথবা ইবনে হাজার আল-আসকালানীকে দেখেছেন তবে তিনি হ্যাঁ-ই উত্তর দিতেন। কারণ তার কাছে মাওলানা কাশ্মিরীকে দেখা ও সাক্ষাৎ উক্ত দু' বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে দেখা ও সাক্ষাতের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।[২৬]

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী গ্রন্থ *সিরাতুন্নবী*-এর প্রখ্যাত লেখক 'আল্লামা সাইয়্যিদ সুলায়মান নদবী (মৃত্যু ১৯৫৩)। তাঁর এ গ্রন্থটি মাওলানা কাশ্মিরীর প্রশংসায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি উল্লেখ করেন যে, মাওলানা কাশ্মিরী ছিলেন একজন উচ্চ শিক্ষিত, দুর্দান্ত অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন এবং শক্তিশালী স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন হাদীসের হাফিজ ও অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আজীবন তিনি হাদীসের দারস দিয়ে গেছেন।[২৭]

হুসাইন আহমাদ মাদানী বলেন, তিনি ভারত, হেজাজ, ইরাক, সিরিয়াসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশ সফর করে অনেক মহান 'আলিমের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাদের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা করেছেন। কিন্তু মাওলানা কাশ্মিরী 'উলূমে নকলিয়া ও আকলিয়া বিষয়ে পারদর্শী সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন।[২৮]

মুফতি কিফায়াতুল্লাহ (মৃত্যু ১৯৫৩)[২৯] পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, মাওলানা কাশ্মিরীর সমতুল্য অন্য কোন 'আলিমের সাথে দেখা করবেন কি না তা তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। 'আলিম সমাজে তার জ্ঞানের গভীরতা, পরিপূর্ণতা, পরহেজগারি ও বহুমুখিতা এবং পার্থিব ধনসম্পদের প্রতি অনীহার কথা স্বীকৃত বিষয়। পক্ষ-বিপক্ষ নির্বিশেষ সকলেই তার 'ইলমের সামনে ছিল অবনত মস্তক। মাওলানা সাইয়্যিদ আসগর হুসাইন বলেন, কোন বিচার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করার সময় তিনি প্রথমে গ্রন্থাগারগুলোতে প্রামাণিক বই-পুস্তক পর্যালোচনা করতেন এবং উপযুক্ত উত্তর খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলেই তিনি মাওলানা কাশ্মিরীর কাছ থেকে নির্দেশনা নিতেন।[৩০]

২. আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রচিত রচনাবলী

মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী যেমন ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক সাধক, সফল ও সুযোগ্য শিক্ষক, কামিল পীর, তেমনি ছিলেন একজন সাহিত্যসেবী তথা বিচক্ষণ লেখক। ইসলামের প্রচার-প্রসারের সকল ক্ষেত্রেই তিনি সফলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ওয়ায-নসীহত, তালীম ও তারবিয়াত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার পাশাপাশি গ্রন্থ রচনায়ও তিনি ছিলেন মনোযোগী। একজন মানুষের রচনাবলী তাঁর আদর্শ ও শিক্ষাকে মানুষের কাছে উপস্থাপন করে এবং তাঁকে অমর করে রাখে। তাঁর অর্জিত শরী'আত ও তরীকতের জ্ঞানকে তিনি গ্রন্থাকারেও রেখে গেছেন যাতে মৃত্যুর পরও মানুষ তাঁর জ্ঞান ও আদর্শ দ্বারা ইসলামের সঠিক আদর্শ অর্জনে উপকৃত হতে পারে।

ছোট-বড় প্রকাশিত ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে রচিত তাঁর ২৩ খানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর রচিত বইগুলো তৎকালীন সময়ে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তৎকালীন সামাজিক চাহিদার ভিত্তিতে এগুলো রচনা করা হয়। বর্তমানে তাঁর এ গ্রন্থগুলো ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক ভূমিকা পালন করছে। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী সামাজিক কুসংস্কার রোধ ও দ্বীনী শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। জ্ঞান পিপাসুরা আজও বিভিন্ন 'ইলমী সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তার সেসব কিতাবের দ্বারস্থ হন। সংক্ষিপ্ত আকারে তার গ্রন্থসমূহের পরিচয় তোলে ধরা হলো:

২.১ মুশকিলাতুল কুরআন (مشكلة القرآن)

আল-কুরআনের উপর মাওলানা কাশ্মিরীর অসাধারণ কীর্তি এটি। এ গ্রন্থে তিনি কুরআনের যেসব আয়াত বা স্থান দুর্বোধ্য সেসবের প্রকৃত ও সঠিক ব্যাখ্যা তোলে ধরেছেন। 'আলিম-'উলামা ও

দ্বীনীমহলে কুরআন-তাফসিরের জন্য গ্রন্থটি এক দুষ্প্রাপ্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। এ গ্রন্থটি মাওলানা আহমাদ বিযনুরী *মুজলিস-ই-ইলমী*, দেওবন্দ থেকে প্রকাশ করেন। তিনি মাওলানা কাশ্মিরী থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে একটি পাদটীকাও সংযোজন করেন।[৩১] ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী *মুজসিল-ই-ইলমী*, দিল্লী থেকে প্রকাশ করেন। এখানে মাওলানা বিন্নুরীর ৩৮ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকাও রয়েছে। এতে তিনি মাওলানা কাশ্মিরীর সংক্ষিপ্ত জীবনী, কুরআনের প্রতি তার বর্ণনাতীত অনুরাগ ও মুজতাহিদসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি তোলে ধরেছেন। এখানে প্রাচীন ও আধুনিক তাফসিরের উপর তুলনামূলক পর্যালোচনাও পেশ করেছেন তিনি।[৩২] পরবর্তীতে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে *মুজলিস-ই-ইলমী* (মালিগাঁও, সুরাট, ইন্ডিয়া) পুনরায় প্রকাশ করে। এ প্রকাশনায় মাওলানা বিন্নুরী ও মাওলানা বিযনুরীর ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে।[৩৩] আর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় পাকিস্তানের করাচী থেকে। করাচীর *মুজলিস-ই-ইলমী* এটি প্রকাশ করে। আর এটির পরিবেশনায় ছিল *ইদারা আল-কুরআন ওয়া 'উলূম আল-ইসলামিয়াহ*, করাচী। এ প্রকাশনায় গ্রন্থটির মোট পৃষ্ঠা ছিল ৪৪৮।[৩৪]

২.২ ফায়যুল বারী (فيض البارى)

ফায়যুল বারী 'আলা সহীহুল বুখারী গ্রন্থখানি আরবী ভাষায় রচিত ইমাম বুখারীর *জামি' আস-সহীহ*-এর একটি ভাষ্যগ্রন্থ। মাওলানা বদরে 'আলম মিরাঠী ডাভেল মাদরাসায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকাকালীন তিনি কাশ্মিরীর দারসে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন এবং তিনি তার বক্তৃতা নোট থেকে এটি সংকলন করেন। এটি মূলত বুখারী শরীফের দারসে মাওলানা কাশ্মিরীর জ্ঞানগর্ভ তাকরিরের গ্রন্থবদ্ধ রূপ। মাওলানা বদরে 'আলম মিরাঠী প্রথমে পাণ্ডুলিপি আকারে লিপিবদ্ধ করে মাওলানা কাশ্মিরীর নিকট সংশোধন করার অনুরোধ করেন। এ পাণ্ডুলিপিটি কায়রোর *মুজলিস-ই-ইলমী*-এর পৃষ্ঠপোষকতায় *জমিয়াত উলামা*, দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থায়নে *মাতবাআ আল-হিজাযী* কর্তৃক আরবি ভাষায় ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল: প্রথম খণ্ডে একটি দীর্ঘ ভূমিকা রয়েছে, যা মাওলানা কাশ্মিরীর জীবনী এবং মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরীর আল-ইসনাদ (বর্ণনাকারীদের শৃঙ্খল) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া ইমাম বুখারীর জীবনী, তার হাদীস সংকলনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসের অন্তর্নিহিত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় এবং আকায়েদ সংক্রান্ত অজানা তথ্য এ গ্রন্থে রয়েছে। গ্রন্থটির মাধ্যমে হাদীস সম্পর্কে মাওলানা কাশ্মিরীর প্রজ্ঞা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও উন্নত 'ইলমী রুচিবোধ সর্বসমক্ষে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। সংকলকের আরবির উপর পারদর্শিতা, সাবলীল উপস্থাপনা, বর্ণনাভঙ্গি ও শব্দের নিপুণ গাথুনি গ্রন্থটির মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মাওলানা বদরে 'আলম মিরাঠী অনেক স্থানে গুরুত্বপূর্ণ টীকা সংযুক্ত করেছেন। হাদীস পাঠকের নিকট গ্রন্থটি একটি দুর্লভ রত্নভাণ্ডার হিসেবে বিবেচিত।[৩৫]

২.৩ আল-'উরফুশ শাযি (العرف الشذى)

এটি *সুনানু তিরমিযী*-এর একটি ভাষ্যগ্রন্থ। দারসে হাদীসে মাওলানা কাশ্মিরীর মুখনিসৃত বিভিন্ন মূল্যবান তথ্য-উপাত্তের গ্রন্থবদ্ধ রূপ এটি। মাওলানা কাশ্মিরীর ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ চেরাগ গ্রন্থটি সংকলন করেন। মাওলানা মুহাম্মদ চেরাগ দেওবন্দের দারুল 'উলূম মাদরাসায় মাওলানা কাশ্মিরীর নিকট হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের গুজারনওয়ালায় শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত হন এবং সেখানে একটি উচ্চতর *ইসলামিক শিক্ষা ইনস্টিটিউট*-এ স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি মাওলানা কাশ্মিরীর নিকট থেকে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি পুন:পরীক্ষা করে দু'খণ্ডে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি গ্রন্থটির নাম দেন, '*আল-'উফুশ শাযি*'। এ গ্রন্থের ভূমিকায় মাওলানা মুহাম্মদ চেরাগ বিভিন্ন বিষয় সংক্ষেপে উত্থাপন করে কাজটি সমাপ্ত করেন। এটি মাওলানা কাশ্মিরীর উর্দূ ভাষায় পাঠদান ছিল; কিন্তু মাওলানা মুহাম্মদ চেরাগ

আরবী ভাষায় রূপান্তরিত করে প্রকাশ করেন। কিছু দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও দু'খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটি *মিশকাত শরীফ* থেকে শুরু করে *দাওরায়ে হাদীস* পর্যন্ত সকল শ্রেণির শিক্ষকের জন্য একটি পথপ্রদর্শক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।[৩৬]

২.৪ মা'আরিফুস-সুনান (معارف السنن)

এটি *সুনানু তিরমিযী*-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। আল-'উফুশ শাযির উপর ভিত্তি করে মাওলানা কাশ্মিরীর স্বনামখ্যাত শিষ্য আল্লামা সাইয়্যিদ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী এটি রচনা করেন। তিনি ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের মুহাব্বাতাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে *দারুল 'উলূম মাদরাসা*-এ মাওলানা কাশ্মিরীর অধীনে নিবন্ধিত হন। অত:পর ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে মাওলানা কাশ্মিরীর সঙ্গে তিনিও ডাভেল গমন করেন। এ সময় তিনি ছাত্র হিসেবে তাঁর নিকট থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন এবং তাঁর নিকট থেকে *সুনানু তিরমিযী*-এর ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। মাওলানা কাশ্মিরীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর *সুনানু তিরমিযী*-এর ব্যাখ্যামূলক বাণী গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে *'মা'আরিফু ফুস-সুনান'* নামে প্রকাশ করেন। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থখানি ছয় খণ্ডে *'আল-মাকতাবা আল-বিন্নুরী'* থেকে আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি কলেবর অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও তিরমিযী শরীফের বহু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের তুলনায় পাঠকের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। ভারত ও পাকিস্তানসহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র গ্রন্থটির সুখ্যাতি চোখে পড়ার মতো। এর থেকে উপকৃত হওয়া ছাড়া কোনো দ্বীনী শিক্ষাঙ্গনের আশানুরূপ সাফল্য অর্জন প্রায় অসম্ভব। তিরমিযীর অপরাপর ব্যাখ্যাদাতাদের উক্তিসহ মুহাদ্দিসদের দুষ্প্রাপ্য বহু তত্ত্বকথা এতে সংযোজন করা হয়েছে।[৩৭]

২.৫ আনোয়ারুল মাহমুদ (أنوار المحمود)

কাশ্মিরী দারুল 'উলূম দেওবন্দে শিক্ষকতাকালে তাঁর একজন সুনামধন্য ছাত্র সিদ্দিক নাজিবাবাদী তাঁর ক্লাস লেকচার এবং আদেশ-নির্দেশ সম্বলিত পাঠ লিপিবদ্ধ করেন। এগুলো আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যামূলক উর্দূভাষায় লিখিত তথ্যাবলী। *আনোয়ারুল বারী* গ্রন্থের লেখক সাইয়্যিদ আহমাদ রিযা বিযনুরী, সিদ্দিক নাজিবাবাদীকে কাশ্মিরীর একজন গুরুত্বপূর্ণ ছাত্র হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি পরে শায়খুল হাদীস হিসেবে *মাদরাসা সিদ্দিকিয়া দিল্লী*-এ নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন।[৩৮] মাওলানা সিদ্দিক তাঁর পাণ্ডুলিপি আকারে লিপিবদ্ধ করা ১০০০ পৃষ্ঠার এ পাণ্ডুলিপিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কাশ্মিরীর নিকট হস্তান্তর করেন। কাশ্মিরী তার পাণ্ডুলিপিটির কিছু সংশোধন করার প্রস্তাব করেন এবং সেটি পাবলিস করার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। অত:পর কাশ্মিরীর ইন্তিকালের মাত্র দু'মাস পর দু'খণ্ডে এটি প্রকাশিত হয়। এতে শাব্বির আহমাদ 'উসমানীর লিখিত কিছু টীকা সংযুক্ত ছিল। খলীল আহমাদ সাহারানপূরীর প্রণীত *বাযলুল মাজহুদ* গ্রন্থ থেকে বিমূর্তও রয়েছে যা *সুনানু আবি দাউদ*-এর একটি ভাষ্যগ্রন্থ হিসেবেও পরিচিত। উল্লেখ যে, এ গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।[৩৯]

২.৬ আসারুস সুনান (أثار السنن)

এটি রচনা করেন বিহারের বিখ্যাত 'আলিম মাওলানা জহিরুল হাসান নিমুবী। এ গ্রন্থে হানাফী ফিকহের সহায়ক হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে। দ্বিতীয়বার দেখে দেওয়ার জন্য গ্রন্থটি শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসানের নিকট পাঠানো হয়। তিনি একে মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরীর নিকট পাঠান। গ্রন্থটি দেখে মাওলানা কাশ্মিরী দারুণ আনন্দিত হন। সংকলকের প্রশংসায় দু'টো কাসিদাও রচনা করেন তিনি। তারপর এতে একটি পরিপূর্ণ টীকা সংযোজন করেন। হানাফী ফিকহের সহায়ক উপাদানগুলো প্রচুর পরিমাণে সন্নিবেশিত হওয়ায় খোদ টীকাটিই একটি জ্ঞানভাণ্ডারে পরিণত হয়।[৪০]

২.৭ ফাসলুল খিতাব ফী উম্মিল কিতাব (فصل الخطاب فى أم الكتاب)

ইমামের পিছনে মোকতাদিরের কেরাত পড়া সম্পর্কে মাওলানা কাশ্মিরী এ গ্রন্থটি প্রথম রচনা করেন। মাওলানা কাশ্মিরী এটি রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এর লাইনগুলো শাফেয়ী মতাবলম্বীদের ধারণার প্রতিবাদে লেখা হয়নি। ইমামের পিছনে কেরাত পরিহার প্রসঙ্গে শুধু হানাফীদের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য।[৪১] তাই আলোচনার দ্বার বন্ধ করতে চায় না। কথার প্রসঙ্গে কথা বলার পথ দীর্ঘায়িতও করতে চাই না। যদি পাঠক এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখেন তাহলে আমি তার কাছ থেকে নেক দোয়া এবং মৃত্যুর পর ইসালে সাওয়াবের আশা করি। যদিও এ সাওয়াবরেসানি শুধু ফাতেহা দিয়ে সম্ভব। কারণ যে তা না পড়ে, তার নামায হয় না। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ/১৩২৮ হিজরিসনে ১০৬ পৃষ্ঠার এ কিতাবটি '*মজলিসে ইলমী*' খুব গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করে।[৪২]

২.৮ খাতিমাতুল খিতাব ফী ফাতিহাতিল কিতাব (خاتمة الخطاب فى فاتحة الكتاب)

ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া সম্পর্কে এটি মাওলানা কাশ্মিরীর দ্বিতীয় রচনা। মাত্র একদিনে ফারসি ভাষায় তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থটি মাওলানা কাশ্মিরীর বিশিষ্ট শিক্ষক শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসানের লেখা ভূমিকাসহ দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত হয়।[৪৩]

২.৯ 'আকিদাতুল ইসলাম ফী হায়াতি 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম (عقيدة الإ سلام فى حياة عيسي عليه السلام)

১৮৫৭ সালের মুসলমানদের বিপর্যয়ের পর তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ব্রিটিশদের বিভিন্ন কোম্পানীগুলো তাদের পাশ্চাত্য কৃষ্টি-কালচারের ফলে মুসলমানদের ধর্মীয় অবক্ষয় সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশদের মদদে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ প্রদর্শন করেন। তিনি নিজেকে নবুওয়াতের দাবির পক্ষে মত পোষণ করেন। তিনি ইসলাম ও ধর্ম বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এছাড়া তিনি নিজেকে প্রতিশ্রুত মাসিহ বলে দাবি করেন। তিনি হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের মৃত্যু হয়ে গেছে বলে পরিষ্কার ঘোষণা দেন। কুরআনে উল্লিখিত হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের ঘটনাকে তিনি নিছক গালগল্প বলে অভিহিত করেন। পুনরায় তার পৃথিবীতে আগমনকে রূপকাহিনী বলে আখ্যা দেন। সে কখনো বলেন কাশ্মিরের রাজধানীতে তিনি সমাধিস্থ আছেন। কখনো বলেন তার সমাধি মক্কা বা মদীনায়। তার এসব বায়বীয় ও অসাড় কথার দাঁতভাঙ্গা জবাব হল এ গ্রন্থ। আরবী ভাষায় রচিত এ কিতাবটি মাওলানা কাশ্মিরী ১৩৪২ হিজরির রমযান মাসে রচনার কাজ সমাপ্ত করেন। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে মাওলানা মুহাম্মদ বিন্নুরী ৩৪০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে একটি ৩২ পৃষ্ঠার ভূমিকা সংযোজন করে প্রকাশ করেন। অত:পর ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে করাচীর *মজলিস-ই-'ইলমী* উক্ত নামে পুন:প্রকাশ করে।[৪৪]

২.১০ তাহিয়্যাতুল ইসলাম ফী হায়াতি 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম (تحية الإسلام فى حياة عيسي عليه السلام)

এ কিতাবটিও হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের জীবিত থাকা সম্পর্কে '*আকিদাতুল ইসলাম ফী হায়াতি 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম*' প্রণয়নের আট বছর পর ১৩৫১ হিজরিসনে মাওলানা কাশ্মিরী এটি রচনা করেন। তিনি ১৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থটির সূচনা করেন অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় আল্লাহর প্রশংসা এবং তার রাসূলের উপর দরুদ পাঠের মাধ্যমে। তারপর লেখেন, কুরআন ও হাদীসে হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের জীবিত থাকা সম্পর্কে যেসব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ রয়েছে, সেগুলোর উপর আমি ইতিপূর্বে কিছু লিখেছিলাম। কিন্তু তাতে কিছু বিষয় বাকি থেকে যায়। এ কারণে পুনরায় এ গ্রন্থটি রচনা করতে হলো। তবে এ গ্রন্থে অতিরিক্ত তথ্য ও যুক্তি রয়েছে। এর ভূমিকায় মাওলানা কাশ্মিরী তার এ রচনাটিকে এ বলে ন্যায্যতা দিয়েছেন যে একই বিষয়ে পূর্ববর্তী

গ্রন্থে তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে বাদ দিয়েছিলেন এবং মির্জা গোলাম আহমাদের কুফর সম্পর্কে উম্মতকে আরও সতর্ক করা দরকার। করাচীর *মজলিস-ই-'ইলমী* এ গ্রন্থটিকে '*আকিদাতুল ইসলাম ফী হায়াতি 'ঈসা (আ.)* গ্রন্থের সাথে একত্র করে ১৯৯৬ সালে এক খণ্ডে প্রকাশ করে।[৪৫]

২.১১ ইকফারুল মুলহিদীন (إكفار الملحدين)

মাওলানা কাশ্মিরী গ্রন্থটি সেসব নামধারী 'আলিমের বিপক্ষে রচনা করেন, যারা কাদিয়ানীদের কাফের মনে করত না। তাদের যুক্তি ছিল কাদিয়ানীরা আল্লাহ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতকে বিশ্বাস করে এবং আমাদের কেবলামুখী হয়ে নামায আদায় করে। তার পরেও তারা কাফের হবে কেন? এ গ্রন্থে মাওলানা কাশ্মিরী তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করেছেন। তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন, মাত্র কয়েকটি জিনিস মেনে এবং দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়াদি অস্বীকার করে কেউ মুসলমান থাকতে পারে না। এ বিষয়টিও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যেভাবে কোনো মুসলমানকে কাফের বলা জঘন্য কুফর, ঠিক সেভাবে কোনো কাফেরকে কাফের না বলা বা কাফের মনে না করাও প্রকাশ্য কুফর। গ্রন্থটিতে অনেক দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান কিতাবের উদ্ধৃতিও দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটি তাঁর জীবদ্দশায় ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর *মজলিস-ই-'ইলমী* থেকে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৩২। এ গ্রন্থটি আরবী থেকে উর্দূ ভাষায় তাঁর প্রিয় ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস মিরাঠী রচনা করে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে করাচীর *মজলিস-ই-ইলমী* থেকে প্রকাশ করেন। অত:পর ১৯৯৬ সালে করাচী থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৪৬]

২.১২ আত-তাসরীহ বিমা তাওয়াতারা ফী নুযুলিল মাসীহ (التصريح بما تواتر فى نزول المسيح)

এ গ্রন্থে কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের অবতরণের বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে। মাওলানা কাশ্মিরী এ সংক্রান্ত ৭০টি হাদীস এতে সন্নিবেশিত করেছেন। হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের জীবিত থাকা ও অবতরণ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন উক্তিও তোলে ধরেন তিনি। বিখ্যাত 'আলিম শায়খ 'আবদুল ফাত্তাহ আবুল গুদ্দাহ (মৃ ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) বৈরুত থেকে এর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং মাওলানা কাশ্মিরীর ছাত্র মুফতি মুহাম্মদ শফি (মৃ ১৯৭৫ খ্রি:) পাকিস্তানের মুলতানের *জমিয়ত তাহাফফুজ খাতমিন নবুয়্যাত* থেকে আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্তু দু'টি প্রকাশনায় কোন সন-তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। *নায়লুল আওতার* গ্রন্থের লেখক কাজী আল-শাওকানী এর একটি সংস্করণ প্রণয়ন করেন।[৪৭] অত:পর তিনি ১৯৯৬ সালে মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী এবং শায়খ 'আবদুল ফাত্তাহ আবুল গুদ্দাহর লেখা একটি ভূমিকাসহ (মৃ ১৯৭৭ খ্রি.) করাচীর *মজলিস-ই-'ইলমী* থেকে পুন:প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি মূল্যবান বহু টীকা যুক্ত করেন।[৪৮]

২.১৩ নায়লুল ফারকাদাইন ফী মাসআলাতি রাফয়িল ইয়াদাইন (نيل الفرقدين فى مسألة رفع اليدين)

নামাযে প্রথম তাকবির ছাড়া হাত তোলা ছিল ফকিহদের মধ্যে বিতর্কের প্রশ্ন এবং বর্তমান সময়ের জন্য একটি বিতর্কিত সমস্যা রয়ে গেছে। ইমাম শাফিঈর মতে রুকুর পরে হাত উঠানো উচিত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ভিন্ন মত পোষণ করেন। শাফিঈ ও হানাফী উভয় মাযহাবই এ বিষয়ে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসের ভিত্তিতে তাদের অবস্থানকে প্রমাণ করে। আরবী ভাষায় রচিত ১৪৫ পৃষ্ঠার এ কিতাবে মাওলানা কাশ্মিরী রুকুর পূর্বে, রুকুর পরে, উভয় সেজদার মাঝখানে এবং দু'রাকাতের পরে হাত উঠানো নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। এর মাধ্যমে মাসআলাটি একটি বলিষ্ঠ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রন্থটির সূচনায় তিনি বলেছেন, আমার এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য নামাযের ভিতরে হাত উঠানো ও না উঠনোর একটি মতামত প্রাধান্য দেওয়া। আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, হানাফী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী হাত না উঠানো দিকটি প্রমাণিত করে হাত উঠানোকে সর্বতোভাবে

অস্বীকার করা। কারণ হাত উঠানোও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। গ্রন্থটির পরিশিষ্টে কাশ্মিরী বলেন, এ বিষয়ে বিতর্কে নামতে হলে পর্যাপ্ত হাদীস অধ্যয়ন এবং ফকিহদের জ্ঞান ও সাক্ষ্য প্রমাণের উপর পরিপূর্ণ অবগতি প্রয়োজন। সবার পক্ষে এ নিয়ে আলোচনা করার কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হল, ভারতে একটি ফেরকার প্রচেষ্টায় মাসআলাটি বিশিষ্ট লোকদের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আম-জনতার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তারাও এখন নিজেদের এ নাজুক মাসআলার উপর কথা বলার যোগ্য বিবেচনা করছে। মাওলানা কাশ্মিরী এ গ্রন্থটি দারুল 'উলূম দেওবন্দে (১৯০৯-১৯২৭) শিক্ষকতা জীবনে আরবী ভাষায় রচনা করেন এবং ১৯৩১ সালে দিল্লী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের ভূমিকায় মাওলানা কাশ্মিরী বলেন, নামাযে হাত উত্তোলন সঠিক না ভুল তা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা এ জাতীয় উভয় প্রথাকে ন্যায়সঙ্গত বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। তার উদ্দেশ্য ছিল হানাফী মাযহাবের রায় এবং মতামত বর্ণনা করা। অত:পর ১৯৯৬ সালে করাচী থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৪৯]

২.১৪ বাসতুল ইয়াদাইন (بسط اليدين)

কিছু লেখার পর সে সম্পর্কে অনবরত গবেষণা করা মাওলানা কাশ্মিরীর সাধারণ অভ্যাস। নামাযের ভিতর হাত উঠানো ও না উঠানো সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনার পর পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী তিনি এ নিয়ে নতুন উদ্যমে গবেষণা শুরু করেন। তখন বেরিয়ে আসে এ বিষয়ে আরো নতুন তথ্য। সেসব তথ্যের সমন্বয়ে তিনি রচনা করেন এ গ্রন্থ। এটি রচনার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমার অভ্যাস হল, কোনো বিষয়কে তন্নতন্ন করে দেখা এবং যখন যে নতুন তথ্য হস্তগত হয় সঙ্গে সঙ্গে তা প্রকাশ করা, যাতে তা হারিয়ে না যায়। তিনি এ গ্রন্থখানি ৬৩ পৃষ্ঠায় আরবী ভাষায় রচনা করেন। এটি পূর্বের লিখিত গ্রন্থের সারসংক্ষেপ স্বরূপ। এ গ্রন্থটি সর্বপ্রথম ১৯৩২ সালে দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৯৬ সালে করাচী থেকে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়।[৫০]

২.১৫ কাশফুস সিতর 'আন সালাতিল বিতর (كشف الستر عن صلوة الوتر)

বিতর নামায ওয়াজিবসহ এর রাকাত সংখ্যা এবং আদায় পদ্ধতি নিয়ে ফকিহদের মাঝে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফার মতে বিতর নামায ওয়াজিব। যদি কেউ এশার নামাযের পর বিতর নামায আদায় না করে এবং ফজরের নামায আদায় করার সময় বিতরের কথা মনে পড়ে তাহলে তার মতে ওই ব্যক্তিকে প্রথমে বিতর আদায় করতে হবে। বিতর নামায তিন রাকাত এবং তা আদায় করতে হবে এক সালামে- এটাও ইমাম আবু হানিফার অভিমত। তবে অন্য ফকিহদের নিকট বিতর নামায আদায় করার ভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।[৫১] মাওলানা কাশ্মিরী হানাফী মাযহাবের পন্থাটি সুদৃঢ় প্রমাণ করতে গিয়ে ১০০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি আরবী ভাষায় লিখিত একটি প্রামাণ্য দলিল। গ্রন্থটি সর্বপ্রথম ১৯৩৪ সালে দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয়বার ১৯৯৬ সালে করাচী থেকে প্রকাশিত হয়।[৫২]

২.১৬ আদ-দারবুল খাতাম 'আলা হুদূসিল 'আলাম (الضرب الخاتم على حدوث العالم)

এটি চারশ' পঙ্‌ক্তির একটি কাব্যগ্রন্থ। এখানে মাওলানা কাশ্মিরী আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সর্বপরি তিনি বেষ্টনকারী জ্ঞান, অপরিসীম ক্ষমতা এবং তার অনাদি ইচ্ছাকে প্রমাণ করেছেন। মাওলানা কাশ্মিরী এটি ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে ডাভেলে অবস্থানকালে রচনা করেন। গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করাই আমার এ গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এ বিষয়ে ভব্যতা-বিবর্জিত বলে আমি *হুদুসে 'আলাম* বিষয়টিকে বেছে নিয়েছি। অথচ উভয় বিষয়ের ফল এক। প্রাচীন দর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে আল্লাহ ও প্রকৃতি সম্পর্কে যা কিছু পাওয়া যায়, তার সবকিছুই আমি এ কাবিতাগুচ্ছে যুক্ত করে দিয়েছি। এ বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞানভাণ্ডারের এমন কিছু নেই, যার উপর আমি চোখ বুলাইনি। বরং এ বিষয়ে

পৃথক পৃথক যেসব গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে, আমি তার প্রত্যেকটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হল, প্রাচীন ও আধুনিক সংগ্রহের মধ্যে আমি সন্তোষজনক তেমন কিছুই পাইনি। জালাল দেওয়ানী এ বিষয়ে যে প্রসিদ্ধ পুস্তকটি রচনা করেছেন তার মধ্যে কোনো সারবস্তু নেই। এখানে আমি যা কিছু বলেছি তার সবই আমার চিন্তাপ্রসূত। এ দাবি করতেও আমার কোনো দ্বিধা নেই যে, আমি এখানে এমন কিছু বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করেছি, যা ইতিপূর্বে কারো লেখনী থেকে নির্গত হয়নি।[৫৩] এ গ্রন্থটি ১৯৬২ সালে *মজলিস-ই-'ইলমী* করাচী থেকে প্রকাশিত হয়। এর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। এর পরিবেশক ছিল *ইদারাত আল-কুরআন আল-ইসলামিয়্যাহ*।[৫৪]

২.১৭ মিরকাতুত তারিম লি হুদুসিল 'আলাম (مرقاة الطارم لحدوث العالم)

এটি পূর্ববর্তী পুস্তকের পরিশিষ্ট। মাওলানা কাশ্মিরী এতে *যারবুল খাতাম* গ্রন্থের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ৬২ পৃষ্ঠার এ রচনাটি তিনি ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে ডাভেল মাদরাসায় পাঠদানকালে রচনা করেন এবং সেই বছরই '*মজলিস-ই-'ইলমী*' যত্নসহকারে প্রকাশ করে। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে মাওলানা কাশ্মিরী বলেন, *হুদুসে 'আলাম* (পৃথিবী নশ্বর) মাসআলাটি নিয়ে প্রাচীন যুগ থেকে বিতর্ক চলে আসছে। এ সম্পর্কে বহু আলোচনা ও পর্যালোচনা হলেও কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। এতে বর্ণিত বিষয়গুলো আমার চিন্তাভাবনার ফল। আমার সিংহভাগ সময় ব্যয় করার পর এটা আমি অর্জন করেছি। ইতিপূর্বে '*যারবুল খাতাম*' শীর্ষক যে পুস্তক রচনা করেছি, তার আলোচ্য বিষয় সহজ ও সাবলীল করার জন্য এ পুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।[৫৫]

২.১৮ সাহমুল গায়ব ফী কাবাদি আহলিল রায়ব (سهم الغيب فى كبد اهل الريب)

একবার রায়বেরেলির এক বিদআতী তার্কিক দিল্লি এসে দেওবন্দের উপর বিভিন্ন ভিত্তিহীন আপত্তি উত্থাপন শুরু করে। হকপন্থীদের গাল-মন্দ করতে থাকে। সে তার ভ্রান্ত 'আকিদা সম্বলিত দু'পৃষ্ঠার একটি লিফলেট ছাপিয়ে বিলি করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আলীমুল গায়েব প্রতিপন্ন করে একটি পুস্তকও প্রকাশ করে। মাওলানা কাশ্মিরী তার অপতৎপরতা সম্পর্কে অবগত হন। তার রচিত পুস্তিকার জবাবে তিনি ২২ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এতে তিনি বিভিন্ন দলিলের মাধ্যমে সঠিক 'আকিদা প্রমাণ করেন। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে দেওবন্দী 'আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গি তোলে ধরেন। গ্রন্থটির শেষে একটি আরবি কাসিদা সন্নিবেশিত করা হয়। এতে দারুল 'উলূমের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জ্ঞান-গরিমার কথা বর্ণনা করা হয়।[৫৬]

২.১৯ কিতাবুন ফীয-যাব্বি 'আন কুররাতিল 'আইনাইন (كتاب فى الذب عن قرة العينين)

শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. '*কুররাতুল 'আইনাইন ফী তাফজিলিস শায়খাইন*' শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর উপর অধিক মর্যাদা প্রদান করেন। জনৈক শিয়া লেখক এ মতের বিরোধিতা করে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। তাতে তিনি হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর উপর হযরত আলীকে অধিক মর্যাদা প্রদান করেন। মাওলানা কাশ্মিরী দিল্লীর আমিনিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা জীবনে শিয়া 'আলিমের এ মতের বিরোধিতা করতে গিয়ে গ্রন্থটি রচনা করেন।[৫৭]

২.২০ খাতামুন নাবিয়্যিন (خاتم النبيين)

কাদিয়ানী বিশ্বাস এবং কাশ্মিরে এর শিক্ষার প্রচার-প্রসার বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মাওলানা কাশ্মিরীকে বিরক্ত করে তোলে। তাদের এ ধারণার বিষক্রিয়া পাঞ্জাবের সীমানা পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে। দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার কারণে কাশ্মিরের মুসলমানেরা এর সহজ শিকারে পরিণত হয়।

মাওলানা কাশ্মিরী তখন অন্তিম শয্যায় শায়িত, কিন্তু নিজ এলাকার এ বেহাল পরিস্থিতি তাকে উৎকণ্ঠিত করে তোলে। দেশের জনগণকে কাদিয়ানীদের বিষাক্ত ছোবল থেকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেন। এটি তাঁর সর্বশেষ রচনা। আল-কুরআনের বাণী, ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين-[৫৮] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে তিনি রাসূল (স.)-এর শেষ নবী হওয়ার ব্যাপারে একশ'টি প্রমাণ উপস্থাপন করেন। গ্রন্থটিকে মাওলানা কাশ্মিরী আখেরাতের সম্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ৩০৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি ফারসি ভাষায় অনূদিত হয় এবং মাওলানা কাশ্মিরীর ইন্তিকালের দু'বছর পর *মজলিস-ই-'ইলমী* করাচী থেকে প্রকাশিত হয়। এ বইটির উর্দূ অনুবাদ মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবীর দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল এবং একই প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মাওলানা আতিকুর রহমান 'উসমানী এবং মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী এ সংস্করণের মুখ্য ভূমিকা লেখেন।[৫৯]

২.২১ দা'ওয়াতে হিফযিল ঈমান (دعوة حفظ الايمان)

মাওলানা কাশ্মিরীর মৃত্যুর তিন দিন আগে কাদিয়ানবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত *ইমদাদ-ই-ইসলাম* নামে একটি সংগঠন দেওবন্দের জামে মসজিদে একটি ইসলামী সম্মেলনের আয়োজন করে। জুমার নামাযের পর কার্যক্রম শুরু হয়। এ সম্মেলনে মাওলানা কাশ্মিরীকে কাদিয়ানবাদের হুমকির উপর একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করতে বলা হয়। কিন্তু তিনি অসুস্থতার কারণে ব্যক্তিগতভাবে সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেননি। তাই তিনি উর্দূ ভাষায় লিখিত একটি অনুরোধ পত্র সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের পাঠ করে শোনানোর জন্য প্রেরণ করেন। সেই পত্রে মাওলানা কাশ্মিরী কিছু কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছিলেন যার দ্বারা কার্যকরভাবে অ-ইসলামী সম্প্রদায়ের বিস্তারকে প্রতিরোধ করতে এবং মুসলমানদের ঈমানকে রক্ষা ও সংরক্ষণ করা যেতে পারে। গবেষণাপত্রটি সঠিক 'আকীদা, ঈমান এবং খাতামুন নুবুওয়াহ ইত্যাদির মতো বেশ কয়েকটি বিষয়কেও স্পর্শ করেছিল। *ইমদাদ-ই-ইসলাম* মাওলানা কাশ্মিরীর মৃত্যুর পর সেই গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করেছিল এবং বিযনুরের মদীনা প্রেসে এটি ছাপানো হয়। এ গ্রন্থটি ৪০ পৃষ্ঠার ছিল। এ পুস্তকে তিনি কাদিয়ানী ফেতনার মারাত্মক দিকগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।[৬০]

২.২২ আন-নূর আল-ফায়িজ 'আলা নাজমিল ফারায়িয (النور الفائض على نجم الفرائض)

উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের শর'ঈ আইন বিষয়ক ফারসি ভাষায় রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ এটি। এ গ্রন্থে ইসলামের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ বইটির একটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি উত্তরাধিকার আইনের একটি সরলীকৃত সংস্করণ। মাওলানা কাশ্মিরীর কবিতা আকারে বইটি লেখার উদ্দেশ্য হলো যাতে ছাত্রদের এ আইনগুলো মুখস্ত করতে সহজ হয়। এ গ্রন্থে ১৯২টি পঙ্ক্তি রয়েছে। গ্রন্থটি রচনার পর মাওলানা কাশ্মিরী তার অন্যতম প্রিয়শিষ্য মাওলানা ফখরুদ্দীন আহমাদ মুরাদাবাদীকে নিয়মিত পাঠ্য হিসেবে পড়ান। তারপর স্মারক হিসেবে এটি তাকে উপহারও দেন। মাওলানা মুরাদাবাদী এ স্মৃতিচিহ্নটি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত না করে ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ/১৩৫৬ হিজরিসনে মুরাদাবাদ থেকে প্রকাশ করেন।[৬১] মাওলানা মুরাদাবাদী একজন দারুল 'উলূম দেওবন্দের যোগ্যতা সম্পন্ন ধর্মীয় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং মুরাদাবাদে ৪৭ বছর অধ্যাপনা করেন। যাহোক, শায়খুল হাদীস হুসাইন আহমাদ মাদানীর ১৯৫৭ সালে ইন্তিকালের পর তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস হিসেবে নিযুক্ত হন।[৬২]

২.২৩ খাযায়িনুল আসরার (خزائن الاسرار)

মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী যখন যে গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতেন তখন তা লিখে রাখতেন, এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এ গ্রন্থটি বিভিন্ন দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য তত্ত্ব-উপাত্য দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। মাওলানা কাশ্মিরী বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়নের সময় এসব বিষয় সংগ্রহ করেছিলেন। মাওলানা কাশ্মিরীর

এ গ্রন্থখানি জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত আল্লামা কামালউদ্দীন আল-দামিরী লিখিত *হায়াত আল-হায়ওয়ান* গ্রন্থের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ৬৫ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থখানি প্রথম *মজলিস-ই-'ইলমী* দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ড. মুজাফফর আল-হাসান মুঙ্গিরী এটি উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন এবং *ইদারা-ই-ইসলামিয়্যাহ* প্রেস লাহোর, পাকিস্তান থেকে প্রকাশ করেন।[৬৩]

উপসংহার

আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী ছিলেন তাঁর সমসাময়িককালে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর খান্দান ও পরিমণ্ডলে শিক্ষানুরাগী এবং আধ্যাত্মিক পুরুষের সমাবেশ বিদ্যমান ছিল। পূর্ব পুরুষাগত ঐতিহ্য অনুযায়ী তিনি যুগপৎভাবে ইসলামী শিক্ষা এবং সূফীতত্ত্বে অনুপ্রাণিত হন। তিনি কাশ্মির থেকে দেওবন্দে আসেন এবং দারুল 'উলূম মাদরাসায় কয়েকজন প্রখ্যাত মুসলিম পণ্ডিতের অধীনে অধ্যয়ন করে হাদীস সাহিত্যে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি তার ন্যায়পরায়ণতা, ভক্তি ও ধার্মিকতার পাশাপাশি তার সাহিত্যিক অবদান এবং ইসলামী বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপলব্ধির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। জ্ঞানার্জনের জন্য তার ছিল উদ্যম এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীস প্রচারের প্রবল আগ্রহ। তিনি একজন অনুকরণীয় শিক্ষক ছিলেন। কাশ্মিরীর ছাত্র হওয়াকে সম্মান ও সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করা হত। দেওবন্দে শিক্ষকতার আঠারো বছর অতিবাহিত করার সময় তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট 'আলিম তৈরি করেন। তাঁর সমসাময়িকরা তাঁর মতামতকে সম্মান করতেন এবং প্রায়শই অনেক বিষয়ে তাঁর পরামর্শ চাইতেন। ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন শাখায় তিনি সমানভাবে দক্ষ ছিলেন। কাশ্মিরী শিক্ষাদানের পাশাপাশি ইসলাম প্রচারেও কিছু সময় ব্যয় করেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন এবং ইসলামের সুরক্ষায় সাহিত্য রচনা করেন। এমনকি কাদিয়ানী ধর্মদ্রোহিতার প্রশ্নে বিতর্কে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। মুসলমানদের রাজনীতিতে তার সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে তিনি ব্রিটিশদের ভারত দখল তীব্র বিরোধিতা করেন এবং ব্রিটিশদের অধীনে চাকরী না করার জন্য অনুরোধ করেন। এভাবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আহ্বানে সমর্থন করতে তার কোনো দ্বিধা ছিল না। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, মুসলমানদের একটি পৃথক রাষ্ট্রের দাবি করার কোন প্রয়োজন নেই, তবে যতদিন তাদের জীবন, ধর্ম এবং ধর্মীয় অনুশীলনগুলো সুরক্ষিত হতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের পক্ষে স্বাধীনতার পরে ভারতে বসবাস চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। তিনি নিজেকে আজীবন দ্বীনের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে অমরত্ব লাভ করেন এবং মুসলিম সমাজে আজও তিনি সমাদৃত হয়ে রয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

১ Yunoos Osman, *Life and works of 'Allamah Muhammad Anwar Shah Kashmiri* (Westville: University of Durban, 2001), P: 33.

২ মাস'উদ আহমাদ কাসিম, *সিরাত-ই-আনোয়ার* (দেওবন্দ: ইদারাত-ই-হাদী, তা. বি.), পৃ: ৯।

৩ আনজার শাহ মাস'উদী, *নকশ-ই-দাওয়াম* (ভারত: দেওবন্দ, শাহ একাডেমী, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৬), পৃ: ২৭।

৪ সাইয়্যিদ আহমাদ বিযনুরী, *আনোয়ারুল বারী* (গুজরানওয়ালা: মাকতাবাত-ই-হাফিজিয়াত, ১৯৮১), পৃ: ২৩১।

৫ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী, *মুশকিলাতুল কুরআন* (মালিগাঁওঃ ইলমী প্রেস, ১৯৭৪), পৃ: ৫।

৬ খলীল আহমাদ সাহারানপূরী ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপূর জেলার আম্বাঠায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সাইয়্যিদুনা আইয়ুব আল-আনসারী (রা.)-এর বংশধর। তিনি নিজ গ্রামেই তাঁর চাচা মাওলানা আনসার 'আলীর তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক আরবি ও ফারসি ভাষা অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে দেওবন্দে দারুল 'উলূম মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেখানে ভর্তি হন। কিন্তু তিনি মাযাহিরুল 'উলূম মাদরাসায় পাঠ সমাপ্ত করেন। কথিত আছে যে, তিনি মাত্র এক বছরে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। অত:পর তিনি হাদীসে পারদর্শী হওয়ার জন্য দারুল 'উলূম মাদরাসায় ভর্তি হয়ে দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বেশ কয়েকটি ইসলামী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। অত:পর ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সাহারানপূরে ফিরে এসে মাযাহিরুল উলূম মাদরাসায় ১৯ বছর অধ্যাপনা করে মদীনা মনাওয়ারায় হিজরত করেন। সেখানে

তিনি ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। দ্রঃ *Life and works of 'Allamah Muhammad Anwar Shah Kashmiri,* p: 37-38.

৭ গোলাম রাসূল হাজারা থেকে এসেছেন যা বর্তমানে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অংশ। তিনি ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদরাসায় অধ্যয়ন শেষ করে ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। এ মাদরাসায় তিনি ৩০ বছর সুনামের সাথে অধ্যাপনা করেন। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দেওবন্দে ইন্তিকাল করেন। দ্রঃ *Life and works of 'Allamah Muhammad Anwar Shah Kashmiri,* p: 37.

৮ কাশ্মিরী, *রাসায়েল আল-ইমাম আল-কাশ্মিরী*, ১ম খণ্ড (করাচীঃ ইদারাতুল কুরআন, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হিজরি), পৃঃ ১০।

৯ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী, *নাফহাতুল আমবার ফী হায়াতি আশ-শায়খ আনোয়ার* (করাচীঃ আল-মাকতুবাতুল বিন্নুরীয়া, ২য় সংস্করণ, ১৪২৪ হিজরি), পৃঃ ৪৮।

১০ *তদেব*, পৃঃ ৪৯।

১১ আমিনুদ্দীন ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের দাক্ষিণাত্যের আওরঙ্গাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দিল্লীর শহরতলী চাঁদনী চকে মাদরাসা আমিনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জুন ইন্তিকাল করেন। দ্রঃ *Life and works of 'Allamah Muhammad Anwar Shah Kashmiri,* p: 39.

১২ 'আবদুল হাই ইবন ফখরুদ্দীন আল-হাসানী, *নুযহাতুল খাওয়াতির* (করাচীঃ আসাহ আল-মাতাবী, ১৯৭৬), পৃঃ ৮২।

১৩ সাইয়্যিদ আহমাদ রিযা বিযনুরী, *আনোয়ারুল বারী*, ২য় খণ্ড (দেওবন্দঃ ন্যাশনাল প্রিন্টিং প্রেস, তা. বি.), পৃঃ ২৩৮।

১৪ *নকশ-ই-দাওয়াম*, পৃঃ ৪৯।

১৫ মাওলানা কারী মুহাম্মদ তাইয়্যিব, *নূরুল আনোয়ার* (দেওবন্দঃ ইদারা-ই-হাদী, তা. বি.), পৃঃ ৭৫।

১৬ *নকশ-ই-দাওয়াম*, পৃঃ ৭৫।

১৭ *তদেব*, পৃঃ ৮১।

১৮ সাইয়্যিদ আহমাদ রিযা বিযনরী, *মালফুযাত-ই-মুহাদ্দিস কাশ্মিরী* (করাচীঃ দাওয়াত-ই-ইসলাম, তা. বি.), পৃঃ ৩৯।

১৯ *তদেব*।

২০ শাব্বির আহমাদ 'উসমানী, *আল-কুরআন আল-হাকিম* (করাচীঃ তাজ আর্ট প্রেস, তা. বি.), পৃঃ ৩৮৮।

২১ *সিরাত-ই-আনোয়ার*, তদেব, পৃঃ ৪৮।

২২ *মালফুযাত-ই-মুহাদ্দিস কাশ্মিরী*, পৃঃ ৪১; *নকশ-ই-দাওয়াম*, পৃঃ ২৮৫।

২৩ *মালফুযাত-ই-মুহাদ্দিস কাশ্মিরী*, তদেব।

২৪ *তদেব*, পৃঃ ৪২।

২৫ *তদেব*।

২৬ *সিরাত-ই-আনোয়ার*, পৃঃ ৪৮

২৭ *আনোয়ারুল বারী*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৪; *নকশ-ই-দাওয়াম*, পৃঃ ২৯৫।

২৮ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী, *নাফহাতুল আমবার* (পাকিস্তানঃ করাচী, আল-মুজলিস আল-ইলমী, ১৯৬৯), পৃঃ ১১৬; *আনোয়ারুল বারী*, ২য় খণ্ড, তদেব।

২৯ তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের শাহজাহাপূর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেওবন্দে হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ৮৬ বছর বয়সে দিল্লীতে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। দ্রঃ *Life and works of 'Allamah Muhammad Anwar Shah Kashmiri,* p: 57.

৩০ *আনোয়ারুল বারী*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৪; *নকশ-ই-দাওয়াম*, পৃঃ ২৯৪।

৩১ *নকশ-ই- দাওয়াম*, পৃঃ ২৯৮।

৩২ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ফারুক আনসারী, *আশ-শায়খ মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ আল-কাশ্মিরী ওয়া আরাউহু আল-ই'তিকাদীয়্যাত* (সৌদি আরবঃ উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০), পৃঃ ৫৯; *নকশে দাওয়াম*, পৃঃ ২৯৯।

৩৩ মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী, *মুশকিলাতুল কুরআন* (ভারতঃ সুরাট, মালিগাঁ, মুজলিস-ই-ইলমী, ১৯৭৪), পৃঃ ১৩৮-১৩৯।

34 *Life and works of 'Allamah Muhammad Anwar Shah Kashmiri*, pp: 62-65.

৩৫ সাইয়্যিদ মাহবুব রিযবী, *তারীখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ*, ২য় খণ্ড (করাচীঃ কুতুবখানা মাকাতুবা-ই-ইলম ওয়া আদব, তা. বি.), পৃঃ ১৪১।

৩৬ মুহাম্মদ চেরাগ, *আল-আরফুজ শাযি* (হাকিম সাইয়্যিদ, তা বি.), পৃঃ ২।

৩৭ ইউসুফ বিন্নুরী, *মা'আরিফ আস-সুনান* (করাচীঃ মাকতাব-ই-বিন্নুরী, ১৯৯৩), পৃঃ ৪৮।

[৩৮] সাইয়্যিদ আহমাদ রিযা বিজনুরী, *আনোয়ারুল বারী*, ৮ম খণ্ড (দেওবন্দ: ন্যাশনাল প্রিন্টিং প্রেস, তা. বি.), পৃ: ২৬০।

[৩৯] *নকশে দাওয়াম*, পৃ: ২০৭।

[৪০] সিরাজুল ইসলাম, *আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরী রহ. জীবন, কর্ম ও অবদান* (ঢাকা: মাকতাবাতুল আফনান,২০১৭), পৃ: ২৯৪।

[৪১] আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী, *ফাসলুল খিতাব ফী উম্মিল কিতাব* (করাচী: মজলিস-ই-ইলমী, ১৯৯৬), পৃ: ১৫২।

[৪২] সুলাইমান ইবন আল-আসআদ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবি দাউদ* (করাচী: হাকিম মুহাম্মদ সাঈদ, তা. বি.), পৃ: ১১৮।

[৪৩] *Life and works of 'Allamah Muhammad Anwar Shah Kashmiri*, p: 81.

[৪৪] *Life and works of 'Allamah Muhammad Anwar Shah Kashmiri*, pp: 71-73.

[৪৫] আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী, *তাহিয়াতুল ইসলাম ফী হায়াতি 'ঈসা* (করাচী: মজলিস-ই-ইলমী, ১৯৯৬), পৃ: ৩৯।

[৪৬] *নাফহাতুল আমবার*, পৃ: ১১৬.

[৪৭] *নকশে দাওয়াম*, পৃ: ৩১৭।

[৪৮] *Life and works of 'Allamah Muhammad Anwar Shah Kashmiri*, pp: 75-76.

[৪৯] *Ibid*, pp: 83-84.

[৫০] *Ibid*, p: 84.

[৫১] মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী, *কাশফুস সিতর 'আন সালাতিল বিতর* (করাচী: মজলিস-ই-ইলমী, ১৯৯৬), পৃ: ২।

[৫২] *Life and works of 'Allamah Muhammad Anwar Shah Kashmiri*, pp: 84-85.

[৫৩] *নাফহাতুল আমবার*, পৃ: ১২৫।

[৫৪] *Life and works of 'Allamah Muhammad Anwar Shah Kashmiri*, p: 67.

[৫৫] *আল-খায়ের, জামি খায়ের আল-মাদারিস* মাসিক পত্রিকা, মুলতান, পাকিস্তান, জুলাই ১৯৯৩, পৃ: ৩৫।

[৫৬] মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ফারুক আনসারী, *আশ-শায়খ মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ আল-কাশ্মিরী ওয়া আরাউহু আল-ই'তিকাদীয়াত* (সৌদি আরব: উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০), পৃ: ৬৩-৬৪।

[৫৭] *আশ-শায়খ মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ আল-কাশ্মিরী ওয়া আরাউহু আল-ই'তিকাদীয়াত*, পৃ: ৬৪; *নাফহাতুল আমবার*, পৃ: ৩২৫-৩২৬।

[৫৮] আল-করআন, ৩৩ ঃ ৪০।

[৫৯] *Life and works of 'Allamah Muhammad Anwar Shah Kashmiri*, pp: 76-77.

[৬০] *Ibid*, p: 78.

[৬১] *Ibid*, p: 82.

[৬২] *Ibid*, p: 82.

[৬৩] *Ibid*, p: 85.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

মানবজীবনে তাওহীদের গুরুত্ব
(The Significance of Tawheed in Human Life)

আব্দুল্লাহ্*

Abstract: Tawheed means recognizing Almighty Allah as the only one in ibadah (worship), which is the first and most important thing in Islam. All teachings and ideals of Islam are founded on Tawheed, which is mandatory (farj) to be implemented in human life, since Almighty Allah has created man only to implement Tawheed. Moreover, the implementation of Tawheed encourages people to worship Allah. As a result, people do righteous good deeds for the sake of Allah, the Omnipotent and abandon dishonest as well as the obscene seeds. In addition to that, peace and order are established in human life and ultimate success is achieved in the hereafter. In fact, Tawheed opens the door to escape (from jahannam) and success in all stages of human life. For this reason the significance of Tawheed in human life is beyond limits.

ভূমিকা
মহান আল্লাহ হলেন সকল কাজের একক ব্যবস্থাপক ও সৃষ্টিকারী, তিনি তাঁর রাজত্বে এবং কার্যক্রমে একক, তাঁর কোন সমকক্ষ নেই, তিনি তাঁর ইবাদতে একক, উত্তম নামসমূহের অধিকারী এবং অন্যরা ব্যতীত তিনিই ইবাদতের একমাত্র অধিকারী। এগুলোই হলো তাওহীদের মূল কথা। যার জন্য মহান আল্লাহ জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন এবং নবী-রাসূলগণ প্রেরণ করেছেন। এ তাওহীদই দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়ার সর্বপ্রথম সোপান এবং আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌঁছার জন্য বান্দার সর্বপ্রথম ধাপ। এজন্যই প্রত্যেক মুসলিমের তাওহীদ জানা ফরয। কেননা তাওহীদ দ্বীনের সর্বশ্রেষ্ঠ বুনিয়াদ। সকল মূলনীতির মূল এবং আমলের ভিত্তি।

তাওহীদের পরিচয়
তাওহীদ (توحيد) শব্দটি আরবী। এটা (وَحَّدَ يُوَحِّدُ تَوْحِيْدًا) ক্রিয়ামূল থেকে উৎপত্তি।[১] আভিধানিক অর্থ, 'কোন জিনিসকে একক করা'[২] বা 'কোন জিনিসকে অন্য জিনিস হতে একক করা'।[৩] 'ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাকে একক গণ্য করাই তাওহীদ।[৪] আর তাহলো আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী হওয়া। তাঁর রুবূবিয়্যাহ, আসমা ওয়া সিফাত, উলূহিয়্যাহ এবং 'ইবাদতে তাঁর কোন শরীক বা সমকক্ষ নেই। তিনি পবিত্র ও সুউচ্চ এবং একক।[৫] ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে তাওহীদ নামকরণ করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাজত্বে এবং কার্যক্রমে একক, তাঁর কোন সমকক্ষ নেই, তিনি তাঁর অস্তিত্ব এবং সিফাতে একক অদ্বিতীয়, তাঁর ইলাহিয়্যাত এবং 'ইবাদতে একক; ইসলামী জীবন ব্যবস্থা এগুলোর উপর ভিত্তিশীল।[৬] আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ '(হে নবী!) আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ একক (ও অদ্বিতীয়)'।[৭] তাওহীদের মূল কথা হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক গণ্য করা এবং তিনি ব্যতীত অন্যান্য মা'বূদ এবং আরবাবদের[৮] অস্বীকার করা।[৯] এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান সৃষ্টিদ্বয় জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।[১০] রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন[১১], আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন।[১২]

তাওহীদের প্রকার
তাওহীদ তিন প্রকার।
১. তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ ২. তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ ৩. তাওহীদুল আসমা ওয়া সিফাত।

১. তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ
তাওহীদুর রুবূবিয়াহ হল আল্লাহর কর্মে আল্লাহকে একক গণ্য করা।[১৩] অর্থাৎ তাঁকে সৃষ্টি, কর্তৃত্ব ও পরিচালনায় একক হিসাবে নির্ধারণ করা'।[১৪] কেননা তিনিই আসমান যমীনের সকল সৃষ্টি, সৃষ্টিজীব ও বস্তুর একচ্ছত্র প্রতিপালক, স্রষ্টা, মালিক ও পরিচালক।[১৫] ইহকাল, পরকাল এবং বিচার দিবসের মালিক।[১৬] আদেশ, নিষেধ এবং হুকুমের একমাত্র অধিকারী।[১৭] সৃষ্টি করা, রিজিক দেয়া এবং সমগ্র সৃষ্টি জগৎ

---

* পিএইচ. ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন এক ও অভিন্ন রব বা প্রতিপালক।[১৮] যিনি অফুরন্ত নে'আমতের মাধ্যমে গোটা সৃষ্টি জগৎকে প্রতিপালন করছেন।[১৯] তিনি কোন সাহায্যকারী এবং অংশগ্রহণকারী ছাড়াই সৃষ্টি, আদেশ, নির্দেশ, মালিক, পরিচালনা, আবিষ্কার এবং সৃষ্টিজগতকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করার একমাত্র অধিকারী; যার কোন শরীক নেই।[২০] আর এ কারণেই আসমান, যমীন, তারকারাজি, পশু-পাখি, গাছ-পালা, দুনিয়াবাসী, জল-স্থলবাসী, ফেরেশতা, জিন এবং ইনসানসহ সবকিছুই স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহর বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর দুনিয়াবী নির্দেশ মেনে চলে।[২১] যা কিছু গগণে ও ভূমণ্ডলে রয়েছে তা আল্লাহর জন্য; সবই তাঁর আজ্ঞাধীন'।[২২] আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তাঁরই অনুগত এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাবে'।[২৩] শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (৬৬১-৭২৮ হি.) বলেছেন, 'পৃথিবীর সকল কিছু স্বভাবগতভাবেই আল্লাহর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে। সকলেই তাঁর নিকটে বিনয়ী ও তাঁর মুখাপেক্ষী। তার কারণগুলো হলো- ১. একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই চাহিদা ও প্রয়োজনসমূহ পূরণ করেন এ বিষয়ে সকলের জ্ঞান রয়েছে। ২. নিরুপায়ের সময় সকলেই কেবল মাত্র মহান আল্লাহকেই আহ্বান করে। ৩. আল্লাহর ইচ্ছা ও নিয়তি সকলেই মানে এবং এর প্রতি বশ্যতা স্বীকার করে।[২৪]

এ প্রকার তাওহীদ সাব্যস্ত করা সকলের জন্য অপরিহার্য।[২৫] কেননা তা তাওহীদুল উলূহিয়্যাহকে আবশ্যক ও অপরিহার্য করে। যে ব্যক্তি তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহকে একক ইলাহ আল্লাহর জন্য স্বীকার করে এবং বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টি, কর্তৃত্ব ও পরিচালনায় আল্লাহ একক এবং তিনি ব্যতীত কেউ তাঁর অংশীদার ও সমকক্ষ নেই। তার জন্য ইহা স্বীকার করাও আবশ্যক হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ কোন প্রকার 'ইবাদতের হক্বদার বা যোগ্য নেই।[২৬] 'ইবাদতের একমাত্র যোগ্য এবং সত্য মা'বূদ হলেন মহান আল্লাহ। আর এটাই হল তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ।

২. তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ

তাওহীদুল উলূহিয়্যাহকে তাওহীদুল ইবাদাহ বলা হয়।[২৭] আর তাহলো 'ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক গণ্য করা। অর্থাৎ কুরবানী, নযর, দু'আ, ভরসা, ভয়-ভীতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, তওবা, প্রত্যাশা এবং 'ইবাদতের অন্যান্য প্রকারগুলোকে একক মা'বূদ আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্র করা; যার কোন শরীক নেই।[২৮] আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন সেই উপাস্য-মা'বূদ, হৃদয়ের অবশ্য করণীয় কাজ হলো যার ''ইবাদত করা এবং তাঁর উদ্দেশ্যে বিনীত-বিনম্র ও অনুগত হওয়া। কেননা তিনি মহান রব, এ জগতের স্রষ্টা, জগতের সকল বিষয়ের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক, সকল পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী, সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এজন্যই পরিপূর্ণ বিনয় ও নম্রতা একমাত্র তাঁর জন্য ছাড়া আর কারো জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। 'ইবাদতের তিনিই একমাত্র যোগ্য। যেহেতু সৃষ্টি, উদ্ভাবন ও পুর্নগঠনের কাজে তিনি একক, সে ক্ষেত্রে আর কেউই তাঁর শরীক হয়নি, তাই সমীচীন হলো তিনি ব্যতীত আর সকলকে বাদ দিয়ে একমাত্র তাঁরই 'ইবাদত করা, তাঁর 'ইবাদতে তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক না করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ 'তাদেরকে কেবল আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে শুধু আল্লাহর 'ইবাদত করবে'।[২৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا 'এবং তোমরা আল্লাহরই 'ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন বিষয়ে অংশীদার স্থাপন করো না'।[৩০] তিনি প্রত্যেক নবী-রাসূলকে তাঁর 'ইবাদতের দিকে আহ্বান করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।[৩১] আর ফিতরাতও এটার সাক্ষ্য বহন করে।[৩২] তাছাড়া বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার হলো তারা তাঁর 'ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না।[৩৩]

'ইবাদতের অর্থ

আভিধানিক অর্থে 'ইবাদত হলো অবনত হওয়া, অনুগত হওয়া, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে আত্মসমর্পণ করা, তাঁর নিষেধকে বর্জন করা, তাঁর নৈকট্য লাভ করা, তাঁর প্রতিদানের আশা করা, তাঁর ক্রোধ ও শাস্তির ব্যাপারে সর্তক থাকা।[৩৪] শরী'আতের পরিভাষায় 'ইবাদত হচ্ছে আল্লাহকে একক জেনে তাঁর নিকট অবনত হওয়া এবং ঐ কর্মের প্রতি আত্মসমর্পণ করা, যার ব্যাপারে তিনি আদেশ করেছেন এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা।[৩৫] এছাড়া আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন এমন সব প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কথা ও কাজ[৩৬] এবং রাসূলগণের দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহর নির্দেশিত যাবতীয় ব্যাপারে

আনুগত্য করা।[৩৭] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেছেন ও যা থেকে নিষেধ করেছেন[৩৮] এবং তাঁর রাসূল (সা.) যা আদেশ করেছেন ও যা থেকে নিষেধ করেছেন তাই 'ইবাদত।[৩৯] 'ইবাদতের অসংখ্য প্রকার রয়েছে। যেমন দৈহিক 'ইবাদত, আর্থিক 'ইবাদত এবং দৈহিক ও আর্থিক মিলিত 'ইবাদত।[৪০] তবে শরীরের যে সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ দ্বারা 'ইবাদত আদায় করা হয়, সে অনুযায়ী 'ইবাদত তিন প্রকার।[৪১] **১.** অন্তরের 'ইবাদত ২. জিহ্বার 'ইবাদত ৩. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের 'ইবাদত। 'ইবাদত আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর কথায় সীমাবদ্ধ। কুরআন সুন্নাহ ব্যতীত কোন বিষয়ই 'ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে না। কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা যা প্রমাণিত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।[৪২]

'ইবাদতের রুকন

'রুকন' অর্থ স্তম্ভ। এটা এমন বিষয় যে, কোন জিনিসের প্রকৃত অবস্থা যার উপর নির্ভর করে এবং তার দ্বারা সম্পন্ন হয়।[৪৩] যেমন (اركان الاسلام) ছালাতের রুকন। যা ইচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে ছালাত বাতিল হয়ে যায়। 'ইবাদত তিনটি রুকন বা ভিত্তির উপর স্থাপিত।[৪৪] যার কোন একটি পরিত্যাগ করলে 'ইবাদত বাতিল হয়ে যায়। ইবনু তাইমিয়্যাহ (৬৬১-৭২৮ হি.) বলেছেন,

مَنْ عَبَدَ اللهَ بِالْحُبِّ وَحْدَهُ فَهُوَ زِنْدِيْقٌ وَمَنْ عَبَدَهُ بِالرَّجَاءِ وَحْدَهُ فَهُوَ مُرْجِئٌ وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْخَوْفِ وَحْدَهُ فَهُوَ حَرُوْرِيٌّ وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُوَحِّدٌ.

'যে ব্যক্তি শুধু ভালোবাসা সহকারে আল্লাহর 'ইবাদত করে সে যিনদীক্ব বা নাস্তিক। যে ব্যক্তি শুধু আশা নিয়ে আল্লাহর 'ইবাদত করে সে মুরজিয়াহ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আর যে শুধু ভয়-ভীতি নিয়ে আল্লাহর 'ইবাদত করে সে হারূরী বা খারিজী সম্প্রদায়ভুক্ত। অপরদিকে যে ব্যক্তি ভালোবাসা, ভয় এবং আশা নিয়ে আল্লাহর 'ইবাদত করবে সে তাওহীদপন্থী মুমিন।[৪৫] এ কারণে 'ইবাদত হিসাবে গণ্য হতে হলে পরিপূর্ণ ভালোবাসা, আশা এবং ভয় উপস্থিত থাকতে হবে।[৪৬] আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ 'তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত'।[৪৭]

'ইবাদত কবুলের শর্ত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا 'যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যেন (আল্লাহ) তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন, তোমাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম আমলকারী'।[৪৮] এখানে 'সর্বোত্তম আমল' (أَحْسَنُ عَمَلًا)-এর অর্থ সম্পর্কে ফুযাইল ইবনু ইয়াদ (রহ.) বলেছেন, أخلصه وأصوبه 'সবচেয়ে বেশি খালেছ আমল ও সর্বাধিক সঠিক আমল'। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আবূ আলী! সবচেয়ে বেশি খালেছ ও সর্বাধিক সঠিক আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন,

إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة.

'আমল যখন খালেছ হবে কিন্তু সঠিক হবে না, তখন তা কবুল হবে না। আর সঠিক হলো কিন্তু খালেছ হল না, তাও কবুল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা খালেছ এবং সঠিক উভয়ই না হবে। খালেছ হলো, যা আল্লাহর জন্য নিবেদিত হবে এবং সঠিক হলো, যা সুন্নাহ অনুযায়ী হবে'।[৪৯] উপরিউক্ত আয়াতে 'ইবাদত কবুলের জন্য মূলত দু'টি শর্ত আলোচিত হয়েছে।[৫০] শর্ত দু'টি হলো- **১.** 'ইবাদত আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করা[৫১] এবং **২.** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শরী'আত মোতাবেক হওয়া।[৫২] উপরিউক্ত দু'টি শর্তের দলীল হল মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী। মহান আল্লাহ বলেন, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا 'যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের 'ইবাদতে কাউকেই শরীক না করে'।[৫৩]

৩. তাওহীদুল আসমা ওয়া সিফাত

'তাওহীদুল আসমা ওয়া সিফাত' হলো আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য যে সকল নাম ও গুণাবলি কুরআনে সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর রাসূল (সা.) সাব্যস্ত করেছেন তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। আর তাঁর থেকে সেসব নাম ও গুণাবলী অস্বীকার করা, যা আল্লাহ তাঁর নিজের থেকে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁর রাসূল

(সা.) তাঁর থেকে অস্বীকার করেছেন। তাতে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, তার ধরন বর্ণনা এবং কোন রূপ উদাহরণ পেশ করা ব্যতীত আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করা'। যেমন আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে জানেন, তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না। একইভাবে আল্লাহর আরও যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর নাম ও মহান গুণাবলী রয়েছে সেগুলোকেও স্বীকার করা এবং আল্লাহ তা'আলা যেসকল নাম ও গুণাবলী অস্বীকার করেছেন সেগুলোকেও অস্বীকার করা।[৫৪]

কুরআন ও সুন্নাহর বহু স্থানে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি ও নাম বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 'আর আল্লাহর জন্যই সুমহান দৃষ্টান্ত রয়েছে। আর তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়'।[৫৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا 'আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামের মাধ্যমে ডাক'।[৫৬] আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি এককম একশ'টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা মুখস্থ করবে সে জান্নাতে যাবে।[৫৭] অর্থাৎ যে ব্যক্তি এগুলো গণনা করবে, হেফাযত করবে এবং নামের চাহিদা মোতাবেক আমল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৫৮]

তাওহীদের স্তর

আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থার নাম দ্বীন।[৫৯] ইসলামী শরী'আতে বেশ কয়েকটি অর্থে দ্বীন শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, দ্বীন অর্থ তাওহীদ[৬০], 'আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার'।[৬১] আনুগত্য ও ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহর উপর বিশ্বাসের নাম দ্বীন। যা তিনি সকল নবী-রাসূল এবং উম্মতের উপর ফরয করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনি তোমাদের জন্যে নির্ধারণ করেছেন দ্বীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ (আ.)-কে। আর যা আমরা অহী করেছিলাম তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম আমরা ইবরাহীম (আ.), মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-কে, এই বলে যে, তোমরা এই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ করো না'।[৬২] উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী (৬০০-৬৭১ হি.) বলেছেন, 'দ্বীন হলো আল্লাহর তাওহীদ ও তাঁর আনুগত্য এবং রাসূলগণ ও আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করা।[৬৩] ইবনু কাছীর (৭০০-৭৭৪ হি.) বলেছেন, 'দ্বীন হলো সকল নবী-রাসূলগণ যা নিয়ে আগমন করেছেন। আর সেটা হলো এককভাবে আল্লাহর 'ইবাদত করা, যার কোন শরীক নেই'।[৬৪] আল্লাহ তা'আলা শেষ নবী এবং তাঁর উম্মতের জন্য দ্বীন নির্ধারণ করেছেন[৬৫] এবং জিবরীল (আ.)-এর মাধ্যমে দ্বীনের বাস্তব শিক্ষা প্রদান করেছেন। আর সেই দ্বীন হলো ইসলাম, ঈমান ও ইহসান।[৬৬] অতএব তাওহীদ বা দ্বীনের স্তর তিনটি। ১. ইসলাম, ২. ঈমান ও ৩. ইহসান।[৬৭]

তাওহীদের পরিধি

তাওহীদের পরিধি ব্যাপক। সৃষ্টির শুরু এবং শেষ সবকিছুই তাওহীদের অন্তর্গত। কুরআনে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। সম্পূর্ণ কুরআনই হলো তাওহীদের দাওয়াত।[৬৮] যেমনটা ইবনুল ক্বাইয়্যিম (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেছেন, كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه 'কুরআনের প্রত্যেক আয়াতই তাওহীদের সাথে সম্পৃক্ত। তাতে রয়েছে তাওহীদের প্রত্যয়ন এবং তার দিকে আহ্বান'।[৬৯] তিনি আরো বলেছেন,فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم 'সম্পূর্ণ কুরআনই তাওহীদ, উহার হক্ব ও উহা কবুলকারীদের পুরস্কারের ব্যাপারে এবং শিরক ও উহাকে প্রত্যাখানকারী মুশরিকদের শাস্তির ব্যাপারে'।[৭০] অতএব বলা যায় যে, সম্পূর্ণ কুরআনই তাওহীদ। তাতে রয়েছে তাওহীদের প্রত্যয়ন এবং তার দিকে আহ্বান। তাওহীদ বাস্তবায়নের বিনিময় এবং তাওহীদের বিধান ও হুকুম বর্জনের ভয়াবহ পরিণাম। কুরআনে তাওহীদের বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি মুসলিমদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথ নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি'।[৭১]

মানবজীবনে তাওহীদের গুরুত্ব

মানবজীবনে তাওহীদের গুরুত্ব অত্যধিক। মানুষের নিঃশ্বাস গ্রহণের প্রয়োজন যেমন, তার জীবনে তাওহীদ গ্রহণের প্রয়োজনও তেমন। তাওহীদ অস্বীকারকারী ব্যক্তি মূলত আল্লাহকে অস্বীকারকারী অর্থাৎ কাফির।

তাওহীদ গ্রহণ না করলে সে জীবন প্রকৃতপক্ষে মুসলিম জীবনই নয়। মানবজীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা রয়েছে। যেমন, ১. মহান আল্লাহ মানুষের নিকট থেকে তাওহীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, তার উপরই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।[৭২] ২. তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এবং তদানুযায়ী আমল করা প্রতিটি মানুষের উপর ফরয।[৭৩] ৩. তাওহীদ সর্বপ্রথম আদিষ্ট বিষয় এবং এর বিপরীত (শিরক) দিক সর্বপ্রথম নিষিদ্ধ বিষয়।[৭৪] ৪. তাওহীদ সর্বোত্তম নেকির কাজ এবং এর বিপরীত দিক সবচেয়ে বড় পাপের কাজ।[৭৫] ৫. যাবতীয় আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হলো তাওহীদ।[৭৬] ৬. তাওহীদের মাধ্যমে যাবতীয় পাপ ক্ষমা করা হয়।[৭৭] ৭. তাওহীদ হলো মানুষের নিরাপত্তা এবং হেদায়াতপ্রাপ্তির পূর্বশর্ত।[৭৮] ৮. তাওহীদের কারণে মানুষ 'মুসলিম এবং কাফির'-এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়।[৭৯] ৯. তাওহীদ কবরে নিষ্কৃতি পাওয়া[৮০] ১০. ক্বিয়ামতের দিন শাফা'আত লাভ[৮১] ১১. জান্নাতে প্রবেশের[৮২] এবং জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার অন্যতম শর্ত।[৮৩] কেননা তা জান্নাতের চাবি ও সৃষ্টিজগতের রক্ষাকবচ, আশ্রয়, নিরাপত্তা ও সাহায্যস্থল।[৮৪] যে ব্যক্তি তা বাস্তবায়ন করবে আখেরাতে সে গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে এবং সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না।[৮৫] যে ব্যক্তি এ তাওহীদের সাক্ষ্য দিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৮৬] এক কথায় মানবজীবনে তাওহীদের গুরুত্ব ও প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। তাওহীদ মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা এনে দেয়। দুনিয়ার কাজকর্মের জন্য মানুষকে পরকালে আল্লাহ নিকট জবাবদিহিতার শিক্ষা দেয়।[৮৭] মানুষকে আত্মসচেতন, আত্মমর্যাদাবান, ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ এবং রবের 'ইবাদতে ঐক্যবদ্ধ করে। ফলে মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মাথা নত করে না এবং তারা একই জামা'আত তথা ঐক্যবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে শিরক মানুষকে বহু রব বা ইলাহর 'ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করে বহুদল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে। এতে মানব জাতির বিভাজন পরিণতিতে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও হানাহানির কারণ হয়। ফলে শান্তি ও মানবতা বিপর্যস্ত হয়। তাওহীদ মানুষকে আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল করে। ফলে যাবতীয় বিপদ-আপদে, দুঃখ-কষ্টে মানুষ নিরাশ হয় না। তাঁর উপর ভরসা রেখে সাফল্য লাভ করে। এভাবে তাওহীদ মানুষকে দুনিয়ার জীবনে সুখ, শান্তি ও সফলতার দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। তাওহীদ মানুষকে আল্লাহভীতি ও ঈমান শিক্ষা দেয়। তা মানুষকে 'ইবাদত ও সৎকর্মে উৎসাহিত করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় মানুষ নেকির কাজে অগ্রসর হয় এবং সকল প্রকার অপরাধ ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। ফলে আল্লাহ মানুষের জন্য আসমানী ও পার্থিব নে'মতসমূহ উন্মুক্ত করে দেন।[৮৮] তাদের জন্য নিরাপত্তা, সুপথ[৮৯], রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা, বড় প্রতিদান[৯০], সাহায্য ও সুপারিশ[৯১] এবং মুক্তি[৯২] নিশ্চিত হয়। এক কথায় তাওহীদ মানবজীবন ও সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং পরকালীন জীবনে সফলতা লাভের মাধ্যম। তা মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই মুক্তি ও সফলতার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, মানবজীবনে তাওহীদের গুরুত্ব ও তা গ্রহণের অপরিহার্যতা অত্যধিক। কেননা ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে তাওহীদেই সুখ, শান্তি, সফলতা এবং মুক্তি। বিপরীতে যে ব্যক্তি তাওহীদকে গুরুত্বারোপ করবে না এবং সার্বিক জীবনে তা বাস্তবায়নে তৎপর হবে না, তাকে অগ্নিতে অধঃমুখে নিক্ষেপ করা হবে।[৯৩] সে সফলকামও হবে না।[৯৪] কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।[৯৫] মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি লাভের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

তথ্যনির্দেশ

[১] মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব ইবন 'আলী আল-ইয়ামানী, *আল-ক্বাওলুল মুফীদ ফী আদিল্লাতিত তাওহীদ* (বৈরূত : দারু ইবনি হাযম, ১৪২৭ হি.), পৃ. ৭১।

[২] মুহাম্মাদ ইবন সালিহ ইবন মুহাম্মাদ আল-'উসায়মীন, *মাজমূ'উ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল*, তাহক্বীক্ব : ফাহদ ইবন নাসির ইবন ইবরাহীম আস-সুলাইমান, ১ম খণ্ড (দারুল ওয়াত্বান, দারুছ ছুরায়্যা, ১৪১৩ হি.), পৃ. ১৯।

[৩] সালেহ ইবন ফাওযান ইবন 'আব্দুল্লাহ আল-ফাওযান, *ই'আনাতুল মুসতাফীদ বিশারহি কিতাবিত তাওহীদ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত : মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২৩ হি.), পৃ. ১৯।

[৪] *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪।

[৫] 'আব্দুল 'আযীয ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্দুর রহমান ইবন বায, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ওয়া মাক্বালাতুন মুতানাওবিয়াতুন*; তাহক্বীক্ব : ড. মুহাম্মাদ সা'ঈদ আশ-শুওয়াঈর, ১ম খণ্ড, (রিয়াদ : দারুল ক্বাসেম, ১৪২০ হি.), পৃ. ৩০।

[৬] সুলাইমান ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব, *তাইসীরুল 'আযীযিল হামীদ ফী শারহি কিতাবিত তাওহীদ*, ১ম খণ্ড (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়ায, তা.বি.), পৃ. ১৭।

[৭] সূরা আল-ইখলাছ, ১১২ : ১।

[৮] আরবাব বলা হয়, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম নেতাদের। যারা আল্লাহর পরিবর্তে হালালকে হারাম হারামকে হালাল করে। দ্র. সূরা আত-তওবাহ, ৯ : ৩১।

[৯] আবুল ফুযাইল নাসিরুদ্দীন আন-নু'আইমী, *আল-জামি'উল মুফীদ লি-দুরুসি তা'আল্লুমিত তাওহীদ* (মাকতাবাতু আনওয়ারিত তাওহীদ, ১৪৩২ হি.), পৃ. ৬১।

[১০] সূরা আয-যারিয়াত, ৫১ : ৫৬।

[১১] সূরা আন-নাহল, ১৬ : ৩৬; সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ২৫।

[১২] সূরা আন-নাহল, ১৬ : ২।

[১৩] *আল-ক্বওলুল মুফীদ ফী আদিল্লাতিত তাওহীদ*, পৃ. ৭৭।

[১৪] *মাজমূ'উ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫।

[১৫] সূরা আল-আরা'ফ, ৭ : ৫৪; সূরা আস-সাজ্দাহ, ৩২ : ২, ৫; সূরা ইউনুস, ১০ : ৩।

[১৬] সূরা আল-ফাতিহা, ১ : ৩-৪; সূরা আল-লাইল, ৯২ : ১৩।

[১৭] সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ৫৪।

[১৮] সূরা ইউনুস, ১০ : ৩, ৩১; সূরা আস-সাজদাহ, ৩২ : ৫।

[১৯] 'আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *আল ক্বওলুস সাদীদ ফী মাক্বাসীদিত তাওহীদ*, (রিয়াদ : দারুত সাবাত, ১৪২৫ হি.) পৃ. ৪২।

[২০] *আল-ক্বওলুল মুফীদ ফী আদিল্লাতিত তাওহীদ*, পৃ. ৭৭।

[২১] সূরা আল-বাক্বারাহ, ২ : ১১৬; সূরা আলে 'ইমরান, ৩ : ৮৩।

[২২] সূরা আল-বাক্বারাহ, ২ : ১১৬।

[২৩] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৮৩।

[২৪] যেমন মাজমূ'উল ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, عِلْمُهُمْ بِحَاجَتِهِمْ وَضَرُورَتِهِمْ إِلَيْهِ وَمِنْهَا دُعَاؤُهُمْ إِيَّاهُ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ وَمِنْهَا خُضُوعُهُمْ وَاسْتِسْلَامُهُمْ لِمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْدَارِهِ وَمَشِيئَتِهِ-দ্র. তাক্বীউদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইবন 'আব্দুল হালীম ইবন তাইমিয়্যাহ, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, তাহক্বীক্ব : আনওয়ারুল বায, ১ম খণ্ড (দারুল ওয়াফা, ১৪২৬ হি.), পৃ. ৪৫।

[২৫] সূরা আল-আরা'ফ, ৭ : ৫৪; সূরা আল-জাসিয়া, ৪৫ : ২৭; *মাজমূ'উ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫।

[২৬] ড. সালিহ বিন ফাওযান আল ফাওযান, *'আক্বীদাতুত তাওহীদ ওয়া বায়ানু মা ইউযাদ্দুহা আও ইয়ানকুসুহা মিনাশ শিরকিল আকবার ওয়াল আসগার ওয়া তা'তীল ওয়া বিদ'ঈ ওয়া গাইরে যালিকা* (রিয়াদ : মাকতাবাতু দারিল মিনহায, ১৪৩৪ হি.), পৃ. ৩৭। উল্লেখ্য যে, এই বইটি পরবর্তীতে *'আক্বীদাতুত তাওহীদ* নামে উল্লেখিত হবে।

[২৭] *আল ক্বওলুস সাদীদ ফী মাক্বাসীদিত তাওহীদ*, পৃ. ৪২।

[২৮] *আল-ক্বওলুল মুফীদ ফী আদিল্লাতিত তাওহীদ*, পৃ. ৭৭, ৭৯; *আল ক্বওলুস সাদীদ ফী মাক্বাসীদিত তাওহীদ*, পৃ. ৪২; মুহাম্মাদ ইবন সালিহ ইবন মুহাম্মাদ আল-'উসায়মীন, *আল-ক্বওলুল মুফীদ ফী কিতাবিত তাওহীদ (দারুল 'আসিমা, তা.বি.)*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯; *'আক্বীদাতুত তাওহীদ*, পৃ. ৪২।

[২৯] সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, ৯৮ : ৫।

[৩০] সূরা আন-নিসা, ৪ : ৩৬।

[৩১] সূরা আন-নাহ্ল, ১৬ : ৩৬, ২; সূরা হূদ, ১১ : ২৫-২৬; সূরা আল-আহক্বাফ, ৪৬ : ২১; সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩ : ৪৫; সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ১১, ১৪; সূরা আল-আন'আম, ৬ : ১৬২।

[৩২] যেমন তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له والفطرة شاهدة بذلك أيضا-আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, তাহক্বীক্ব : সামী ইবন মুহাম্মাদ, ৫ম খণ্ড, (দারুত তায়্যিব, ২য় সংস্করণ, ১৪২০ হি.), পৃ. ৩৩৮।

[৩৩] মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আবূ 'আব্দিল্লাহ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, ৯ম খণ্ড (দারু তৃওক্বিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), পৃ. ১১৪, হাদীস নং-৭৩৭৩।

[৩৪] *আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ লিল-বুহূছ আল-ইলমিয়্যাহ ওয়াল-ইফতা*, সংগ্রহ ও বিন্যাস : শাইখ আহমাদ ইবন আব্দুর রাযযাক আদ-দুয়াইশ (রিয়াদ : দারুল 'আছিমাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৯ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬; *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩; *আক্বীদাতুত তাওহীদ*, পৃ. ৫৬; আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম, *কালিমার মর্মকথা* (ঢাকা : জায়েদ লাইব্রেরী, ৩য় সংস্করণ ২০১৮ খৃ.), পৃ. ৭৭।

[৩৫] *আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ লিল-বুহূছ আল-ইলমিইয়্যাহ ওয়াল-ইফতা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬।
[৩৬] নুখবাতু মিনাল ‘ওলামা, *কিতাবু উছূলুল ঈমান ফী যূইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড (সঊদী আরব : ওয়ারাতুশ শুয়ূনিল ইসলামিয়া ওয়াল আওক্বাফ ওয়াদ দাওয়াতি ওয়াল ইরশাদ, ১৪২১ হি.), পৃ. ৩৪।
[৩৭] আহমাদ ইবন হাজার আল-বাত্বামী ‘আলী ইবন ‘আলী, *তাতহীরুল জিনান ওয়াল ফুরকান ‘আন দারানিশ শিরকি ওয়াল কুফরান* (কুয়েত : দারুস সালাফিয়া, ১১তম সংস্করণ, ১৯৮৪ হি.), পৃ. ১৬।
[৩৮] *আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ লিল-বুহূছ আল-ইলমিয়্যাহ ওয়াল-ইফতা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬।
[৩৯] সূরা আল-হাশর, ৫৯ : ৭।
[৪০] *আল-মাওসূ‘আতুল ফিক্বহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ*, ২৬তম খণ্ড (কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওক্বাফ ওয়াশশুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৪ হি.), পৃ. ৩২৩; আব্দুর রহমান নাছির আস-সা‘আদী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, ১ম খণ্ড (মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি.), পৃ. ২৩০।
[৪১] *কিতাবু উসূলিল ঈমান ফী যূইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ*, পৃ. ৪২।
[৪২] মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আন-নাইসাপুরী, *আস-সহীহ*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত : দারু ইহইয়াউত তুরাছিল ‘আরাবী, তা.বি.), পৃ. ১৩৪৩, হাদীস নং-১৭১৮।
[৪৩] ইবরাহীম ও তাঁর সাথীবৃন্দ, *মু‘জামুল ওয়াসীত্ব* (দারুদ দাওয়াত, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭১।
[৪৪] *তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪; *কিতাবু উসূলিল ঈমান ফী যূইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫।
[৪৫] তাক্বীউদ্দীন আবুল ‘আব্বাস আহমাদ ইবন ‘আব্দুল হালীম ইবন তাইমিয়্যাহ, *ইমরাযুল কুলুব ওয়া শিফাউহা* (কায়রো : মাতবা‘আতুস সালাফিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০২ হি.), পৃ. ৭৪; *মাজমূ‘উল ফাতাওয়া*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮১।
[৪৬] *তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪।
[৪৭] সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৯০।
[৪৮] সূরা আল-মুলক, ৬৭ : ২।
[৪৯] আবু না‘ঈম আহমাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আছবাহানী, *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, ৮ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল কিতাবিল ‘আরাবী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৫ হি.), পৃ. ৯৫; *কিতাবু উসূলিল ঈমান ফী যূইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ*, পৃ. ৩৬।
[৫০] *তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০৮; ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫; *কিতাবু উসূলিল ঈমান ফী যূইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ*, পৃ. ৩৫।
[৫১] সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, ৯৮ : ৫; সূরা আত-তওবাহ, ৯ : ৩১; সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ১১, ১৪; আবূ ‘আব্দির রহমান আন-নাসাঈ, *আস-সুনান*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, (হালাব : মাকতাবাতুল মাত্ববূ‘আতিল ইসলামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৭ হি.), হাদীস নং-৩১৪০, পৃ. ২৫।
[৫২] সূরা আল-হাশর, ৫৯ : ৭; সূরা আন-নিসা, ৪ : ৬৫, ১১৫; ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, ৯ম খণ্ড, হাদীস নং-৭২৮০, পৃ. ৯২,; ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং-১৭১৮, পৃ. ১৩৪৩।
[৫৩] সূরা আল-কাহ্ফ, ১৮ : ১১০।
[৫৪] *আল ক্বওলুস সাদীদ ফী মাক্বাসীদিত তাওহীদ*, পৃ. ৪০; *কিতাবু উসূলিল ঈমান ফী যূইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ*, পৃ. ৯৮; *আল-ক্বওলুল মুফীদ ফী আদিল্লাতিত তাওহীদ*, পৃ. ৮০; *আল-ক্বওলুল মুফীদ ফী কিতাবিত তাওহীদ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩।
[৫৫] সূরা আন-নাহল, ১৬ : ৬০।
[৫৬] সূরা আল-আ‘রাফ, ৭ : ১৮০।
[৫৭] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং-২৭৩৬, পৃ. ১৯৮; ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং-২৬৭৭, পৃ. ২০৬২।
[৫৮] *মাজমূ‘উল ফাতাওয়া*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৩৮০; আহমাদ ইবন ‘আলী ইবন হাজার আল-‘আসক্বালানী, *ফাৎহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী*, ১১তম খণ্ড (বৈরূত : দারুল মা‘রেফা, ১৩৭৯ হি.), পৃ. ২২০।
[৫৯] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯।
[৬০] আবূ ‘আব্দিল্লাহ শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী, *আল-জামি‘উ লি আহকামিল কুরআন*, তাহক্বীক্ব : আহমাদ বারদূনী, ১৬তম খণ্ড (কায়রো : দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৩ হি.), পৃ. ১০।
[৬১] আবুল হুসাইন আহমাদ ইবন ফারেস ইবন যাকারিয়া, তাহক্বীক্ব : আব্দুস সালাম মুহাম্মাদ হারূন, *মু‘জামু মাক্বাইসিল লুগাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল ফিকর, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খৃ.), পৃ. ৩১৯; ‘আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন ‘আলী আল-জুরজানী, তাহক্বীক্ব : ইবরাহীম আবইয়ারী, *আত-তা‘রীফাত*, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৫ হি.), পৃ. ১৪১।
[৬২] সূরা আশ-শূরা, ৪২ : ১৩।
[৬৩] *আল-জামি‘উ লি আহকামিল কুরআন*, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ১০।
[৬৪] *তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪।
[৬৫] সূরা আশ-শূরা, ৪২ : ১৩।
[৬৬] ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৮, পৃ. ৩৬।
[৬৭] *আল-ক্বওলুল মুফীদ ফী আদিল্লাতিত তাওহীদ*, পৃ. ৪১।

[৬৮] ড. মুহাম্মাদ খলীফা আত-তামীমী, *মু'তাক্বিদু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ফী তাওহীদিল আসমা ওয়া সিফাত* (রিয়াদ : আযওয়াউস সালাফ, ১৪১৯ হি./ ১৯৯৯ খৃ.), পৃ. ৪২।

[৬৯] মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর ইবন ক্বাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *মাদারিজুস সালিকীন বাইনা মানাযিলি ইয়্যাকা না'বুদু ওয়াইয়্যাকা নাসতা'ঈন*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তাবি), পৃ. ৪৬৮।

[৭০] *প্রাগুক্ত*।

[৭১] সূরা আন-নাহ্‌ল, ১৬ : ৮৯।

[৭২] সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ১৭২; সূরা আর-রূম, ৩০ : ৩০; সূরা আল-যারিয়াত, ৫১ : ৫৬; ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-১৩৮৫, পৃ. ১০০।

[৭৩] সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৯; *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, পৃ. ৭৮৭; আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ আল-ক্বাযবীনী, *আস-সুনান*, ১ম খণ্ড (মিশর : দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তা.বি.), হাদীস নং- ২২৪, পৃ. ৮১।

[৭৪] সূরা আল-বাক্বারাহ, ২ : ২১-২২; হাফিয ইবন আহমাদ আল-হাকামী, মা'আরিজুল কুবূল বি শারহি সিলমিল উছূল ইলা 'ইলমিল উছূল, ২য় খণ্ড (দাম্মাম : দারু ইবনিল কাইয়্যিম, ১৪১০ হি.), পৃ. ৪৮১।

[৭৫] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-২৬, পৃ. ১৪, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং-৪৪৭৭, পৃ. ১৮।

[৭৬] সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ৬৫; সূরা আন-নূর, ২৪ : ৩৯; ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং-২৯৮৫, পৃ. ২২৮৯।

[৭৭] মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা ইবন সাওরাতা ইবন মূসা আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, ৫ম খণ্ড (মিশর : মাকতাবাতু মুছত্বফা আল-হালাবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৫ হি.), হাদীস নং-৩৫৪০, পৃ. ৫৪৮; ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-৪৩০০, পৃ. ১৪৩৭।

[৭৮] সূরা আল-আন'আম, ৬ : ৮২।

[৭৯] সূরা আল-বাক্বারাহ, ২ : ১-৭।

[৮০] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ২৭; আবূ দাঊদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল 'আসরিয়্যাহ, তা.বি.), হাদীস নং-৪৭৫৩, পৃ. ২৩৯।

[৮১] সূরা ত্ব-হা, ২০ : ১০৯; সূরা আলে 'ইমরান, ৩ : ৮৫।

[৮২] সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৭২; ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৯৪, পৃ. ৯৩।

[৮৩] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৪৪, পৃ. ১৭।

[৮৪] সূরা আল-'আনকাবূত, ২৯ : ৬৫; সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৮৭; সূরা আন-নামল, ২৭ : ৮৯।

[৮৫] সূরা আন-নামল, ২৭ : ৯০; ইবনু জারীর ত্বাবারী, *জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন*, তাহক্বীক্ব : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, ১৯তম খণ্ড (মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি.), পৃ. ৫০৭।

[৮৬] সূরা আল-মায়েদাহ, ৫ : ১১৯; ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৯৩, পৃ. ৯৪।

[৮৭] মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা ইবন সাওরাতা ইবন মূসা আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, ৪র্থ খণ্ড (মিশর : মাকতাবাতু মুছত্বফা আল-হালাবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৫ হি.), হাদীস নং-২৪১৭, পৃ. ৬১২।

[৮৮] সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ৯৬।

[৮৯] সূরা আল-আন'আম, ৬ : ৮২।

[৯০] সূরা আল-মূলক, ৬৭ : ১২; ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, ৮ম খণ্ড, হাদীস নং-৬৪৮০, পৃ. ১০১।

[৯১] সূরা আল-আন'আম, ৬ : ৫১।

[৯২] আবূ বকর বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, ২য় খণ্ড (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রূশদ, ১৪২৩ হি.), হাদীস নং-৭৩১, পৃ. ২০৩।

[৯৩] সূরা আন-নামল, ২৭ : ৯০; ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৯৩, পৃ. ৯৪; *জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন*, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ৫০৭।

[৯৪] সূরা আল-মুমিনূন, ২৩ : ১১৭।

[৯৫] সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৭২।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

ইমাম বুখারী (রহ.) জীবন ও রচনাবলি
Imam Bukhari (RA.) Life and Works

শেখ মো: তৈয়বুর রহমান*

Abstract: *Imam Bukhari* is a famous Imam of *Hadith* literature. His full name is *Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah ibn Bardizyah Al-Jufi Al-Bukhari*. He was born on Friday, 13 Shawwal 194 AH in the city of *Bukhara* (a city in present day Uzbekistan). His father was an Islamic Scholar and learned person. He began studying *Hadiths* while he was still young. He completed his initial studies, especially of Hadith, in *Bukhara*. At the age of 16, he had memorized many books of famous scholars. At the age of eighteen, he visited *Makkah* accompanied by his mother and brother. After performing the *Hajj* (pilgrimage), his brother and mother returned to Bukhara but he stayed there for further education. He spent two years in *Makkah* and learned *Hadith* and other religious studies from Islamic Scholars of *Makkah*. After that, he went to *Madinah* and gained further education in the field of *Hadith* and Islamic jurisprudence for four years. After spending six years in Makkah and Madinah, he left for *Basra*, *Kufa*, *Baghdad* and visited *Egypt*, Sham and others cites in his time. He written many books during his life. His work is not only in the discipline of the *Hadith*, but also other sciences such as *Tafsir*, *Fiqh*, and *Tarikh*. His Famous book is al-Zami al-Sahih. This Article aims at throwing light on the short life and works of Imam Bukhari in briefly.

ভূমিকা

ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন বিদ্যাকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বিশেষত তিনি হাদিস শাস্ত্রের ইমাম তথা *আমীরুল মু'মিনীন* হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত হাদীস সংকলন হলো, *সহীহুল বুখারী* যা দ্বীনি বিষয়ে কুরআনুল কারীমের পর অধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস সংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করে যাঁরা তাঁর এ মহান বাণীর প্রচার ও প্রসারে জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং বিশ্ববাসীর সম্মুখে রাসূলে কারীম (সা.)-এর মহান আদর্শ ও জীবনধারা উপস্থাপন করেছেন, ইমাম বুখারী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী। তাই মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন হিফয করেন। অল্প বয়সেই মুখস্থ করেন হাজার হাজার হাদীস। তাঁর সমগ্র জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করলে এ সত্যই প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ যেন রাসূল (সা.) এর অমীয় বাণী অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং সারক্ষণের জন্যই তাঁকে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। আর এই কারণেই হয়তো ইলমে হাদীসের জটিল ও কঠিন বিষয়সমূহ তাঁর নিকট সহজবোধ্য হয়েছে। যার ফলে হাদীস শাস্ত্রে তিনি যে অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করেন, তা আর কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। শুধু তাঁর যুগেই নয়, কিংবা তাঁর দেশেই নয়, বরং সকল যুগে ও সকল দেশে যত মহান ব্যক্তি ইলমে হাদীসের খিদমাত করেছেন তাঁরা সকলেই ইমাম বুখারীর (রহ.) শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। তাই তিনি কালজয়ী মুহাদ্দিস হিসেবে অমরত্ব লাভ করতে সক্ষম হন।

নাম ও বংশ পরিচয়

ইমাম বুখারী (রহ.) এর আসল নাম ছিল মুহাম্মাদ। উপনাম হলো, আবূ আবদিল্লাহ, উপাধি *আমিরুল মু'মিমীন ফিল হাদীস*। পিতার নাম, ইসমা'ঈল, পিতামহের নাম ইবরাহীম, প্রপিতামহের বংশক্রম মুগীরাহ।[১] তাঁর পুরো নাম হলো, *আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমা'ঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ*

---

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইবনে বারদিযবাহ আল-জু'ফী[২] *আল-ইয়ামানী আল-বুখারী (রহ.)।*[৩] তাঁর বংশ তালিকায় উল্লিখিত *বারদিযবাহ* ছিলেন পারসিক বংশীয় জনৈক অগ্নিপূজক। অগ্নি উপাসক হিসেবে তিনি মারা যান।[৪] মুগীরাহ বুখারার শাসনকর্তা ইয়ামান আল-জু'ফীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এদিকে সম্পর্কযুক্ত করে তাঁকে আল-ইয়ামানী ও আল-জু'ফী বলা হয়। পিতা ছিলেন ইমাম মালিক (রহ.) এর একজন শিষ্য[৫] এবং তৎকালীন যুগের একজন বড় মুহাদ্দিস। তিনি আমৃত্যু বুখারা অঞ্চলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ্র প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর মাতা ছিলেন বিদুষী ও নেককার রমণী। ইমাম বুখারীর জীবনীকার শায়খ আব্দুস সালাম আল-মুবারকপূরী তাঁকে বিশেষ কারামতের অধিকারীনী বলে উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে,

كانت والدة الإمام البخارى أيضا عابدة صاحبة الكرامات، و قدرزقت حظا وافرا من الابتهال إلى الله و الدعاء له. [৬]

'ইমাম বুখারী (রহ.)-এর আম্মা ও ইবাদাত কারিনী এবং অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিনী ছিলেন, তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ও দু'আর প্রচুর সুযোগ লাভ করেছিলেন।'

জন্ম ও জন্মস্থান

ইমাম বুখারী (রহ.) ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল মুতাবিক ১৯ জুলাই ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে জুমু'আর সালাতের পর মুসলিম অধ্যুষিত ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির *লীলাভূমি বুখারা*[৭] নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন।[৮] ইসলাম বিজয়ের পূর্বে এ নগরী ছিল সামানীয় শাসকদের রাজধানী। এটি ছিল জায়হুন থেকে দুদিন পথের দূরবর্তী স্থান। এ নগরী ৫৫ হিজরীতে মুসলিমরা বিজয় লাভ করে। এ প্রসঙ্গে ইয়াকূত আল-হামাভী বলেন।[৯]

انها فتحت بيد سعيد بن عثمان فى سنة 55 ه فى خلافة معاوية، وكان حاكم خراسان من قبل معاوية.

'এ নগরী ৫৫ হিজরীতে মুয়া'বিয়ার খিলাফতকালে সা'ঈদ ইবনু 'উসমানের হাতে বিজিত হয়। এ সময় তিনি মু'য়াবিয়ার (রা:) পক্ষ থেকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন।'[১০]

ইমাম বুখারী জন্মের পর তাঁর মায়ের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। কথিত আছে যে, তিনি ছোট বেলায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এতে তাঁর মাতা চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং আল্লাহর কাছে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তিনি স্বীয় সন্তানের দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে অবিরাম গতিতে দু'আ করতে লাগলেন। হঠাৎ এক দিন স্বপ্নযোগে ইবরাহীম (আ:) এর সাথে তাঁর যিয়ারত নসীব হলো। আল্লাহর নবী ইবরাহীম (আ:) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك ওহে! তোমার বেশি ক্রন্দনের কারণে আল্লাহ তোমার সন্তানের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখতে পেলেন যে, সত্যিই তাঁর সন্তান সম্পূর্ণ দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেয়েছে। তিনি বিনয়াবনত হয়ে আল্লাহর দরবারে সেজদায় অবনত হলেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।[১১]

শিক্ষা জীবন

ইমাম বুখারীর (রহ.) নিজ গৃহে হাতে খড়ি হয়। কেননা তিনি যে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন সেই পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল জ্ঞান-চর্চা করা। তাঁর পিতা ছিলেন একজন উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন আলিম এবং বিত্তশালী ব্যক্তি। তাই তাঁর নিকট জ্ঞানের মর্যাদা ছিল অপরিসীম। ইমাম বুখারী (রহ.) শৈশবকালে তাঁর পিতাকে হারান। পিতার পরিত্যক্ত অঢেল সম্পদ ও একটি গ্রন্থাগার লাভ করেন। এই গ্রন্থাগারে বসেই চলতে থাকে তাঁর জ্ঞান চর্চা।[১২] নিম্নে তাঁর বর্ণাঢ্য শিক্ষা জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

প্রাথমিক শিক্ষা

তাঁর পিতা মুহাদ্দিস ইসমাঈলের মৃত্যুর পর শৈশব থেকেই ইমাম বুখারী (রহ.) স্নেহময়ী মাতা তাঁর শিক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[১৩] অতি অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে জ্ঞান অর্জনের প্রতি গভীর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ছোট বেলা থেকে তাঁর অসাধারণ স্মৃতি শক্তি এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, তিনি এক মহান ব্যক্তিরূপে আবির্ভূত হবেন। তিনি হবেন বিশ্বজয়ী, লাভ করবেন বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও সুনাম। বস্তুত ইমাম বুখারী

(রহ.)-ই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর খ্যাতির সূচনা হয় ছাত্র জীবন থেকেই। তদানীন্তন যুগের বিদ্যোৎসাহী মহলে তিনি ছিলেন আলোচনার বিষয়বস্তু সবাই তাঁর অসাধারণ মেধার প্রশংসা করতেন।[১৪]

ইমাম বুখারী বাল্যকাল থেকেই স্থানীয় মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস শিক্ষা আরম্ভ করেন। কথিত আছে যে, তিনি বাল্যকালেই সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ করেছিলেন। একাদশ বছর বয়সে তাঁর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর প্রতিভার বিকাশ ঘটে। এ সময় বুখারা নগরীতে 'আল্লামা দাখিলী হাদীস শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর যশ ও খ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষার জন্য গমন করেন। একদা ইমাম দাখিলী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে একটি হাদীসের সূত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, سفيان عن أبى الزبير عن إبراهيم। ইমাম বুখারী (রহ.) সূত্রটি শুনেই বলে উঠলেন, আবূ যুবায়র ইবরাহীম-এর নিকট থেকে আদৌ কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। মুহাদ্দিস দাখিলী এগারো বছর বয়স্ক বালকের এ কথা শুনে বিস্মিত হলেন এবং ধমক দিলেন। বালক বুখারী বিনয়ের সাথে তাকে বললেন, إرجع إلى الأصل إن كان عندك 'আপনার নিকট মূল পান্ডুলিপিটি রক্ষিত থাকলে একবার দেখে নিন তাতে এ বর্ণনা পরম্পরা কীভাবে লিখিত আছে।' মুহাদ্দিস দাখিলী বালকের এই অনুরোধে মূলকপি দেখে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং তাঁকে ডেকে উক্ত বর্ণনার সূত্র শুদ্ধ করে বলতে বললেন। এরপর বুখারী বললেন, সুফইয়ান, যুবায়র এবং 'আদী থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। এতদশ্রবণে মুহাদ্দিস দাখিলী হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং কলম দিয়ে নিজের লেখাটি সংশোধন করে নিলেন।[১৫]

ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি যখন মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভে রত ছিলেন, তখনই তাঁর মনে হাদীস শিক্ষার একান্ত বাসনা জাগ্রত হয়। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী রহ নিজেই বলেন,

ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكُتَّاب فقلت كم كان سنك فقال عشر سنين أو أقل ثم خرجت من الكتاب بعد العشر

'মক্তবের প্রাথমিক অধ্যয়ন কালে হাদীস মুখস্থ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার মনে ইলহাম করা হয়। এ সময় তাঁর বয়স কত ছিল জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, দশ বছর কিংবা তারও কম। দশ বছর পর আমি মক্তবে শিক্ষাগ্রহণ করে বের হয়ে আসি।'[১৬]

ইমাম বুখারী (রহ.) অসংখ্য উস্তাদের নিকট থেকে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। হাশিদ ইবনু ইসমা'ঈল বলেন, 'আমি এবং ইমাম বুখারী হাদীস অধ্যয়নের জন্য এক উস্তাদের নিকট একই সাথে যাতায়াত করতাম। ইমাম বুখারী (রহ.) সেই উস্তাদের নিকট থেকে পনেরো হাজার হাদীস মুখস্থ করেছিলেন।[১৭]

ইমাম বুখারী (রহ.) এর সমসাময়িক যুগে বুখারার বিদ্যালয়সমূহের যে সমস্ত প্রতিভাবান ও খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ছিলেন, তন্মধ্যে যাঁরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন, আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু সালাম বিকেন্দী, ইউসুফ বিকেন্দী, আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ মুসনাদী, ইবরাহীম ইবনুল আশ-আশ।[১৮] ইমাম বুখারী ষোল বছর বয়স পর্যন্ত স্বীয় আবাসভূমিতে অবস্থান করে উল্লিখিত শিক্ষকগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন এবং অতি অল্প বয়সেই তিনি হাদীস শাস্ত্রে এমন সূক্ষ্ম জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন যে, হাদীসের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ তাঁর উপস্থিতিতে হাদীস বর্ণনা করতে বিব্রতবোধ করতেন।[১৯]

হাদীসের উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য ভ্রমণ

১৬ বছর বয়সেই ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারায় অবস্থানকালে সকল মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ সমাপ্ত করেন।[২০] এরপর হাদীসের উচ্চতর শিক্ষার জন্য সর্বপ্রথম তিনি ২০ হিজরী/ ৮২৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মা ও বড় ভাই আহমাদের সাথে হজ্ব পালনার্থে মক্কায় গমন করেন। হজ্জ সম্পন্ন করে তাঁর মা ও ভাই দেশে চলে আসেন কিন্তু তিনি পরবর্তীকালে সেখানে অবস্থান করে দীর্ঘ ছয় বছর হাদীস শিক্ষায় মনোনিবেশ

করেন। পাশাপাশি তিনি হাদীস লেখনিতেও মনোযোগ দেন। এ লেখনী ও গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন,

فلما طعنت في ثماني عشرة سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم وذلك أيام عبيد الله بن موسى وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم في الليالى المقمرة

'উবায়দুল্লাহ বিন মূসা এর আমলে আঠার বছর অতিক্রমকালে আমি সাহাবী ও তাবি'ঈগণের বিচার-ফয়সালা সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করি। অত:পর আমি মদীনায় রাসূলে কারীম (সা.)-এর কবরের নিকটে বসে *আত্ তারীখুল কাবীর* গ্রন্থ রচনা করি। আর চন্দ্রদীপ্ত রাতে এই লেখনীর কাজ সম্পন্ন করি।'[২১]

হাদীস সংগ্রহে ভ্রমণ

ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বহু দেশ ও নগর পরিভ্রমণ করেছেন। এক একটি শহরে উপস্থিত হয়ে সম্ভাব্য সকল হাদীস তিনি আয়ত্ত করেন। তারপর তিনি অন্য শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের এমন কোন উল্লেখযোগ্য শহর ছিল না, যেখানে তিনি উপস্থিত হয়ে হাদীস সংগ্রহ করেননি। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.) ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে গমণ করে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী নিজেই বলেন, [২২]

كتبت عن الف شيخ من العلماء و زيادة، و ليس عندى حديث إلا اذكراسناده

'আমি এক হাজারের অধিক শিক্ষকের নিকট থেকে হাদীস লিখেছি এবং আমার কাছে এমন হাদীস নেই যার সনদ আমি উল্লেখ করেনি।'

আল্লামা যাহাবী (রহ.) এ প্রসঙ্গে বালখ, বাগদাদ, মক্কা, বসরা, কূফা, আসকালান, হিম্‌স, দামিশ্‌ক প্রভৃতি শহরের নাম উল্লেখ করেছেন। আর কোন শহরের কোন মুহাদ্দিস থেকে তিনি হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেছিলেন, তার নামও লিখে দিয়েছেন, [২৩] কিন্তু এই তালিকা পূর্ণাঙ্গ নয় বলে কেউ কেউ মনে করেন। আল্লামা খাতীব আল-বাগদাদী ইমাম বুখারী (রহ.) এর দেশ ভ্রমণ সম্পর্কে বলেছেন, **رحل فى طلب العلم إلى سائر محدثى الأمصار** 'ইলমে হাদীসের সন্ধানে বিভিন্ন শহরের সকল মুহাদ্দিসের নিকটই তিনি সফর করেছেন।[২৪] হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইমাম বুখারী (রহ.) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করেছেন, সে সম্পর্কে একটি ধারণা দানের উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই বলেন,

دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، وإلى البصرة أربع مرات، وأقمت بالحجاز ستة أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد

'আমি সিরিয়া, মিসর ও জাযীরায় দু' দু'বার করে গমন করেছি। বসরা গিয়েছি চারবার। হিজাযে ক্রমাগত ছয় বছর পর্যন্ত অবস্থান করেছি। আর কূফা ও বাগদাদে যে আমি কতবার গমন করেছি এবং মুহাদ্দিসগণের খিদমতে উপস্থিত হয়েছি, তা গণনা- করতে পারব না।'[২৫] এভাবে ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মক্কা ও মদীনা মুনাওওয়ারাসহ দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেরিয়েছেন। এমনি করে প্রায় চল্লিশ বছর তিনি দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন।[২৬]

ইমাম বুখারীর দেশ ভ্রমণের মানচিত্র

হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন

ইমাম বুখারী তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বড় বড় শহর ভ্রমণ করে সমসাময়িক যুগের খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে প্রায় তিন লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। সুক্ষাতিসুক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংগৃহীত হাদীসগুলো থেকে মাত্র সাত হাজার হাদীসের সমন্বয়ে স্বীয় সহীহ গ্রন্থ সংকলন করেন। হাদীস লেখার সময় ইমাম বুখারী (রহ.) এক বিস্ময়কর পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, **ما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت و تيقنت صحته، فاكتبت فى الصحيح إلا اغتسلت قبل ذلك و صليت** 'আমি এই সহীহ গ্রন্থে এক একটি হাদীস লিখার পূর্বে গোসল করেছি দু'রাকা'আত নফল সালাত আদায় করেছি। এমনটি না করে আমি একটি হাদীসও লিপিবদ্ধ করিনি।[২৭] প্রত্যেকটি হাদীস লিখার পূর্বে গোসল করা ও দু'রাকা'আত নফল সালাত পড়ার পদ্ধতি মক্কা ও মাদীনা উভয় স্থানেই তিনি অবলম্বন করেছেন। একেকটি হাদীস লেখার পূর্বে তিনি সে সম্পর্কে সর্বতোভাবে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। প্রকৃতই রাসূল (সা.) এর হাদীস কি-না, তা দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত না হয়ে তিনি একটি হাদীসও সংকলন করেননি। তিনি নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি প্রত্যেকটি হাদীস সম্পর্কে মহান আল্লাহর নিকট থেকে ইস্তিখারার মাধ্যমে না জেনে এবং এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে দৃঢ় নিশ্চিত না হয়ে কোন হাদীস সংযোজন করিনি।[২৮]

ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন হাদীসের একজন মহান পন্ডিত। তিনি মহানবী (সা.)-এর সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। এ পর্যায়ে তাঁর দেখা একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্নের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী উক্ত স্বপ্নের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, ইমাম বুখারী বলেন,

رأيت النبى صلى الله عليه رسل وكأننى و اقف بين يديه، وبيدى مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبّرين، فقال لى أنت تذب عنه الكذب فهو الذى حملنى على إخراج الجامع الصحيح.

একবার আমি রাসূলে কারীম (সা.)-কে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি তার সামনে দন্ডায়মান আর আমার হাতে রয়েছে একটি পাখা। সেই পাখা দ্বারা তার শরীরে বসা মাছিগুলোকে তাড়িয়ে দিচ্ছি। অত:পর আমি কতিপয় স্বপ্নবেত্তার কাছে উক্ত স্বপ্নের কথাব্যক্ত করি। তাঁরা বললেন, আপনি ভবিষ্যতে 'ইল্‌মে হাদীসের খিদমত করবেন তথা মিথ্যা হাদীসসমূহকে চিহ্নিত করে তার মূলোৎপাটনের ব্যবস্থা করে বিশুদ্ধ হাদীস সমূহের সংকলন করবেন।[২৯] কেননা রাসূল (সা.)-কে স্বপ্নে দেখার অর্থ হলো আসলেই তাঁকে দেখা। যেমন রাসূল (সা.) বলেন,

من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل بي

'যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই দেখে। কেননা শয়তান অবশ্যই আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।'[৩০] বস্তুত: ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস সংকলনের এ মহান দায়িত্ব অত্যন্ত যত্ন নহকারে পালনে আজীবন সাধনা করেছেন। এই মহান দায়িত্ব পালনে তিনি যে অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করেছেন তাঁর কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটি শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য। আর এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই তিনি হয়েছেন মহান এবং অনন্য অসাধারণ। *সহীহুল বুখারী* সংকলনের কারণ প্রসংগে ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, 'অধিকাংশ হাদীস বিশারদগণ যখন সনদ আকারে হাদীস সংকলন করতেন, তাঁদের মধ্যে যারা অধ্যায় ও সনদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন: আবূ বকর ইবনু আবী শায়বা (রহ.)। ইমাম বুখারী (রহ.) এ সকল সংকলনে বর্ণনা ধারা, লিখন ও বিন্যাসপদ্ধতি অবলোকন করেন তখন তিনি দেখতে পান ঐ সমস্ত কিতাবে *সহীহ্* ও *হাসান* হাদীসের একই স্তরে বিন্যাস এবং পাশাপাশি অসংখ্য *য'ঈফ হাদীস* বিদ্যমান। তখন ইমাম বুখারী (রহ.) এর মনে দৃঢ়তার সাথে সাড়া দিল যে, এমন হাদীসের গ্রন্থকে মহামূল্যবান বলা যায় না। ফলে তিনি সহীহ হাদীস সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ ও সুদৃঢ় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[৩১]
ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই তাঁর এ সংকলনের আরেকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,[৩২]

كنا عند إسحاق ابن راهويه فقال لى لوجمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

'আমরা ইসহাক ইবনু রাওয়াইহে-এর নিকট ছিলাম, তিনি আমাকে বললেন, আপনি যদি রাসূল (সা.) এর সুন্নাহর একটি বিশুদ্ধ কিতাব সংকলন করতেন! এ কথাটি আমার মনে দাগ কাটে। অত:পর আমি সহীহ বুখারী সংকলনের কাজ শুরু করি।'

কর্মজীবন

'ইমাম বুখারীর কর্মজীবন ছিল খুবই বিস্তৃত এবং বর্ণাঢ্য। তাঁর শ্রেষ্ঠতম কর্ম হচ্ছে *সহীহুল বুখারী গ্রন্থ* রচনা। তিনি হাদীস সংকলনের পাশাপাশি আমরণ হাদীসের পাঠদান ও ফাতওয়া প্রদানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু তাঁর নিকট সমবেত হয়ে হাদীসের জ্ঞানার্জন করতেন। নিম্নে তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

হাদীসের পাঠদান

১৮ বছর বয়সে শিক্ষা জীবন শেষ করেই তিনি অধ্যাপনা শুরু করলে তাঁর পান্ডিত্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে হাদীসের জ্ঞান অন্বেষণের জন্য দূর দূরান্ত থেকে শ্রোতাগণ তার নিকট ভিড় করত। এমনকি পথ চলার সময়ও হাজার হাজার লোক হাদীস শ্রবণের জন্য তাঁকে ঘিরে ধরতো।[৩৩] ইমাম মুসলিমের সম্মানিত শিক্ষক প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহ্ইয়া আয্-যুহলী তাঁর সকল ছাত্রকে ইমাম বুখারীর হাদীসের দারসে বসার অনুমতি প্রদান করেন, এর ফলে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর হাদীসের গভীর জ্ঞান ও উত্তম চরিত্রের কারণে ইমাম যুহলীর দরবার প্রায় খালি হয়ে গিয়েছিল।
ইমাম বুখারীর হাদীসের দারসে এতো পরিমাণ লোকের সমাগম হতো যে, তিল পরিমাণ জায়গা ফাঁকা থাকত না।[৩৪] মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ ইবন 'আ'সিম বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী (রহ.) এর হাদীসের তিনটি মজলিস ছিল। তার মজলিসে বিশ হাজারের বেশি লোক সমবেত হত। ইমাম মুসলিম (রহ.) একদা ইমাম বুখারী (রহ.) এর হাদীসের দারস শুনে আশ্চর্যান্বিত ও মুগ্ধ হয়ে তাঁর কপালে চুমু খেলেন এবং আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, 'হে সকল শিক্ষকের শিক্ষক, মুহাদ্দিসগণের সর্দার এবং হাদীসের রোগের চিকিৎসক। আমাকে আপনার পদদ্বয় চুম্বন করার অনুমতি দিন।[৩৫]

খালকে কুরআন ও ঈমানী পরীক্ষা

খালকে কুরআন অর্থাৎ *কুরআন সৃষ্ট* মতবাদের মাধ্যমেই মু'তাযিলা সম্প্রদায় তৎকালীন খলীফা আল-মামূন কর্তৃক রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায়। ৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে *খালকে কুরআন* মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৬] ২৫০ হিজরীতে যখন ইমাম বুখারী (রহ.) নিশাপুরে আগমন করলেন তখন সেখানকার মানুষের মধ্যে তাঁর থেকে হাদীস

শ্রবণের জন্য বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।[৩৭] এরই ধারাবাহিকতায় তৎকালীন নিশাপুরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া যুহলী (রহ.) তার মজলিসের ছাত্রদেরকে ইমাম বুখারীর মজলিসে বসার নির্দেশ দেন এর ফলে সকল ছাত্র ইমাম বুখারী (রহ.) এর প্রতি মুগ্ধ হয়ে যায় এবং ইমাম যুহলীর মজলিস ত্যাগ করে। এতে তিনি ইমাম বুখারীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে লাগলেন এবং বুখারা নগরী থেকে তাঁকে অপসারণ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। তাঁর এ ষড়যন্ত্র ও কুটকৌশল বাস্তবায়নের জন্য তিনি একদিন ইমাম বুখারী (রহ.) এর মজলিসে যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করেন এবং ঘোষণা দেন যে, আমার সাথে যে যেতে চাও যেতে পারবে তবে এমন কোন প্রশ্ন ইমাম বুখারী (রহ.) কে করা যাবে না, যাতে করে আমার মাঝে এবং তার মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে সেই ঘটনাই ঘটে। তিনি গোপনে একজন ছাত্রকে খালকে কুরআন সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য নির্দেশ দেন। উক্ত শিক্ষার্থী মজলিসের মধ্য হতে উঠে প্রশ্ন করলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ফীল হাদীস। কুরআনের শব্দ যা আমাদের মুখ থেকে বের হয় তা কী মাখলুক আল্লাহর সৃষ্টি? এর জবাবে ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন,

حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب، فهو كلام الله ليس بخلق، قال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم

'মানুষের নড়াচড়া, তাদের শব্দ, উপার্জন এবং লেখালেখি সব কিছুই সৃষ্ট। গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ, সংরক্ষিত সুস্পষ্ট বিবরণ সম্বলিত কুরআন যা অন্তরে রক্ষিত তা আল্লাহর বাণী, তা সৃষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে বস্তুত: তাঁদের স্তরে এটি সুস্পষ্ট নিদর্শন।[৩৮] ইমাম বুখারী (রহ.) এর এ সুক্ষ্ম জবাব সাধারণ জনগণ বুঝতে না পারায় ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।[৩৯] এ সুযোগে ইমাম যুহলী সাধারণ জনগণের মাঝে একথা ছড়িয়ে দেন যে, ইমাম বুখারী কুরআনকে মাখলুক বলেছেন। একথা প্রচার হওয়া মাত্র গোটা বুখারা নগরীতে ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে আম জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। পরবর্তীকালে তা সহিংসরূপ ধারণ করলে বুখারার তৎকালীন শাসনকর্তা তাকে বুখারা নগরী থেকে নির্বাসন দেন।[৪০] পরবর্তীকালে ইমাম বুখারী (রহ.) এই সমস্যার সমাধান করেন একটি গ্রন্থ প্রণয়নের মাধ্যমে তা হলো খালকু মাফ আলীল 'ইবাদ'।[৪১]

মৃত্যু ও দাফন

ইমাম বুখারী (রহ.) এ প্রতিকূল অবস্থায় বুখারার শাসনকর্তা ও জনগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে প্রিয় জন্মভূমির মায়াজাল কাটিয়ে বুখারা থেকে চির বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ইমাম বুখারী (রহ.) হিজরত করে সমরকন্দ নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। সেখানেও তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা অপপ্রচার চালাতে লাগল। ফলে তিনি সমরকন্দ থেকে হিজরত করে খরতঙ্ক নামক নিভৃত পল্লীতে পৌঁছে তাঁর এক নিকটাত্মীয় গালিব ইবনু জিবরীলের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন।[৪২] সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। এ অবস্থায় সমরকন্দবাসীর পক্ষ থেকে উপর্যুপরি দরখাস্ত আসতে থাকলে তিনি তথায় যাওয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু পরে জানতে পারলেন যে, বুখারায় তাঁর বিরুদ্ধে ছড়ানো বিদ্বেষের অগ্নিশিখা সমরকন্দকেও গ্রাস করেছে। এ অবস্থায় মনের দু:খে রাত্রিকালে সালাতান্তে মহান আল্লাহর দুরবারে দু'আ করলেন, **اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك** হে আল্লাহ! এই বিশাল পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রতি সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। অতএব এখন তুমি আমাকে তোমার নিকট নিয়ে নাও।[৪৩] মহান আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুলের মাধ্যমে এ জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ২৫৬ হিজরীতে শুক্রবার দিবাগত রাত্রে 'ঈশার সালাতের সময় ঈদুল ফিতরের রাতে সমরকন্দের অন্তর্গত 'খরতঙ্ক' নামক গ্রামে ৬২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[৪৪] তাঁর ইন্তিকালের পূর্বরাত্রে বিখ্যাতমুহাদ্দিস আব্দুল ওয়াহিদ ইবনু আদাম আত-তাওয়াবীসী এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেন। খতীব আল-বাগদাদী তাঁর এ স্বপ্নের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, শায়খ আততাওয়াবীসী বলেন,[৪৫]

رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى النوم و معه جماعة من أصحابه، وهو واقف فى موضع، فسلمت عليه فرد على السلام، فقلت ما و قوفك هنا يارسول الله، فقال انتظر مجمد بن إسماعيل البخارى، فلما كان بعدأيام بلغنى موته فنظرت فإذا هوقدمات فى الساعة التى رايت فيها النبى صلى الله عليه وسلم

‘স্বপ্নে আমি রাসূল (সা.) কে এক জায়গায় সাহাবাদের এক জামাতসহ দাঁড়ানো দেখলাম। তাঁকে আমি সালাম দিলাম, তিনি উত্তর দিলেন, অত:পর এখানে অবস্থান করার বিষয়ে আমি তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন’, আমি মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈলের অপেক্ষায় আছি। কয়েকদিন পর যখন ইমাম বুখারীর মৃত্যুর খবর পেলাম তখন হিসেব করে দেখলাম যে, আমি যখন রাসূল (সা.) কে স্বপ্নে দেখেছিলাম ইমামের মৃত্যু তখন হয়েছিল।’

তাঁর মৃত্যুতে শোকাভিভূত হয়ে ইমাম দারিমী নিম্নোক্ত শোকগাঁথা রচনা করেন,

عَزَاءٌ فَمَا يَصْنَعُ الجَازِعُ ‍ ‍ ‍ وَدَمْعُ الْأَسَى أَبَدًا ضَائِعُ
بَكَى النَّاسُ مِنْ قَبْلُ أَحْبَابَهُمْ ‍ ‍ ‍ فَهَلْ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَاجِعُ
تَدَلَّى ابْنُ عِشْرِينَ فِي قَبْرِهِ ‍ ‍ ‍ وَتِسْعُونَ صَاحِبُهَا رَافِعُ
وَلِلْمَرْءِ لَوْ كَانَ يُنْجِي الْفِرَا ‍ ‍ ‍ رُ فِي الْأَرْضِ مُضْطَرَبٌ واسعُ
يُسلِّمُ مُهْجَتَهُ سَامِحًا ‍ ‍ ‍ كَمَا مَدَّ رَاحَتَهُ الْبَائِعُ
وَكَيْفَ يُوَقِّي الْفَتَى مَا يَخَافُ ‍ ‍ ‍ إِذَا كَانَ حَاصِدَهُ الزَّارِعُ[৪৬]

কাব্যনুবাদ

ব্যথিত হৃদয় ধৈয্যধারণ ছাড়া কী-ইবা করিতে পারে?
বেদনাশ্রু যদিও সদাই নিরবে অঝোর ধারায় ঝরে।
প্রিয়জনের বিরহে তাই কেঁদেছে কতশত আপনজনে
ফিরেছে কি কেউ মৃত্যুর পরে কভু এ অবনিপরে?
বিশ বছরের যুবক নিয়েছে কবরশয্যা ফিরেনিকো আর
নবতিপর বৃদ্ধরা হায় এখনও বেঁচে আছে এ ধরণীপর
আপন জনের শতচেষ্টা বাঁচিয়ে রাখার তরে
কোনোও ভাবে যদি মৃত্যু হতে পালিয়ে থাকতে পারে
কলিজাসম আপনজনকে অবশেষে হয় সপিতে
বিক্রেতা যেমন প্রিয়বস্তুকে তুলে দেয় ক্রেতার হাতে
ভীতি হতে যুবক কীভাবে হইবে আত্মরক্ষাকারী
কৃষক যখন নিজেই ক্ষেতের ফসল কর্তনকারী।

ইমাম বুখারীর সমাধিস্থল

রচনাবলী

ইমাম বুখারী (রহ.) পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন, কিন্তু বিশ্ব মুসলিমের জন্য রেখে গিয়েছেন ইসলামী জ্ঞানের ভান্ডার হিসেবে বেশ কতগুলো অমূল্য গ্রন্থরাজি। তাঁর এ সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থের মধ্যে দু'টি গ্রন্থ বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ। একটি *সহীহুল বুখারী* অপরটি *তারীখুল কাবীর*।[৪৭] নিম্নে ইমাম বুখারী (রহ.) এর সংকলিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হলো:

আল-জামি'উস সহীহ [الجامع الصحيح]: এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ও অনবদ্য রচনা। হাদীস শাস্ত্রের এটি বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। আল্লামা আইনী বলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আলিমগণ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, মহান আল্লাহর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমের পরই *সহীহুল বুখারী* অধিকতর বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত।[৪৮]

এ গ্রন্থের ভূয়শী প্রশংসায় ইমামগণের বিভিন্ন মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

এক. ইমাম যাহাবী বলেন,[৪৯]

وأما جامع البخاري الصحيح، فأجل كتب الإسلام، وأفضلها بعد كتاب الله تعالى

'আর সহীহ জামি' আল-বুখারী, এটি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কিতাব এবং আল্লাহর কিতাবের পর অন্যতম'

দুই. ইমাম নববী বলেন, [৫০]

أول مصنّف في الصحيح المجرّد، صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم. وهما أصح الكتب بعد القرآن. والبخاري أصحّهما، وأكثرهما فوائد. وقيل: مسلم أصح، والصواب الأول

'শুধু সহীহ হাদীসের প্রথম সংকলন গ্রন্থ সহীহুল বুখারী, অত:পর সহীহ মুসলিম। আর এ দুটি কিতাব আল-কুরআনের পরে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ, এ দুয়ের মধ্যে বুখারী অধিক শুদ্ধতম ও অতি উপকারী। কেউ কেউ বলেন, 'সহীহ মুসলিম অধিক বিশুদ্ধ। তবে প্রথম অভিমতই সঠিক।'

তিন. ইমাম সাখাভী বলেন, [৫১] أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح مسلم وصحيح البخاري

'আল্লাহর কিতাবের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব সহীহ মুসলিম এ সহীহ বুখারী।'

চার. ইমামুল হারামাইন বলেন, [৫২]

لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أن ما في الصحيحين مما حكما بصحته من قول النبي ﷺ لما ألزمته الطلاق، لإجماع علماء المسلمين على صحته.

'কেউ যদি এ মর্মে শপথ করে যে, বুখারী-মুসলিম রাসূল (সা.)-এর যে হাদীসকে সহীহ বলেছেন তা সঠিক না হলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে, এতে তার স্ত্রী তালাক হবে না। কারণ এ হাদীসগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মুসলমানদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'

পাঁচ. ইমাম ইবনুস সালাহ্ বলেন, [৫৩] وكتاباهما (البخاري ومسلم) أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز

'উক্ত দুটি কিতাব (আল-বুখারী ও মুসলিম) মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কিতাবের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব।'

আত-তারীখুল কাবীর [التاريخ الكبير]: এটি রিজাল শাস্ত্র বিষয়ক একটি মূল্যবান গ্রন্থ। ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ্ গ্রন্থটি পাঠ করে তৎকালীন বুখারার আমীর আব্দুল্লাহ ইবনু তাহির খুরাসানীর সামনে উপস্থাপন করে আনন্দচিত্তে বলেছিলেন, 'হে আমীর! আমি আপনাকে একটি যাদু দেখাচ্ছি।"[৫৪] ইমাম বুখারী এ গ্রন্থে সাহাবী, তাবি'ঈ ও অন্যান্য হাদীস বর্ণনাকারীর নাম ও তাঁদের পিতার নাম উল্লেখ করে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণ বলেন, [৫৫]

قدم الإمام البخارى فى كتابه حزا اسماء للصحابة أولابغض لنظرعن اسماء أبائهم ثم اتبعهم بذكراسماء التابعين، ثم من جاء بعدهم ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر بقية الأسماء مع ترتيب أسماء آبائهم

'ইমাম বুখারী রা. তাঁর এ গ্রন্থে প্রথমে সাহাবাদের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের পিতৃ পরিচয়সহ, অত:পর তাবি'ঈগণের নাম, অত:পর পরবর্তীদের নাম উল্লেখ করেছেন, এরপর অন্যান্যদের নাম তাদের পিতৃ পরিচয়সহ ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছেন।'

আত-তারীখুস সাগীর [التاريخ الصغير]: এ গ্রন্থের বর্ণনাগুলো ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে তাঁর ছাত্র আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্দিস সালাম আল-খাফফাফ রিওয়ায়াত করেন। গ্রন্থটির বিস্তারিত বিবরণ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তরে হাজী খলীফা ইবনুল নাদীস ও ইবনু খায়ব তাঁদের গ্রন্থসমূহে এ গ্রন্থটির নাম লিপিবদ্ধ করেছেন অবশ্য ইবনু খায়র গ্রন্থটি সাত খণ্ডে বিভক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৬]

আসামীউস সাহাবাহ্ [أسامى الصحابة]: এটি ও রিজাল বিষয়ক ইমাম বুখারীর অনবদ্য গ্রন্থ। তিনি মনে করতেন যে, হাদীসের 'ইলমু রিজালের সম্পর্কে যেমন রূহ ও শরীরের সম্পর্ক। গ্রন্থটি আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান আল-আশকার ইমাম বুখারী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এ গ্রন্থের ভূমিকায় ইমাম বুখারী (রহ.) লিখেছেন যে, [৫৭]

كتاب مختصر من تاريخ النبى صلى الله عليه وسلم والمهاجرين و الأنصار، و طبقات التا بعين لهم بإحسان، و من بعدهم ووفاتهم، وبعض نسبهم وكناهم و من يرغب فى حديثه.

'এটি রাসূল (সা:), মুহাজির, আনসার এবং একনিষ্ঠ অনুসারী তাবিঈগণ ও তাদের পরবর্তীগণের ইতিহাস, তাদের মৃত্যু, বংশ পরিচিতি ও গুণাবলী এবং যারা রাসূলের হাদীসের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। তাদের বিবরণ সম্বলিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।'

আত-তারীখুল আওসাত [التاريخ الأوسط]: এ গ্রন্থে ইমাম বুখারী সাহাবীদের জীবন-চরিত আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ গ্রন্থটিকে كتاب أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم নামে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছে কীনা তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে শায়খ উবায়দুল্লাহ আর রাহমানী বলেন জার্মানীর দারুল উলূসে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।[৫৮]

জুযউ রাফ'ইল ইয়াদাইন [جزء رفع اليدين]: সালাতে হস্তদ্বয় উত্তোলন সম্পর্কে এ গ্রন্থটি সংকলন করা হয়েছে। এতে হস্তত্তোলনের বিপক্ষের রিওয়াতগুলোর অতি সূক্ষ্ম সমালোচনা হয়েছে এবং হস্তউত্তোলন সম্পর্কিত হাদীসগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি ইমাম বুখারীর ছাত্র মাহমুদ ইবনু ইসহাক তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

কিতাবু খালকি আফ'আলিল 'ইবাদ [كتاب خلق أفعال العباد]: এ গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবী ও তাবি'ঈগণের অনুসৃত রীতি হিসেবে বাতিল ফিরকাসমূহের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। এটি আল-কালাম বিষয়ক একটি প্রাচীন গ্রন্থ। গ্রন্থটি বৈরূত থেকে সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়েছে।[৫৯]

কিতাবুয-যু'আফা আল-কাবীর [كتاب الضعفاء الكبير]: এতে নামের ক্রমধারা অনুযায়ী দূর্বল রাবীগণের নাম ও বিস্তৃত বিবরণ সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গ্রন্থটি ইমাম বুখারী থেকে তাঁর ছাত্রবৃন্দ যেমন আবূ বিশর মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবনু হাম্মাদ আদদাওলাবী, আবূ জা'ফর সুসাব্বিহ ইবন সা'ঈদ, আদম ইবন মূসা আল-খুয়ারী প্রমুখ রিওয়ায়াত করেন। গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছে।[৬০]

আল-আদাবুল মুফরাদ [الأدب المفرد]: এটি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মহান জীবনাদর্শ ও নিষ্কলুষ আচার ব্যবহারের আলোচনা সম্বলিত একটি অতি উপাদেয় গ্রন্থ। নাওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁন এর একটি চমৎকার পূর্ণাঙ্গ ফারসি অনুবাদ করেছেন। এছাড়া শায়খ 'আবদুল গাফ্ফার (রহ.) একে উর্দূতে ভাষান্তরিত করে প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে অসংখ্যবার মুদ্রিত হয়েছে।[৬১]

কিতাবুর রিকাক [كتاب الرقاق]: হাজী খালীফা (রহ.) স্বীয় গ্রন্থে কিতাবুর রিকাক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া ইমাম বুখারী (রহ.) স্বয়ং তাঁর কিতাবের বিশেষ বিশেষ স্থানে এ হাদীস গ্রন্থটির কথা ও উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থ সম্পর্কে ইবনুল মুলাক্কিন লিখেছেন যে, [৬২]

و من الغريب ما فى كتاب الجهر بالبسملة لأبى سعد إسما عيل بن أبى القاسم البوسنجى أنه صنف كتابا أورد فيه ما ئة ألف حديث صحيح.

'আশ্চর্য্যের বিষয় হলো, আবূ সা'আদ ইসমাঈল ইবনে আবিল কাসিম আল-বুসানজি কর্তৃক লিখিত কিতাব, যেখানে বিস্‌মিল্লাহ স্বশব্দে পাঠ করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি এক লক্ষ্য সহীহ হাদীস আনায়ন করেছেন।'

বিররুল ওয়ালিদাইন [بر الوالدين]: এ গ্রন্থে পিতা-মাতার প্রতি ছেলে-মেয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি মুহাম্মাদ ইবনু দিল্লুবিয়্যাহ ইমাম বুখারী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। গ্রন্থটি অসংখ্য বার মুদ্রিত হয়েছে।[৬৩]

কাদায়াস-সাহাবাহ ওয়াত্ তাবি'ঈন [قضايا الصحا به والتابعين]: গ্রন্থটি ইমাম বুখারীর প্রথম রচিত গ্রন্থ। এ সময় তাঁর বয়স ছিল আঠারো। এরপর তিনি 'তারীখুল কাবীর' গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেন। বর্তমানে এ গ্রন্থটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।[৬৪]

উপসংহার

ইমাম বুখারী (রহ.) কাল প্রবাহে একটি বিস্ময়ের নাম। স্মৃতির প্রখরতা, জ্ঞানের গভীরতা, চিন্তার বিশালতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অটুট সততা, আর বিশাল পর্বতসম হিম্মতের এক মূর্ত প্রতীক ছিলেন এ মহাপুরুষ। তিনি ইলমে হাদীসের এক বিজয়ী সম্রাট, তাঁর সংকলিত হাদীসের মহামূল্যবান সংকলন *সহীহুল বুখারী* বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে আল-কুরআনের পরেই যার অবস্থান। কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম উম্মাহ তাঁর সাধনার কাছে ঋণী। তিনি ছিলেন একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তি। তিনি সব সময় আল্লাহকে ভয় করে চলতেন। তাঁর চরিত্রে তিন গুণের সমাহার ঘটেছিল। তিনি কম কথা বলতেন, লোভী ছিলেন না। মানুষের জাগতিক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন না। জ্ঞানচর্চা ছিল তাঁর একমাত্র ব্যস্ততা। আত্মপ্রশংসা বিমুখতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি একজন বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস হয়েও কোন মানুষের সামনে নিজ জ্ঞান ও প্রতিভার প্রশংসা করেননি। তিনি সাদামাটাভাবে জীবন যাপন করতেন। তিনি তাঁর *আদাবুল মুফরাদ* গ্রন্থে আদাব ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত মতগুলো হাদীস সংকলন করেছেন সেগুলোর প্রত্যেকটির উপর আমল যেন তাঁর চরিত্রে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। এক কথায় তিনি ছিলেন জ্ঞান-প্রতিভা, আচার-আচরণ সর্বদিক থেকেয় একজন পূর্ণ মানুষ।

তথ্যনির্দেশ

১ ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বালী, *শাযারাতুয্ যাহার*, ২য় খণ্ড (মাকতাবাতুল-কুদসী, কায়রো, মিসর, ১৯৩১ খ্রি.), পৃ. ১৩৪; খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুল খনেজী, ১৯৩০খি.), পৃ. ৬; ইমাম আন-নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ১ম খণ্ড (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৭-৬৮।

২ আল-জু'ফী (الجعفي) শব্দের ج অক্ষর পেশ বিশিষ্ট ع অক্ষর সুকুন এবং শেষ অক্ষর ف এর দ্বারা একটি গোত্রের দিকে নিসবত করা হয়েছে। দ্রঃ *হাদইউস সারী*, পৃ. ৬৬২; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন-নুবালা*, ১২শ খণ্ড (বৈরূত: দারু সাদির, তা.বি.), পৃ. ৩৯২; ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযাম ফীত তারীখ*, ৭ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৯৫-৯৬।

৩ ইনুল খাল্লিকান, *ওফায়াতুল আ'ইয়ান*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৩২৪-৩২৫।

৪ *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬; ইবনু হাজার আল-'আসকালানী, *হাদইউস সারী* (কায়রো: মাকতাতাবাতুস সাফা, ২০০৬ খ্রি.), পৃ ৬৬২; *ওফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯০; *শাযারাতুয্-যাহাব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪।

৫ ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ*, ১১শ খণ্ড (বৈরূত: দারুল-ফিক্র, ১৯৭৭খ্রি.) , পৃ. ২৭।

৬ শায়খ আব্দুস সালাম আল-মুবারকপূরী, *সীরাতুল ইমাম আল-বুখারী*, ১ম খণ্ড (দারু-'আলামিনল ফাওয়ায়িদ, ১৪২২হি.), পৃ. ৬১।

৭ **বুখারা:** এটি উজবেকিস্থান প্রজাতন্ত্রে অবস্থিত। বর্তমান এ নগরটি মধ্য এশিয়ার অন্তভুক্ত। এটি জায়হুন, নদীর তীরে *মা-ওয়ারাউন নাহার* এলাকার একটি প্রধান নগরী, যা সমরকন্দ থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণ বলেন, تقع مدينة "بخارى" في آسيا الوسطى، في جمهورية "أوزبكستان" وهى إحدى مدن بلاد ما وراء النهر.ويشير أحد المؤرخين القدامى إلى أن الثلوج التى كانت تذوب كونت الماء الكثير الذى تجمَّع مع ماء آخر أتى من النهر، وظل هذا الماء الغزير يحمل الطمى إلى أن طُمر ذلك الموضع "سمرقند" بالجبال في ناحية الأرض حيث تمهدت "بخارى" الذى يقال له. দ্র: ড. জামীল 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল মিসরী, *হাদিরুল আ'লামিল ইসলামী*, ২য় খণ্ড (মক্কা: দারু উম্মিল কূরা, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৫২২।

৮ ইবনু হাজার আল-আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, ৯ম খণ্ড (হায়দারাবাদ: দায়িরাতুল মা'আরিফ আন্-নিযামিয়াহ, ১৯০৮খ্রি.), পৃ. ৪২; *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬।

৯ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৫৪।

১০ শায়খ আব্দুস সালাম আল-মুবারকপূরী, *সীরাতুল ইমাম আল-বুখারী*, ১ম খণ্ড (মক্কা: দারু 'আলামিল ফাওয়ায়িদ, ১৪২২ হি.), পৃ. ৬৫।

১১ *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড. পৃ. ৭-৮; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ*, পৃ. ৩২-৩৩; ইমাম সুবকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ আল-কুবরা, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ২০১৬।

১২ *সীরাতুল ইমাম আল-বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৩।

১৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮।

১৪ *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪; ইবনু হাজার, *আল-আসকালানী হাদইউস আয্-সারী* (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ৪৪৮।

১৫ *সিয়ারু 'আলামিন নুবালা*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৩; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *ইমাম বুখারী (রহ.) জীবন ও হাদীস চর্চা* (ঢাকা: ইসলামিক সেন্টার, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ৬৮; *সীরাতুল ইমাম আল-বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭।

১৬ ইবনু হাজার আল-'আসকালানী, *হাদইউস সারী* (দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী (বৈরূত: দারুল কুতুব আল'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ৪৪৮; *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬; মুহাম্মাদ আবূ যাহু, *আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন* (বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৩৫৩; *হাদইউস সারী*, পৃ. ৪৭৮-৪৭৯।

১৭ মূলভাষ্য: كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، فلا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام، فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب، فما تصنع؟ فقال لنا يوما بعد ستة عشر يوما: إنكما قد أكثرتما علي وألححتما، فأعرضا علي ما كتبتما. فأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد على خمسة عشر ألف حديث، فقرأها كلها عن ظهر القلب، حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. আস্-সুবকী, *আত-তাবাকাতুস শাফিঈয়্যাহ আল-কুবরা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫; *তারীখু বাগদী*, ২য় খণ্ড. পৃ. ১৪; *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২য় খণ্ড. পৃ. ৫৫৬।

১৮ *সীরাতুল ইমাম আল-বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭২-৭৭।

১৯ তাহির আল-জাযাইরী, *কিতাবু তাওদীহিন-নাযার ইলা উলূমিল আছার*, ২য় খণ্ড (মিসর : আল-মাকতা'আতুল জামাল্যিাহ, ১৯১১খ্রি.), পৃ. ১০৪; *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন*, পৃ. ৩৫৫।

২০ *তাযকিরাতুল হুফফায*, পৃ. ১২২।

২১ *তারীখু বাগদাদ*, পৃ. ৭; আস্-সুবকী, *তাবাকাতুশ্ শাফি'ঈয়্যাহ আল কুবরা*, পৃ. ৫।

[২২] *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩; *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০।

[২৩] ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায* (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১২২।

[২৪] *তারীখু বাগদাদ*, পৃ. ৪; *শাযারাতুয যাহাব*, পৃ. ১৩৪।

[২৫] *আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন*, পৃ. ৩৪৪।

[২৬] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: *সীরাতুল ইমাম আল-বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৯-১০২।

[২৭] *হাদইউস সারী*, পৃ. ৪২; *তারীখু বাগদাদ*, পৃ. ৯; আস্-সুবকী, *তাবাকাতুশ্ শাফি'ঈয়্যাহ আল-কুবরা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬-৭।

[২৮] বদরুদ্দীন আল-'আইনী, *মুকাদ্দামাহ 'উমদাতুল ক্বারী* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৮৯০খ্রি.), পৃ. ৫।

[২৯] *শাযারাতুয্ যাহাব*, পৃ. ১৩৪; সিদ্দীক হাসান খান, *আল্ হিত্তাহ্ ফী যিকরিস সিহাহ আস-সিত্তাহ্* (ভারত: কানপুর, ১৮৬৬খ্রি.), পৃ. ৮৭।

[৩০] ইমাম আল-বুখারী, *আল-জামি'উস সাহী*, ২য় খণ্ড (করাচি: নূর মুহাম্মদ কুতুব খানা, ১৯৬১খ্রি.), পৃ. ১০৩৬।

[৩১] *হাদইউস সারী*, পৃ. ৭।

[৩২] *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড, পৃ ৮; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪০১।

[৩৩] আবু কাসিম মুহাম্মদ হুসায়ন বাসুদেবপুরী, *ইমাম বুখারী (রহ.)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ৪৮-৪৯।

[৩৪] ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন, *উলূমুল হাদীস* (রাজশাহী: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০০০খ্রি.), পৃ. ২৭১।

[৩৫] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, *কিতাবুস সুন্নাহ*, তাহকীক: মুহাম্মদ হামিদ আল-ফাকা, (বৈরূত: দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৪৯; ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, *শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়্যাহ* (বৈরূত: দার ইবনে হাযম, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১৮৮।

[৩৬] সূরাহ্ আল-'আনকাবূত: ৪৯।

[৩৭] *তাবাকাতুশ-শাফি'ঈয়্যাহ আল-কুবরা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৮; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৫৫।

[৩৮] ফুয়াদ সিজগীন, *তারীখুত তুরাছিল আরাবী*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল বাশায়ির আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪২১হি.), পৃ. ২৫৯।

[৩৯] *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড, ৩০; *সিয়ার-আলামিন নুবালা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৪।

[৪০] *তারীখু বাগদাদ*, পৃ. ৩৪।

[৪১] *তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ আল কুবরা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

[৪২] *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ*, পৃ. ৩০।

[৪৩] *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, পৃ. ৭২।

[৪৪] বদরুদ্দীন 'আয়নী, *উমদাতুল ক্বারী* (বৈরূত: দারুল-ফিকর, তা.বি.), পৃ. ১৩০।

[৪৫] *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪।

[৪৬] *সিয়ারু আলামিন-নুবালা*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৮।

[৪৭] *তাবাকাতুশ্ শাফি'ঈয়্যাহ আল কুবরা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪।

[৪৮] আল-কাস তাল্লানী, *হাদইউস সারী*, পৃ. ৪৯১-৪৯২।

[৪৯] *ইরশাদুস সারী ফী শারহিল বুখারী*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২৯।

[৫০] *ইমাম নববী, আত তাকরীব ওয়াত তাইসীর* (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩।

[৫১] ইমাম সাখাভী, *আল-গায়াতু ফী শারহিল হিদায়া ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, ১ম খণ্ড (মদীনা মুনাওয়ওয়ারাহ: মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল হিকাম, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৭৭।

[৫২] ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৪২

[৫৩] ইবনুস সালাহ্, *মা'রিফাতু আনও'য়ায়ে উলূমিল হাদীস*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৬খ্রি.), পৃ. ৮৪।

[৫৪] *সীরাতুল ইমাম আল-বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪।

[৫৫] শায়খ আলাভী মুহাম্মাদ, *মানহাজুল ইমাম বুখারী ফী তারীখিল কাবীর* (বৈরূত: দার ইবনে হাযম, ২০১৪ খ্রি.), মুকালামাহ্ অংশ।

[৫৬] *ফিহিরিস্ত ইবনু খায়র*, পৃ. ২০৫; *কাশফুয যুনূন*, ১ম খণ্ড পৃ. ২২০; *আল-ফিহিরিস্ত*, পৃ. ৩২২।

[৫৭] *আত-তারীখুস সাগীর*, পৃ. ৩।

[৫৮] *সীরাতুল ইমাম আল-বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮।

[৫৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯০।

[৬০] *সীরাতুল ইমাম আল-বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১।

[৬১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২।

[৬২] *উমদাতুল কারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯।

[৬৩] *সীরাতুল ইমাম আল-বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯।

[৬৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৬।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

কত্থক নৃত্যশৈলী ও উপশাস্ত্রীয় সংগীতের সাথে তবলা সংগতবাদন
(Tabla accompaniment with Kathak dance Style and Semi- classical music)

ড. দীনবন্ধু পাল*

Abstract: At present 'Kathak' is the most famous dance form amongst all classical dance forms. Indian cultural section's synthesizing feature, different art form's linkage and foreign art culture's influence observed in this style. Kathak dance would be lifeless without percussion instrument like tabla ; Although in dance forms different style, fashion and dramatics are certainly important. while kathak dance performance, the main artist obtains supreme accompaniment from the co-artists and instrumentalists. This full-fills each other's artistry. tabla artist's role is undeniable while accompaniment with a semi classical style. A admirable tabla artist should have certain knowledge about semi-classical styles such as, `Dadra', `Kajri', `Hori', `Chaity' etc. For accompaniment With `Kathak' and semi-classical style. a tabla artist should have traditional learning from a reputed school.

ভূমিকা

সংগীতের বিপুল ও বিশাল বৈভবের মধ্যে তালবাদ্য যন্ত্রের অন্যতম হলো "তবলা"। সেই প্রাচীনকাল থেকে ঔপনিবেশিক আমল তথা বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষে "তবলা" বাদ্যযন্ত্রটি স্বতন্ত্র ও সংগতবাদনে সমধীক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। বিভিন্ন ঘরানা ও শৈলীর মাধ্যমে উচ্চাঙ্গ ও লঘু সংগীতের প্রায় সকল শাখায় স্বতন্ত্র বাদনের পাশাপাশি সংগতবাদনে তবলার বিকাশ ও ব্যপ্তি সমধীক। আলোচ্য শিরোনামের আলোকে আমরা এই অংশে উপশাস্ত্রীয় সংগীত ও কত্থক নৃত্য শৈলীতে সংগতবাদন (তবলা) সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সক্ষম হব।

সংগীতের প্রাচীনতম ধারার মধ্যে নৃত্য একটি। কেবলমাত্র উচ্চাঙ্গ নৃত্য শৈলীর সাথে সংগত বাদন এবং নান্দনিকতা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র গবেষণা হতে পারে। তবে সকল নৃত্য শৈলীর সাথে তালবাদ্য হিসেবে তবলা ব্যবহৃত হয় না। উচ্চাঙ্গ নৃত্য প্রকরণের মধ্যে কত্থক নৃত্যে- তালযন্ত্র হিসেবে তবলা ও পাখোয়াজের বাদনক্রিয়া হয়ে থাকে। তবে পাখোয়াজের তুলনায় তবলার ব্যবহার বেশি হয়ে থাকে। উচ্চাঙ্গ নৃত্য ধারার মধ্যে ভরতনাট্যম, কথাকলি ও মনিপুরি এগুলোর সাথে মৃদঙ্গ, মৃদঙ্গম বা অন্যান্য মনিপুরিখোল তালবাদ্য যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নৃত্য শৈলীর সাথে তবলার সংগত বাদনের জন্য একাধিক স্বতন্ত্র গুরুমুখি পরম্পরা রয়েছে।

বর্তমানকালের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নৃত্যধারা কত্থক। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারার সমন্বয়ের বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন শিল্পধারার যোগসূত্র, বহিরাগত শিল্প সংস্কৃতির প্রভাবে গীতরূপ, বাদন পদ্ধতি ও নৃত্যছন্দের আবয়বিক ও অন্তররূপের বারবার পরিবর্তন ঘটিয়েছে।[১]

কত্থক নৃত্যের উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। উত্তরভারতের সংগীত ও কত্থক নৃত্যপদ্ধতিতে পরবর্তীকালে আরব ও পারসিক সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। [২]

কথিকা শব্দ থেকে কত্থক শব্দের উৎপত্তি। প্রাচীন উত্তর ভারতের যাযাবর সম্প্রদায় থেকে এই নৃত্যের ফর্ম উদ্ভূত। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রধান চারটি ধারার মধ্যে কত্থক একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ধারা। বাঁকি গুলো হচ্ছে - ভরতনট্যম, কথাকলি, মনিপুরী। প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেবদেবীর লীলা ও

* প্রফেসর, সংগীত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পৌরাণিক উপকথার বর্ননায় কয়েকটি সম্প্রদায় ছিল যারা নৃত্য ও গীত দিয়ে দেব দেবীর মাহাত্ম পরিবেশন করতেন এসব সম্প্রদায়গুলো হলো :- কথক, গ্রন্থিক, পাঠক ইত্যাদি।[৩]

কথক নৃত্যধারার প্রথম শিল্পীরূপে দেবর্ষি নারদকে কল্পনা করা হয়। ত্রিভুবনে সংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে নারদ হরিগুণগান প্রচার করতেন। ব্রক্ষমহাপুরাণে কথক সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪]

রাধাকৃষ্ণের ভক্তিবাদ এর প্রভাবে কথক নৃত্যধারা পরিপুষ্ট হয়। রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক নৃত্য পদ্ধতির যে রূপ নাট্য শাস্ত্রে বর্ণিত হল্লীসক, চচয়ী, নাট্যরাসক প্রভৃতি থেকে আমরা পাই; সে রূপের ছায়া পরবর্তীকালে কথক নৃত্যধারায় দেখা যায়।[৫]

এছাড়াও প্রয়োগরীতি ও আঙ্গিকে মূরলী গৎ, পনঘাট গৎ, কবিতাবোল, নটবরী বোল প্রভূতি ক্ষেত্রে রামলীলা নৃত্যধারা ও কথক নৃত্যর বিস্ময়কর সাদৃশ্য চোখে পড়ে।[৬]

দীর্ঘকাল ধরে ধর্মীয় উৎসব ও মন্দির কেন্দ্রিক পরিবেশনা হওয়ায় কথক নৃত্যের কোনো সুসংহত রূপ গড়ে ওঠেনি। মোঘল আমলে দরবারী সংগীত ও নৃত্যের যুগ সূচিত হলেই কথক নৃত্যের একটি সুসংগত রূপ গড়ে ওঠে। কথক নৃত্যের সবচাইতে বেশি বিকাশ ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে লক্ষ্ণৌ এর আসাফুদ্দৌলা ও ওয়াজীদ আলীশাহ এর দরবারকে কেন্দ্র করে। কথকের দ্বিতীয় ধারার বিকাশ ঘটে জয়পুর রাজদরবারে। পরবর্তীকালে বারানসীতেও কথক নৃত্যের বিকাশ ঘটে।

কথক নৃত্যে নৃত্যাংশ প্রধান। বহুবিচিত্র ছন্দপ্রয়োগে রঞ্জনা সৃষ্টি করা নৃত্যাংশের প্রধান কাজ। সাধারণভাবে এই ছন্দ প্রয়োগগুলিকে 'বোল' বলা হয়।

তবে সহযোগী সংগীত ও তালযন্ত্র এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কথক নৃত্যে মোট বারোটি পর্যায়। তবলা বা পাখোয়াজের বিভিন্ন বোলবাণী লহড়া নির্ভর নৃত্য পদ্ধতিটি স্পট হয়ে ওঠে। বারোটি পর্যায়ে রয়েছে গনেশ বন্দনা, আমদ, ঠাট, নটবরী, পরমেলু, পরণ, ক্রমলয়, কবিতা, তোড়া, টুকরা ও সংগীত প্রধান। প্রারম্ভিক পর্যায়ে থাকে গনেশ বন্দনা ও আমদ নটবরী অংশে তালসহযোগে নৃত্য পরিবেশিত হয়। পরমেলু অংশে বাদ্যধ্বনীর সাথে নৃত্য পরিবেশিত হয়। পরণ অংশে বাদক বোল উচ্চারণ করে নৃত্যশিল্পী পায়েরতালে তার জবাব দেয়। তবলা বা পাখোয়াজের সাথে নৃত্য পরিবেশনকালে ক্রমান্বয়ে বিলম্বিত লয়ে ও পরে দ্রুতলয়ে নৃত্য পরিবেশিত হয়। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা সেই বৈদিক যুগ থেকেই চলে আসছে। প্রায় ২০০০ বছরের পুরানো। এই চর্চা মূলত : মন্দিরে পরিবেশিত স্তোত্র থেকেই সৃষ্টি। বর্তমানে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রধান দুইটি ধারা বিদ্যমান। যথা (১) হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গসংগীত (২) কর্ণাটকীসংগীত। উত্তরভারতীয় হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গসংগীত বৈদিক দর্শন, ভারতের দেশজ শব্দ সুর এবং পারস্যের সাঙ্গীতিক প্রভাবে ঋদ্ধ। হিন্দুস্থানী সংগীতের মূল প্রেরণা এসেছে হিন্দু ধর্মের নবরস হতে। রাগ আশ্রিত এই সাংগীতিক প্রকাশ বর্তমান অবধি অতি জনপ্রিয় হয়ে আসছে। সাতসুর ও ২২টি শ্রুতির সমন্বয়ে আরোহণ, অবরোহণ বিন্যাস, বাদী ও সমবাদী স্বরের প্রয়োগ এবং মীড়, গমক ও অন্যান্য সাঙ্গীতিক কৌশলের মাধ্যমে উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয়সংগীত পরিবেশন করা হয়। উচ্চাঙ্গকণ্ঠসংগীত শিল্পীগণ মঞ্চপরিবেশনার শেষ পর্যায়ে সাধারণ দর্শক শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য কিছু আঞ্চলিক শৈলী পরিবেশন করে থাকে। এই শৈলীগুলি গুরুপরম্পরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হয়েও অনেক সুন্দরভাবে পরিবেশন করতে পারেন বা করে থাকেন। রাগের বিশুদ্ধতা মানার বাধ্যবাধকতা এই সকল শৈলীতে নেই। আবার উচ্চাঙ্গকণ্ঠসংগীত শিল্পীরা রাগসংগীত পরিবেশনার গম্ভীর আবহের পরে হালকা মেজাজের এই গানগুলি পরিবেশন করেন। যা কোনো না কোনো রাগ নির্ভর তাই এগুলোকে উপশাস্ত্রীয় শৈলী বলে মানা হয়।

ভারতীয় শাস্ত্রীয়সংগীত পরিবেশিত হয় মূলত দুভাবে যথা (১) কণ্ঠসংগীত (২) বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের এককভাবে পরিবেশন করা যন্ত্রাংশসমূহ হলো : সরোদ, সেতার, তবলা, বীণা, সারেঙ্গী, বাঁশী, বেহালা,সন্তুর, সুরবাহার, মৃদঙ্গ। সহায়ক যন্ত্রসমূহ , তানপুরা, এস্রাজ, হারমোনিয়াম ইত্যাদি। তবে বিভিন্ন যন্ত্রের স্বতন্ত্র বাদনে তবলা মূখ্য ভূমিকা পালন করে। শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীত তথা

উপশাস্ত্রীয় সংগীতে তবলা সংগতবাদন আবশ্যকীয়। উপশাস্ত্রীয় সংগীতের ধরণ, শৈলী সুর মুর্ছনা ও তবলার তাল ও ঘরানাগত শিল্পীর বাদন শৈলী ও নান্দনিকতার সংমিশ্রণে সংগীতের এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। কত্থক নৃত্যশৈলী ও উপশাস্ত্রীয় সংগীতের সাথে সংগতবাদনের জন্য তবলা শিল্পীকে হতে হবে দক্ষ এবং বিশেষ ঘরানার তালিমপ্রাপ্ত। কেননা উভয় সংগীত ধারার মধ্যে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন শৈলী ঘরানা ও নান্দনিকতা। একজন তবলাশিল্পী যদি নৃত্য শৈলীর সাথে সংগতবাদনে অভ্যস্ত না হন তিনি নৃত্য শৈলীর পরিপূরক বাদনে হয়তো সার্থকতা দেখাতে পারবেন না। কেননা তবলার স্বতন্ত্র বাদনে ধারাবাহিক যে বোলবাণী বাজানো হয় নৃত্য ধারায় তা পুরোপুরি বাজানো হয় না। নৃত্য শৈলীতে অনেক লয়কারী সমৃদ্ধ কম্পোজিশান বাজানো হয়। তবে নৃত্য ধারার সাথে সম্পৃক্ত সংগতবাদকের নিকট তালিম নিয়ে বাজানো সম্ভব। নৃত্য পরিবেশনের সার্থকতা অনেকাংশেই নির্ভর করে একজন দক্ষ তবলাশিল্পীর উপর। তাই বলা যায় উপশাস্ত্রীয়সংগীত ও কত্থক নৃত্য শৈলী এই উভয় ধারায় সমানভাবে পারদর্শী, তবলাশিল্পীকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। কারণ সংগতকারের সাফল্যের উপরই একটি সার্থক ও সুন্দর উপস্থাপনা সৃষ্টি হতে পারে যা দর্শকের হৃদয় আকৃষ্ট করে।

বিষয় বিবরণ : ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে রাগসংগীত চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা যায়। চর্যাপদ থেকে শুরু করে গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলী সংগীতে রাগের চর্চা ও বিশুদ্ধ ভাব-গাম্ভীর্যে পরিবেশিত হয়ে আসছে যা উচ্চাঙ্গসংগীত বা শাস্ত্রীয়সংগীত ধারার অন্তর্গত। উচ্চাঙ্গসংগীত বা শাস্ত্রীয়সংগীত পরিবেশনার শেষ অংশে শিল্পী দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য হালকা মেজাজের কিছু গান পরিবেশন করেন। যাতে রাগের বিশুদ্ধতা মানার বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু কোন না কোন রাগ নির্ভর গান, এগুলো উপশাস্ত্রীয় সংগীত নামে বহুল প্রচলিত। শাস্ত্রীয় উপশাস্ত্রীয় সংগীতে তালসংগত হিসেবে তবলা ও পাখোয়াজ সংগতবাদন সেই প্রাচীন আমল থেকেই প্রবাহমান। তাল ভারতীয় সংগীতের একটি অনবদ্য সৃষ্টি। পৃথিবীর আর কোন সংগীতে ছন্দ সমন্বিত আবর্তনের এমন গভীর ব্যবহার লক্ষিত হয় না।

উপশাস্ত্রীয় সংগীতে বিভিন্ন রাগের উপর ভিত্তি করে তাল যেমন দাদরা শৈলী, এবং লোকজ ধারায় গান যেমন কাজরী, হোরী, এবং চৈতি শৈলীতে বিষয়, প্রকরণ, সমাজ,পরিবেশের রূপ বিভিন্ন নান্দনিকতা প্রকাশিত হয় তাল ছন্দের দোত্যনায় যা তবলাসংগতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। দাদরা শৈলীতে ঠুমরীর বিশেষ প্রভাব লক্ষনীয়। কাজরী শৈলীতে লঘু অঙ্গের তাল যেমন- কাহার্বা, দাদরা, তেওড়া, খোলঠেকা ইত্যাদি তালের ঠেকার প্রয়োগই বেশি। হোরী লঘু রাগ গীতিতে গাওয়া রাধাকৃষ্ণের দোল যাত্রার পদে বর্ণিত গান যা ত্রিতাল, দীপচন্দী, আদ্ধা, দাদরা, কাহার্বা, পোস্ত, ধূমালী ইত্যাদি তালে নান্দনিকভাবে উপস্থাপিত হয়। চৈতি শৈলীতে লোকজ ও ঠুমরী শৈলীর প্রভাব লক্ষনীয় এতে সংগতবাদনে তবলায় বিভিন্ন তালের ঠেকার ব্যবহারই বেশি। শাস্ত্রীয় ও উপশাস্ত্রীয় এই সকল গানে ফুটে উঠে বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্মীয় অনুভূতি রসে সৃষ্ট বিভিন্ন পদ গান, লোকবিশ্বাস, জীবনধারা ও প্রকৃতির রূপ। আর শিল্পী সেই গান বিভিন্ন রাগে এবং তালছন্দে গায়কী দ্বারা সে নান্দনিক আবহ তৈরী করে তাতে তাল যন্ত্রের শিল্পীরা সংগতবাদনের মাধ্যমে বিশেষ করে 'তবলা' ভাবরস ও নান্দনিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে। অনুরূপভাবে কত্থক নৃত্য শৈলী ও এককভাবে উৎকর্ষ সাধন করতে পারে না। বিভিন্ন তাল সংগত বিশেষ করে তবলা ও পাখোয়াজ সংগতের মাধ্যমে উৎকর্ষ সাধন করে।

বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রসারে কত্থক নৃত্যের যে নতুন রূপ তা মূলত শুদ্ধরূপ। ধ্রুপদ ও ধামার সংগীত পদ্ধতিকে অনুসরণ করে নৃত্য সংগঠন রাজপুত এমনকি মুঘল আমলেও প্রচলিত ছিল। স্বামী হরিদাস, সুরদাস, তানসেন, গোবিন্দ স্বামী নন্দু দাস প্রভৃতি প্রখ্যাত সুরকারদের রচিত সংগীত এই নৃত্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হত।[৭]

মন্দির থেকে দরবার এই প্ররিক্রমায় কত্থক নৃত্য মুসলমান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লি, আগ্রা ও লক্ষ্মৌ এই তিনটি কেন্দ্রে ও হিন্দুরাজাদের আনুকূল্যে রাজস্থানে প্রধান শিল্পকলারুপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

অবশ্য এই দুই স্থানেই আড়ম্বর ও বিলাসের প্রকরণরূপে প্রযুক্ত হওয়ার ফলে আঙ্গিক ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে সামান্য প্রভেদ থাকলেও চরিত্রগত পার্থক্য ছিল না।[৮]

বিন্দাদিন ছিলেন পরমবৈষ্ণব। কথিত আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে নটবর নৃত্যলীলা প্রসারের আদেশ দেন। কত্থক নৃত্য পদ্ধতিতে তিনি কয়েকটি নতুন আঙ্গিক সংযোজন করেন। নৃত্য প্রধান কত্থক নৃত্যধারায় বিন্দাদিন ভজন, ঠুংরী, দাদরা, কবিতা প্রভৃতি সহযোগে ভাব সমৃদ্ধ নৃত্যাংশ সংযোজন করেন।[৯]

কত্থক নৃত্যানুষ্ঠানে শিল্পীর নির্দেশ অনুযায়ী সারেঙ্গী ও তবলা বা পাখোয়াজ বাদক প্রথমে সর সহযোগে লহড়া বাদন করেন। এই রীতি থেকেই তালাশ্রয়ী নৃত্য-পদ্ধতিটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। কত্থক নৃত্যে নৃত্যাংশ প্রধান। বহুবিচিত্র ছন্দপ্রয়োগে রঞ্জনা সৃষ্টি করা নৃত্যাংশের প্রধান কাজ। সাধারণভাবে এই ছন্দপ্রয়োগগুলিকে 'বোল' বলা হয়।

নৃত্যসংগঠন ও প্রয়োগবৈচিত্র্য অনুসারে কত্থক নৃত্যধারার নৃত্যাংশে এগুলিকে সাধারণভাবে বারোটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। গনেশবন্দনা, আমাডা, থাতা, নটবরী, পরমেলু, পারান, ক্রমলয়, কবিতা, তোড়া, টুকড়া, সংগীত ও পাধান এই বারোটি পর্যায়ে নৃত্যাংশ গঠিত হয়।[১০]

কত্থক নৃত্যের পর্যায় অনেকগুলো হলেও এর প্রধান পর্যায় হচ্ছে তিনটি। আমদ, পরণ ও গৎ এই তিনটি পর্যায়কেই কত্থকের তিন প্রধান পর্যায় বলে ধরা হয়ে থাকে। আমদ পর্যায়ে নর্তকের মঞ্চে প্রবেশ ঘটে। তারপর নর্তক সালামের ভঙ্গীতে দর্শকদের আভিবাদন করেন। এরপরের অংশ পরণ।[১১]

কত্থক শাস্ত্রীয় নৃত্যর একটি অতন্ত উল্লেখযোগ্য ধারা। বর্তমানকালে শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা সমূহের মধ্যে কত্থকই সবচেয়ে জনপ্রিয়। প্রাচীনকালে দেবদেবীর মাহাত্ম্যের বিবরণমূলক বিভিন্ন কাহিনীকে গীত ও নৃত্য সহযোগে উপস্থাপিত করে বেড়াবার কাজে নিয়োজিত কয়েকটি সম্প্রদায় ছিল। পাঠক, গ্রন্থিক, কত্থক প্রভৃতি বিভিন্ননামে এইসব সম্প্রদায় পরিচিত হলেও এদের ক্রিয়াকর্ম একই রকম।[১২]

কত্থক নৃত্যের সাথে তবলা সংগতবাদন

অন্যান্য উচ্চাঙ্গ নৃত্য শৈলীর মধ্যে বর্তমানে কত্থক নৃত্যের প্রচার ও প্রসার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যে কোনো বড় বড় শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুষ্ঠানে কত্থক নৃত্যশৈলী পরিবেশনার রীতি বহুল প্রচলিত। কোনো কোনো নৃত্যগুরু বা পণ্ডিতগণ বলেন উচ্চাঙ্গ নৃত্য শৈলী চার প্রকার, আবার কোনো নৃত্যগুরু বা পণ্ডিতগণ উচ্চাঙ্গ নৃত্য শৈলী তিন প্রকার বলে মনে করেন। এই বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ভরত নাট্যম, কথাকলি, কত্থক ও মনিপুরি এই চার প্রকার উচ্চাঙ্গ নৃত্য শৈলী। কিন্তু কোনো কোনো নৃত্যগুরু বা পণ্ডিতগণ মনিপুরি নৃত্য শৈলীকে উচ্চাঙ্গ নৃত্য বলে মনে করেন না। ভরতনাট্যম, কথাকলি ও মনিপুরি এই তিন উচ্চাঙ্গ নৃত্য শৈলীর সাথে সংগত বাদনে তালযন্ত্র হিসেবে সাধারণত তবলা ব্যবহৃত হয় না। ভরত নাট্যমের সাথে মৃদঙ্গ বা মৃদঙ্গম, মনিপুরির সাথে মনিপুরি খোল ও কথাকলি নৃত্যের সাথে সংগতবাদনে তালযন্ত্র হিসেবে চাণ্ডা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে শুধুই কত্থক নৃত্য শৈলীর সাথে তালযন্ত্র হিসেবে তবলা ও পাখোয়াজ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে পাখোয়াজের তুলনায় তবলার সংগতবাদন বেশি প্রচলিত। কাজেই কত্থক নৃত্যের সাথে তবলার সংগতবাদন সম্পর্কে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

উচ্চাঙ্গকণ্ঠসংগীত, উচ্চাঙ্গযন্ত্রসংগীতে যে রাগসংগীত পরিবেশিত হয় তা স্বতন্ত্র তবলাবাদনে প্রধানত দুইটি লয়ে পরিবেশিত হয় অর্থাৎ প্রথমে বিলম্বিত লয় এবং মধ্যলয় বা দ্রুতলয়ে। তেমনি উচ্চাঙ্গ কত্থক নৃত্য শৈলীও প্রধানত দুইটি লয়ে পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে শিল্পীর পরিবেশনার সুবিধার্থে লয় নির্বাচন করার স্বাধীনতা পান। কত্থক নৃত্য পরিবেশনে মঞ্চে সহযোগী শিল্পী হিসেবে যাঁরা উপস্থিত থাকেন, তবলাবাদক / পাখোয়াজবাদক / সারেঙ্গী / এস্রাজ / সেতার / বেহালা / হারমোনিয়াম বাদক ও তানপুরা বাদক এবং উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীত শিল্পী। প্রত্যেক সহযোগী শিল্পীগণই তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ বাদনশৈলীতে ভিষণভাবে পারদর্শী। কত্থক নৃত্য শৈলীর উপস্থাপনের জন্য গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বিভিন্ন সহযোগী

শিল্পীগণ। বিশেষকরে তবলাবাদকের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা কত্থক নৃত্য শৈলী তালযন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। বারোটি নিয়মে কত্থক নৃত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে, যথা– গণেশবন্দনা, আমাডা বা আমদ, থাতা বা থাট, নটবরী, পরমেলু, পরণ, ক্রমলয়, কবিতা, তোড়া, টুকড়া, সংগীত ও পাধান। তবে এই বারোটি নিয়মের মধ্যে আমাডা বা আমদ, পরণ ও গৎ এই তিনটি অংশে কত্থক নৃত্যদিয়ে থাকেন। অন্যান্য উচ্চাঙ্গ সংগীত শৈলীর সাথে কত্থক নৃত্য শৈলীর মিল থাকলেও, স্বতন্ত্র তবলাবাদন বা তবলা লহড়ার সাথে কত্থক নৃত্য অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। উল্লেখ্য যে কত্থক নৃত্যে যেমন পর্যায়ক্রমে বারোটি অংশ উপস্থাপনা করলে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবেশনা হয়। ঠিক তেমনি স্বতন্ত্র তবলাবাদনেও পর্যায়ক্রমে পেশকার, উঠান, ঠেকা, কায়দা, রেলা, লগ্গী, টুকড়া, গৎ, চক্রদার, পরণ, মুখড়া, মোহড়া ইত্যাদি কম্পোজিশনগুলো পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করলে তবেই একটি পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র তবলাবাদন বা তবলা লহড়া হয়।

প্রথমে কত্থক নৃত্য শিল্পীর নির্দেশমত নাগ্মার সহযোগে স্বতন্ত্র তবলাবাদন বা তবলা লহড়া উপস্থাপন করেন এবং কত্থক নৃত্য শিল্পী মঞ্চে এসে গণেশ বন্দনার মাধ্যমে বিঘ্ননাশ হয়, এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই হয়তো কত্থক নৃত্য শৈলীর সাথে গণেশ বন্দনা যুক্ত হয়েছে। আমাডা বা আমদ কত্থক নৃত্যানুষ্ঠানের প্রারম্ভিক বা সূচনা অংশ। এই অংশে কত্থক নৃত্য শিল্পী মঞ্চে দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলে দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে সালাম বা শ্রদ্ধা নিবেদনের ভঙ্গি করেন। আমাডা বা আমদ কথার অর্থ প্রবেশ। অর্থাৎ আমাডা বা আমদ এর মাধ্যমে কত্থক নৃত্য শিল্পী তাঁর নৃত্য পরিবেশনায় প্রবেশ করেন। আমাডা বা আমদ অংশে প্রবেশের আগে শিল্পী বিভিন্ন দেহ ভঙ্গির সূচনা করেন, সেই অংশটিকে কত্থক নৃত্য শৈলীর ভাষায় থাতা বা থাট বলে। এই অংশে শিল্পী তবলার তালের ভাব আবেদন অনুযায়ী দৃষ্টি, গ্রীবা ও শিরকর্মের বিভিন্ন ভঙ্গির সংকেত প্রদান করেন। থাতা বা থাট অংশ শেষ করেই শিল্পী ভগবান শ্রী কৃষ্ণকে 'নটবর' রূপে কল্পনা করেন এবং তা, থেই, তাৎ এই বাণীগুলি উচ্চারণ করে 'নটবর' অংশের আবহ সৃষ্টি করেন। সেই জন্য পরবর্তীকালে কত্থক নৃত্য গুরুগণ এই বাণীগুলিকে বিভিন্ন ছন্দে ছন্দায়িত করেন এবং এই বাণীগুলিকে নটবর বলে আখ্যায়িত করেন। 'পরমেলু' শব্দের অর্থ বিভিন্ন ধ্বনির মিলনে ছন্দ সৃষ্টি করা। এই অংশে তালযন্ত্রের বিভিন্ন ছন্দ বৈচিত্র্য এবং সংগীতের বিভিন্ন ভাব আবেদন এক সঙ্গে মিশে যায় সেই সাথে নৃত্য শিল্পী বিভিন্ন ভঙ্গিতে তালযন্ত্রের বিভিন্ন ছন্দ্র বৈচিত্র্য ও সংগীতের সুর বৈচিত্র্যকে এক সঙ্গে তরঙ্গায়িত করে থাকেন।

পরণ পাখোয়াজের বাণী। বিভিন্ন ধরনের পরণের বাদনক্রিয়া পাখোয়াজে হয়ে থাকে। যথা– গজপরণ, গনেশপরণ, শিবপরণ, রেলাপরণ, চক্রদারপরণ, টুকরাপরণ ইত্যাদি। কত্থক নৃত্য শৈলীর সাথে তবলার সংগতবাদনে পাখোয়াজের বিভিন্ন ধরনের পরণ একজন অভিজ্ঞ তবলাবাদক তাঁর মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে উপস্থাপন করেন। কত্থক নৃত্য শৈলীর সাথে নিয়মিত সংগতবাদনে অভ্যস্ত না থাকলে একজন অভিজ্ঞ তবলাবাদক হয়েও এই শৈলীর সাথে সংগতবাদন করা খুবই মুশকিল। উদাহরণস্বরূপ একজন অভিজ্ঞ মেডিসিন ডাক্তারকে দিয়ে কোনো অপারেশন করানো কী সম্ভব ? আবার কোনো অভিজ্ঞ নাক, কান, গলার ডাক্তার কি অভিজ্ঞ মেডিসিন ডাক্তারের কাজ করতে পারবেন? কাজেই যে তবলাবাদক এই নৃত্য শৈলীর সাথে নিয়মিত সংগতবাদনে অভ্যস্ত, কেবলমাত্র তিনিই এই নৃত্য শৈলীর ভাব আবেদন অনুযায়ী তাঁর মেধা ও দক্ষতা প্রদর্শন করে নান্দনিকতাপূর্ণ সংগতবাদন করে থাকেন।

উদাহরণস্বরুপ কয়েকটি টুকরা, গৎ, পরণ ও চক্রদার উল্লেখ করা হলো :

টুকরা (১)

দিনদিন	তেটেতেটে	ক্রেধাক্রে	ধাতেটে
১	২	৩	৪
থুন থুন	নানানানা	কতেটেধা	কৎতা
৫	৬	৭	৮
ধাকতা	ধা	কতেটেধা	কৎতা
৯	১০	১১	১২

ধাকতাধা কতেটেধা কৎতা ধাকতা

১৩ ১৪ ১৫ ১৬

\+

(ধা) [১৩]

১

টুকরা ((২)

থুন থুন নাগেতেটে গদ্দি ঘেরেনাস

১ ২ ৩ ৪

ধাথুনানা কৎ ধাথুনানা ধাথুনানা

৫ ৬ ৭ ৮

ধাতিৎ ধা ধাথুনানা ধাথুনানা

৯ ১০ ১১ ১২

ধাতিৎধা ধাথুনানা ধাথুনানা ধাতিৎ

১৩ ১৪ ১৫ ১৬

\+

(ধা)

১

গৎ (মাঞ্জাদার)

দিন দিন তাকেটে তাকেটে

১ ২ ৩ ৪

ধাতেরেকেটে ধেতেটে কতা গদিঘেনে

৫ ৬ ৭ ৮

ধাতেরেকেটে তেটেকতা গদ্দি ঘেন্না

৯ ১০ ১১ ১২

দিনদিন তাকেটেতাকেটে ধাতেরেকেটে ধেতেটে কতাগদিঘেনে

১৩ ১৪ ১৫ ১৬

\+

(ধা) [১৪]

১

চক্রদার

তেনেতেনে তেনেতা – তেনে তেনেতা

১ ২ ৩ ৪

– তেনে নাগধেনে ধা-গে নাগধেনে

৫ ৬ ৭ ৮

ধা-গে নাগধেনে ধা তেনেতেনে

৯ ১০ ১১ ১২

তেনেতা – তেনে তেনেতা – তেনে

১৩ ১৪ ১৫ ১৬

নাগধেনে ধা-গে নাগধেনে ধা-গে

১৭ ১৮ ১৯ ২০

নাগধেনে ধা তেনেতেনে তেনেতা

২১ ২২ ২৩ ২৪

- তেনে তেনেতা তেনে নাগধেনে
২৫ ২৬ ২৭ ২৮
ধা-গে নাগধেনে ধা-গে নাগধেনে
২৯ ৩০ ৩১ ৩২
+
(ধা) [১৫]
১

চক্রদার (২)
ধেটেতেটে তাগেতেটে ক্রেধেতেটে তা
১ ২ ৩ ৪
ক্রেধেতেটে ধা-ধা ক্রেধেতেটে ধা-ধা
৫ ৬ ৭ ৮
ক্রেধেতেটে ধা-ধা ধা ধেটেতেটে
৯ ১০ ১১ ১২
তাগেতেটে ক্রেধেতেটে তা ক্রেধেতেটে
১৩ ১৪ ১৫ ১৬
ধা-ধা ক্রেধেতেটে ধা-ধা ক্রেধেতেটে
১৭ ১৮ ১৯ ২০
ধা-ধা ধা ধেটেতেটে তাগেতেটে
২১ ২২ ২৩ ২৪
ক্রেধেতেটে তা ক্রেধেতেটে ধা-ধা
২৫ ২৬ ২৭ ২৮
ক্রেধেতেটে ধা-ধা ক্রেধেতেটে ধা-ধা
২৯ ৩০ ৩১ ৩২
+
(ধা) [১৬]
১

পরণ
ধেটেতেটে তাগেতেটে ক্রেধেতেটে তাগেতেটে
১ ২ ৩ ৪
ক্রেধেতেটে ক্রেধেতেটে ক্রেধেতেটে তাগেতেটে
৫ ৬ ৭ ৮
ক্রেধেতেটে ধা-ধা থুন থুন ক্রেধেতেটে
৯ ১০ ১১ ১২
ধাধা থুন থুন ক্রেধেতেটে ধাধা
১৩ ১৪ ১৫ ১৬
+
(ধা)
১

ক্রমলয় অংশে বিলম্বিত, মধ্যলয় ও দ্রুতলয় ভেদে তালবাদ্য সহযোগে কত্থকনৃত্য শিল্পী পদকর্মের বিভিন্ন লয়কারীর চমক সৃষ্টি করেন। বিশেষ করে ক্রমলয় অংশে মূল শিল্পী ও তাঁর সহযোগী শিল্পীদের

লয়দার হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। কেননা এই পর্যায়ে নৃত্যশিল্পী বিভিন্ন লয়ের লয়কারী করে নৃত্য পরিবেশনার নানারকম ভাব আবেদন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সুতরাং বিভিন্ন লয়ের লয়কারী যদি তাঁর সহযোগী শিল্পীগণ সঠিকভাবে ধরে রাখতে না পারেন তাহলে নৃত্য শিল্পীর মূল পরিবেশনার মেজাজ বা অনুষ্ঠানের ভাব আবেদন বা দর্শক শ্রোতার মনোরঞ্জন করা কোনোটাই সম্ভব হবে না। ঠিক তেমনি মূল শিল্পীকেও সহযোগী শিল্পীদের লয়ের সাথে একত্রিত হয়ে পরিবেশনাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হয়।

ক্রমলয় পর্যায়ে শিল্পী কত্থক নৃত্য শৈলীর ধরাবাঁধা ছককে অতিক্রম করে তাঁর নিজস্ব মেধা ও দক্ষতা প্রদর্শন করে মূল পরিবেশনার নান্দনিকতা বৃদ্ধি করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সেই সাথে সহযোগী শিল্পীগণও তাৎক্ষণিক পরিবেশনার ধারাবাহিকতাকে অনুসরণ করে তাঁদের সমস্ত মেধা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নৃত্য পরিবেশনাকে আরো বেশি প্রাণবন্ত করে গড়ে তোলেন।

কবিতা পর্যায়ে কবিতার আবৃতির সাথে তবলা বাদক সুকৌশলে তাঁর মেধা ও দক্ষতা প্রদর্শন করে তবলার বাণীর সাথে কবিতার বাণীর সংমিশ্রণ করে বিভিন্ন ছন্দ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন এবং এই ছন্দ বৈচিত্র্যের ভাব আবেদনের সাথে যুক্ত হয়ে নৃত্য শিল্পী তাঁর অভিব্যক্তির বহিপ্রকাশ ঘটানোর চেষ্টা করেন এবং সেই সাথে শিল্পী তাঁর পায়ের সাহায্য তাল রক্ষা করেন।

কবিতা অংশ শেষ করেই শিল্পী টুকড়া / গৎ অংশে প্রবেশ করেন। টুকড়া ও গৎ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো। টুকড়া কথার অর্থ অংশ, টুকড়া বন্দিশশ্রেণীর রচনা এর কোনো বিস্তার হয় না, এটি সাধারণত এক আবর্তন থেকে দুই/তিন চার আবর্তন পর্যন্ত হয়ে থাকে। টুকড়াতে তবলা ও পাখোয়াজের বোল বা বাণীর সমাবেশ ঘটে বলে সহজেই দর্শক শ্রোতার মন আকৃষ্ট হয়। শুধুমাত্র তবলার বোল বা বাণী দিয়ে টুকড়া কম্পোজিশান সৃষ্টি হয় না, তবলাও পাখোয়াজের বাণীর সংমিশ্রণে হয় বলে টুকড়ার আওয়াজ খোলা ও জোড়ালো। সাধারণত ধেৎধেৎ, ধেটেতেটে, ধাগেতেটে, ক্রেধেতেটে, ক্রান, থুনাগধা ইত্যাদি বাণীর ব্যবহার হয়ে থাকে। তবলা ও পাখোয়াজের বোল বাণীর সংমিশ্রিত রূপের নামই টুকড়া। গৎ হচ্ছে বিভিন্ন লয়কারী সহযোগে শুধু তবলার বোলবাণী দ্বারা গঠিত কম্পোজিশন।এটি বন্দীশশ্রেণীর রচনা সমূহের মধ্যে কাব্য প্রধান। আবিধানিক 'গতি' শব্দ হতে 'গৎ' এর উৎপত্তি। অর্থাৎ যে রচনার মধ্যে বিভিন্ন গতি বা ছন্দের সমাবেশ থাকে তাকে বলা হয় 'গৎ'। এটা একটি সুসংবদ্ধ কাব্যিক রচনা। গৎ বহু প্রকার, সরল গৎ, অকাল গৎ, মাঞ্জাদার গৎ, পল্লী গৎ, দুধারী গৎ, কামালীকি গৎ ইত্যাদি। কত্থক নৃত্য শৈলীতে বিভিন্ন ধরনের গৎ / টুকড়া প্রচলন লক্ষণীয়। গৎ ও টুকড়া অংশে তবলাবাদক প্রথমে মুখে আবৃতি করেন। আবৃতি শেষ করেই নাগ্‌মার সহযোগে উক্ত গৎ টুকড়া তবলায় বাজান এবং তাৎক্ষণিক নৃত্য শিল্পীও বিভিন্ন দেহ ভঙ্গির মাধ্যমে উক্ত গৎ / টুকড়াটি পরিবেশন করেন। নৃত্য শিল্পী কোনো একটি গৎ / টুকড়া মুখে আবৃতি করেন হাতে তাল দিয়ে অথবা নাগ্‌মার সাথে তাঁর আবৃতি শেষ হওয়ার সাথে সাথে তবলাবাদক নাগ্‌মার সহযোগে উক্ত গৎ / টুকড়াটি উপস্থাপন করেন এবং শিল্পী বিভিন্ন ভঙ্গির মাধ্যমে টুকড়া / গৎটি পরিবেশন করেন।

উল্লেখ্য যে টুকড়া / গৎ অংশে উভয় শিল্পীগণ টুকড়া বা গৎ একসঙ্গে উপস্থাপন করে থাকেন। আবার কোনো কোনো কত্থনৃত্য শিল্পী টুকড়া / গৎ পরিবেশনের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের চক্রদারও পরিবেশন করে থাকেন। চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে এই বোল বা বাণী কমপক্ষে তিনবার সমকে স্পর্শ করে তিহাই যুক্ত হয়ে সমে সমাপ্ত হয়, তাকে সংগীতের পরিভাষায় চক্রদার বা চক্রধার বলে। বিভিন্ন ধরনের চক্রদারের প্রচলন বিদ্যমান যেমন- কামালী চক্রদার, বেদম ফরমাইশি চক্রদার, সেলামী চক্রদার, মাঞ্জাদার গৎ চক্রদার ইত্যাদি। বিভিন্ন তবলা ঘরানার বিভিন্ন চক্রদার পরিবেশনের রীতি প্রচলিত তেমনি কত্থক নৃত্য শৈলীতেও বিভিন্ন ধরনের চক্রদার পরিবেশনের রীতি প্রচলিত। বিভিন্ন চক্রদারের ভাবআবেদন ও নান্দনিকতা নৃত্য শিল্পী তাঁর মেধা ও দক্ষতা দিয়ে বিভিন্ন অঙ্গিভঙ্গি ও অভিনয়ের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেন। কত্থক নৃত্য শৈলীর টুকড়া / গৎ, চক্রদার পর্যায়টি উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসংগীতের জবাবী বাদনক্রিয়ার অনুরূপ। টুকড়া / গৎ, চক্রদার অংশে মূলশিল্পী ও সংগতকারী তবলা শিল্পীকে ভীষণভাবে শ্রুতিধর বুদ্ধিমত্তা ও লয়দার হওয়া

একান্তভাবে প্রয়োজন। কেননা এই পর্যায়ে বিভিন্ন লয়কারীর সহযোগে বিভিন্ন ধরনের গৎ / টুকড়া ও চক্রদার শিল্পী ও সহযোগী শিল্পীগণ উপস্থাপন করে থাকেন। সংগীত অংশে বিভিন্ন বোল বাণীকে সাংগীতিক বা সংগীতের রীতিতে উপস্থাপন করাকে সংগীত বলে।

'পাধান' শব্দটি মূল সংস্কৃত শব্দ থেকে উদ্ভত। শিল্পী নৃত্য পরিবেশনার একপর্যায়ে বিভিন্ন বোল বাণী বা যে তালে নৃত্য পরিবেশন করছেন সেই তালের বিভিন্ন লয়কারীর সমাবেশ হাতে তাল দিয়ে নাগ্‌মার সহযোগে উপস্থাপন করে থাকেন। কত্থক নৃত্য শৈলীর ভাষায় তালের বা বোলের এই ধারা বর্ণনাকেই পাধান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কত্থক নৃত্য শৈলীতে সাধারণত নৃত্য অংশই প্রধান। ধ্রুপদ, ধামার, কীর্তন, ভজন, ঠুমরী, দাদরা, গজল ইত্যাদি সংগীত শৈলীর সাথে এই নৃত্যাংশ সম্পৃক্ত। কত্থক নৃত্য শৈলী ভাব আবেদন সম্বলিত, কাজেই এই ভাব আবেদন প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ভঙ্গি ও বিভিন্ন মুদ্রার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তবে অন্যান্য উচ্চাঙ্গ নৃত্য শৈলীর মতো কত্থক নৃত্য শৈলীতে বিভিন্ন ভঙ্গি বা হস্তক্রিয়ার তেমন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। অনেক সময় শিল্পী তাঁর পরিবেশনার সুবিধার্থে বিভিন্ন ভঙ্গি বা ভাব অভিনয় ক্রিয়ার পরিবর্তন করে থাকেন। কত্থক নৃত্য শৈলী সম্পর্কে দুটো বিষয়ের ধারণা থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন। প্রথমত এই নৃত্য শৈলী তালাশ্রয়ী নৃত্য এবং দ্বিতীয়ত এই নৃত্য শৈলীতে ধরাবাঁধা নিয়ম অতিক্রম করে শিল্পী তাঁর নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করে নৃত্য পরিবেশনার অবাধ স্বাধীনতা গ্রহণ করেন। বর্তমানকালে কত্থক নৃত্য শৈলীতে নুতন ধারা ও রূপ বৈচিত্র্য প্রচলিত, তবে প্রাচীনকালের কত্থক নৃত্য শৈলীর সাথে গুণগত ও চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে।

উপশাস্ত্রীয় সংগীতে দাদরা শৈলীর সাথে সংগতবাদন

এই শৈলীর গান ঠুংরী অঙ্গে গীত হয়ে থাকে। তবে এই গানের প্রকৃতি ঠুংরী অপেক্ষা হালকা এবং চলন অপেক্ষাকৃত দ্রুত। সাধারণত দাদরা তালে এই গান গীত হয় বলে উক্ত গানকে দাদরা শৈলীভুক্ত করা হয়েছে।[১৭]

ঠুংরী গীত ধারার উদ্ভুত এক প্রকার গান। দাদরা তালে দ্রুতলয়ে সাধারণত ভৈরবী রাগে এই গান গাওয়া হয়। এই গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে বেশ একটি লোক আমেজ পাওয়া যায়। কি সুর কমে, কি পদ সংযোজনে এই গানে লোক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই সব বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হলে দাদরা তাল ভিম অন্য তালে রচিত গানকেও দাদরা বলতে দেখা যায়।[১৮]

দাদরা শৈলীতে ঠুমরী শৈলীর প্রভাব লক্ষ্যণীয়। তবে ঠুমরী শৈলীর চাইতে দাদরা শৈলী হালকা প্রকৃতির এবং এই শৈলীর গান দ্রুতলয়ে পরিবেশিত হয়ে থাকে। সাধারণত দাদরা তালে এই শৈলীর গান পরিবেশন হয় বলে এই শৈলীকে দাদরা শৈলী বলে। বলা বাহুল্য এই শৈলীতে অন্য কোনো লঘু তাল প্রযুক্ত হলেও এই শৈলীর গানকে দাদরা শৈলী বলেই মানা হয়।

কোনো কোনো উচ্চাঙ্গকণ্ঠসংগীত শিল্পীগণ খেয়াল পরিবেশনের পর দাদরা গান গেয়ে থাকেন। আবার দাদরা শৈলীর সাথে কত্থক নৃত্য শিল্পীগণ নৃত্য পরিবেশন করে থাকেন। ভৈরবী, গাড়া, পাহারী, ঝিঝিট, পিলু রাগ ছাড়াও বিভিন্ন মিশ্র রাগে দাদরা শৈলীর গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই শৈলীর গানেও দুটো অংশ থাকে এবং ঠুমরী শৈলীর অনুকরণে দাদরা শৈলীর গান পরিবেশিত হয়। সাধারণত তালযন্ত্র হিসেবে তবলায় বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এই শৈলীর গান লঘু প্রকৃতির হওয়ায় অন্যান্য আনদ্ধ যন্ত্র ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আবার সহযোগী শিল্পী হিসেবে হারমোনিয়াম বাদক, সারেঙ্গী বাদক ও দাদরা শৈলীর সাথে সম্পৃক্ত থাকেন।

দাদরা শৈলীর সাথে সংগতবাদনে তবলাবাদককে শিল্পীর সুরবৈচিত্র্যের ভাব আবেদন অনুযায়ী তাৎক্ষণিক ঠেকার বিভিন্ন প্রকার বাজানোর অভ্যাস থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন। দাদরা শৈলীতেও পরিবেশনার শেষের দিকে কোনো কোনো শিল্পী লগ্গীর বাদনক্রিয়া সংগত বাদনে পছন্দ করেন। আবার কোনো কোনো শিল্পীগণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঠেকার প্রকার বাজানোতেই পুরো পরিবেশনা শেষ করেন।

সেই ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক তবলা বাদককে গানের ভাব অনুযায়ী লগ্গীর বাদনক্রিয়া করতে হয়। এই শৈলীর গানও তিহাই দিয়ে শেষ করেন।

কাজরী শৈলীর সাথে সংগতবাদন :

কাজরী উত্তর প্রদেশে কাজলী দেবীকে কেন্দ্র করে যে গান গাওয়া হয় তাহাকেই কাজরী বা কাজলী সংগীত বলে। এই গান মূলত এই প্রদেশের লোকসংগীতের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ তৃতীয়াতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিনে মহিলারা নববস্ত্রে সুসজ্জিতা হয়ে শৃঙ্গের রসাত্মক ভাষায় কাজলী দেবীর গান সারারাত্রিব্যাপী গেয়ে থাকেন।[১৯]

কাজরী শৈলী ভারতের উত্তর প্রদেশের লোকজ অঙ্গের গান। যা এই প্রদেশে বহুল প্রচলিত। তবে এই গান উত্তর প্রদেশের লৌকিক আচার অনুষ্ঠানে গাওয়া হলেও অন্যান্য স্থানেও এই শৈলীর গানের প্রভাব রয়েছে। একক ও সমবেত দুই ভাবেই এই শৈলীর গান গাওয়া হয়ে থাকে। কাজরী শৈলীর গান সাধারণত সমবেতভাবেই বেশি গাওয়া হয়, তবে একক পরিবেশনাও হয়ে থাকে। কাজরী শৈলীর গান বর্তমানে তেমন প্রচলন নাই। তবলা ছাড়াও অন্যান্য তালবাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কাজরী শৈলীতে লঘু অঙ্গের তাল ব্যবহৃত হয়। কাহার্বা, দাদরা, তেওড়া, খোলঠেকা ইত্যাদি। এই শৈলীর সাথে সংগতবাদনে সাধারণত ঠেকার প্রয়োগই বেশি হয়। তবে কিছু কিছু সময় বিভিন্ন ধরনের ঠেকার প্রকার বাজানো হয়ে থাকে।

হোরী শৈলীর সাথে সংগতবাদন

বর্তমানে লঘুরাগগীতিতে পর্যবসিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের দোল লীলা এই গানের পদে বর্ণিত হয়। দোল উৎসবের রঙ খেলাকে বলা হয় হোরী বা হোলী। তা থেকেই এই গানের নাম হোরী হয়েছে। ধ্রুপদাঙ্গে রচিত ধামারেও (দ্রঃ) দোল লীলার বর্নণা থাকে। তাই পূর্বে ধামারকেও বলা হত হোরী।[২০]

ধামার শৈলীর গানের অনুকরণে হোরী গান রচিত। 'রাধাকৃষ্ণ' প্রেমবিষয়ক ও বসন্তকালে হোলী উৎসবের রূপ বর্ণনামূলক ভাষা এই গানের প্রধান অঙ্গ।[২১]

ধামার শৈলীর অনুকরণে হোরী গান রচিত হলেও এই শৈলী ধামারের তুলনায় অনেক বেশি চঞ্চল। ধামার শৈলী পরিবেশিত হয় শুধুই ধামার তালে এবং সংগত বাদনে তালযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় পাখোয়াজ। কিন্তু হোরী শৈলী পরিবেশিত হয়ে থাকে বিভিন্ন তালে যথা– ত্রিতাল, দীপচন্দী, আদ্ধা, দাদরা, কাহার্বা, পোস্ত, ধূমালী ইত্যাদি।

হোরী শৈলীর গান অঞ্চল ভেদে বিভিন্নভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে। সাধারণত বসন্তকালে দোল উৎসবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক কথা নিয়ে এই হোরী শৈলীর গানের প্রচলন লক্ষ্যণীয়। এই উৎসবে বিভিন্ন অঞ্চলে সমবেতভাবে দাঁড়িয়ে ঢোলুক, নাল, খোল, মন্দিরা জিপ্সি ইত্যাদি সহযোগে হোরী শৈলীর গান পরিবেশনা করে থাকেন। আবার এককভাবে বিভিন্ন মঞ্চে বসেও এই শৈলীর গান পরিবেশিত হতে দেখা যায়।

হোরী শৈলীতেও স্থায়ী ও অন্তরা দুটো অংশ থাকে। হোরী শৈলীতে ঠুমরীর প্রভাব লক্ষ্যণীয়। তাই অনেক সময় কোনো কোনো খেয়াল গায়ক খেয়াল পরিবেশনার পর ঠুমরীর পরিবর্তে হোরী পরিবেশন করে থাকেন। ধ্রুপদ ও খেয়ালের মতই হোরী শৈলীও বিভিন্ন রাগে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

হোরী শৈলীর সাথে সাধারণত তালযন্ত্র হিসেবে তবলা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে দলীয় ভাবে যখন হোরী শৈলীর গান পরিবেশিত হয়, সেই সময় তালযন্ত্র হিসেবে ঢোলক, নাল, খোল, মন্দিরা, জিপসি ইত্যাদি ব্যবহার হতে দেখা যায়। এই শৈলীর সাথে সংগতবাদনে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঠেকার প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবে সংগতবাদনকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য কিংবা পরিবেশনার নান্দনিকতা বৃদ্ধির জন্য ঠেকার প্রকার বা খানাপুরির প্রয়োগে সংগতবাদন করা যেতে পারে। যেহেতু ঠুমরী শৈলীর সাথে সম্পৃক্ত, তাই এই শৈলীর শেষের দিকে সংগত বাদনে লগ্গীর প্রয়োগ করা যেতে পারে। উভয় শিল্পী একসঙ্গে তিহাই দিয়ে হোরী শৈলীর পরিবেশনার সমাপ্তি করেন।

চৈতি শৈলীর সাথে সংগতবাদন :

লোকগীতি বিশেষ। ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহার অঞ্চলে সমধিক প্রচলিত। শ্রী কৃষ্ণের দোল যাত্রা ও হোলী উৎসবের পর প্রধানত চৈত্র মাসে এই গান গাওয়া হয়। চৈত্র থেকে চৈতি কথাটির উদ্ভব হয়েছে। প্রমই চেতির প্রধান বিষয়বস্তু। মানবিক প্রেমত্রর মূখ্য বিষয় হলেও কৃষ্ণ প্রেমও এসে পড়ে।[২২]

সাধারণত রাম গীতির ব্যথাভরা জীবনদর্শনই এই গানে প্রধান স্থান পাইয়া থাকে। চৈতি গান বিহার প্রদেশে বিশেষ লোকপ্রিয় এবং সবিশেষ আদৃত।[২৩]

চৈতি শৈলীর গান ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহার অঞ্চলের প্রভাব লক্ষণীয়। সাধারণত এই অঞ্চলে এই গান চৈত্র মাসে গাওয়া হয় বলে এই শৈলীর নাম চৈতি হয়েছে। এই শৈলীর গান একক ও সমবেত দুইভাবেই পরিবেশিত হয়ে থাকে। চৈতি শৈলীতে লোকজ ও ঠুমরী শৈলীর প্রভাব রয়েছে। তালবাদ্যযন্ত্র হিসেবে তবলা ছাড়াও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই শৈলীতে লঘু অংশের তাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চৈতি শৈলীতে গুরু পরম্পরা তালিমপ্রাপ্ত শিল্পী না হলেও সেই অঞ্চলের শিল্পীরা এই শৈলীর গান পরিবেশন করে থাকেন। এই শৈলীর সাথে সংগতবাদনে সাধারণত তালের ঠেকার প্রয়োগই বেশি হয়ে থাকে। তবে একঘেয়েমী দূর করার জন্য বিভিন্ন আঙ্গিকে ঠেকার প্রয়োগ করে সংগত বাদন করলে পরিবেশনার নান্দনিকতা বৃদ্ধি পেতে পারে। তবলা ছাড়াও সহযোগী যন্ত্র হিসেবে মন্দিরা, জিপ্‌সি, খন্‌জনী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রগুলো এই শৈলীর সাথে সংগতবাদনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপসংহার

কথক নৃত্য ও উপশাস্ত্রীয় সংগীতে সংগতবাদন অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা পালন করে। তাল যন্ত্রের বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহিত হয়। প্রত্যেক যন্ত্রের বাদক বা শিল্পী স্ব স্ব যন্ত্রের তাল- ছন্দ ও সুর মুর্চ্ছনায় মূল সংগীত অথবা নৃত্যকে করে প্রাণস্পর্শী। কথক নৃত্য শৈলীতে তবলাশিল্পী তবলার বিভিন্ন বোল বাণীর সুসংহত উপস্থাপন হস্ত সঞ্চালনার কৌশলে নান্দনিক ঝংকার একত্রে মিলে সৃষ্টি করে দৃষ্টি নন্দন ও মোহনীয় ভাব রসের। শাস্ত্রীয়সংগীতে ভাব গম্ভীর সুর মুর্চ্ছনার মাঝে মাঝে তবলাশিল্পীর দাপুটে তাল দোত্যনা গতি সঞ্চার করে। শেষ অংশে যখন গায়ক উপশাস্ত্রীয় সংগীত গাওয়া শুরু করেন তখন তবলা শিল্পী ও গানের ভাব- তাল-লয় অনুসারে তার শিল্প নৈপূন্য প্রদর্শনের সুযোগপান ফলে উভয় মিলে মিশে সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে। সকল ধরনের দর্শক শ্রোতা আনন্দ উপভোগ করে। স্বতন্ত্র তবলা-সংগতবাদনে কোনো কায়দা, রেলা, লগ্গী, টুকড়া, গৎ, তিহাই ইত্যাদির বোল বাণীগুলি মৌখিকভাবে বলতে গেলে ছন্দ এবং সুরের বিশেষ ঢঙ ব্যবহার করতে হয়। যা তবলা ও বাঁয়ার সংমিশ্রণে শব্দ প্রক্ষেপণের সাথে সম্পৃক্ত। তেমনি এ নৃত্য শৈলীতে অনেক বর্ণ বা বাণী নৃত্য শিল্পীর উচ্চারিত ঢঙ অনুযায়ী তবলা শিল্পীকে বাজাতে হয়। এই বাদন ক্রিয়ার মধ্যেই তবলা ও বাঁয়ার ব্যবহারে নান্দনিকতা স্পষ্ট হয়। এছাড়া নৃত্য শিল্পী যে তালের বিভিন্ন ধরনের লয়কারী ব্যবহার করেন। তাৎক্ষণিক ভাবে সংগতকারী তবলাবাদককে তা অনুসরণ করতে হয়। উভয়ের ছন্দ বৈচিত্র্য যখন শব্দ প্রক্ষেপণের মাধ্যমে অর্থাৎ বাদনক্রিয়া এবং নৃত্যের মোহনীয়তা একই ঢঙে উপস্থাপিত হয়, তখন তা দর্শক শ্রোতার কাছে সমাদৃত হতে থাকে। উপশাস্ত্রীয় শৈলী সব শ্রেণীর দর্শক শ্রোতার কাছে খুব সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে। এবং মূল পরিবেশনাও প্রাণবন্ত হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. অলোক দত্ত, *প্রসঙ্গ তবলা*, সুবর্ণ রেখা কর্তৃক ৭৩ মাহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৭০০০০৯ হইতে প্রকাশিত ২৫শে বৈশাখ ১৪০৭ সন। পৃ. ২৫

২. গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, *ভারতের নৃত্যকলা*, পঞ্চম সংস্করণ, (নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা-৭৩, ১৯৯৭), পৃ.২০৮

৩. *তদেব*, পৃ. ২০৮

৪. *তদেব*, পৃ. ২১০

[৫.] *তদেব*, পৃ. ২০৯

[৬.] *তদেব*, পৃ. ২১১

[৭.] করুণাময় গোস্বামী, *সংগীত কোষ*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৪), পৃ. ৬৮

[৮.] দেবব্রত দত্ত, *সংগীত তত্ত্ব* (১ম খণ্ড), (দেবব্রত দত্ত ট্রাস্ট, ৪৯/১ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯, ১৪০০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২০৬

[৯.] করুণাময় গোস্বামী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৫

[১০.] দেবব্রত দত্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১২

[১১.] করুণাময় গোস্বামী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০০

[১২.] দেবব্রত দত্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৬

[১৩.] ড. প্রবীর ভট্টাচার্য এর নিকট থেকে ব্যবহারিক গৃহীত শিক্ষা, ১৯৯৩

[১৪.] *তদেব*

[১৫.] অশোক কুমার স্যান্যাল এর নিকট থেকে ব্যবহারিক গৃহীত শিক্ষা, ১৯৮৪

[১৬.] অধ্যাপক মানস দাস গুপ্তের নিকট থেকে ব্যবহারিক গৃহীত শিক্ষা, ১৯৯৪

[১৭.] করুণাময় গোস্বামী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৭

[১৮.] দেবব্রত দত্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১২

[১৯.] করুণাময় গোস্বামী, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২৮৫

[২০.] দেবব্রত দত্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২১২

[২১.] করুণাময় গোস্বামী, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৭০০

[২২.] দেবব্রত দত্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২০৬

[২৩.] করুণাময় গোস্বামী, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২৯৭

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাট্য মাদার পিরের পালা : বিষয় ও পরিবেশনরীতি
(Indigenous Bangla Theatre Mother Pirer Pala: Content and performance style)

ড. এস এম ফারুক হোসাইন*

Abstract: A review of the history of Indigenous Bengali Theatre shows that Pirpuja or their service-oriented Panchali originated in the late seventeenth century. The life stories of the Pirs, worldly powers, Mahatma, and devotees came up in all these vows and ritualistic Panchali narratives. Researchers have termed this theatre as Pirpanchali considering the context of its content. Mother Pir is one of the pir-dervishesthat can be found in Bengali Pirpanchali. Pala or songs of Mother Pir are presented based on the life story of Mother Pir, her miraculous powers, Mahatma, affection towards devotees, etc. The main intention of the textual essay is to reveal the content and performance of the Mother Pir Pala or song.

ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাট্যের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় পিরপূজা বা তাঁদের সেবা-কেন্দ্রিক পাঁচালির উদ্ভব হয় সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে। পিরদের জীবনগাথা, অলৌকিক ক্ষমতা, মাহাত্ম ও ভক্তবাৎসল্যের প্রসঙ্গগুলো উঠে এসেছিলো এ সকল ব্রতকথা ও কৃত্যমূলক পাঁচালি আখ্যানে। গবেষকগণ বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গটি বিবেচনায় এ নাট্যাঙ্গিকটিকে পিরপাঁচালি রূপে অভিহিত করেছেন।[১] বাঙলা পিরপাঁচালিতে যে সকল পির-দরবেশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাদের মাধ্যে অন্যতম মাদার পির। মাদার পিরের জীবনগাথা, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা, মাহাত্ম, ভক্তের প্রতি স্নেহপ্রবণতা প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে উপস্থাপিত পালা মাদার পিরের পালা বা গান নামে পরিচিত। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মূল অভিপ্রায় মাদার পিরের পালার বিষয়বস্তু এবং পরিবেশনরীতির স্বরূপ উন্মোচন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তের জন্য নির্বাচিত হয়েছে মোহনপুর উপজেলার মাদার পালার গায়েন মোসতফা সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত ‘বিবি কুসুমের পালা’। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ‘মাদার পিরের পালা’ অপেক্ষা ‘মাদার পিরের গান’ শিরোনামটি অধিক প্রচলিত হলেও বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ‘মাদার পিরের গানে’র পরিবর্তে ‘মাদার পিরের পালা’ শিরোনামটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ মাদার পিরের গানে পরিবেশিত আখ্যানগুলো পালা হিসেবেই সর্বত্র দৃশ্যমান।

মাদার লৌকিক পির হিসেবে বাংলাদেশে অধিক পরিচিত। অঞ্চলভেদে মাদার পিরকে নানা নামে অভিহিতি হতে দেখা যায়। গবেষকদের মতে তাঁর নামগুলো তাঁর আত্মিক রূপেরই দ্যোতক।[২] মাদার পির সম্পর্কিত আলোচনায় লক্ষণীয় উভয় বাংলায় ‘শাহ মাদার’ নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। এতদ্ব্যতীত ‘দম মাদার বা দমের মাদার’, ‘মাদার দেওয়ান’, ‘মাদার সাহেব’, ‘মাদার পির’, ‘মাদার মনি’ ‘জিন্দা পির’ এবং ‘মাদার’ নামেও তিনি অভিহিত। গবেষকগণ মনে করেন শাহ্ মাদার ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ভারতবর্ষে তাঁর আগমন ঘটেছিলো ইসলাম ধর্ম প্রচারের অভিপ্রায়ে। তাঁর লিঙ্গ পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় “না মরদ আছে না আওরতের নেসানি”।[৩] অর্থাৎ মাদার পির পুরুষ নন এবং স্ত্রীও নন। মাদার পিরের জীবনী নিয়েও ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন মাদারের জন্ম সিরিয়ায় ১৩১৫ খ্রিস্টাব্দে। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৪৩৪ সালে ভাতের কানপুর জেলার মকনপুরে।[৪] তবে অন্য তথ্যে লক্ষণীয় তাঁর মৃত্যু হয় ১৪৩৭ সালে।[৫] গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ অগ্নিজনিত দুর্ঘটনা থেকে পরিত্রাণ নিমিত্তে মাদার পিরের পূজা করতো। কারণ মাদার ছিলেন অগ্নি-নির্বাপণকারী পির বা অগ্নির অধিকর্তা। এতদ্ব্যতীত বায়ু, রোগ, ব্যাধি,

* প্রফেসর, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বিপদ-আপদ এবং মনোবাসনা পূরণকারী পির হিসেবেও মাদার সাধারণ মানুষের কাছে বেশ জনপ্রিয়।[৬] মাদার পিরের প্রতীক হচ্ছে বাঁশের দণ্ড। লালসালু কাপড়ে আবৃত এ বাঁশের দণ্ডদুটি প্রায় ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ফিট দীর্ঘ হয়ে থাকে, যা মাদারের থানের মধ্যখানে স্থাপন করা হয়। লোকশ্রুতিতে জানা যায় এই দুটি বাঁশখণ্ডের একটি হলো মাদার পিরের প্রতীক।

মাদারের থান হলো মাদারের চেলা বা ভক্তদের আস্তানা। মাদার ভক্ত ফকিরদের বলা হয় মাদারের চেলা। মাদারী ফকিরেরা সাধারণত গেরুয়া পোশাকধারী হয়। মাথায় থাকে জটাওয়ালা লম্বা চুল, হাতে-পায়ে লোহার বালা, ত্রিশূল সদৃশ লম্বা লোহার দণ্ড এবং ৫/৬ ফিট লম্বা গিটযুক্ত বাঁশের লাঠি। লাঠিটি সোজা কখনো বাঁকা হয়ে থাকে। রঙিন কাপড়ে জড়ানো এ লাঠির স্থানে স্থানে মুড়ানো থাকে রূপা বা ব্রোঞ্জের পাত দ্বারা। মাদারী ফকিরদের নিকট এই লাঠি খুবই মূল্যবান ও পবিত্র। সরিষা তৈল মালিশ করে খুব যত্নসহকারে সংরক্ষণ করা হয় লাঠিটিকে। মাদার থানে অবস্থানকারী মাদারী ফকিররা 'দম মাদার দম মাদার' বলে জিকির করে থাকে। মাদারের ভক্ত বা অনুসারীরা 'মাদারীয়ান সম্প্রদায়' হিসেবে অভিহিত।[৭] মাদারিয়া সম্প্রদায় মাদারের থানকে কেন্দ্র করে মাঘমাসের পূর্ণিমায় নৃত্যগীত, ওরস ও মেলা আয়োজনের মধ্য দিয়ে মাদারের উৎসব আয়োজন করে। গবেষকগণ মনে করেন মাঘমাসের পূর্ণিমা থেকে বর্ষাকালের পূর্ব পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডের ভয় বেশি থাকে বিধায় উক্ত সময়ে উৎসবের আয়োজন করা হয়।[৮] বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত ভক্তিসহযোগে মানত উপলক্ষে মাদার পিরের পালা এবং মাদারের জারী উপস্থাপিত হতো। পরবর্তীতে তা বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠে।

মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে জানা যায় মাদার পির কেন্দ্রিক পরিবেশনায় মোট ১২টি পালা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশিত হয়ে থাকে।[৯] যদিও কোনো কোনো পালার একাধিক খণ্ড রয়েছে। উপস্থাপিত পালাগুলো হচ্ছে- মাদারের জন্ম পালা, খাকপত্তনের পালা, সাত আউলিয়ার উরসনামা পালা, পুণ্যের পালা, বড়পির সাহেবের পালা (সাত খণ্ড), বিবি কুসুমের পালা (দুই খণ্ড), বিবি গুঞ্জরার পালা (দুই খণ্ড), রাক্ষস-বিভীষণের পালা, গৌরা চান্দের পালা, জুমলের পালা, ছিনমন কাজীর পালা, নৌকা বিলাস পালা।[১০] মাদারের পালার গায়েন মোসতফা সরকার কর্তৃক আরো জানা যায় মাদারের জন্ম পালা এবং খাকপত্তনের পালার আয়োজন করা বর্তমানে সম্ভব হয় না। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন আত্মিক শুদ্ধতা এবং মৌলবাদের রক্তচক্ষু এই পালা দুটি উপস্থাপনের মূল অন্তরায় হিসেবে ক্রিয়াশীল। তাঁর মতে রাজশাহী অঞ্চলে বিবি কুসুমের পালা, জুমলের পালা, বড়পির সাহেবের পালা, রাক্ষস-বিভীষণের পালা, বিবি গুঞ্জরার পালা অধিক জনপ্রিয় পালা হিসেবে মঞ্চস্থ হয়।

অনত্র্য বেলাল হোসেন তাঁর প্রবন্ধে আরো কিছু পালার নাম উল্লেখ করেছে। তাঁর মতে আসকানের পালা, ধনা রাখালের পালা, কিস্তি নামার পালা, ঔষুধ নামার পালা প্রভৃতি মাদার পালাগুলো রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে পরিবেশিত হতো।[১১] আবার গবেষক আল জাবির মাদার পির সম্পর্কিত আলোচনায় আরো কিছু নতুন পালার নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন, সরুৎনামা পালা, কংসরাজ পালা, নজ্ঞান মাদার পালা এবং রমণীসুদ্ধি পালা।[১২] মাদারের পালার সংখ্যা ভিত্তিক উক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় মাদার পিরকে অবলম্বন পূর্বক কতগুলো পালা পরিবেশিত হয় তার সঠিক পরিসংখ্যান অজ্ঞাত। হয়তো অনেক পালা কালের গর্ভে বিলীন হয়েছে, অথবা কোনো কোনো পালার নাম এখনো গবেষকদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। এক্ষেত্রে বলা যায় মাদার পিরকে কেন্দ্র করে পরিবেশিত পালাগুলোর সঠিক পরিসংখ্যান এখনো অজানা। গবেষক বেলাল হোসেন, আল জাবির, সাইদুর রহমান লিপন এবং মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যে প্রাপ্ত পালাগুলো হলো- মাদারের জন্ম পালা বা ফকিরা পালা, খাকপত্তনের পালা, বিবি কুসুমের পালা, জুমলের পালা, ছিনমন কাজীর পালা, বড়পির সাহেবের পালা, গৌরা চান্দের পালা, রাক্ষস-বিভীষণের পালা, ধনা রাখালের পালা, কিস্তি নামার পালা, ঔষুধ নামার পালা, নৌকা বিলাস পালা, বিবি গুঞ্জরার পালা, পুণ্যের পালা, সুরুৎনামা পালা, কংসরাজ পালা, নজ্ঞান মাদার পালা, রমণীসুদ্ধি পালা। অর্থাৎ মাদার পির অবলম্বনে পরিবেশিত মোট ১৮টি পালার সন্ধান মিলে। তবে পালার উক্ত পরিসংখ্যানটি চূড়ান্ত পরিসংখ্যান হিসেবে মনে করা যৌক্তিক

নয়। কারণ মাদার পিরের প্রভাব বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই বিরাজমান ছিলো। সেহেতু মাদার পির অবলম্বনে পরিবেশিত আরো কোনো পালার অস্তিত্ব থাকাটাই স্বাভাবিক। এতদ্ব্যতীত একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে পালার নাম ভিন্ন ভিন্ন হয়। বক্ষ্যমাণ গবেষণার পরবর্তী আলোচনা মাদার পির অবলম্বনে পরিবেশিত পালাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নিম্নে বর্ণিত পালাগুলোর বিষয়বস্তু মাদার গানের গায়েন মোসতফা সরকারের নিকট থেকে গৃহীত হয়েছে। তবে গবেষক সাইমন জাকারিয়া ও গবেষক বেলাল হোসেনের গবেষণাকর্মেও পালাগুলোর বিষয়বস্তু উল্লিখিত আছে।

মাদারের জন্মপালা বা ফকিরা পালা : মাদারের জন্ম কথা, অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে তার আবির্ভাব, ফকির হবার ঘটনাবলী নিয়ে মাদারের জন্ম পালা পরিবেশিত হয়। পালাটিতে মাদারের ফকির হবার কাহিনিসমূহ প্রাধান্য পাওয়ায় এটি ফকিরা পালা হিসেবেও পরিচিত।

বড়পির সাহেবের পালা : বড়পির আব্দুল কাদের জিলানী এবং মাদার পিরের সাথে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে তীব্র মতবিরোধিতার কাহিনি সমন্বয়ে তৈরি পালা বড়পির সাহেবের পালা। এই পালাটির বিষয়বস্তু সাত খণ্ডে বিভক্ত।

খাকপত্তনের পালা : পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে তৈরি খাকপত্তনের পালা। বর্তমান সময়ে পালাটির পরিবেশনা নিয়ে পালাকারদের মধ্যে লোকবিশ্বাস জনিত কিছু ভীতি থাকায় পালাটি অভিনীত হয় না বলে জানা যায়।

জুমলের পালা : সোনাপুর শহরের বাদশা ধনপতি শাহ এবং সোনাই বিবির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে জুমল। জুমলের জন্ম বৃত্তান্ত অবলম্বনে নির্মিত কাহিনি জুমলের পালা হিসেবে পরিচিত। কোনো কোনো গায়েন 'জুমল'কে 'জুমন' নামেও অভিহিত করেন। সে হিসেবে এ পালাটি কোনো কোনো স্থানে জুমনের পালা হিসেবেও উল্লিখিত।

বিবি কুসুমের পালা : মাদারের আশীর্বাদে রোম শহরের নিঃসন্তান বাদশা শেরশাহ্ ও তার ছোট বিবি কুসুমের সন্তান লাভ এবং সন্তান লাভ পরবর্তী সময়ে কুসুমের দুর্ভোগ বিবি কুসুমের পালার মূল বিষয়বস্তু। জানা যায় পালাটি দুই খণ্ডে বিভক্ত।

রাক্ষস-বিভীষণের পালা : এই পালায় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং মাদার পিরের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ ও যুক্তি-তর্ক অনুষ্ঠিত হয়। পালাটির বিষয় একটি নিষ্পাপ শিশুর কলেরায় মৃত্যুর সময় আজরাঈল কর্তৃক তার জানকবজ করা। কাহিনির এক পর্যায়ে মাদার পির আল্লাহ কর্তৃক অভিশপ্ত হয়। মা ফাতেমার মাধ্যমে আল্লাহ এবং মাদার পিরের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। মাদারের ক্ষমা প্রার্থনায় আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দেন যে, মাদার পিরের ভক্তকুলের মাঝে আর কখনো বিভীষণ (কলেরা) প্রবেশ করবে না।

বিবি গুঞ্জরার পালা : পালাটির বিষয় বস্তুতে বিবি কুসুমের পালার বিষয়বস্তুর সাথে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ এ পালার কাহিনি বস্তুতে নিঃসন্তান রাজার সন্তান লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে। আরব দেশের জিঞ্জিরা শহরের বাদশা শিকল ও তার সর্বকনিষ্ঠ পত্নী বিবি গুঞ্জরার ঘরে দুই পুত্র সন্তানের জন্ম হয় মাদার পিরের দোয়ায়। সন্তান দুটির নাম আসব ও ইসব। সন্তান লাভের প্রয়াস, সন্তান লাভ এবং সন্তান দুটিকে কেন্দ্র করে তৎপরবর্তী ঘটনাবলী হচ্ছে এ পালার মূল বিষয়বস্তু। বিবি গুঞ্জরার পালাটি কোথাও কোথাও গুঞ্জর বা গুঞ্জন বিবির পালা নামেও প্রচলিত।

নৌকা বিলাস পালা : পাথর দিয়ে মাদার পিরের নৌকা তৈরির কাহিনি অবলম্বনে তৈরি নৌকা বিলাস পালা।

গৌরা চান্দের পালা : মাদারিয়া সম্প্রদায় বিশ্বাস করে পৃথিবীর চারদিকে অবস্থান করেন বিখ্যাত চার পির। এরূপ বিশ্বাস থেকে তারা মনে করে দক্ষিণ দিকের পির হচ্ছে গৌরা চান্দ। মাদার পির এবং গৌরা চান্দের মধ্যকার বাহাজ, অলৌকিক ক্ষমতার লড়াইকে অবলম্বন করে তৈরি কাহিনি গৌরা চান্দের পালা হিসেবে পরিচিত।

সাত আউলিয়ার ওরসনামা পালা : মাদার পিরের নির্দেশে জুমল সাত আউলিয়ার ওরসের আয়োজন করে। সে আয়োজনের প্রক্রিয়া ও বিষয়বস্তু নিয়ে নির্মিত হয়েছে সাত আউলিয়ার ওরসনামা পালা।

ধনা রাখালের পালা : পালাটির মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে মাদার পিরের অলৌকিক শক্তির প্রদর্শন। মাদার পির তাঁর অলৌকিক শক্তি দ্বারা ধনা রাখালকে হেদায়েত ও রাখালের ইচ্ছা পূরণ করাই হচ্ছে ধনা রাখালের পালাটির মূল বিষয়বস্তু।

পূণ্যের পালা :- পূণ্যের পালা বিষয়বস্তু ভক্তের মাঝে মাদার পিরের গুণকীর্তন করা, তাঁর মাহাত্ম ও অলৌকিক ক্ষমতা প্রভৃতি মানবকুলে প্রচার করা।

উল্লেখ্য মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য এবং বিভিন্ন গবেষণাকর্ম পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ছিনমন কাজীর পালা, কিস্তি নামার পালা, ঔষধ নামার পালা, কংসরাজ পালা, নজ্জান মাদার পালা, রমনীসুদ্ধি পালার বিষয়বস্তু সম্পর্কে রাজশাহী অঞ্চলে তেমন কোনো বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পাওয়া যায় না।

উপরিউক্ত আলোচনায় লক্ষণীয় মাদারের পালায় পরিবেশিত কাহিনিগুলোর বিষয়বস্তু মাদার পিরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত এবং বিস্তৃত। মাদার পিরের অলৌকিক ক্ষমতা, ভক্তের প্রতি স্নেহ প্রবণতা, প্রতিবাদ প্রতিরোধ, ক্রোধান্ধতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলোর আশ্রয়ে বিন্যস্ত হয়েছে পালাগুলোর বিষয়বস্তু। তবে উল্লিখিত পালাগুলোর বিষয়বস্তুর সাথে বাঙলা অনেক লোকপালার বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়- বিবি কুসুমের পালায় কুসুমের বনবাস জীবন যাপন অনেকটা রূপভান লোকপালার কেন্দ্রিয় চরিত্র রূপভানের বনবাস জীবনকে মনে করিয়ে দেয়। অন্যত্র বিবি গুঞ্জরার পালার গুঞ্জরা চরিত্রটির প্রতিচ্ছবি যেন কুশান পালার গুঞ্জরা বিবির চরিত্রটির অনুরূপ।[১৩] মাদারের পালা ও কুশান গানের আঙ্গিকগত পার্থক্য থাকলেও উক্ত আঙ্গিকদ্বয়ে পরিবেশিত পালা দুটির নাম ও চরিত্র দুটির নামও অভিন্ন। তবে বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

আবার মাদারের পালাগুলোর বিষয়বস্তু ও অভিপ্রায়ের সাথে লিটার্জিক্যাল প্লে, মিস্ট্রি প্লে, মিরাকল ও মর‌্যালিটি প্লে'র অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান। কারণ পরিবেশনায় এবং বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুষঙ্গগুলো উভয় নাট্যাঙ্গিকে দৃশ্যমান। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় ইস্টার ও খ্রিস্টমাস এর মতো বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে লিটার্জিক্যাল প্লেসহ উল্লিখিত নাট্যাঙ্গিকগুলো অভিনীত হতো।[১৪] যা ছিলো খ্রিস্টান জাতির ধর্মগুরু যিশুর মহিমা, অলৌকিক ক্ষমতা এবং মহানুভবতার বিষয়কে অবলম্বন পূর্বক রচিত।

পরিবেশনরীতি : মাদার পালার আয়োজন করা হয় মূলত দুটি উপলক্ষকে সামনে রেখে। প্রথমত মানত উপলক্ষে, এবং দ্বিতীয়ত কোনো উৎসব, পার্বণ বা নিছক চিত্তবিনোদনের অভিপ্রায়ে। জানা যায় মাদার অগ্নি, বায়ু ও রোগ-ব্যাধি নিরাময়কারী পির।[১৫] যে কারণে রোগ ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ, বিভিন্ন বিপদ আপদ থেকে নিষ্কৃতি, সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি প্রভৃতি কারণে মানত হিসেবে গ্রামের সাধারণ মানুষ মাদার পালার আয়োজন করে থাকে। ভক্তি সহকারে বিভিন্ন কৃত্যাচারের মাধ্যমে অনেকটা ভাব-গাম্ভীর্য্য সহকারে পালাটি আয়োজিত হয়। অন্যত্র সমাজের বিভিন্ন উৎসব-পার্বণকে কেন্দ্র করে কিংবা শুধুমাত্র অবসর বিনোদনের জন্য কোনো সৌখিন ব্যক্তি বা সংঘের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় মাদারের গান বা পালা। আক্ষরিক অর্থে মাদার পিরের পালা পরিবেশনার সুনির্দিষ্ট কোনো সময় পরিদৃষ্ট হয় না। মানতকারীর সুবিধা মতো সময়ে এবং পরিবেশনকারী দলের সম্মতিতে বছরের যে কোনো সময় পালাটি উপস্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত উৎসব, পার্বণ এবং গ্রামের মানুষের অবসর সময়কে কেন্দ্র করে বছরের যে কোনো সময় মাদারের পালা উপস্থাপিত হয়ে থাকে। মাদার পালার গায়েনদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় শীতকাল এবং চৈত্র-সংক্রান্তি এই পালাটি উপস্থাপনের জন্য উপযুক্ত সময়। তাদের মতে অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকে শীতকালে আর নতুন ফসলের আগমনের ফলে মাদারের পালা অধিক পরিবেশিত হয়। তবে অল্প-বিস্তর প্রায় সারা বছর গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী অন্যান্য বাঙলা নাট্যাঙ্গিকগুলোর মতো মাদারের পালাও পরিবেশিত হয়। মাদার পালা মূলত আসরকেন্দ্রিক পরিবেশনা। গায়েন-দোহার সম্মিলনে নৃত্যগীত মাধ্যমে যে কোনো বৈঠকে পরিবেশিত হয় পালাটি।[১৬] রাতে বা দিনে আসরে আসরে বন্দিত হয় মাদার পির। নৃত্য,গীত, বাদ্য, বর্ণনা আর অভিনয়ে গায়েন -দোহার কর্তৃক পরিবেশিত হয় মাদারের গুণকীর্তন।

মাদারের পালার পরিবেশনরীতিকে নাট্য গবেষক সাইদুর রহমান লিপন তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন ১. আখ্যান পূর্ব পরিবেশনা ২. আখ্যান ৩. অন্তখণ্ড।[১৭] আবার আখ্যান পূর্ব পরিবেশনা তিনটি স্তরে বিভাজিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রথম স্তর সমন্বিত বাদ্যযন্ত্র পরিবেশনা বা কনসার্ট, দ্বিতীয় স্তর সালাম ফিরানো এবং তৃতীয় স্তর বন্দনাগীত পরিবেশনা। গবেষক ইউসুফ হাসান অর্ক তাঁর গবেষণাকর্মে পালাগানের গঠন আলোচনায় উল্লিখিত বিভাজনকে অঙ্গবিভাজন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে পালাগানের পরিবেশনা বন্দনা, আখ্যান এবং সমাপনী এই প্রধান তিন ভাগে বিন্যস্ত।[১৮] তিনি মনে করেন পালাগান পরিবেশনার এই গঠনটি বাংলাদেশের অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী নাট্যাঙ্গিকগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বক্ষমাণ গবেষণার পরবর্তী আলোচনা গবেষণা অন্তর্ভূক্ত মাদার পিরের পালা 'বিবি কুসুমের পালা'র পরিবেশনরীতি অন্বেষণ। উল্লেখ্য, এ পালাটির আসর আয়োজন করা হয়েছিলো একজন অসুস্থ সন্তানের আরোগ্য লাভের আশায় মানত হিসেবে।

পালার আসর ব্যবস্থা :

বিবি কুসুমের পালাটি আয়োজিত হয়েছিলো ভূমিসমতল বৃত্তাকার মঞ্চে একটি বৃহৎ বৃক্ষ তলায়। চারপাশে চারটি খুটির সাহয্যে তৈরি ছিলো টিনের একটি ছাউনি। খুটি চারটির মাঝখানে দোহার ও যন্ত্রীদের বসার স্থান। খড়ের উপরে কাঁথা বিছানো এ স্থানটি দোহার ও বাদকদের স্থান হলেও নাচিয়েরা বা ছোকরারাও অবসরে বিশ্রাম গ্রহণ করে এখানে । খুঁটি চারটির চারপাশে ঘুরে ঘুরে নৃত্য-গীত ও বর্ণনা সহযোগে অভিনয় করে পালার মূল গায়েন । মঞ্চের চারদিক খড়, চট ও বাড়ি থেকে আনা বিভিন্ন আসনে উপবিষ্ট হন দর্শকবৃন্দ । এক্ষেত্রে খড়, পাটের চট বা চাটাই বিছানো মাটি, টোল, পিঁড়ি, মোড়া, বেঞ্চ, চেয়ার প্রভৃতি আসবাব দর্শকাসন হিসেবে দৃষ্টিগোচর হয় । অন্যত্র আসনহীন দর্শকগণ দাঁড়িয়ে উপভোগ করেন মাদার পালার অভিনয় ক্রিয়া । মঞ্চের পরিমাপ সম্পর্কে জানা যায় মঞ্চের উপর ঝুলানো সামিয়ানা বা অন্যকোনো উপকরণ দ্বারা নির্মিত ছাউনি এবং স্থানের বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে অভিনয় মঞ্চের আয়তনের বিস্তৃতি। তবে গায়েনের মতে তা ৮×১২ হাতের বেশি নয় । আর আসরস্থান হিসেবে সাধারণত নির্বাচিত হয় মানতকারীর বাড়ির আঙ্গিনা । সেক্ষেত্রে স্থানের সংকোচন না হলে মানতকারীর পার্শ্ববর্তী বাড়ির আঙ্গিনা, স্কুল মাঠ, বাজার সংলগ্ন মাঠ পালার আসর স্থান হিসেবে নির্বাচিত হয়।

বাদক ও দোহারের আসন গ্রহণ এবং জয়ধ্বনী : পরিবেশনার শুরুতে দোহার ও বাদ্যযন্ত্রীদল মঞ্চে পরস্পরের মুখোমুখী বৃত্তাকার অবস্থায় আসন গ্রহণ করে । আসন গ্রহণ শেষে দোহারগণ জয়ধ্বনি দিতে থাকে মাদার পিরসহ অন্যান্য পির-মুর্শিদের নামে । খোল, করতাল, মন্দিরার বৈতালিক বাদ্যে বাদক ও নাচিয়েগণ সমস্বরে জয়ধ্বনীতে অংশগ্রহণ করে থাকে। উল্লেখ্য, ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাট্যাঙ্গিক আলকাপ নাট্যেও জয়ধ্বনীর প্রচলন লক্ষ করা যায়।

কনসার্ট : জয়ধ্বনী শেষে শুরু হয় সমবেত যন্ত্রসংগীত। খোল, মন্দিরা, করতাল এবং ঝাঁঝের সমন্বিত এ বাদ্য কনসার্ট নামে অভিহিত। মাদার গানের মূল গায়েন মোসতফা সরকারের মাধ্যমে জানা যায় বাদ্যযন্ত্রের এই সমন্বিত পরিবেশনাটি স্থানীয়ভাবে 'বাউয়ালি' নামেও পরিচিত। মাদার পালার অভিনেতাদের আসন গ্রহণ, তাদের মানসিক প্রস্তুতি, দর্শক সমাবেশ, দর্শকের আসন গ্রহণ ও তাদের মনোযোগ আসরের প্রতি কেন্দ্রিভূত করার জন্য কনসার্ট পর্বটি অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়।

সালাম নিবেদন: কনসার্ট বা বাউয়ালি পর্ব শেষে শুরু হয় সালাম নিবেদন। এ পর্বে দোহারগণ, কখনো কখনো গায়েনসহ আল্লাহ্, রাসুল, পির-পয়গাম্বর এবং উপস্থিত দর্শকদের প্রতি গানের সুরে সুরে সালাম নিবেদন করেন। বাদ্যসহযোগে নিবেদিত সালামের কথাগুলো হচ্ছে-

আস্‌সালাহ্ মালাইকুম্ আরে ও ভাই
ওয়ালাইকুম্ আস্‌সালাম।

দুই বা ততোধিক বার তারা সালাম দিয়ে থাকেন। উপস্থাপনের অভিপ্রায়ে এবং প্রক্রিয়া দৃষ্টে মনে হয় বন্দনার মতো সালাম নিবেদনও একটি ভক্তিমূলক পরিবেশনা।

দিশা: সালাম পরবর্তী পর্ব দিশা। দিশা হচ্ছে লৌকিক গানের সাধারণ ধুয়া, যা পদ্যে বা গদ্যে উভয়ে পরিবেশিত হতে পারে। গবেষকের মতে ধুয়া হচ্ছে সাধারণ অর্থে গীত ধ্রুবপদ। দিশা পর্বে দোহারগণ আল্লাহ্, রাসুল, পির, মুর্শিদ, দেশ প্রভৃতি বিষয় স্বরণে সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে।

পাকের গান: নাচিয়ে বা ছুকরীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় পাকের গান। নাচিয়েগণ কখনো বৃত্তাকার কখনো অর্ধ বৃত্তাকারভাবে দোহারদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে নৃত্যগীত পরিবেশন করে বলে এই গানগুলোকে রাজশাহী অঞ্চলের মাদার পালার গায়েনগণ পাকের গান হিসেবে উল্লেখ করে থাকে। তৃতীয় লিঙ্গের কিশোর বা যুবকগণ নাচিয়ে সেজে খেমটা নাচে পাকের গান পরিবেশন করে। যে কোনো বিষয় নিয়ে এই গান তৈরি হয়। আবার বাংলা সিনেমা, জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত বা দেশের গানও স্থান পায় পর্বটিতে। গায়েনের মতে প্রেম, বিরহ, প্রণয়, প্রকৃতি, সংসার জীবন, ফুল, স্বদেশ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে গানগুলো নির্বাচিত বা তৈরি হয়। সাধারণত খেমটাসহ একটি গানেই সমাপ্ত হয় এ পর্বটি। তবে দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী এ সংখ্যা বৃদ্ধিও পেয়ে থাকে।

রোগীর আরোগ্য কামনা : মাদারের পালা পরিবেশনার এ পর্বে অসুস্থ ব্যক্তি বা মানতকারীর রোগীকে নিয়ে মঞ্চে ওঠেন পালার মূল গায়েন। চিনি, দুধ, কলা, পাঁচ পদের মিষ্টিসহ নতুন গামছা দ্বারা আবৃত কুলা থাকে রোগীর মাথায়। চাল, ধান, দূর্বা, সিঁদুর, মোমবাতিসহ একটি চালুন থাকে একজন নাচিয়ের হাতে। চালুনে কলাপাতা বিছিয়ে তার উপর রাখা হয় নাচিয়ের হাতের উপকরণগুলো। রোগী ও নাচিয়েসহ গায়েন রোগীর আরোগ্য লাভের অভিপ্রায়ে মঞ্চের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে এবং কালেমা পড়তে থাকে। গায়েনের হাতের চামর এ সময় ব্যবহৃত হয় রোগীর ঝাড়-ফুঁক কাজে। সাত পাক মঞ্চ প্রদক্ষিণ শেষে রোগী ও নাচিয়ে মঞ্চ ছেড়ে তাদের আসন গ্রহণ করে। শুরু হয় বন্দনা পর্ব।

বন্দনা: বন্দনা অর্থ নিবেদন বা গুণকীর্তন। ঐতিহ্যবাহী অনেক বাঙলা নাট্যে বিশেষ করে পাঁচালি ধারায় এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। গবেষকের মতে পাঁচালি, লীলানাট্য, কথকথা, যাত্রা, গীতিকা, পালার প্রারম্ভে স্রষ্টা, নানা দেব-দেবী, পূণ্যস্থান এবং পির-পয়গাম্বরদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যে সঙ্গীত তাই 'বন্দনা' নামে পরিচিত।[১৯] বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের গবেষণা অন্তর্ভূক্ত পালায় শিখন গুরু, দর্শক, পিতামাতা, পৃথিবীর চারদিক, দেশ প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা হয় বন্দনা পর্বে। বন্দনা পর্বে পরিবেশিত সঙ্গীতের কথাগুলো বক্ষ্যমাণ পালার গায়েন রচিত হলেও কিছু কিছু অংশ গুরু পরম্পরায় তাদের মধ্যে প্রবাহিত বলে জানা যায়। মাদারের পালার পরিবেশনা দৃষ্টে প্রতীয়মান এর বন্দনা অংশটি দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথমত "দোহারী বন্দনা" দ্বিতীয়ত "গায়েনের বন্দনা"। আমাদের পরবর্তী আলোচনা দোহারী বন্দনা।

দোহারী বন্দনা পর্বটি পরিবেশিত হয় সমন্বিত বাদ্যযন্ত্রসহ ধুয়া সহযোগে। নাচিয়েগণ নৃত্যসহযোগে অংশ নেয় দোহারের সাথে। বাদ্য ও গীতের তালে তালে নাচিয়েগণ মঞ্চকে বা দোহারগণকে বৃত্তাকার আবার অর্ধবৃত্তাকার ভাবে দ্রুত গতিতে প্রদক্ষিণ করে। এসময় কোমরের বিভিন্ন ঘূর্ণায়মান ভঙ্গি, দ্রুতলয়ে পদবিক্ষণ, শরীরের বিভিন্ন অংশ বিশেষ করে বক্ষাংশের ছন্দবদ্ধ উচ্চকিত প্রদর্শন এবং মুখায়বের শৃঙ্গার অভিব্যক্তিসহ বিভিন্ন শারীরিক ভঙ্গিমার সাহায্যে নৃত্যরত নাচিয়েগণ অভিনয় স্থান বা মঞ্চকে প্রদক্ষিণের মাধ্যমে নৃত্য পরিবেশন করে দোহারী বন্দনায়। এ বন্দনা পর্বে সাধারণত প্রতি ছয় ও আট চরণ পর পর বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যতানে ধুয়াগীত পরিবেশিত হতে থাকে। গায়েন কর্তৃক জানা যায় দোহারী বন্দনায় গায়েনের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়। এ সময় তিনি বিশ্রামেও থাকতে পারেন অথবা মঞ্চে দণ্ডায়মানও থাকতে পারেন।

বন্দনা পর্বের পরবর্তী আলোচনা গায়েনের বন্দনা। গায়েনের বন্দনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুর ব্যতীত বর্ণনাত্মক পদ্যের অন্তমিল ছন্দে বাদ্যযন্ত্রসহযোগে পরিবেশিত হয় নৃত্যগীত। গবেষণা অন্তর্ভূক্ত পালার গায়েনের বন্দনার একাংশ নিম্নরূপ :

আগেতে আগ বন্দরে শূণ্যে নয়রে কার
সাহেব আল্লাহ্ বন্দেছেরে পরোগা দিগার।

আল্লাহ্ আল্লাহ্ বল রে বান্দা আল্লাহ্ আল্লাহ্ বল
এই বান্দার বসতি যেমন বাদ্য করে ঢোল।
বাদ্যকরে ঢোল রে ভাই ভাঙিলে বাদ্য মানা
দেহের মালিক ছেড়ে যাবে, ভাঙবে বারাম খানা।
ভাঙবে বারাম খানা রে আল খাল্লা হবে খালি
দিনে দিনে ছেড়ে যাবে সোনার মর্দআলী।
আল্লাহ্র নামটি নেওনা বান্দা জিহ্বার আলিসে
মউতকালে কলিজা তোমার জাইরা তুলবে বিষে।
আল্লাহ্র নামটি নিতে বান্দা যে করিবে হেলা
জবান বন্ধ হবে তোমার মউতের বেলা।।

বন্দনার উপরিউক্ত চরণগুলো সমন্বয়ে একটি শিকল রচিত বলে জানা যায় পালার গায়েন কর্তৃক। এরূপ সাতটি শিকল দ্বারা রচিত বন্দনার সমগ্র অংশটি। সাতটি শিকলের প্রতিটি এক একটি বিষয় বা ব্যক্তির অবলম্বনে রচিত। যেমন, প্রথম শিকলটি আল্লাহ্কে কেন্দ্র করে। এরূপ নবী করিম (সাঃ), বিবি ফাতেমা, হযরত আলী, হাসান-হোসেন, পির-পয়গাম্বর, মাদার পির, চারদিক, গায়েনের ওস্তাদ-গুরু, পিতা-মাতা, দর্শক, আসর, দেশ এই সাতটি শিকলে বন্দনা পর্বটি সম্পন্ন হয় গবেষণা অন্তর্ভূক্ত পরিবেশনা বিবি কুসুমের পালায়।[২০] পালার মূল গায়েন খোল, মন্দিরা এবং করতালের সমন্বিত বাদ্যের ছন্দবদ্ধ তালে তালে অন্তর্মিলযুক্ত বর্ণনাত্মক পদ্যে পরিবেশন করে বন্দনা। এক্ষেত্রে বাদ্যের তালে তালে গায়েন মাঝে মধ্যে শারীরিক বিভিন্ন ভঙ্গিমা প্রদর্শন করে থাকে। বন্দনার এই অংশটি গায়েনের বন্দনা হিসেবে অভিহিত।

আখ্যান বা মূল কাহিনি : গবেষকের মতে কোনো পালার আখ্যান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন উপাদান সমন্বয়ে নির্মিত। এই উপাদানগুলো দৃশ্য বা দৃশ্যাংশ হিসেবে গায়েনের গীতমূলক অঙ্গ (স্থায়ী অংশ) এবং গীতহীন অঙ্গ (অস্থায়ী অংশ) এর সুষম বিন্যাসের মাধ্যমে গড়ে ওঠে আখ্যানের শরীর।[২১] উপাদানগুলো হচ্ছে গীত, কথা, নাচাড়ি এবং বোলাম। এখানে 'গীত' অর্থ গান, 'কথা' অর্থ বর্ণনা, 'নাচাড়ি' অর্থ নৃত্য এবং 'বোলাম' অর্থ সংলাপ বা কথোপকথন। উপরিউক্ত আলোচনায় গীতমূলক অঙ্গ বলতে গবেষক বুঝিয়েছেন সচেতনভাবে গায়েন কর্তৃক পরিবেশনার সুরারোপিত অংশ এবং গীতহীন অংশ হচ্ছে গায়েনের পরিবেশনার যে অংশে সুরারোপ করা হয়না বা হয়নি। যেমন সংলাপ ও কথোপকথন অংশে সুর আরোপিত হয় না বলে এ ধরনের অংশকে গবেষক 'গীতহীন' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে বন্দনা, আখ্যানের বিভিন্ন দৃশ্য বর্ণনা, চরিত্রের ক্রিয়া অথবা আবেগ প্রকাশের বর্ণনা-ব্যাখ্যা এবং সমাপনী অংশ সুরসহযোগে পরিবেশিত হয় বলে এ ধরনের অংশকে গবেষক গীতমূলক হিসেবে বিবেচনা করেছেন।[২২]

বিবি কুসুমের পালার অভিনয় ক্রিয়া বর্ণনা, গান, নৃত্য এবং সংলাপ বা কথোপকথনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় গায়েন ও দোহার কর্তৃক। অর্থাৎ বর্ণনাত্মক পদ্য, বর্ণনাত্মক গীত, সংলাপাত্মক পদ্য ও গদ্য ব্যবহার পূর্বক পরিবেশিত হয় উক্ত পালার আখ্যান অংশ।[২৩] মূল গায়েন আখ্যান পরিবেশনায় বর্ণনা, গীত, নৃত্য ও সংলাপে অংশগ্রহণ করলেও তার সহঅভিনেতা বা দোহার কখনোই চরিত্রে বর্ণনাত্মক অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে না। আখ্যানের বর্ণনাত্মক অভিনয় অংশে একক কর্তৃত্ব থাকে শুধুমাত্র গায়েনের। সংলাপাত্মক অভিনয় সম্পন্ন হয় গায়েন-দোহার, গায়েন-সহঅভিনেতার উক্তি- প্রত্যুক্তিতে। এতদ্ব্যতীত গায়েন কখনো একক বা দ্বৈত চরিত্রে নিজেই সংলাপাত্মক অভিনয় ক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। এক্ষেত্রে নাচিয়েও তার সহযোগী-অভিনেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দোহারের মধ্য থেকেও সংলাপাত্মক অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। গীত বা গান পরিবেশিত হয় গায়েন, দোহার ও নাচিয়েদের সমন্বয়ে। গায়েনের গানে সাহায্যকারী হিসেবে দোহারের সাথে নাচিয়েরাও ধুয়া পরিবেশন করে গায়েনকে সহযোগিতা করে থাকে। পালাগানে দৃষ্ট হয় গায়েন সাধারণত ডাইনার সাথে কথোপকথন বা উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে চরিত্রাভিনয় করে থাকেন। এক্ষেত্রে ডাইনাকে মঞ্চে অবতীর্ণ হতে দেখা যায় না। অন্যত্র মাদারের

পালায় জুমল নামক চরিত্রটি এবং কখনো কখনো নাচিয়েগণও মঞ্চে গায়েনের সাথে চরিত্রাভিনয়ে অবতীর্ণ হয়। তবে এ চরিত্রাভিনয় ইউরোপীয় চরিত্রাভিনয় থেকে ভিন্ন। ভিন্নতাটি পরিলক্ষিত হয় অভিনেতার সংলাপ প্রক্ষেপণে, অভিব্যক্তি প্রকাশে এবং শারিরীক নানা ভঙ্গিতে। আখ্যানের মুখ্য চরিত্রগুলোর সুখ, দুঃখ আনন্দ-বেদনা, বিদায়, মনোবাসনা বা আকাঙ্ক্ষা, পূর্ণতা বা প্রাপ্তি প্রাসঙ্গিক নানা ঘটনা ও বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বক্ষ্যমাণ আখ্যানে গানের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পরিবেশিত গানের মাধ্যমে চরিত্রের আবেগ-অনুভূতি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঘটনা ও বিষয়ের তাৎপর্য দর্শক মনে বাস্তবতার উদ্রেক ঘটায়। ফলে পরিবেশিত আখ্যানের সাথে দর্শকের যেমন একাগ্রতা তৈরি হয় অন্যদিকে ঘটনা ও চরিত্রের ক্রম পরিণতির জন্য দর্শকমনে তৈরি হয় উৎকণ্ঠা। উল্লেখ্য মাদারের পালার গায়েনসহ অন্যান্য সকল অভিনেতার অভিনয় ক্রিয়ায় আধ্যাত্মিক অনুভব বা সাত্ত্বিকতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণরূপে বিবেচিত হয়।

মঞ্চ ব্যবস্থা : গবেষণা অন্তর্ভূক্ত আখ্যানের মূল গায়েন কর্তৃক জানা যায় তাদের পরিবেশনায় মঞ্চ ব্যবস্থাপনার পুরো দায়িত্বটি থাকে আয়োজক ব্যক্তি বা সংগঠনের উপর।[২৪] আর্থাৎ আয়োজক তাঁর বাড়ির আঙ্গিনা, স্কুল মাঠ বা হাট-বাজার সংলগ্ন কোনো খোলা স্থানে তৈরি করে মাদার পালার মঞ্চ। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন এক্ষেত্রে মঞ্চের পরিমাণ হচ্ছে সর্বোচ্চ ১৪ ফিট × ১৪ ফিট এবং সর্বনিম্ন ১০ ফিট×১০ ফিট আয়তনের।[২৫] তবে গায়েন মোসতফা সরকার কর্তৃক জানা যায় মঞ্চায়তনের ক্ষেত্রে তাদের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপ মেনে চলা সম্ভব হয় না। মঞ্চের আয়তনের ক্ষেত্রে তারা আয়োজকের উপরই ছেড়ে দেন। এক্ষেত্রে আয়োজক কর্তৃক নির্ধারিত স্থান এবং তৈরি মঞ্চায়তনের বিস্তৃতির উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট হয় অভিনয় স্থান। তবে নৃত্যগীত নির্ভর পরিবেশনা হওয়ায় বৃহৎ মঞ্চায়তনের পক্ষে নন মাদার পালার দলের শিল্পীরা। তাদের মতে মঞ্চের মাপ সর্বোচ্চ ১৮ ফিট×১২ ফিট হলে ভালো হয়।

দর্শকেরর জন্য নির্ধারিত স্থানের মাঝখানের চার কোণে চারটি বাঁশের খুঁটির ওপর ঢেউটিন, বাঁশের চাটাই বা সামিয়ানার ছাউনি দিয়ে তৈরি হয় মঞ্চ। এ সময় মঞ্চটি দেখতে আয়তকার হলেও অভিনয়ের সময় পুরো মঞ্চটি রূপ নেয় ভূমিসমতল বৃত্তাকার মঞ্চে। কারণ ছাউনির নিচে মুখোমুখি অবস্থায় গোল হয়ে বসেন দোহার ও বাদ্যকরগণ। তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে অভিনয় ও নৃত্য পরিবেশিত হয় বিধায় মঞ্চের বা অভিনয় স্থানের এরূপ আকৃতি লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য, মঞ্চে দর্শকাসন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য বক্ষ্যমাণ আলোচনার আসর ব্যবস্থাপনা অংশে উপস্থাপিত হয়েছে।

পোশাক ও মেকআপ পরিকল্পনা: পর্যবেক্ষণকৃত মাদার গানের মূলগায়েন এবং ছুকরি বা নাচিয়েগণ ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রের পোশাক প্রাত্যাহিক জীবনে ব্যবহৃত পোশাকগুলোই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মূলগায়েন পরিধান করেন বিশেষ ধরনের খিলকা বা ফতুয়া, বুক খোলা আলখেল্লা বা আলপি, পাজামার মতো ধূতি। মাথার তাজ বা মকুট, গলায় পরিধান করে সহস্র দানার তসবি এবং কোমরে কোমরবন্ধ। গায়েনের ধূতি এবং খিলকা সাদা রঙের এবং আলখেল্লা সাদা-লাল কাপড় সমন্বয়ে তৈরি। মাথার তাজ লাল রঙের কাপড় দ্বারা নির্মিত। নাচিয়েগণ জরি ও চুমকি লাগানো রঙিন জর্জেট বা সূতির শাড়ি, হাফ অথবা থ্রি-কোয়াটার ব্লাউজ, গলায় বিভিন্ন ধরনের পুতির মালা এবং কোমরে পুতির তৈরি বিছা, কানে দুল ও হাতে বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিকের চুড়ি পরিধান করে। আবার কখনো তাদের চুমকি জড়ানো রঙিন জর্জেটের ঘাগড়াও পরিধান করতে দেখা যায়। দোহার ও বাদ্যকরগণ শার্ট, গেঞ্জি, ফতুয়া অথবা পাঞ্জাবির সাথে লুঙ্গি পরিধান পূর্বক অংশগ্রহণ করে মাদারের পালায়।

পালাটিতে পোশাকের অনুরূপ মেকআপেও দোহার ও বাদ্যযন্ত্রীগণ একেবারে নিরাভরণ, মেকআপহীন। শুধুমাত্র নাচিয়ে বা ছুকরিরা উজ্জ্বল মেকাপ গ্রহণ করে আসরে তাদের উচ্চকিত করার জন্য। ছুকরিরা মেকআপ ব্যবহার করে মুখে, হাতে, গলায়সহ শরীরের দৃশ্যমান প্রায় সকল অংশে। জিংক অক্সাইড, পিউরি, পাউডার, টিপ, তৈল, কাজল, লিপিস্টিক, আলতা, রোজ, জরি প্রভৃতি উপকরণ মেকআপ হিসেবে তারা ব্যবহার করে থাকে। বর্তমানে প্যানকেক এবং টিউবও তারা ব্যবহার করছে বলে জানা যায়।

মূলত নাচিয়েগণ তাদের গায়ের উজ্জল রং এবং মুখে মসৃন গোলাপী আভা তৈরি করার মাধ্যমে সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করার অভিপ্রায়ে মেকআপ নিয়ে থাকে।

অভিনেতাদের হস্তবাহিত উপকরণ সমূহ : গবেষণা অন্তর্ভূক্ত পরিবেশনাটির অভিনেতাদের মধ্যে একমাত্র মূলগায়েন অধিক হস্তবাহিত উপকরণ ব্যবহার করে থাকে। পর্যবেক্ষণকৃত পালায় দেখা যায় আশা, চামর ও সোয়া হাতের রুমাল হচ্ছে গায়েনের প্রধান হস্ত উপকরণ। পিরের নিদর্শন এবং ফকিরালির বৈশিষ্ট্য থেকে গায়েন 'আশা' ও 'চামর' ব্যবহার করে থাকে বলে জানা যায়। এ ছাড়াও গামছা, ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র, পরণের ধূতি বা আলখেল্লা কখনো কখনো অভিনেতার অভিনয় উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে এ পালায় ব্যবহৃত হয় বাঙালির ঐতিহ্যবাহী লোকজ বাদ্যযন্ত্র। ১টি খোল, ১টি মন্দিরা ও ১টি করতালের সমন্বিত বাদ্যে পরিবেশিত হয় সমগ্র আখ্যান।

মাদারপালা পরিবেশনার সময়সীমা : মাদারের পালা পরিবেশনার নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই। সাম্প্রতিক সময়ে এক রাত বা এক রাত এক দিন ধরে এই পালাটি পরিবেশিত হয়। গায়েনের মতে মাদার পিরের গান চার রাত চার দিন, সাত রাত সাত দিন এমনকি একুশ দিন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়। এক্ষেত্রে আয়োজনকারী মানত, সামর্থ্য, সময় প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভির করে এই পালাটি পরিবেশনার সময়সীমা নির্ধারিত হয়। উল্লেখ্য এক রাত এক দিন গান পরিবেশনার জন্য তারা ৭০০০ টাকা সম্মানী নিয়ে থাকে।

সমাপনী: আখ্যান পরিবেশনার শেষে অনুষ্ঠিত হয় সমাপনী পর্ব। গবেষণা অন্তর্ভূক্ত মাদারের পালার পরিবেশনার সমাপনী পর্বটি দুইভাগে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। প্রথমত রোগীর লোকচিকিৎসা পর্ব এবং দ্বিতীয়ত দর্শকদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ পর্ব।

রোগীর চিকিৎসা পর্ব : আখ্যান পরিবেশনা শেষ হলে মানতের উপলক্ষ রোগীকে মঞ্চে তুলে গায়েন। রোগীর সাথে গায়েন সাত পাক ডান থেকে বাঁয়ে এবং সাত পাক বাম থেকে ডানে চক্রাকারে মঞ্চ প্রদক্ষিণ করে। এসময় হাতের চামর দ্বারা রোগীকে ঝাড়-ফুঁক দিতে থাকে। মন্ত্রপড়ে ঝাড়-ফুঁক শেষে রোগীকে তুলে দেয়া হয় তার পরিবারের কাছে গায়েন নির্দেশিত পরবর্তী কৃত্যাচারের জন্য।

বিদায় পর্ব : রোগীর চিকিৎসা শেষে গায়েন গানে গানে দর্শকের কাছে বিদায় প্রার্থনা করে। তার ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করে দর্শকদের নিজ নিজ গৃহে গমনের জন্য অনুরোধ জানান। দর্শকের সাথে তার মুর্শিদকেও বিদায় জানান গায়েন। পর্যবেক্ষণকৃত বিবি কুসুমের পালায় সমাপনী গানটি ছিলো নিম্নরূপ:

ও পালা খতম রে হলো
পালা খতম হয়ে গেলো ও মুখে আল্লাহ রাসূল বল রে
ও পালা খতম রে হলো,
যে যেখানে ছিলে রে বাবা সে সেখানে যাও রে
ও পালা খতম রে হলো।
আমার আসর ছেড়ে মুর্শিদু নিজ মুকামে যাও রে
ও পালা খতম রে হলো।।

সমাপনী সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়েই সমাপ্তি ঘটে গবেষণা অন্তর্ভুক্ত পালার। বলা যায় প্রায় সকল ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাট্যাঙ্গিকের পরিবেশনরীতিতে এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তবে তা পরিবেশনার ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

উপসংহার

বাংলাদেশের চর্চিত ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাট্যাঙ্গিকগুলোর মধ্যে জনপ্রিয় একটি নাট্যাঙ্গিক হচ্ছে মাদার পিরের পালা। মাদার পির অবলম্বনে যতগুলো পালা বর্তমান সময় পর্যন্ত গবেষকদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে তার সবগুলো পালায় কেন্দ্রিয় চরিত্র মাদার পির এবং তাঁর সহচর জুমল। পালার অন্যান্য চরিত্রগুলোর সমাবেশ ঘটেছে কাহিনির উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের অনুষঙ্গে। অর্থাৎ মাদারের অভিপ্রায় এবং তা বাস্তবায়ন কল্পে কাহিনির অগ্রগতি, সম্প্রসারণ ও সমাপ্তি। মাদার পিরের পালার কাহিনি বা বিষয়বস্তু মাদার পিরের এক

একটি অভিপ্রায় পূরণের এক একটি অভিযাত্রা বললে অত্যুক্তি হয় না। মাদার পিরের পালার পরিবেশনার প্রতি লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই মাদার ভক্ত সম্প্রদায় বা মাদার ভক্ত কোনো ব্যক্তির উদ্যোগ থেকেই এ পালার আয়োজন করা হয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সৌখিন প্রয়াস হিসেবেও পালাটির আয়োজন হয়ে থাকে। গবেষকের অভিমত থেকে বলা যায় মাদার পিরের পালা পিরপূজাকেন্দ্রিক পাঁচালির অন্তর্ভুক্ত। মঙ্গলকাব্যের মতো মানব জীবনের বাস্তব পরিচয় পিরপাঁচালিতে উদ্ভাসিত না হলেও মাদার পিরের পালা সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনভূতিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সম্ভবত একারণেই মাদার পিরের পালা কৃত্যমূলক ঔপচারিক পাঁচালি হিসেবে গ্রাম-বাংলার আপামর জনসাধারণের নিকট এখনো জনপ্রিয় পরিবেশনা রূপে আদৃত।

তথ্যনির্দেশ

[১] সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, (ঢাকা : হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৮), পৃ. ২৯৫।

[২] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, (ঢাকা: গতিধারা, ২০০১), পৃ: ২১৬।

[৩] ড. দেবব্রত নস্কর, *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা*, (কতকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯), পৃ:৪৭৯।

[৪] তদেব।

[৫] সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক: বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮), পৃ:১২৭।

[৬] বেলাল হোসেন, *উত্তরবঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতিতে মাদার পিরের প্রভাব*, "মাদার পিরের গান", উপদেষ্টা সম্পা: শামসুজ্জামান খান (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৬), পৃ: ৪৫।

[৭] তদেব, পৃ:৫৩।

[৮] সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩২২।

[৯] মোসতফা সরকার, গবেষণা অন্তর্ভুক্ত পালার মূল গায়েন, অডিওতে ধারণকৃত সাক্ষাৎকার, মোহনপুর, রাজশাহী, ১৭-০৫-২০২২।

[১০] তদেব।

[১১] বেলাল হোসেন, *উত্তরবঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতিতে মাদার পিরের প্রভাব*, "মাদার পিরের গান" উপদেষ্টা সম্পা: শামসুজ্জামান খান, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭২)।

[১২] আল জাবির, "মাদার পিরের পালা পরিবেশনারীতির লোকশৈলী", মাদার পিরের গান, উপদেষ্টা সম্পা: শামসুজ্জামান খান (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৬), পৃ. ১৭৪।

[১৩] সুবোধ সেন, *উত্তরবঙ্গের লোকনাটক ও লোকজীবন*, (কলকাতা : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র ২০০২), পৃ. ১৩২।

[১৪] ডক্টর গৌরশংকর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা* (কলকাতা : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০৭), পৃ: ৫৫৬।

[১৫] বেলাল হোসেন, *উত্তরবঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতিতে মাদার পিরের প্রভাব*, "মাদার পিরের গান", উপদেষ্টা সম্পা: শামসুজ্জামান খান, প্রাগুপ্ত পৃ: ৪৫।

[১৬] সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ*, (ঢাকা: শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, গণ সাহায্য সংস্থা ১৯৯৮) পৃ. ৩৩।

[১৭] মো: সাইদুর রহমান লিপন, *বাংলাদেশের লোকনাট্যে অভিনয় পদ্ধতি*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১০) পৃ. ৬৭।

[১৮] ইউসুফ হাসান অর্ক, *বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য পালাগান*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৮) পৃ. ১৫৩।

[১৯] সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২২৯।

[২০] মোসতফা সরকার, গবেষণা অন্তর্ভুক্ত পালার মূল গায়েন, প্রাগুপ্ত।

[২১] ইউসুফ হাসান, *বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য পালাগান*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৫৩।

[২২] তদেব, পৃ. ১৪১।

[২৩] সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য*, প্রাগুপ্ত , পৃ. ৩৮৭।

[২৪] মোসতফা সরকার, গবেষণা অন্তর্ভুক্ত পালার মূল গায়েন, প্রাগুপ্ত।

[২৫] সাইদুর রহমান লিপন, *বাংলাদেশের লোকনাট্যে অভিনয় পদ্ধতি*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৬৫

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

শেখ সাদির কাব্যের মৌলিক আদর্শ
(The Basic Ideal of Sheikh Sadi's Poetry)

মো. আল আমিন মোল্লা*

Abstract: Sheikh Sadi is a renowned figure in Persian literature. He was born in Shiraz but his literary work was universal. *Gulistan* (1258) and *Bustan* (1257) are among his literary works which have immortalized him. His works both in prose and verse particularly the *Gulistan* and *Bustan* have been acknowledged as masterpieces and even acclaimed as epoch-making in the evolution of Persian literature. Sadi's style of writting is impressive and charming. Each of his essays contains a combination of fluency of expression and realistic moral teachings. His poetry plays a very important role in the formation of a developed society. In his poems, he has laid out his basic ideals in various aspects of personal life, family life, social life and state life. Praise be to Allah, praise of the Prophet, Justice, righteousness, contentment, modesty and humility, truthfulness, love of Allah, patience and long-suffering, silence, love of creation, gratitude for the blessings, pray to Allah for forgiveness etc are the basic ideals of Sheikh Sadi's poetry. So in this article I will try to discuss sadi's short biography, literary work and the basic ideals of sadi's poetry.

ভূমিকা

শেখ সাদি ছিলেন ফারসি সাহিত্যের একজন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ কবি। তিনি গদ্য ও পদ্য উভয় ধারায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর কাব্য প্রতিভা বিশ্বের কোনো আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং তা ছিলো বিশ্বজনীন, সর্বব্যপ্ত। তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব, যাঁর কবিতা দেশ, জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তথা সর্বস্তরের মানুষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এবং পঠিত হয়ে আসছে। ফারসি সাহিত্যে তাঁর অমূল্য অবদান *গুলিস্তান* ও *বুস্তান* গ্রন্থদ্বয় যা তাঁকে অমর করে রেখেছে। লোকচরিত্রের অসাধারণ অভিজ্ঞতা, মানুষের আচার-ব্যবহার ও সমাজ-নীতির উপর অদ্ভুত তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁর স্বীয় রচনায় পরিলক্ষিত হয়। বিশাল সমাজের সর্বত্র যে সকল অনাচার-কদাচার ও পাপানুষ্ঠান প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত হয়, যা সহজে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, সূক্ষ্মদর্শী কবি শেখ সাদির নিপুণ তুলিতে সে বিষয়গুলো সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর কাব্যে এসব বিষয়ে কিছু মৌলিক আদর্শ খুব সহজ-সরল ভাষায় উপমা ও উৎপেক্ষার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। শেখ সাদির কাব্যের মৌলিক আদর্শসমূহ আলোচনা আলোচ্য প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

সাদি পরিচিতি

অমর কবি শেখ সাদির নাম নিয়ে জীবনীকারদের মধ্যে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। খাজা আলতাফ হুসাইন হালি বলেন-তাঁর আসল নাম 'শরফুদ্দিন' উপাধি 'মুসলেহ' এবং কাব্য নাম সাদি।[১] ড. যাবীহ্ উল্লাহ্ সাফা সাদির নাম 'আবু মুহাম্মদ মুশাররফ উদ্দিন (শরফুদ্দিন) মুসলেহ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুশাররফ আস সাদি আস শিরাজি' বলে উল্লেখ করেছেন।[২] মুহাম্মদ জাফর ইয়াহাকির মতে- সাদির মূল নাম 'মুসলেহ' উপাধি 'মুশাররফ উদ্দিন' এবং কাব্যনাম সাদি।[৩] তবে বিশুদ্ধ অভিমত হলো কবির নাম মুশাররফ উদ্দিন বিন মুসলেহ উদ্দিন আব্দুল্লাহ।[৪] সাদি তাঁর উপনাম। সাদির পিতার নাম আব্দুল্লাহ শিরাজি। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম এবং ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন।[৫] সাদির পিতা শিরাজের বাদশাহ আতাবেক সা'দ বিন জঙ্গীর সেক্রেটারী ছিলেন। শেখ সাদির নামের ন্যায় জন্ম তারিখ নিয়েও জীবনীকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। খাজা

* এম ফিল. গবেষক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আলতাফ হুসাইন হালির মতে- শেখ সাদি মোজাফফর উদ্দিন আতাবেক বিন জঙ্গীর শাসনামলে ৫৮৯ হিজরি মোতাবেক ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[৬] আবদুল মওদুদের মতে- মুসলেহ উদ্দিন শেখ সাদি ৫৭১ হিজরি মোতাবেক ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইরানের তৎকালীন রাজধানী শিরাজে জন্মগ্রহণ করেন।[৭] প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ই. জি. ব্রাউন এর মতে, শেখ সাদি ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১১৮৫, ১১৯১, ১১৯৩ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন।[৮] এ. জে. আরবেরীও সাদির জন্ম সাল ১১৮৪ বলে উল্লেখ করেছেন।[৯] শেখ সাদি তাঁর বাল্যকাল শিরাজ নগরেই অতিবাহিত করেন।[১০]

পিতার তত্ত্বাবধানে থেকেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।[১১] শৈশবে পিতাকে হারানোর ফলে কবি শেখ সাদি শোকের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। কিন্তু সাদির মাতা তাঁর মধ্য বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর নিকট হতেও তিনি জীবনোপযোগী পাথেয় গ্রহণ করেছিলেন যা তিনি স্বীয় *গুলিস্তান* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১২] প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর কবি শেখ সাদি উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বাগদাদ (বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রে) গমন করেন এবং নিযামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। এ সময় তিনি আব্দুর রহমান ইবনে জাওযীর নিকট (মৃত্যু ৬৫৬ হি./১২৫৮খ্রি.) দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।[১৩] এছাড়াও তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস, হাদিস, ফিকহ্ প্রভৃতি ইসলামি ধর্মতত্ত্বে তাঁর আশ্চর্য ব্যুৎপত্তি ছিল এবং একজন পাক্কা শরীয়তপন্থী হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল।

সাদি অবসর সময়ে সিদ্ধপুরুষদের আশ্রমে গিয়ে অতীন্দ্রিয় জগতের তথ্য সংগ্রহ করতেন। পরিশেষে তিনি মহর্ষি শেখ শিহাবুদ্দীন ওমর সোহরাওয়ার্দীর (মৃত্যু ৬৩২হি./১২৩৪খ্রি.) মুরিদ হন এবং সুফি সাধনায় দীক্ষা গ্রহণ করেন।[১৪] সাদি তাঁর কাছেই সুফিতত্ত্বের পরম জ্ঞান লাভ করেন। শেখ সাদি বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। কবি শেখ সাদি অসংখ্যবার সাগর ভ্রমণে বেরিয়েছেন। অধিকাংশ জীবনীকারের বর্ণনা অনুসারে পায়ে হেঁটে কবি শেখ সাদি ১৪ বার হজ্বব্রত পালন করেন।[১৫] দীর্ঘকাল ভ্রমণের পর সাদি ৬৫৫ হিজরি মোতাবেক ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মভূমি শিরাজ নগরীতে ফিরে আসেন।[১৬] জীবনের শেষ পর্যায়ে শেখ সাদি মাতৃভূমি শিরাজ নগরীর এক নির্জন খানকায় জীবন যাপন করতেন। এ স্থানেই তিনি অধিকাংশ সময় গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। উক্ত খানকায় সাদি ৬৯১ হিজরি মোতবেক ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১৭] শিরাজ নগরীর পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের পাদদেশে 'দিলকুশা' নামক স্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। তাঁর মাজার 'সাদিয়া' নামে খ্যাত এবং সকলের জিয়ারতের স্থানে পরিণত হয়েছে।[১৮]

সাদির রচনাবলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সাদির জীবনের দীর্ঘসময় সফরে অতিবাহিত হলেও তিনি ফারসি সাহিত্যে অসাধারণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। শেখ সাদির সাহিত্যকর্মের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলন হল তাঁর *সাদি নামেহ* যা পরবর্তীকালে *বুস্তান* নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[১৯] সাদি নানা দেশ ভ্রমণ থেকে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং যে সব ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন, সে সব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি ৬৫৫ হিজরি মোতাবেক ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দে *বুস্তান* কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। সাদির *বুস্তান* কাব্যে আনুমানিক চার হাজার শ্লোক রয়েছে এবং এ কাব্যগ্রন্থটি আলাদাভাবে ও *কুল্লিয়াতে সাদিতে* অন্তর্ভুক্ত করে বহুবার প্রকাশিত হয়েছে।[২০] সাদির *বুস্তান* কাব্যগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ওপর দশটি অধ্যায় রয়েছে।

শেখ সাদির চিরঞ্জীব সাহিত্যকর্মের মধ্যে *গুলিস্তান* গদ্য গ্রন্থটি অন্যতম। *বুস্তান* কাব্যগ্রন্থ রচনার এক বছর পর সাদি ফারসি সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও বিখ্যাত গদ্যগ্রন্থ *গুলিস্তান* ৬৫৬ হিজরি মোতাবেক ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন।[২১] তিনি তৎকালীন শাসনকর্তা আতাবেক মুজাফফর উদ্দিন সা'দ বিন আবু বকর বিন সা'দ জঙ্গীর নামে গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। কবি শেখ সাদির *গুলিস্তান* গ্রন্থটিও তাঁর *বুস্তান* গ্রন্থের ন্যায় নৈতিক শিক্ষায় ভরপুর।[২২] আটটি অধ্যায়ের সমন্বয়ে এই *গুলিস্তান* গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। সাদিকে গযলের ক্ষেত্রে একজন নৈতিক ও দার্শনিক প্রচারক বলে মনে হয়।[২৩] ফারসি সাহিত্যে গযলের পূর্ণাঙ্গ রূপায়নকারী হলেন কবি শেখ সাদি। কোনো কোনো কবি সাহিত্যিক সাদির গযলের প্রতি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁকে

গযলের ক্ষেত্রে পয়গাম্বর আখ্যায় ভূষিত করেছেন।[২৪] তাঁর গযলের একটি বড় মূলনীতি হচ্ছে সহজবোধ্যতা। উচ্চ ভাবধারা ও সংবেদনশীল সূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে তিনি সহজ-সরল অথচ শক্তিশালী উপমা-উৎপেক্ষার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর গযলে সব সময় একটি সুনির্দিষ্ট ও পরিষ্কার বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছেন।

ফারসি সাহিত্যে সাদির অন্যান্য অবদান হলো কাসায়েদ (প্রশংসামূলক কবিতা), দিওয়ানে গাযালিয়াত (গীতিকবিতা), মার্সিয়া (শোকগাঁথা), সাহেবিয়া,[২৫] খাবিছাত (বিদ্রুপাত্মক কবিতা) রুবা'ঈ (চতুস্পদী কবিতা), মাসনাভি (দ্বি-পদী কবিতা), কেতয়াত (খণ্ড কবিতা) ও মুফরাদাত (একক পংক্তি) ইত্যাদি।[২৬]

সাদির কাব্যের মৌলিক আদর্শ

শেখ সাদির রচনাশৈলী চিত্তাকর্ষক ও মনোহরী। তাঁর উপমা ও অলংকার হৃদয়গ্রাহী এবং বর্ণনা ও প্রকাশভঙ্গি অনবদ্য। তিনি রাজা বাদশাহ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলের জন্য কবিতা রচনা করেছেন। উন্নত সমাজ গঠনে তাঁর কবিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি তাঁর কবিতায় ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মৌলিক চেতনা বা আদর্শ তুলে ধরেছেন। শেখ সাদি তাঁর সমস্ত রচনায় মানবতা ও নৈতিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন সর্বাগ্রে। তাঁর রচনা বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, সাদি তাঁর মৌলিক চেতনা বা আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই *বুস্তান* ও *গুলিস্তান* গ্রন্থের অধ্যায় বিন্যাস করেছেন। নিম্নে শেখ সাদির কাব্যের মৌলিক আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

আল্লাহর প্রশংসা

মহান আল্লাহ তায়ালা হলেন অনাদি, অনন্ত, সম্মানিত ও পবিত্র। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহ তায়ালা একক ও অদ্বিতীয় সত্তা যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সমস্ত সৃষ্টিকূল তার মুখাপেক্ষী। সমস্ত সৃষ্টির মহান স্রষ্টা একমাত্র তিনিই। সমস্ত প্রশংসাও কেবল মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য। শেখ সাদি তাঁর *বুস্তান* ও *গুলিস্তান* গ্রন্থের শুরুতে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও একত্ববাদের স্বরূপ বর্ণনার প্রয়াস পেয়েছেন। কবির ভাষায়-

به نام خداوند جان آفرین   حکیم سخن در زبان آفرین
خداوند بخشنده ی دستگیر   کریم خطا بخش پوزش پذیر[২৭]

আমি মহান আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যিনি প্রাণ সৃষ্টি করেছেন;
তিনি মহাজ্ঞানী, যিনি কথা বলার শক্তি দান করেছেন।
ক্ষমাশীল ও সাহায্যকারী আল্লাহ তায়ালা
দয়ালু এবং গুনাহ মার্জনাকারী।

রাসুলের প্রশংসা

সাদির মৌলিক আদর্শের মধ্যে অন্যতম একটি আদর্শ হলো রাসুলের প্রশংসা। শেখ সাদি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম ও গুণের প্রশংসা করেই বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর রচিত সেই প্রশংসাগীতি (দরুদ) সমগ্র দুনিয়ার নবীপ্রেমিক ও আশেকদের আত্মার প্রশান্তি লাভের মহৌষধ হিসেবে সমাদৃত।[২৮] সাদি রাসুল (সা.)-এর প্রশংসায় বলেন-

بلغ العلىٰ بكماله   كشف الدّجىٰ بجماله
حسنت جميع خصاله   صلوا عليه و آله[২৯]

চারিত্রিক মাধুর্যে সম্মানের উঁচু আসনে আসীন তিনি
স্বভাব ও সৌন্দর্যের আলোতে দূর হয় সব অন্ধকার।
তাঁর উন্নত গুণাবলি শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ শিখরে
সকলে তাঁর ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর দরুদ পাঠ কর।

ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে একে অন্যের সঙ্গে চলতে হলে ন্যায়নীতি রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার ছাড়া মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কোনো ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা আসতে পারে না। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন- "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায় সাক্ষ্যদানে দৃঢ় থাক। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন কখনো ন্যায় বিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করো। এটাই তাকওয়ার নিকটতর। আর আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করছ নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অধিক অবগত।"[৩০] নৈতিক কবি শেখ সাদি সমাজ সংশোধনের ক্ষমতা যাদের হাতে রয়েছে সেই শাসকশ্রেণিকে ন্যায়পরায়ণ হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তারা যেন মানুষের কল্যাণে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন এবং সকল অন্যায়কে প্রতিরোধ করেন। কেননা, ন্যায়পরায়ণ ও সৎ শাসক পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে সকলেই তাঁর জন্য দোআ করতে থাকেন। অপরপক্ষে অত্যাচারী শাসক পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে কেউ তাকে স্মরণ করেন না, বরং সকলেই তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। ন্যায় বিচার থেকে বিচ্যুতি একটি জাতিকে ধ্বংস করে দেয়। ন্যায় বিচার ছাড়া কখনো সভ্য সমাজ ও উন্নত রাষ্ট্র গড়ার কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও পরহেজগার লোককে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব দেওয়া উচিৎ। কবি সাদির ভাষায়-

اگر جاده یی بایدت مستقیم ره پارسایان، امید است و بیم
طبیعت شود مرد را، بخردی به امید نیکی و بیم بدی
گر این هر دو در پادشاه یافتی در اقلیم و ملکش پنه یافتی[৩১]

যদি সরল সঠিক পথ নিশ্চিত করতে চাও
পরহেজগারগণের পথেই রয়েছে প্রত্যাশা ও ভয়।
জ্ঞানীদের জন্য এটাই স্বাভাবিক
কল্যাণের প্রত্যাশা ও মন্দের ভয়।
এ দুটি মহৎ গুণ বাদশাহদের মধ্যে প্রত্যক্ষ হলে
দেশে-মহাদেশে কল্যাণের সন্ধান পাবে।

চরিত্র সংশোধন

মানুষের সামাজিক পরিচয় গড়ে ওঠে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে। শেখ সাদি মানবিক স্বভাব-চরিত্রকে পরিমার্জিত করে উন্নত ও উত্তম চরিত্রে বলীয়ান হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। কবি সাদির ভাষায়-

عنان باز پیچان نفس از حرام بمردی ز رستم گذشتند و سام[৩২]

আত্মার কু-প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখা
রুস্তম ও সামের বীরত্ব হতেও শ্রেষ্ঠ।

ধৈর্য ও সহনশীলতা

মানব জাতির একটি মহৎ গুণ হলো ধৈর্য ও সহনশীলতা। ইহজগতে এমন কোনো কাজ নেই যা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ছাড়া সমাধান করা যেতে পারে। পৃথিবীতে যারা সুন্দর জীবন গড়তে সক্ষম হয়েছে, তারা ধৈর্যের মাধ্যমেই তা করতে পেরেছে। তাই মানবজীবনে ধৈর্যের গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমের সুরা লুকমানের ১৭ নম্বর আয়াতে বলেন-"হে বৎস! নামায কায়েম রাখবে, সৎকাজের নির্দেশ দেবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং যে কোন বিপদে ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয় এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"[৩৩] ধৈর্য ও সহনশীলতা খোদাভীরু লোকদের অন্যতম গুণ। সত্যিকার খোদা প্রেমিকদের পার্থিব দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা, গ্লানি কখনো বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনা। শেখ সাদির মৌলিক আদর্শের মধ্যে একটি অন্যতম আদর্শ হলো ধৈর্য ও সহনশীলতা। শেখ সাদি মানবজীবনে ধৈর্যের সুমহান গুরুত্বকে সর্বাধিক

মূল্যায়ন করেছেন। কেননা, ধৈর্য এমন একটি ঢাল, যা মানুষকে অনেক বিপদ ও বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা করে। আবার কখনো জীবনে সফলতা বয়ে আনতে সাহায্য করে।[৩৪] সাদির ভাষায়-

مطلب گر توانگری خواهی   جز قناعت که دولتیست هنی
گر غنی زر بدامن افشاند   تا نظر در ثواب او نکنی
کز بزرگان شنیده ام بسیار   صبر درویش به که بذل غنی[৩৫]

তুমি যদি ধনী হতে চাও তবে অল্পে পরিতৃপ্ত হও।
দান খয়রাতে যখন থাকে ধনীরা রত,
সেই দানেরই সওয়াবের চেয়ো না তো ভাগ।
মনীষীদের অনেক উপদেশ শুনেছি,
দরবেশের ধৈর্য ধনী লোকের দানের চেয়ে দামি।

অল্পে তুষ্ট ও লোভ থেকে বিরত থাকা

অল্পতেই পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হওয়া মানুষের একটি মহৎ গুণ। অনন্য এ গুণটি যে অর্জন করতে সক্ষম হয়, জীবনের শত দুঃখ-কষ্ট ও অপূর্ণতায় তার কোনো আক্ষেপ থাকে না। আর অধিক চাহিদা, না পাওয়ার হাহাকার এবং অন্যের সম্পদের ওপর অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা একজন মুমিনের জন্য কল্যাণকরও নয়। লোভ মানুষকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করে। লোভ সকল পাপের মূল। সাদি বলেন, ধর্মের বিনিময়ে কখনো দুনিয়া খরিদ করো না। বোধ হয়, তোমার জানা নেই যে, পশুপাখি লোভের তাড়নায় পড়ে শিকারির জালে আটকে যায়। চিতাবাঘ হিংস্র জন্তুদের মধ্যে প্রধান। সেও খাবারের লোভে শিকারির জালে আটকে পড়ে। তুমি যার রুটি এবং পানি খাচ্ছ, ইঁদুরের ন্যায় তার জালে আবদ্ধ হবে।[৩৬] অল্পে তুষ্ট থাকা এবং লোভ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে কবি শেখ সাদি তাঁর কবিতায় উপদেশ দিয়েছেন । কবির ভাষায়-

خدا را ندانست و طاعت نکرد   که بربخت و روزی قناعت نکرد
قناعت توانگر کند مرد را   خبر کن حریص جهانگرد را[৩৭]

সে আল্লাহকে চিনল না এবং আনুগত্যও করল না
খোদার দেওয়া রিজিকে যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করল না।
অল্পতে তুষ্টি মানুষকে সমৃদ্ধ করে
লোভের বশে জগৎ ঘুরলেও শান্তি পাওয়া যায় না।

বিনয় ও নম্রতা

ব্যক্তিজীবনে যে যত বেশি বিনয়ী ও নম্র, সে তত বেশি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। বিনয়গুণ দিয়ে অন্যের চোখে বপন করা যায় ভালবাসার বীজ। সাদি বিনয় ও নম্রতাকে মানুষের সম্মান ও মর্যাদার চাবিকাঠি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীতে সম্মানিত হতে চাইলে অহংকারকে বর্জন করতে হবে।[৩৮] অধিক সম্মান ওই ব্যক্তি লাভ করতে পেরেছে, যে প্রথমে নিজেকে ছোট করে দেখেছে। কবির ভাষায়-

بلندیت باید، تواضع گزین   که آن بام را نیست سلّم جز این[৩৯]

যত বেশি পেতে চাও মান এবং সম্মান, তত বেশি বিনম্র হও
কেননা, বিনম্র হওয়া ছাড়া পাবেনা সে সোপান।

অধিক সম্মান পেতে হলে, নম্র হতে হবে। বিনয় ও নম্র ব্যবহার দ্বারা পৃথিবীতে অনেক অসাধ্যকেও সাধ্যে পরিণত করা যায়। কেননা, নম্র হওয়া ছাড়া বড় হওয়ার আর কোনো পথ নেই। নম্রতাই বড় হওয়ার চাবি।[৪০]

সদা সত্য কথা বলা

সত্যবাদিতা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকট একটি প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত গুণ। পক্ষান্তরে অসত্য ও মিথ্যাবাদী সকলের কাছে ঘৃণিত। সত্য-মিথ্যা প্রিয়-অপ্রিয় হওয়ার ব্যাপারে সকল জাতিই একমত। পবিত্র কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও"।[৪১] প্রশংসা পাওয়ার জন্য সত্যকে অতিক্রম করে অতিরঞ্জিত করা বা মিথ্যা বলা কারো কাম্য নয়। সত্য কথা বললে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। সরল ও সত্য পথে থেকে কেউ ধ্বংস হয় না। আরবিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে, সত্য মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধ্বংস করে। কবি সাদির ভাষায়-

راستی موجب رضای خداست   کس ندیدم که گم شد از ره راست[৪২]

সত্যবাদীর ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হন
কখনো দেখিনি সত্যবাদীর পরাজয় (ধ্বংস) হয়।

সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া বা ভালোবাসা

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি সৃষ্টির প্রতি দয়া করে না, স্রষ্টার পক্ষ থেকে তার প্রতি দয়া করা হবে না।[৪৩] পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সব কিছুই মহান আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে হলে তার সৃষ্টি জগতের সকল সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে হবে। শেখ সাদি মানব সেবার পাশাপাশি সকল জীবের প্রতি দয়া বা ভালোবাসা প্রদর্শনের কথা ব্যক্ত করেছেন। কবির দৃষ্টিতে আল্লাহকে পেতে হলে চাই তাঁর সৃষ্টি লোকের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ। সৃষ্টিকে উপেক্ষা করে স্রষ্টার সন্ধান করা ভণ্ডামি মাত্র।[৪৪] সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টা বিরাজমান, তাই তাদের সেবা করলে আল্লাহকে পাওয়া সম্ভব। কবির ভাষায়-

تو با خلق نیکی کن، ای نیکبخت   که فردا نگیرد خدا با تو سخت[৪৫]

তুমি সৃষ্টিজীবের প্রতি দয়া কর ইহজগতে,
আল্লাহ তায়ালা দয়া করবেন তোমায় পরজগতে।

সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব

মানবতার মূল মন্ত্র হলো সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। জন্মগতভাবে বিশ্বের সকল মানুষ গভীর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। সমাজে মানুষে মানুষে যে সংঘাত-সহিংসতা, কলহ-বিগ্রহ, হানাহানি, খুনাখুনি, লুটতারাজ, হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা চলছে, এসব অনাচার থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সবাইকে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। ফারসি সাহিত্যের কিংবদন্তি পুরুষ শেখ সাদি তাঁর সাহিত্যকর্মের সর্বত্র মানবতার জয়গান গেয়েছেন। পৃথিবীর সকল মানুষকে একই বন্ধনে বেঁধে কবি শেখ সাদি সাম্য, শান্তি ও সুখের পৃথিবী গড়ার আহবান জানিয়েছেন। মানবতার প্রতি সাদির একাত্মবোধ ছিলো সুগভীর ও উচ্চমানের। সাদির ভাষায়-

بنی آدم اعضای یکدیگرند   که در آفرینش ز یک جوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار   دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی   نشاید که نامت نهند آدمی[৪৬]

এই পৃথিবীতে আদম সন্তান এক দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায়
একই উৎস থেকে সবাইকে সৃষ্টি করা হয়েছে।
এক অঙ্গে ব্যাথা পেলে অন্য অঙ্গ স্থির থাকে না
অন্যের কষ্টে যদি তুমি হও নির্বিকার
তবে তোমার নাম মানুষ রাখা উচিৎ নয়।

খোদাপ্রেম

অমর কবি শেখ সাদি দুনিয়ার প্রেমের উদাহরণ দিয়ে খোদা প্রেমের সুন্দর বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। পার্থিব জগতে প্রেমিকের জন্য পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলেও কষ্টকর মনে হয় না, প্রেমিকের আশায় ধৈর্যধারণ করা অসহনীয় নয়। প্রেমিকের তিক্ত ব্যবহারও মিষ্টি মনে হয়। তাই বন্ধুর যে কোনো ব্যবহারে প্রেমিকরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। এই পার্থিব জগতে মানুষ যেমন তাঁর প্রেমিকের জন্য সবকিছু বিলেয়ে দেয়, তেমনিভাবে আল্লাহ প্রেমে মত্ত হয়ে খোদা প্রেমিকরা পার্থিব জগতের সুখ-শান্তি ভুলে যায়। কবির ভাষায়-

می صرف وحدت کسی نوش کرد　　که دنیا و عقبی، فراموش کرد[৪৭]

যে কেবল একত্ববাদের সুরা পান করেছে,
সে দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-শান্তি ভুলে গেছে।

আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। বান্দা আল্লাহর কাছে কোনো প্রকার আবেদন ছাড়াই মহামূল্যবান জীবন, প্রখর মেধা ও তীক্ষ্ণ জ্ঞান-বুদ্ধিসহ অসংখ্য নেয়ামত লাভ করেছে। এছাড়াও পৃথিবীতে বসবাসের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, আলো, বাতাস, পানিসহ আরো অসংখ্য নেয়ামত লাভ করেছে। আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে আল্লাহ তায়ালা তাতে সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হন। মহাপবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-"যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেবো এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয় আমার শাস্তি হবে কঠোর।"[৪৮]শেখ সাদি সেই অপরিসীম নেয়ামতের কথা মানুষকে স্মরণ করে দেওয়ার পাশাপাশি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার জন্য উপদেশ দান করেছেন। কবি সাদির ভাষায়-

اگر شکر کردی که با دیده یی　　و گر نه تو هم چشم پوشیده یی[৪৯]

যদি তুমি শুকরিয়া আদায় করো তবে তোমার চোখ আছে
আর যদি শুকরিয়া আদায় না করো তবে তুমি অন্ধ।

সময় ও যৌবনকালের সঠিক মূল্যায়ন

সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়। নয়তো এ সময়ের জন্য আফসোস করতে হয়। কাজেই জীবনের এক একটা মুহূর্ত মুক্তার চেয়েও দামি। যৌবনকাল হলো জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। যদি কেউ জীবনের সমৃদ্ধি এবং সুখের ফল ভোগ করতে চায় তবে তাকে পরিশ্রম, সততা এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে যৌবনকালেই তা অর্জন করতে হবে। কেননা, বার্ধক্যে এসে তা অর্জন করা মোটেও সম্ভব নয়। এদিকে ইঙ্গিত করে কবি শেখ সাদি বলেছেন-

جوانا ره طاعت امروز گیر　　که فردا جوانی نیاید ز پیر
فراغ دلت هست و نیروی تن　　چو میدان فراخ است، گویی بزن[৫০]

হে যুবক সৎকর্মের পথ আজই ধরো
কেননা, বৃদ্ধকালে যৌবনটা ফিরে পাবে না।
চিন্তামুক্ত মন এবং শক্তিশালী দেহে
মাঠটা খালি, বলটা মেরে গোল করো অর্জন।

নিজ কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

প্রত্যেক প্রাণ'ই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। যখন প্রাণপাখি পিঞ্জর ছেড়ে চলে যাবে তখন শতচেষ্টা করেও তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। কবি সে দিন (মৃত্যু) আসার পূর্বেই নিজ কৃতকর্মের জন্য মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য বলেছেন। কবিতার ভাষায়-

بیا تا برآریم دستی ز دل　　　که نتوان بر آورد فردا ز گل[৫১]

এসো খাঁটি দিলে খোদার কাছে তোলো তোমার হাত

কেননা, আগামীকাল কবর থেকে তোমার হাত উঠাতে পারবে না।

তাই ইহকালীন এবং পরকালীন শান্তি নিশ্চিত করতে হলে মৃত্যুর পূর্বেই আমাদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে।

উপসংহার

মানব সমাজকে পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ ও শান্তিময় করার আদর্শ ও শিক্ষা শেখ সাদি তাঁর *গুলিস্তান* ও *বুস্তান* অমর গ্রন্থ দুটির মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যে উপস্থাপন করেছেন। যেহেতু তিনি তাঁর দীর্ঘ শিক্ষাজীবন ও ভ্রমণ জীবন শেষে *গুলিস্তান* ও *বুস্তান* গ্রন্থ দু'টি রচনা করেন, সেহেতু তাঁর স্বীয় রচনায় ন্যায়-নীতি, খোদাভীতি, ধৈর্য ও সহনশীলতা, মানবতা, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, মৈত্রী, পরোপকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে বাস্তবমুখি আদর্শ ও চেতনা বিপুলভাবে পরিদৃষ্ট হয়। শেখ সাদির মৌলিক চেতনা, আদর্শ বা চিন্তাধারা একজন মানুষকে সত্যিকারের আদর্শ মানব হিসেবে গড়ে তুলতে অসামান্য অবদান রাখতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তথ্যনির্দেশ

১ খাজা আলতাফ হুসাইন হালি, *হায়াতে সাদি* (নয়াদিল্লী: কাওমি কাউন্সিল বারায়ে ফুরুগে উর্দু যাবান, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১২।

২ ড. যাবীহ উল্লাহ সাফা, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, তৃতীয় খণ্ডের ১ম খণ্ড (তেহরান: এনতেশারাতে ফেরদৌস, ৭ম সংস্করণ, ১৩৬৯ হি.), পৃ. ৫৮৪-৫৮৫।

৩ ড. মুহাম্মাদ জাফর ইয়াহাকি, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* (ইয়েক ও দো) (তেহরান: চাপখানায়ে শেরকাত, ১৯৯৯), পৃ. ১৭০।

৪ E.G. Browne, *A Literary History of Persia*, Vol-2 (Cambridge: At the University Press, 1969), P. ৫২৬; মির্জা মকবুল বেগ বাদাখশানি, *আদব নামায়ে ইরান* (লাহোর: নেগারেশাত, তা.বি), পৃ. ৪৩৭।

৫ *হায়াতে সাদি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩।

৬ তদেব, পৃ. ১২।

৭ আবদুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৪), পৃ. ১৮৪।

৮ *A Literary History of Persia*, Vol-2, op.cit, P. 526.

৯ A.J. Arberry, *Classical Persian Literature* (London: George Allen and Unwin LTD), P. 186.

১০ মোঃ নাজিম উদ্দিন ভূঁইয়া, *হযরত শেখ সাদী (রহঃ)* (ঢাকা: মীরসন্স পাবলিকেশন্স, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৫), পৃ. ১৪।

১১ J.A. Boyle, *The Cambridge History of Iran*, Vol-5 (Cambridge: At the University Press, 1968), P. 595.

১২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ইরানের কবি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৮),পৃ. ১৩০।

১৩ *মুসলিম মনীষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

১৪ মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, পারস্য প্রতিভা (ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ২০০৩), পৃ. ১৫৯।

১৫ *মুসলিম মনীষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

১৬ *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৭। ।

১৭ *আদব নামায়ে ইরান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪১।

১৮ তদেব, পৃ. ৪৪১; মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (সম্পা.), *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৯), পৃ. ১৪৭।

১৯ *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৫।

[২০] তদেব, পৃ. ৬০৬।.

[২১] Tanwir Ahmad, *A Short History of Persian Literature* (Calcutta: Naz Publishung Centre, 2nd edition 1991), P. 184.

[২২] *The Cambridge History of Iran*, Vol-5, op.cit, P. 598..

[২৩] *A Short History of Persian Literature*, op.cit, P. 182.

[২৪] *হায়াতে সাদি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

[২৫] শেখ সাদির বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ফারসি ও আরবি কেতআ, রুবাঈ, মাসনাভিসহ অন্যান্য কবিতার সমষ্টি এই সাহেবিয়া। যা তিনি শাসসুদ্দীন সাহেব দেওয়ান জুয়াইনীকে উদ্দেশ্য করে রচনা করেন। যেহেতু খাজা শাসসুদ্দীন জুয়াইনীর সাথে কবি শেখ সাদির গভীর সম্পর্ক ছিল, তাই এ সকল কবিতাকে সাহেবিয়া নামে নামকরণ করা হয়েছে। [দ্র. *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, ৩য় খণ্ডের ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ, ৬০৭; *হায়াতে সাদি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।]

[২৬] আল্লামা শিবলী নোমানী, *শেরুল আজম*, ২য় খণ্ড (লাহোরঃ ইশরাত পাবলিশিং হাউস, তা.বি.), পৃ. ৪৪-৪৫।

[২৭] মনসুর মেহেরাঙ্গ, *বুস্তানে সাদি* (তেহরানঃ চাপখানায়ে নীল, এনতেশারাতে দাস্তান, ২য় সংস্করণ ১৩৮৬ হি.), পৃ. ১১।

[২৮] মোস্তাক আহ্মাদ, *আল্লামা শেখ সাদীর আত্মদর্শন* (ঢাকাঃ রোদেলা প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ১৮। ।

[২৯] মির্জা আব্দুল আজিম খান গুরগানি (সম্পা.) *গুলিস্তানে সাদি* (তেহরানঃ এনতেশারাতে ইরান, মেহর, ১৩৮০ হি. শা.), পৃ. ৯৮।

[৩০] *আল-কুরআন*, সুরা আল-মায়িদাহ্, আয়াতঃ ৮।

[৩১] বুস্তানে সাদি, পৃ. ৪২।

[৩২] মোহাম্মদ আলী ফোরুগী, *কুল্লিয়াতে সাদি* (তেহরানঃ এনতেশারাতে আমির কাবির, ১৩তম সংস্করণ, ১৩৮৩ হি. শা.), পৃ. ৩৪২।

[৩৩] *আল-কুরআন*, সুরা লুকমান, আয়াতঃ ১৭।

[৩৪] মাহমুদুল হাসান নিজামী (অনূ.), *মহাকবি শেখ সাদী'র কালজয়ী গ্রন্থ গুলিস্তাঁ* (ঢাকাঃ রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৭), পৃ. ৮৬।

[৩৫] *কুল্লিয়াতে সাদি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

[৩৬] *বুস্তানে সাদি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭।

[৩৭] তদেব, পৃ. ২৭৫।

[৩৮] মাহমুদুল হাসান নিজামী (অনূ.), *মহাকবি শেখ সাদী'র কালজয়ী গ্রন্থ বোস্তাঁ* (ঢাকাঃ রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৭), পৃ. ১০৬।

[৩৯] *বুস্তানে সাদি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬।

[৪০] *মহাকবি শেখ সাদী'র কালজয়ী গ্রন্থ বোস্তাঁ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

[৪১] *আল-কুরআন*, সুরা আত-তাওবাহ্, আয়াতঃ ১১৯।

[৪২] *গুলিস্তানে সাদি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

[৪৩] *বুখারী শরীফ*, হাদিস নম্বর, ৬০১৩।

[৪৪] *মুসলিম মনীষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।

[৪৫] *বুস্তানে সাদি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

[৪৬] *গুলিস্তানে সাদি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

[৪৭] *বুস্তানে সাদি, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬।

[৪৮] *আল-কুরআন*, সুরা ইবরাহীম, আয়াতঃ ৭।

[৪৯] *বুস্তানে সাদি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫।

[৫০] তদেব, পৃ. ৩৪৯।

[৫১] তদেব, পৃ. ৩৭৩।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

হাফিজের কবিতায় মূল্যবোধ ও নান্দনিকতা
(Values and Aesthetics in Hafiz's Poetry)

ড. মো. কামাল উদ্দিন*

Abstract: Hafiz was arguably the greatest poet of the 14^{th} century of Persian literature. His odes, panegyrics, fragments, quatrains and so on rank high in Persian literature. The themes of his poetry include the beloved, the Lord and praised. His poems are mystical and devotional, and considered eulogistic in general. The hidden characteristic of his poetry is interrelation among his verses. He employs varying kinds of rhetorical techniques and his divan; is a dictionary of rhetorical techniques. He uses simile and amphibole impressively in his verses that provokes the reader's utter amazement and admiration. The great characteristic of the lyrics of Hafiz remains to be a harmonious balance between word and meanings. The vocabularies such as heart, Hafiz, head, soul and love, soil, Saki, jovial, eye, beloved, flower, sorrow, tresses, face, affair, goblet, friend and water are widely visible in his verses for aesthetic meanings. He illustrates the pleasures of youth, wine and wine house, the beauties of nature and creation. It may be considered that Hafiz ranks among the greatest poets of all time. The article attempts to narrate values and aesthetics in the poetry of Hafiz.

ফারসি সাহিত্য পৃথিবীর অপরাপর সাহিত্যের মতো সমৃদ্ধির মর্যাদায় আসীন। ইরানের কবি ফেরদৌসি, রুমি, হাফিজ, আত্তার, খৈয়াম ও শেখ সাদি বিশ্বসাহিত্যে সমাদৃত। মানুষের মনোলোকের বর্ণিল কল্পনানুভূতির ছন্দোবদ্ধ চিত্রায়ণে হাফিজের তুলনা বিরল। মানুষের জীবনের কথা, সমাজের কথা শব্দব্যঞ্জনায় ফোটে ওঠে তার কবিতায়। মানবাত্মার চিরন্তন মহাসমুদ্রে অবগাহনের রহস্যময় কাল্পনিক রূপায়ণ তার কাব্য। ঐশ্বরিক চেতনা, ইরানি ঐতিহ্য, ইসলামি ভাবধারা, মানবিক মূল্যমান-ইত্যাকার বিষয়ের সমাহারে কবিতা হয়ে ওঠে প্রাণময়, সর্বজনীন। দেশ, কাল, যুগ পেরিয়ে হৃদয়-মননকে উচ্ছসিত, উদ্ভাসিত করে তোলে তার কবিতা। হাফিজের কবিতা বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য রত্ন। ফারসি ভাষায় রচিত হলেও হৃদয়ানুভূতি পৃথিবীর সব মানুষের, সব ভাষার, সব যুগের। হাফিজের গজলে ঐশ্বরিক প্রেমের স্বরূপ ধরা পড়ে বৈষয়িক সৌন্দর্যের অবয়বে। প্রায় সাতশত বছর পেরিয়ে গেলেও এতোটুকু কমেনি এর কদর, ম্লান হয়নি এর অন্তলোর্কের বিভা। সৃষ্টিজগতের রহস্যময় বিচিত্র রূপ ধরা পড়ে তার কবিতায়। চিরন্তন প্রেমের নিবীড় আবেশে হৃদয়-মন আন্দোলিত হয়। সত্যের আলোয় ভরে ওঠে।

কবির মূলনাম মোহাম্মদ। পূর্ণনাম খাজা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ হাফিজ শিরাজি। সঠিক জন্মতারিখ জানা যায় না। অধিকাংশ গবেষকের মতে, ১৩২৭ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের শিরাজ নগরীতে তার জন্ম। পিতা বাহাউদ্দিন ছিলেন ইসফাহানের খ্যাতিমান ব্যবসায়ী। শৈশবেই পিতার স্নেহের পরশ থেকে বঞ্চিত হন এবং অর্থকষ্টে জর্জড়িত হয়ে পড়েন। মাকে নিয়ে জীবিকা নির্বাহে চাকরি নেন রুটিবিক্রেতার দোকানে। জ্ঞানান্বেষণের অদম্য স্পৃহা তাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। মাওলানা কাওয়াম উদ্দিন আব্দুল্লাহর কাছে প্রাথমিক শিক্ষাসহ পবিত্র কুরআন হেফজ করেন। শামসুদ্দিন আব্দুলাহ শিরাজি ও কাজি এজদুদ্দিন আব্দুর রহমান ইয়াহইয়ার কাছে দর্শন ও সুফিতত্ত্বসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ভূষিত হন খাজা হাফিজ উপাধিতে। দিওয়ানে হাফিজ পরমাত্মার প্রতি ভালোবাসার গভীরতার এক অপরূপ কাল্পনিক চিত্রায়ণ। আধ্যাত্মিক ভাবপুষ্ট এ দিওয়ানে রয়েছে ৫৭৩টি গজল, ৪২টি কেতআ, ৬৯টি রুবাই, ৬টি মাসনবি, ২টি কাসিদা এবং

* প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১টি মোখাম্মাস কবিতা। কবি হাফিজ *লেসানুল গায়েব* (অদৃশ্যের বাণী), *তরজমানুল আসরার* (রহস্যের মর্মোদ্ধারকারী) অভিধায় ভূষিত। আধ্যাত্মিক প্রেমের প্রকৃতি ও স্বরূপ এবং পথ পরিভ্রমণের নব দিগন্ত উন্মোচিত হয় তার কাব্যে। উপমা-উৎপ্রেক্ষা, রূপক ও চিত্রকল্পের সমাহারে সৃষ্টি হয় অভিনব রূপকল্প। ফারসি গজলকাব্যে এক বৈপ্লবিক রূপকার কবি হাফিজ। কবিতায় ছন্দের তালে তালে অধ্যাত্মপ্রেমের পরিচয় ফোটে ওঠে।

হাফিজের কবিতায় মূল্যবোধ

হাফিজের কবিতা নৈতিক মূল্যমানের চেতনায় আলোকিত। ঐশীপ্রেম, ইসলামি ঐতিহ্য, মানবিকতা, ধৈর্য, সহশীলতা ও পরকালীন অনন্ত জীবনের অবতারণায় কবিতা হয়ে ওঠে বাঙময়। হাফিজের কবিতায় আল-কোরআনের আলো দীপ্তিমান। কোরআনের প্রজ্ঞাময় ভাবধারায় রচিত কবিতা মানুষের জীবনকে আলোকিত করে। সত্যের দিশা দেয়। চিরন্তন সত্যের মহাসড়কে মানুষ ধাবিত হয়। হাফিজের কবিতা মানুষের কল্যাণের তরে নিবেদিত। বৈষয়িক চাওয়া-পাওয়া মুখ্য নয়; মহাজাগতিক ভাবনায় অন্তর ভরে ওঠে। আগামীর স্বপ্নে সত্যের আলোয় জীবন ভরে উঠে। কবির কণ্ঠে অনুরণিত হয়-

ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ   به قرآنی که اندر سینه داری[১]
زحافظان جهان کس چو بنده جمع نکر   لطایف حکمی با نکات قرآنی[২]
صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ   هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم[৩]

তোমার কবিতার চেয়ে উন্নত দেখিনি কিছু হে হাফিজ
কুরআনের নির্যাস যা তোমার হৃদয়ের গভীরে সুপ্ত।
পৃথিবীর কোনো হাফেজ আমার মতো গ্রথিত করেনি
আল-কুরআনের সূক্ষ্ম তত্ত্বের সাথে প্রজ্ঞাময় অভিধা।
প্রভাতে জেগে ওঠে কল্যাণ প্রত্যাশী হও হে হাফিজ
যা কিছু শিল্পীত রূপ সবই কুরআনেরই মর্মকথা।

হাফিজের কবিতায় অধ্যাত্মচেতনা খুবই প্রাণময় ও হৃদয়গ্রাহী। অধ্যাত্মপ্রেমের মূলে রয়েছে স্রষ্টার প্রতি নিবেদনের এক অনুপম অনভূতি। যা হৃদয়ের গভীরে অনাবিল প্রশান্তি ছড়িয়ে দেয়। ঐশীপ্রেমের বর্ণিল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে হাফিজের কবিতায়। কবির দৃষ্টিতে প্রেমের মাঝে ডুবে যাওয়া হৃদয়ের কোনো মৃত্যু নেই, তা চিরন্তন। প্রেমের বন্ধনেই সৃজিত এ সৃষ্টিজগত। প্রকৃত প্রেমের সাগরে ডুবে যাওয়াই যেন সফলতার মাপকাঠি, স্থায়িত্বের নিদর্শন। প্রেমের তাগিদে জাগরিত হৃদয়ের কোনো মৃত্যু নেই। হাফিজের কবিতায় ঝংকৃত হয়:

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق   ثبت است برجریدهء عالم دوام ما[৪]

হিয়াটী যার প্রেম-জীবিত মরণ নাইকো তাহার
ভবের খাতায় অমর কোঠায় দেখ লিখন মোদের।[৫]

অপর একটি পঙ্‌ক্তির প্রতি দৃষ্টির আলো দেয়া যাক-

شعر حافظ همه بیت الغزل معرفتست   آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش[৬]

হাফিজের কবিতার সব পঙ্‌ক্তিই এশকে এলাহির পরিচায়ক
হৃদয়গ্রাহী ও সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ এ- কবিতা।

হাফিজের কাব্যে প্রেমের বৈচিত্র্যময় অনুভবের সন্ধান মিলে। মিলনের আনন্দ আর বিরহের বেদনাও প্রেমেরই অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। প্রেমের পথ কণ্টকাকীর্ণ; পুস্প কানন নয়। প্রেমের পথ সুখময় ভাবলেও পদে পদে রয়েছে বিড়ম্বনা, প্রতিকূলতা। প্রেমের তরে জীবন বিলিয়ে দিতে পিছপা হয় না প্রেমিক হৃদয়। পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভের দুর্নিবার আকাঙ্খা মানুষকে শত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করতে উৎসাহী করে তোলে। পরমাত্মার আকর্ষণ এতটাই তীব্র ও প্রবল যে কোনো বাহ্যিক সংকটমুহূর্ত এ যাত্রাপথে বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতে পারে না। হাফিজের দিওয়ানের প্রথম গজলেই রয়েছে কাঁটাযুক্ত প্রেমময় অনুভূতির অবতারণা।

কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে শত বাধাবিপত্তি অতিক্রমের চিত্র কাব্যিক ব্যঞ্জনা ও রূপকের মাধ্যমে ফোটে ওঠে। কবির হাফিজের ভাষায়:

شبِ تاریک و بیمِ موج و گردابی چنین هایل　　کجا دانند حالِ ما سبکبارانِ ساحل‌ها
همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر　　نهان کِی مانَد آن رازی کزو سازند محفل‌ها
حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ　　مَتٰی ما تَلْقَ مَنْ تَهْویٰ دَعِ الدُّنْیا و اَهْمِلْها[7]

অন্ধকার রাত, ঊর্মি-সংঘাত, ঘূর্ণাবর্তও তুমুল গর্জে
বেলায় বাস্ যার বুঝ্‌বে ছাই তার পথের ক্লেশ মোর সমুন্দর যে।
তামাম মোর কাম্ শুধুই বদ্‌নাম, নিজের দোষ্ ভাই নিজের দোষ্ সে
গোপন্ দুর্ ছাই রয় কি নাম্ তার রাজ-সভায় যার চর্চা জোর-সে।[৮]

কবিতার শৈল্পিকতার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যমানের সম্পর্ক ওতপ্রোত। কোনো কোনো কবি তাদের সৃষ্টিকর্মে মূল্যবোধকে ফোটিয়ে তোলেন প্রাণবন্তরূপে। কবি হাফিজও তাদের তালিকার শীর্ষে। পার্থিব লোভ-লালস, অহমিকা জলাঞ্জলি দিয়ে এগিয়ে যান প্রাণের পরশে। ধৈর্য, পরোপকারিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় মানবীয় গুণাবলিকে উন্নত স্তরে উপনীত করে দেয়। সবশ্রেণির মানুষের প্রতি হাফিজের এই ভালোবাসার দ্বার উন্মুক্ত। পার্থিব জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতেও তা অধিক কার্যকর। উন্নত জীবনের লক্ষে কবি বাজিয়েছেন নৈতিক মূল্যমানের গানের বীণা। কবির ভাষায়-

صبر کن حافظ به سختی روز و شب　　عاقبت روزی بیابی کام را[৯]
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند　　جوانان سعادتمند پند پیر دانا را[১০]

দিবস-রজনীর কঠোরতায় ধৈর্য ধারণ কর
সফলতা আসবে তোমার জীবনে একদিন।
প্রাণ মোর নীতিবাক্য গ্রহণ কর যা জীবনের চেয়ে মূল্যবান
সৌভাগ্যবান যুবকেরা অভিজ্ঞ পণ্ডিতের উপদেশ বাণী শোন।

হাফিজের কবিতায় ইতিহাস-ঐতিহ্যের অতারণা ঘটেছে প্রাণবন্তরূপে। ইরানের পৌরাণিক ঘটনাপরম্পরাও কবিতায় নতুন মাত্রা যুক্ত করে। কেই খসরু, জামশিদ, কেউ কাউস, আফরাসিয়াব ও সিয়াউশের কাহিনি খুবই হৃদয়গ্রাহী। আল-কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন কাহিনি- হজরত আদম (আ.), সোলায়মান (আ.), মুসা (আ.), ঈসা (আ.), ইউসুফ -জোলেখা, খিজির, সামেরি ও কারুনের কাহিনি কাব্যের প্রতিপাদ্যকে জীবন্ত করে তোলে। ইসলামি ঐতিহ্য, নবি-রসুলদের কাহিনি ও মূল্যবোধের সমবায়ে হাফিজের কবিতা হয়ে ওঠে ব্যঞ্জনাময়। কবির ভাষায়-

اگر آن تُرک شیرازی به دست آرد دل ما را　　به خال هِندویَش بخشم سمرقند و بخارا را
بده ساقی مِیِ باقی که در جنت نخواهی یافت　　کنار آب رُکن آباد و گُلگشت مُصَّلا را
ز عشق ناتمام ما جمال یار مُستَغنی است　　به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را؟[11]

শিরাজের সেই তুর্কিতন্বী যদি গ্রহণ করে হৃদয় মোর
গালের তিলের তরে বিলিয়ে দিব সমরখন্দ ও বোখারা।
বিলিয়ে দাও বাকি শরাব, পাবে না বেহেশতেও
রোকনাবাদের স্রোতস্বতীর তীর ও পুষ্পাস্তীর্ণ আসন।
জানতাম আমি ইউসুফের প্রতিনিয়ত বিকাশমান সৌন্দর্যচ্ছটা
সতীত্বের পর্দা থেকে বের করে আনল জোলায়খাকে।

হাফিজের কাব্যদর্শন মূলত জীবনের দর্শন। দার্শনিক কথামালা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কাব্য সূক্ষ্ম ও সংক্ষিপ্তাকারে গ্রথিত। কবিতার মূলসুরে রয়েছে জীবনের মৌলিক দর্শন। দুঃখময় অনুভূতিকে কাব্যকলায় চিত্রিত করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বিরহ-বেদনার অবতারণায়ও উচ্ছল-উচ্ছাসের বহিপ্রকাশ ঘটান তিনি। সংস্কারমূলক কবিতায়ও শৈল্পিক সৌন্দর্যের ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রতিকুলতা উপেক্ষ করে আশাবাদী জীবনের প্রতি তার ছিল গভীর অনুরাগ। যা কবিতার পরতে পরতে পরিদৃষ্ট হয়। জীবনদর্শনের অবতারণার সঙ্গে

সঙ্গে নান্দনিক চিত্রগুলোও দ্যোতনাময় হয়ে ওঠে। প্রতিকুলতার বিপ্রতীপে সংগ্রামী জীবনের অঙ্গিকার হাফিজের কবিতা।

مقام عیش میسرنمی شود بی رنج بلی به حکم بلا بسته اند روز الست [১২]
حدیث آرزومندی که در این نامه ثبت افتاد همانا بی‌غلط باشد که حافظ داد تلقینم[১৩]

কাঁটাহীন পুস্পলাভ হয় না কোনোকালে
সৃষ্টিলগ্নে হ্যাঁ শব্দটি সব বিপদের মূলে।
আশার বাণী মিশে একাকার কবিতার ছন্দে
হাফিজের কবিতায় সুন্দরের ঝংকারে হৃদয় দোলে।

আধ্যাত্মিক পথচলা যেন শেষ হবার নয়। নব নব আঙ্গিক, রূপ, অবয়বে তা এগিয়ে যায় সম্মুখপানে। ফারসি সুফিকবি আত্তারের *মানতেকুত তায়েরে* (পাখির ভাষ্য) আধ্যাত্মিক সাধনা, রুমির *মসনবির* অন্তহীন বাসনা, হাফিজের দিওয়ানে স্রষ্টার সান্নিধ্যে উপনীত হবার লক্ষ্যে দুর্নিবার সংগ্রামের পরিচয় মেলে। সৃষ্টিজগতের প্রকৃত রহস্য অনুসন্ধান এক আধ্যাত্মিক বাসনা। স্রষ্টাকে খোঁজা, সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা অনাদিকাল থেকে চলে এসেছে। যুগে যুগে কবিসাহিত্যিকের রচনায় তা চিত্রিত হয় নব নব আঙ্গিকে, অবয়বে, অনুভূতিতে। কবি হাফিজের কবিতায়ও এ পৃথিবীতে মানুষের আগমনের রহস্য, সৃষ্টিজগতের অন্তর্নিহিত রহস্য অনুসন্ধানের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা দীপ্যমান। যদিও জীবন ও জগতের রহস্যোন্মোচন মোটেও সহজ নয়। হাফিজের কবিতায়ও এ অদম্য অনুভূতির প্রকাশ ঘটে এভাবে-

حافظ از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو که کس نگشود و نگشاید بحکمت این معما را[১৪]

গায়কী ও শরাবে মত্ত থাকো হাফিজ, যুগের রহস্যে মনোযোগ কম দাও
কেউ পারেনি প্রজ্ঞা দিয়ে এ রহস্যের বেড়াজাল উন্মোচন করতে।

কবি হাফিজের কবিতায়ও যেন পরম সত্তার প্রেমের ফল্গুধারা ঝড়ে পড়ে। কবির দৃষ্টিতে প্রেম-ভালোবাসা এমন এক ঐশ্বরিক চেতনা যা মানুষকে তার প্রেমের মূলে তথা পরমাত্মার দিকে ধাবিত করে। সে আকর্ষণ তাকে প্রতিনিয়ত টেনে নিয়ে যায় পরম এক অনুভূতিতে। সৃষ্টিজগতের সবই তার কাছে হয়ে ওঠে মধুর, আনন্দময়। হাফিজের কবিতা দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবকিছুর উর্দ্ধে ওঠে এক অনাবিল প্রেমের আবহ সৃষ্টি করে। কাব্যের ছন্দের তালে তালে যেন আকাশ থেকে তারকারাজি নিক্ষিপ্ত হয়। বাংলা, শিরাজ ও সমরকন্দের প্রেমপিয়াসি হৃদয়ের তরে ঝংকৃত হয় হাফিজের কবিতার সুর অপরূপ মহিমায়। কবি হাফিজের ভাষায়:

به شعر حافظ شیراز می‌رقصند و می نازند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی[১৫]

হাফিজের কবিতার ছন্দের তালে গাইছে ও নৃত্য করছে
কাশ্মীরের কৃষ্ণনয়না এবং সমরকন্দের তুর্কি নারীরা।

হাফিজের কবিতার নান্দনিক সৌরভ

হাফিজের কবিতার ভাব ও নান্দনিক আবেদন বিশ্বময়। প্রেমের বর্ণিল চিত্র অঙ্কিত হয় হাফিজের কবিতায়। কবিতার সুরভি জগতজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ভাষা, ছন্দ ও সুরের ঝংকারে মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। জাগতিক ও মহাজাগতিক ভাবনার সাথে নান্দনিকতায় কবিতা হয়ে ওঠে শিল্পীত। কবিতার আনন্দময় অনুভূতি সারা বিশ্বের মানুষের হৃদয়কে আলোড়িত করে। বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯) কবিকে বাংলায় আমন্ত্রণ জানান। বার্ধক্যে উপনীত কবি বাংলা ভ্রমণে অপারগ হলেও গজল পাঠিয়ে দেন সুলতানের উদ্দেশ্যে; যা আজও বাংলা ও ভারতবর্ষের মানুষের প্রতি হাফিজের গভীর ভালোবাসার পরশ হিসেবে গণ্য।

شکر شکن شوند همه طوطیات هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود
طیِّ مکان ببین و زمان در سلوکِ شعر کاین طفلِ یکشبه رهِ یکساله میرود[১৬]

আজকে পাঠাই বাংলায় যে ইরানের এই ইক্ষু-শাখা
এতেই হবে ভারতের সব তোতার চঞ্চু মিষ্টিমাখা।

দেখ গো আজ কল্পলোকের কাব্যদূতীর অসীম সাহস
এক বছরের পথ যাবে যে, একটি নিশি যাহার বয়স।[১৭]

সুলতানের আমন্ত্রণে হাফিজ বাংলায় আসতে অপারগ হলেও কবি নজরুলের আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করতে পারেননি কবি। নজরুল তাকে ঠিকই বাংলায় নিয়ে আসেন। হাফিজের কবিতা যারা বাংলায় সর্বপ্রথম ভাষান্তর করেন কবি নজরুল। নজরুল অনুদিত হাফিজের ছয়টি গজল সর্বপ্রথম কলকাতার মুসলিম ভারত পত্রিকায় প্রকাশ পায় ১৯২০ সালে। ফারসি ছন্দরীতির আদলে নজরুলের ভাবান্তরিত হাফিজের প্রথম গজল-

اَلا يا اَيُّهَا السّاقی اَدِرْ كَأسَاً و ناوِلْها   که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکل‌ها
به بوی نافه‌ای کآخر صبا زان طُرّه بگشاید   ز تابِ جَعدِ مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها
مرا در منزلِ جانان چه امنِ عیش چون هر دَم   جَرَس فریاد می‌دارد که بَربندید مَحمِل‌ها
بمِی سجّاده رنگین کن گرت پیرِ مُغان گوید   که سالِک بی‌خبر نَبوَد ز راه و رسمِ منزل‌ها[18]

হ্যাঁ, এয়্ সাকী, শরাব্ ভর্ লাও, বোলাও পেয়ালী চালাও হর্দম্!
প্রথম প্রেম-পথ সহজ-সুন্দর, শেষের দিক্ তা'র ঢালাও-কর্দম"!
কসম্ তার ভাই ভোরের বায় ভায় অলক-গুচ্ছের যে বাস্ কান্তার,
বহুৎ দিল্ খুন্ করলে কুম্বল কপোল-চুম্বী চপল ফাঁদ্দার।
আরাম সুখ্ মোর হারাম বিলকুল পথের্ মঞ্জিল পিয়ার মুল্কের
নকীব হর্দম হাঁকায়, হাম্দম্ পথিক! দূরপথ গাঁঠরী তুল্ ফের।
যদিই ক'ন তোর সাগ্নিক ঐ পীর্ মুসল্লায় কর্ শরাব্-রঙীন,
পথে্ রথ্ যার অচন্ নয় তার কোথায় পথ-ঘাট খারাপ্ সঙ্গীন্।[১৯]

নজরুল রুবাইয়াতে হাফিজের কাব্যানুবাদ শেষ করেন ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে। নজরুল যেদিন রুবাইয়াতে হাফিজের অনুবাদ শেষ করেন, ঠিক সেদিনই তার কলিজার ধন, প্রাণের স্পন্দন বুলবুল এ ধরণী থেকে চিরবিদায় নেয়। নজরুলের ভাষায়, 'যেদিন অনুবাদ শেষ হ'ল, সেদিন আমার খোকা বুলবুল চ'লে গেছে! আমার জীবনের যে ছিল প্রিয়তম, যা ছিল শ্রেয়তম তারই নজ্রানা দিয়ে শিরাজের বুল্বুল্ কবিকে বাঙ্লায় আমন্ত্রণ কওে আন্লাম। বাঙ্লার শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দিনের আমন্ত্রণকে ইরানের কবি-সম্রাট উপেক্ষা করেছিলেন। আমার আহ্বান উপেক্ষিত হয়নি। যে পথ দিয়ে আমার পুত্রের "জানাজা" (শব-যান) চ'লে গেল, সেই পথ দিয়ে আমার বন্ধু, আমার প্রিয়তম ইরানী কবি আমার দ্বারে এলেন। আমার চোখের জলে তাঁর চরণ অভিষিক্ত হ'ল!'[২০] হাফিজের প্রথম রুবাই'র প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক।

جزنقش تو در نظر نيامد مارا
جزکوی تو رهگذر نيامد مارا
خواب ارچه خوشآمدهمه رادرعهدت
حقا که به چشم در نيامد مارا[২১]

তোমার ছবির ধ্যানে, প্রিয়,
দৃষ্টি আমার পলক-হারা।
তোমার ঘরে যাওয়ার যে-পথ
পা চলেনা সে-পথ ছাড়া।
হায়, দুনিয়ায় সবার চোখে
নিদ্রা নামে দিব্য সুখে,
আমার চোখেই নেই কি গো ঘুম,
দগ্ধ হ'ল নয়ন-তারা॥ [২২]

নজরুলের প্রতি হাফিজের ভালোবাসা অবিচ্ছেদ্য। তারা যেন আত্মার আত্মীয়। দেশ, কাল ও ভাষার কোনো ব্যবধান সেখানে মুখ্য নয়। নজরুল ও হাফিজ দুজনেই শিশুপুত্র শৈশবে পিতার বুক খালি করে চিরবিদায়

গ্রহাণ করে। কবি হাফিজ যেভাবে পুত্রশোকে কবিতা লিখেন ঠিক একইভাবে নজরুলও সেই কবিতা অনুবাদের মাধ্যমে মনের বেদনার প্রকাশ ঘটান। হাফিজের ভাষায়-

دلا دیدی که آن فرزانه فرزند
چه دید اندر خم این طاق رنگین

بجای لوح سیمین در کنارش
فلک بر سر نهادش لوح سنگین

নজরুলের অনুবাদে দৃষ্টিগোচর হয়-

'ওহে হৃদয়! তুই দেখেছিস–
পুত্র আমার আমার কোলে
কি পেয়েছে এই সে রঙীন
গগন-চন্দ্রাতপের তলে।
সোনার তাবিজ রূপার সেলেট
মানাতনা বুকে রে যার,
পাথর চাপা দিল বিধি
হায় কবরের শিয়রে তার।[২৩]

কবি হাফিজের প্রতি নজরুলের ছিল গভীর অনুরাগ। কালের যোজন যোজন ব্যবধান এ ভালোবাসাকে এতটুকু ম্লান করেনি। নজরুল হাফিজের মানসপ্রিয়া শাখ্-ই-নবাতের তরে লিখেছেন দীর্ঘ কবিতা। শাখ্-ই-নবাতের সূচনায় রয়েছে-

শাখ্-ই-নবাত! শাখ্-ই-নবাত্! মিষ্টি রসাল 'ইক্ষু-শাখা'।
বুলবুলিরে গান শেখাল তোমার আঁখি সুর্মা-মাখা।
বুলবুল-ই-শিরাজ হলো গো হাফিজ গেয়ে তোমার স্তুতি,
আদর করে 'শাখ-ই-নবাত্' নাম দিল তাই তোমার তূতী।
তার আদরের নাম নিয়ে আজ তুমি নিখিল-গরবিনী,
তোমার কবির চেয়ে তোমায় কবির গানে অধিক চিনি।[২৪]

মহাকালের গণ্ডি পেরিয়ে হাফিজ ছড়িয়ে পড়েন বিশ্বের প্রতিটি জনপদে। দেশ, কাল, ভাষা, বর্ণ এক্ষেত্রে এতটুকু ব্যত্যয় সৃষ্টি করেতে পারেনি। কালচক্রের বাঁকে হাফিজের গভীর অনুরাগের স্পর্শে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন হাফিজের একনিষ্ঠ ভক্ত। নিজে কবি না হলেও তার ন্যায় হাফিজের ভক্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্করমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হাফিজের এতটাই অনুরাগী ছিলেন যে, কখনো কখনো গভীর রাতে শয্যাত্যাগ করে হৃদয়ের আবেগে হাফিজের গজল আবৃত্তি করতেন। হাফিজের গজলের এ পঙ্‌ক্তি দুটি তার অধিক প্রিয় ছিল-

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود　　هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود
آن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت　　که اگر سر برود از دل و از جان نرود[25]

কখনো মন প্রাণ হ'তে মোর প্রেম তোমারি যাবে না,
কখনো মোর স্মরণ হ'তে সে মাধুরী যাবে না।
প্রেম তোমারি এমনই মোর মন ও প্রাণে বিঁধেছে,
শির যাবে যাক, প্রাণ হ'তে মোর প্রেম তোমারি যাবে না।[২৬]

হাফিজ যেন রহস্যের ভাষ্যকার, প্রেমের নতুন ব্যাখ্যাতা। কালের কপোলতলে আজো মানুষের হৃদয়ে গহীনে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৯৩২ সালের ১৮ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাফিজ শিরাজির সমাধিপ্রাঙ্গনে উপনীত হন। ভাগ্যনির্ধারণে ধর্মান্ধতার প্রতি তার এতটুকু অনুরাগ ছিল না। তথাপি এক বিশেষ মুহূত্যে চোখ বুজে দিওয়ানে হাফিজে হাত রাখলে গজলটি বের হয় তার প্রথম পঙ্‌ক্তি হলো:

غلام نرگس مست تو تاجدارانند　　خراب باده لعل تو هوشیارانند[27]

'মুকুটধারী রাজারা তোমার মনোমোহন চক্ষুর দাস

তোমার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত সুধায় জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমানেরা অভিভূত।’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ পঙ্‌ক্তি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। তার মনের গভীরে তা এতোটাই রেখাপাত করে যে, কবি নিজেই সে অনুভূতি প্রকাশ করেন-

‘এই সমাধির পাশে বসে আমার মনের মধ্যে একটা চমক এসে পৌঁছল, এখানকার এই বসন্তপ্রভাতে সূর্যের আলোতে দূরকালের বসন্তদিন থেকে কবির হাস্যোজ্জ্বল চোখের সংকেত। মনে হল আমরা দুজনে একই পানশালার বন্ধু, অনেকবার নানা রসের অনেক পেয়ালা ভরতি করেছি। আমিও তো কতবার দেখেছি আচারনিষ্ঠ ধার্মিকদের কুটিল ভ্রূকুটি। তাদের বচনজালে আমাকে বাঁধতে পারে নি; আমি পলাতক, ছুটি নিয়েছি অবাধ প্রবাহিত আনন্দের হাওয়ায়। নিশ্চিত মনে হল, আজ কত-শত বৎসর পরে জীবনমৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে মানুষ হাফিজের চিরকালের জানা লোক।’[২৮]

সঙ্গীতের অনুপম মাধুর্যে হাফিজের কবিতা হয়ে ওঠে বাঙ্‌ময়। সুরের মুর্চ্ছনা ঝংকার সৃষ্টি করে হৃদয়ের গভীরে। আকাশ থেকে তারকা নিক্ষিপ্ত হয় তার কবিতার ছন্দের তালে তালে। সৃষ্টিরহস্যের উৎসমূলে যিনি তার কাছ থেকেই এসেছ তার এ ঐশ্বরিক দ্যুতি। তাই তো আকাশ-বাতাস মুখরিত তার কবিতায়।

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ　　که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریارا[২৯]

গজল গাইছ, মুক্তা গাঁথছ, আনন্দে গান গাও হে হাফিজ
তোমার কবিতায় আকাশ থেকে সুরাইয়া তারকা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

প্রেমের কোনো ভাষা নেই। ভৌগোলিক সীমা নেই: শুধুই অনুভব। সত্য সুন্দরের প্রতি ভালোবাসার চিরন্তন অনুরাগ। কালিক, ভাষিক ও দৈশিক সীমায় আবন্ধ করা সম্ভব নয় হাফিজের কবিতাকে। ভাষার কোনো বন্ধ এখানে মুখ্য নয়। সাহিত্য যেভাবে ভাবের বিষয়; সেখানে হাফিজ তো ভাবেই কারিগর। প্রেমের আবেগের সাথে অনুভূতির সাথে ভাষা বিপ্রতীপে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখে না। হাফিজের ভাষায়-

یکی است ترکی و تازی در این معامله حافظ　　حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی[৩০]

এই জগৎ সংসারে কেউ তুর্কি কেউ আরবি হে হাফিজ
প্রেমের অনুভূতি প্রকাশ কর যে ভাষায় তুমি ক্ষমতা রাখো।

যৌবনের প্রাণশক্তি আকাশসীমা অতিক্রমে ক্লান্ত হয় না; উচ্ছসিত হয়। যৌবনের মানদণ্ড বয়সের ফ্রেমে নয়; মনের কল্পনাশক্তির সাথে মিশে আছে। অনেক যুবা-তরুণ, বার্ধ্যকে লালন করে। আবার অনেরক বৃদ্ধও যৌবনের উদ্দীপনায় এগিয়ে চলে সামনের দিকে আগামীর পথে। নতুন নতুন স্বপ্ন কল্পনা তাদের মনকে আলোকিত করে। অন্যদেরকেও তা আলোড়িত করে। কোনো বাঁধার প্রাচীর অগ্রযাত্রাকে ধামিয়ে দিতে পারে না। নদীতে বাঁধ দিলে যেভাবে জোয়ারের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় তাদের বেলায়ও একই ঘটনা দৃশ্যমান হয়।

رونق عهد شباب است دگر بستان را　　می‌رسد مژدهٔ گل بلبل خوش الحان را
ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی　　خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را[31]

আবার পুষ্পোদ্যানে যৌবনের সৌন্দর্য বিকশিত হচ্ছে
সুকণ্ঠ বুলবুলির কাছে পৌঁছে যাচ্ছে পুষ্পের মিলনের সুসংবাদ।
হে প্রভাত সমীরণ! যদি তুমি বাগানের নবযুবাদের কাছে পৌঁছাও
আমাদের সালাম পৌঁছে দিও দেবদারু, গোলাপ ও কিংসুকের নিকট।

হাফিজের কবিতা প্রেম, মানবতা, দর্শন, মূল্যবোধ, নান্দনিকতা ও শৈল্পিক মহিমায় উদ্ভাসিত। অধ্যাত্মচেতনা কবিতার প্রধান উপজীব্য। এ দর্শনের মূলে রয়েছে কোরআন, হাদিস ও ইসলামি ঐতিহ্যের মর্মবাণী। জরাজীর্ণতাকে মাড়িয়ে তারুণ্যের তথা সৃষ্টির জয়গান গেয়েছেন তিনি। সংস্কারমুখী চিন্তাধারার গভীরতা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে কবিতার পাতায় পাতায়। চিন্তাগত ও ধর্মীয় গোঁড়ামি, অসহনশীলতার বিরুদ্ধে হাফিজ ছিলেন দীপ্তকণ্ঠ। দৈশিক-কালিক-ভাষিক সীমারেখার বহু উর্দ্ধে তিনি আসীন। জীবন সম্বন্ধে সত্য উপলব্ধিকে রূপায়িত করেন কল্পনার মাধুরীতে। শৈল্পিক ও নান্দনিক অনুভবের চিত্রায়ণ ঘটে কবিতার পরতে পরতে। মানুষের মনোলাক মূল্যমান ও নান্দনিক ছোঁয়ায় ভরে যায়।

তথ্যনির্দেশ

[১] হাফিজ শিরাজি, *দিওয়ানে গাজালিয়্যাতে শামসুদ্দিন খাজা হাফিজ শিরাজি,* ড. খলিল খতিব রাহবার (সম্পা.) (তেহরান: এন্তেশারাতে সুফি আলী শাহ, ২০০০), .পৃ. ৬০৮।
[২] *তদেব, ভূমিকা*, পৃ. ২৬।
[৩] *তদেব*, পৃ. ৪৩১।
[৪] *তদেব*, পৃ. ১৭।
[৫] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *দীওআন-ই হাফিয* (ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৩৮), ভূমিকা, পৃ. ভূমিকা, পৃ. ১।
[৬] *দিওয়ানে গাযালিয়্যাতে মাওলানা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ খাজা হাফিজ শিরাজি*, পৃ.৩৮১।
[৭] *তদেব*, পৃ. ১।
[৮] কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, আব্দুল কাদির (সম্পা.) (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জুন, ১৯৮৩), পৃ. ২৯৮।
[৯] *দিওয়ানে গাজালিয়্যাতে মাওলানা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ খাজা হাফিজ শিরাজি*, পৃ. ১৩।
[১০] *তদেব*, পৃ. ৫।
[১১] *তদেব*,পৃ. ৪।
[১২] *তদেব*, পৃ. ৩৭।
[১৩] *তদেব*, পৃ. ৪৮১।
[১৪] তদেব, পৃ. *৫।*
[১৫] তদেব, পৃ. ৬০০।
[১৬] তদেব, পৃ. ৩০৫।
[১৭] নজরুল ইসলাম, *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* (কলিকাতা: ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৩১), পৃ. ৮৭।
[১৮] *দিওয়ানে গাজালিয়্যাতে মাওলানা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ খাজা হাফিজ শিরাজি*, পৃ. ১।
[১৯] কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, আব্দুল কাদির (সম্পা.), পৃ. ২৯৮।
[২০] নজরুল ইসলাম, *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* (কলিকাতা: ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৩১), মুখবন্ধ, পৃ. ৮।
[২১] আল্লামা মোহাম্মদ কাজভিনি,*হাফিজ*(তেহরান: এন্তেশারাতে আসাতির, ১৯৭৬), পৃ. ৪০৩।
[২২] নজরুল ইস্লাম, *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ*, পৃ. ১৭।
[২৩] তদেব, ৮৪-৮৫।
[২৪] কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৮), পৃ. ১৩৬।
[২৫] *দিওয়ানে গাজালিয়্যাতে মাওলানা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ খাজা হাফিজ শিরাজি. পৃ.* ৩০২।
[২৬] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *দীওআন-ই হাফিয* (ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৩৮), ভূমিকা, পৃ. ৩।
[২৭] *দিওয়ানে গাজালিয়্যাতে মাওলানা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ খাজা হাফিজ* শিরাজি, পৃ. ২৬৩।
[২৮] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পারস্য-যাত্রী* (কলিকাতা: বিশ্বভারতী, ফাল্গুন ১৩৯২ বাংলা), পৃ. ৪৩-৪৪।
[২৯] *দিওয়ানে গাজালিয়্যাতে মাওলানা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ খাজা হাফিজ শিরাজি*, পৃ. ৫।
[৩০] তদেব, পৃ. ৬৫০।
[৩১] তদেব, পৃ. ১৪।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

শাহনামা মহাকাব্যের বিষয়-বৈচিত্র্য ও কাব্যিক-নৈপুণ্য
(Subject-Variety and Poetic-Craft of Shahnama Epic)

ড. মো. ওসমান গনী*

Abstract: Abul Kashem Ferdousi (935/941-1020/1025A.D.) was the most brilliant, distinguished, acknowledged, popular and famous poet in Persian literature. He is also the'National Poet`of Iran. Ferdousi completed the epic *Shahnama* in 394 A.H. It is a valuable source of information on the civilization, customs, rites and manners of ancient Iran. It deals not only with war, loot, massacre, and peace but also gives an account of social and cultural advancement of every period. The chief characteristics features of the epic *Shahnama* are as avoiddance of Arabic words, preciseness and force of diction, indensity of emotion and sentiment, flight of imagination,elucidetion of events, depiction of love scene, selection of characters and the use of rhetoric. This article highlighted those topics on the light of the epic *Shahnama*.

ভূমিকা

ফারসি ভাষা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষা এবং এর সাহিত্যও যথেষ্ট উন্নত। এ ভাষায় অনেক খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে। তন্মধ্যে একাদশ শতাব্দী হতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পযর্ন্ত ছিল ফারসি সাহিত্যের গৌরবময় যুগ। এ দীর্ঘ সময়ে এমন কিছু প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব ঘটেছে যাঁদের কীর্তি অম্লান হয়ে থাকবে। তন্মধ্যে ইরানের জাতীয় কবি মহাকবি আবুল কাশেম ফেরদৌসির (৯৩৫/৯৪১-১০২০/১০২৫খ্রি) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে অনেক ফারসি কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিকের সুফি-দর্শন, অধ্যাত্মবাদ ও চিন্তা-দর্শনের উপর বাংলায় গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু, বাংলার যুব সমাজকে তাদের স্বদেশ-প্রেম ও জাতীয়তাবাদ, ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান ও মমত্ববোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে অদ্যাবধি মহাকবি আবুল কাশেম ফেরদৌসির শাহনামা মহাকাব্যের পৌরাণিক কাহিনী, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বীরত্বগাঁথা, প্রেম কাহিনী, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও তার অন্তর্নিহিত বিষয়-বৈচিত্র্যের উপর কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। তাই ফারসি ভাষার জ্ঞান পিপাসু ও সাহিত্যানুরাগী হিসেবে ফেরদৌসির শাহনামা মহাকাব্যে যে পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে এবং তাতে ইরানি জাতীয়তাবাদ, বীরত্বগাঁথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, প্রেম-ভালবাসা, ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ, রোমান্টিক গল্প ও রূপকগল্পের মাঝে স্বদেশ প্রেম ও জাতীয়তাবোধের স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে, তা উদ্‌ঘাটন করাই হচ্ছে প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

মহাকবি ফেরদৌসি ও তাঁর শাহনামা

ইরানের জাতীয় কবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি ফারসি ভাষায় *শাহনামা* মহাকাব্য রচনা করে ফারসি ভাষা ও ইরানের জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবন দান করেছেন। ফারসি সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিস্তারের লক্ষ্যে ইরানে গযনবি শামক সাবুক্তগিন (মৃ ৯৯৭খ্রি.) এবং তার পুত্র সুলতান মাহমুদের (মৃ. ১৩৩০ খ্রি.) অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুলতান মাহমুদ শুধু রাজ্য বিজয়ী ছিলেন না; বরং তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগীও ছিলেন। তাঁর দরবারে কবিদের সংখ্যাই ছিল চার শতের বেশি। সুলতান মামুদের রাজ দরবারের অন্যতম কবি ছিলেন ফেরদৌসি। তিনি ইরানকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার লক্ষ্যে দীর্ঘ ত্রিশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে *শাহনামা* মহাকাব্য রচনা করেন। ফলে তিনি ফারসি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইরানের জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

ফেরদৌসির আসল নাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বিখ্যাত আরবি সাহিত্যিক আল বান্দারি *শাহনামা* কাব্যের আরবি অনুবাদে ফেরদৌসির নাম ‘মানসুর বিন হাসান’ বলে উল্লেখ করেছেন।[১] হামাদুল্লাহ মাসতুফি তাঁর

---

* প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখে গুজিদে নামক ইতিহাস গ্রন্থে ফেরদৌসির নাম 'হাসান বিন আলি' এবং দৌলতশাহ তাঁর *তাজকেরা* গ্রন্থে 'হাসান বিন ইসহাক বিন শরফ শাহ' বলে উল্লেখ করেছেন।[২] অধ্যাপক ব্রাউনও এ মত সমর্থন করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ফেরদৌসি সংক্রান্ত আলবান্দারির অনুবাদই সর্বাধিক প্রাচীন ও গ্রহণযোগ্য। সুতরাং ফেরদৌসির প্রকৃত নাম 'মানসুর বিন হাসান' জানাই যুক্তিযুক্ত। তবে 'ফেরদৌসি' তাঁর উপাধি এবং 'আবুল কাসেম' তাঁর উপনাম।[৩]

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বীরত্ব গাথাঁর মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসির জীবনী পুরোপুরি ভাবে জানা যায় না। তবে ফেরদৌসির মৃত্যুর প্রায় একশত বছর পরে ইরানের বিশিষ্ট লেখক নিজামি আরুজি সামারকান্দি তাঁর *চাহার মাকালা* গ্রন্থে ফেরদৌসির জীবনী সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ফেরদৌসি ইরানের তুস নগরীর তাবরান এলাকার 'বাঝ' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৪] এ গ্রামেই তাঁর পূর্বপুরুষগণ চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ফেরদৌসির পিতা মোহম্মদ ইসহাক ইবনে শরফ শাহ তুস নগরে রাজকীয় উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। দৌলাতশাহ সামারকান্দির ভাষ্য মতে, ফেরদৌসি তুস নগরীর 'রোযান' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন। তবে নিজামি আরুজির মতই অধিক গ্রহণযোগ্য।[৫]

ফেরদৌসির জন্ম তারিখ কোনো জীবনী লেখক উল্লেখ করেননি বিধায় তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ জানা যায় না। তাই এ বিষয়ে আমাদেরকে কবির রচনার উপর নির্ভর করতে হয়। *শাহনামা*র কতিপয় স্থানে ফেরদৌসি নিজের বয়স ৫৮, ৬৫, ৭১, ৭৬ এবং ৮০ বছর বলে উল্লেখ করেছেন। কবি দীর্ঘ ৩০/৩৫ বছরে লিখিত *শাহনামা*র বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বয়সের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এমন কোনো বিষয় উল্লেখ করেননি; যা থেকে তাঁর প্রকৃত জন্ম তারিখ নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে *শাহনামা*র বর্ণিত শ্লোকের উপর অনুমান করে ফেরদৌসির সম্ভাব্য জন্ম তারিখ নির্ণয় সম্ভব। *শাহনামা*র শেষাংশে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে–

که من گفتم این نامه شهریار　　　ز هجرت شده پنج هشتاد بار[৬]

' আমি বাদশাহদের এই গাঁথা পূর্ণ করলাম
যখন পাঁচ আশি বার অতিক্রান্ত হয়ে গেল।'

এ শ্লোকের দেখা যায় ৫×৮০=৪০০ হিজরীতে (১০০৯ খ্রি.) ফেরদৌসি শাহনামা রচনা শেষ করেন।[৭]
অপর দিকে *শাহনামা* কাব্যের অন্যত্র ফেরদৌসি উল্লেখ করেছেন –

غنوده همی چشم می شارفش　　　کنون سالم آمد به هفتاد و شش[৮]

' তখনি চোখ আরামে ঘুমিয়ে গেল অস্তে
যখন নিরাপদে ৭৬ বছরে আসলাম।'

এ শ্লোকে ফেরদৌসির বয়স ৭৬ বছরের কথা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে জন্ম সাল (৪০০ হিজরী-৭৬) ৩২৪ হিজরী মোতাবেক ৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ বলে ধরা যায়।[৯] এ ব্যাপারে অধিকাংশ গবেষকই একমত পোষণ করেছেন যে ফেরদৌসি ৪০০ হিজরি মোতাবেক ৯৩৫ খ্রিস্টব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

মহাকবি ফেরদৌসির বাল্যকাল তুস নগরীর 'দেহকান' পরিবারে অত্যন্ত সুখ ও স্বচ্ছন্দের সাথে অতিবাহিত হয়। কেননা পৈত্রিক দিক থেকে তাঁর আর্থিক অবস্থাও ছিল মোটামুটি ভালো। কাজেই বাল্যজীবনে অভাবের তীব্র কষাঘাত তাকে সহ্য করতে হয়নি। তিনি বিদ্যার্জনের প্রতি বিশেষ যত্নশীল ও মনোযোগী ছিলেন। তাঁর বাল্যকালের অধিকাংশ সময় পাঠ্যে ও বিদ্যাচর্চায় অতিবাহিত করেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই কবিতা রচনা শুরু করেন।[১০] ফলে তিনি এমন একটি মহাকাব্য উপহার দিয়েছেন যার মাধ্যমে ইরানের জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবন দান করেন।

ফেরদৌসি তুস নগরে বসেই স্ব-ইচ্ছায় শাহনামা রচনা শুরু করেছিলেন। অনেকে মনে করে থাকেন যে, ফেরদৌসি সুলতান মাহমুদের নির্দেশে *শাহনামা* রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা ফেরদৌসি ৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ মাতন্তরে ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে *শাহনামা* রচনা শুরু করেছিলেন। অপর দিকে সুলতান মাহমুদ ৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ২৭ বছর বয়সে গযনীর সিংহাসনে আরোহন করেন। এ থেকে বুঝা যায় ফেরদৌসি

সুলতান মাহমুদের ক্ষমতায় আরোহণের ২৪ মতান্তরে ১৯ বছর পূর্বেই *শাহনামা* রচনা শুরু করেন।[১১] ফেরদৌসির অগ্রজ কবি আবু মনসুর দাকিকির (মৃ. ৯৭৬/৯৮১খ্রি.) অসমাপ্ত *শাহনামা* সমাপ্ত করার প্রত্যয় নিয়ে এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এছাড়াও কবি নিজ শহরে এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাহচর্য লাভ করেন এবং তিনিও ফেদৌসিকে *শাহনামা* রচনায় উৎসাহ প্রদান করেন। কবির নিজের ভাষায়–

تو گفتی که با من بیک پوست بود　　بشهرم یکی مهربان دوست بود
به نیکی خر آمد مگر پای تو　　مرا گفت خوب آمد این رای تو ۱۲

‘আমাদের নগরীতে এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন
লোকে বলে আমরা ছিলাম, এক দেহ এক আত্মা।
তিনি বললেন, তোমার শুভ বাসনাকে আমি স্বাগত জানাই
তুমি আনন্দের সাথে বাসনাকে গ্রহণ কর।’

এছাড়াও ফেরদৌসি তাঁর প্রথম পৃষ্ঠপোষক আবু মনসুর বিন মুহাম্মদের উৎসাহের কথা *শাহনামায়* উল্লেখ করেছেন। তিনিই ফেরদৌসিকে *শাহনামা* রচনা করে কোন বাদশাহর কাছে উৎসর্গ করার জন্য পরাপর্শ দিয়েছিলেন। তবে কবির একটি ইচ্ছা ছিল যে, যদি এই *শাহনামা* থেকে উপঢৌকন হিসেবে কোন অর্থ পাওয়া যায় তবে তা তিনি তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহ উৎসবে ব্যয় করবেন। ফেরদৌসির ভাষায়-

بسی رنج بردم با امید گنج　　سی و پنج سال از سرای سپنج [১৩]

‘ঐশ্বর্যের আশায় অনেক কষ্ট করলাম,
৩৫টি বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করলাম।’

এ কারণেই হয়ত তিনি সুলতান মাহমুদের রাজ দরবারে গিয়েছিলেন। ফেরদৌসির সুলতান মাহমুদের দরবারে উপস্থিত হওয়া নিয়ে বিভিন্ন কাহিনী পরিলক্ষিত হয়। তবে একথা সত্য যে, তুসের গভর্ণর মনসুর বিন মুহম্মদের উৎসাহে এবং সুলতান মাহমুদের উজির হাসান মায়মন্দির সহায়তায় ফেরদৌসি সুলতান মাহমুদের রাজদরবারের সভা কবির মর্যাদায় সমাসীন হন। প্রথম সাক্ষাতেই সুলতান মাহমুদ কবির আবৃত্তি করা কয়েকটি কবিতা শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং আনন্দে বলে উঠেন–

ای فردوسی تو دربار مرا فردوس کردی [১৪]

‘ হে ফেরদৌসি তুমি আমার দরবারকে বেহেস্তে পরিণত (আলোকিত) করে দিলে।’

এর পর থেকে কবি ফেরদৌসি অধিক খ্যাতি অর্জন করেন এবং মাহমুদের রাজদরবারের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এ সময় সুলতান মাহমুদ তাঁকে *শাহনামা* রচনা সমাপ্ত করতে উপদেশ দেন এবং এর প্রতিটি চরণের জন্য একটি করে স্বর্ণমুদ্র প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেন।[১৫] ফেরদৌসির সাথে সুলতানের গভীর সম্পর্ক ও সম্মান দেখে রাজসভার অন্যান্য কবিগণ ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে। তারা কবিকে রাজদরবার থেকে বের করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ফেরদৌসি দীর্ঘ দিন রাজসভায় বসেই *শাহনামা* লেখা সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু সুলতান মাহমুদ ফেরদৌসির পরিশ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন করলেন না এবং নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতিও রাখলেন না। সুলতান কবিকে ৬০ হাজার শ্লোকের বিনিময়ে ৬০ হাজার স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে ৬০ হাজার রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করেন। এতে কবির আত্মমর্যাদায় আঘাত হানে এবং নিজের জন্য অপমান মনে করেন। অবশেষে ফেরদৌসি দুঃখ, অনুতাপ ও ক্ষোভ নিয়ে গযনি ত্যাগ করে তুস নগরীতে ফিরে আসেন। [১৬]

মহাকবি ফেরদৌসির জীবনের শেষ দিনগুলো অত্যন্ত দুঃখ কষ্ট ও দারিদ্রতার মধ্যে অতিবাহিত হয়। তিনি সুলতান মাহমুদের দরবার থেকে ফিরে এসে তুস নগরে বসে সুলতান মাহমুদকে ব্যঙ্গ করে একশত চরণ বিশিষ্ট একটি হিজু (অপবাদমূলক) কবিতা রচনা করেন। এ কবিতার কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ-

به سر بر نهادی مرا تاج زر　　اگر شاه را شاه بودی پدر
مرا سیم و زرتا به زانو بدی　　اگرمادر شاه با نو بدی
به جای طلا نقره ام داده است　　یقینم که شاه نانوا زده است ۱۶

‘যদি সুলতানের পিতা সুলতান হতেন
তবে আমার শিরে স্বর্ণ মুকুট শোভা পেত।
যদি সুলতানের মাতা রাজ কন্যা হতেন,
তবে আমাকে হাটু পর্যন্ত স্বর্ণ স্তুপের মধ্যে গ্রোথি করতো।
আমার বিশ্বাস শাহ ছিলেন রুটি বিক্রেতার পুত্র
তাই তিনি স্বর্ণের স্থলে রৌপ্য প্রদান করেছেন।’

এই কবিতা সুলতান মাহমুদের কাছে পৌছালে তিনি আরও ক্ষিপ্ত হন। কিন্তু ঘটনাক্রমে একদিন সুলতান ভারত থেকে কোনো এক অভিযান শেষে প্রত্যাবর্তন করার সময় রাস্তার পাশে কোনো এক হিন্দু রাজার কেল্লা দেখতে পান। সুলতান মাহমুদ তার উযির হাসান মায়মুন্দির মাধ্যমে সংবাদ প্রদান করেন যে, রাজাকে বলুন তিনি যেন মাহমুদের দরবারে উপস্থিত হয়ে তার আনুগত্য স্বীকার করেন। আর যদি আনুগত্য স্বীকার না করে তবে কি বলতে হবে তুমিই বলে দিবে। তখনি মায়মুন্দি বলে উঠেন–

همی گرز و میدان افراسیاب　　اگر جز به کام من آید جواب [১৭]

‘যদি আমার আশানুরূপ জবাব না আসে তবে
তখনই গুর্জ ও ময়দানে আফরাসিয়াব।’

অর্থাৎ মাহমুদের আনুগত্য স্বীকার না করলে আফরাসিয়ারের যুদ্ধের
ময়দানের মত অবস্থা হবে।’

এই শ্লোকটি কাব্যিক সৌন্দর্য সুলতানকে চমকিত করে। তিনি উযিরকে জিজ্ঞেস করেন এর রচয়িতা কে ? উত্তরে হাসান মাহমুদি বলেন: ‘সেই হতভাগা কবি যিনি গযনির রাজসভা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।’ সুলতান এই সময় ফেরদৌসিকে স্মরণ করেন এবং তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য আফসোস করেন। অতঃপর তাকে ৬০ হাজার স্বর্ণ মুদ্র পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সুলতানের অনুচরগণ যখন তুসের তাবরান নগরীর রুদবার (Rtubar gate) দিয়ে নগরীতে প্রবেশ করছিল তখন রেজান দ্বার (Gate of Ragan) দিয়ে ফেরদৌসির মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে তাঁর ভক্তগণ এগিয়ে চলছিলেন সমাধির দিকে।[১৮] অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, কবির শেষ জীবন অর্থাভাবে কাটলেও অর্থ যখন তার দ্বারস্থ হলো, তখন তিনিই জগতে ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত সুলতানের এই স্বর্ণমুদ্রা কবির একমাত্র কন্যার নিকট আনা হলে তিনিও তা গ্রহণ করেননি। অতঃপর সুলতান মাহমুদ এই অর্থ দিয়ে ফেরদৌসির নামে একটি পান্থশালা নির্মানের নির্দেশ দেন।[১৯] এই মহান কবি ফেরদৌসি ৪১১ হিজরি মোতাবেক ১০২০ খ্রিস্টাব্দে মতান্তরে ৪১৬ হিজরি মোতাবেক ১০২৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

শাহনামা মহাকাব্যের তথ্য-উপাত্ত

ফারসি ভাষায় যে গ্রন্থে রাজা-বাদশাহদের জীবনী ও যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা করা হয়, তাকে *শাহনামে* বলা হয়।[২০] বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দ *শাহনামে* পরিবর্তন হয়ে *শাহনামা* বলে প্রচলিত হয়েছে। ফেরদৌসির রচিত *শাহনামা*র পূর্বেও এ ধরনের কিছু প্রাচীন মহাকাব্যের কথা জানা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- *আরদেশিরে পাপকান* ও *শাহনামেয়ে গাশতাসব. কার নামাকে আরদেশিরে পাপকান* গ্রন্থে ইরানি সম্রাট আরদেশির ও তার পুত্র শাপুর এর বর্ণনা রয়েছে। *শাহনামেয়ে গাশতাসব* গ্রন্থে সম্রাট গাশতাসবের বর্ণনা রয়েছে। পরবর্তী কালে মহাকবি ফেরদৌসি কর্তৃক রচিত *শাহনামা* ইরানের জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। এটি শুধু ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের, মহাকাব্যই নয় বরং পৃথিবীর মহাকাব্যসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম মহাকাব্য। A.J. Arberry - একে `World's Literary Master pieces' বলে উল্লেখ করেছেন। ফেরদৌসি এই *শাহনামা* রচনা সম্পর্কে বলেছেন-

بسی رنج بردم در این سال سی　　عجم زنده کردم بدین پارسی [২১]

'দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে বহু পরিশ্রম করলাম
যার দ্বারা আমি ফারসিকে পুনরুজ্জীবিত করলাম।'

শাহনামা মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে আবেস্তা, পাহলভি ও আরবি গ্রন্থাবলি উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়। প্রখ্যাত ফারসি সাহিত্য সমালোচক ড. রেজা যাদেহ শাফাকের মতে- 'আবেস্তা, বুনদাহিশান, দিনকারাত ইত্যাদি গ্রন্থ *শাহনামার* আদি উৎস। এ ছাড়া পাহলভি ভাষা থেকে আরবি বা ফারসিতে অনূদিত গ্রন্থাবলি *শাহনামা*র উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তন্মধ্যে মাসউদ মারওয়াযি, আবুল মোয়াইয়্যাদ বালখি ও আবু আলি বালখির *শাহনামা* উল্লেখযোগ্য। ফেরদৌসির *শাহনামা* রচনায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে *শাহনামায়ে আবু মানসুরি* ও কবি দাকিকির অসমাপ্ত *শাহনামা* সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস ।[২২]

শাহনামা মহাকাব্যের বিষয়-বৈচিত্র্য

ফেরদৌসি মহান আল্লাহর নামে মহাকাব্য *শাহনামা*র সূচনা করেছেন। এরপর বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স:), সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাতার গুরুত্ব, মানুষ ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য, শহানামা রচনার প্রেক্ষাপট এবং ইরানের পঞ্চাশজন বাদশহার গৌরবময় ইতিহাস মাসনবি কব্যাকারে তুলে ধরেছেন। মুসলিম বাহিনী কর্তৃক ইরান দখল এবং ইরানের শেষ সম্রাট তৃতীয় ইয়াযদেগার্দের পতনের মধ্য দিয়ে *শাহনামা* মহাকব্যের বিষয়বস্তু বা ঘটনা প্রবাহ শেষ হয়েছে। *শাহনামা* মহাকাব্য ৬টি খণ্ডে বিভক্ত এবং ৬০ হাজার শ্লোকে সমাপ্ত। ইরানের প্রাচীন ঘটনাবলি বর্ণনার মাধ্যমে ইরানের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরাই হলো *শাহনামা*র মূল বিষয়। *শাহনামা*র ঘটনাপ্রবাহ পৌরাণিক কাহিনির মাধ্যমে শুরু হয় এবং ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় এসে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। *শাহনামা*র ঘটনাপ্রবাহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

(ক) পৌরাণিক যুগঃ ইরানের প্রথম সম্রাট কিউমারস থেকে এ যুগের সূচনা এবং হোশাঙ্গ, তাহমরাস, জামশিদ ও জাহাকের বর্ণনার পর ফরিদুনের সিংহাসনে আরোহণের মধ্য দিয়ে এ যুগের পরিসমাপ্তি।

(খ) বীরত্বপূর্ণ যুগঃ ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণের দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে এ যুগের সূত্রপাত। সম্রাট কাভের সিংহাসনে আরোহণের মাধ্যমে এর সূচনা এবং ইতিহাসের মহাবীর রুস্তমের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ যুগের যনিকা। শাহনামার এ অংশটুকু ইরানিদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্যের বীরত্বগাঁথা কাহিনীসমূহের কাব্যিকরূপ।

(গ) ঐতিহাসিক যুগ: সম্রাট বাহমানের সিংহাসনে আরোহণের মাধ্যমে এ যুগের সূত্রপাত এবং সর্বশেষ সাসানি সম্রাট তৃতীয় ইয়াযদেগারদ-এর পতনের মধ্য দিয়ে *শাহনামা* মহাকাব্যের ঘটনাপ্রবাহের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এ যুগে বীরত্বপূর্ণ কল্পকাহিনী, অলৌকিক ব্যক্তিবর্গ এবং অস্বাভাবিক কার্যাবলির পরিবর্তে ঐতিহাসিক ও বাস্তব ঘটনাবলি শাহনামায় স্থান লাভ করেছে।

শাহনামার সর্বত্রই অস্ত্রের ঝঁণ-ঝাঁণি ধ্বনিত হয়েছে। এখানে মনুচেহের, জাল, তুস, গেভ, রুস্তম, সোহরাব ও ইস্ফান্দিয়ারের বীরত্বকে অত্যন্ত নিখঁতভাবে তুলে ধরেছেন। এতে জালের প্রতি রুদাবার আসক্তি, সিয়াউশের প্রতি সাওদাবা এবং রুস্তমের প্রতি তাহমিনার আসক্তি ও প্রেমের কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া রূপক কাহিনীর আবতারণা শাহনামার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখানে কিউমার্স কর্তৃক বাঘের চামড়া পরিহিত অবস্থায় পাহাড় থেকে অবতরণ, হোশাঙ্গ কর্তৃক দৈত্যের উপর বিজয়ী হওয়া, জালের সী-মোরগের বাসায় লালিত-পালিত হওয়া, কায়কাউসের দৈত্য কর্তৃক বন্দি হওয়া এবং মহাবীর রুস্তম কর্তৃক সাতটি মঞ্জিল অতিক্রম করে কায়কাউসকে উদ্ধার করার রুপক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ফেরদৌসি শাহনামার চরিত্র চিত্রণে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বাদশাহদের চরিত্রের ভাল-মন্দ দিক সুন্দরভাবে ফুটে তুলেছেন। সাথে সাথে নারী চরিত্রের মধ্যে সওদাবার চরিত্র ও শাস্তি এবং রুদাবার চরিত্র ও পুরস্কারের কাহিনী চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ ছাড়া শাহনামায় রয়েছে ব্যথাতুর করুণ রস। এখানে তুর ও

সুলম কর্তৃক এরজের প্রাণনাশ, আফরাসিয়াব কর্তৃক সিয়াউশের জীবনাবশান এবং বাবা মহাবীর রুস্তম কর্তৃক পুত্র সোহরাবের প্রাণনাশের করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।[২৩]

শাহনামা মহাকাব্যের কাব্যিক-নৈপুণ্য

কবির প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হলো কল্পনা। কিন্তু কেবল কল্পনার উপর নির্ভর করে কোনো বৃহৎ কাব্য সৃষ্টি হয় না। সেই কল্পনাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আশ্রয় নিতে হয়। কবি জ্ঞানের অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও কল্পনাকে বাস্তবতার সঙ্গে সংযোজন করে। সে জন্যই *শাহনামা* ইতিহাস না হয়ে কাব্য হয়েছে। তথ্যের সংগ্রহ না হয়ে তা হয়েছে যৌবনপ্রাপ্ত ইরানের প্রাণময় চলমান প্রতিচ্ছবি। *শাহনামা* ইতিহাস হলে জাহাকের রাজত্বকাল এক হাজার বছর হতে পারত না এবং *শাহনামা*র মহানায়ক রুস্তম তিনশত বছর ধরে সম্রাটের পর সম্রাটের রাজ্যকালব্যাপী স্বীয়শৌর্য ও আত্মমর্যাদা প্রকটিত করার অবকাশ পেতেন না। *শাহনামা* একটি মহাকাব্য। চরিত্র চিত্রণে, ব্যপ্তিতে, শৌর্য-বীর্যের প্রকাশে, বুক ভাঙা বেদনায়, ঐদার্য ও হৃদ্যতার মানবিক উদ্ভাসনে এই কাব্য এমন এক অসীম চিত্রশালার দ্বার উন্মুক্ত করে; যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর যে কোনো দেশের সাহিত্যে দুর্লভ। হোমারের 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' কিংবা বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসের 'মহাভারত' যে ধরনের মহাকাব্য *শাহনামা* সে ধরনের মহাকাব্য নয়। কেননা এগুলোর নেয়ামক শক্তি কাল নয়- স্থান। সেখানে গ্রীস ও ট্রয়, অযোধ্যা ও লঙ্কা, হস্তিনাপুর ও কুরুক্ষেত্রকে কেন্দ্র করেই ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। একের পতনে অন্যের মহিমা সেখানে ভাস্বর। অন্যদিকে *শাহনামা*কে নিয়ন্ত্রণ করেছে মহাকাল। যে কালের বহমান স্রোতে ঘটনা ও স্থান মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে বিলীন হয়ে যায়। সেখানে শাহী পরিবারের উত্থান পতনে বীরের শৌর্যে ও সম্রাটদের মহানুভবতায় এক মূল্যবোধের উদ্ভব ঘটেছে এবং শেষাবধি তা উত্তরাধিকার সূত্রে ইতিহাসেরই শিক্ষা হয়ে মানুষের হাতে আসছে।[২৪] *শাহনামা*য় যদিও রূপ-কাহিনীসমূহের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; তথাপিও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইরান-তুরান তথা সমগ্র এশিয়ায় যে ঐতিহাসিক তথ্যাদি পাওয়া যায় ফেরদৌসি সেগুলোকেই *শাহনামা*য় কাব্যরূপ দিয়েছেন।

ফেরদৌসির *শাহনামা* পারস্য সাহিত্যকে অতি উন্নত সাহিত্যিক ভাবধারা, প্রকাশভঙ্গি ও মননশীলতার অধিকারী করেছে। *শাহনামা*র সাহিত্য বিচারে যে সত্যটি সর্বাধিক গুরুত্ব পায় তা হলো- এর মাধ্যমে কবি একদিকে যেমন শক্তিশালী আরবি ভাষার প্রভাবে মৃত: প্রায় মাতৃভাষাকে পুনরুজ্জীবন দান করেছেন, অপরদিকে তেমনি ইরানিদের গৌরবময় জাতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে সাহিত্য মঞ্জুসায় গ্রথিত করেছেন। যা পরবর্তীতে পারস্য কবিদের প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করেছে। ফেরদৌসি তাঁর *শাহনামা* রচনার ক্ষেত্রে আরবি শব্দ পরিহারের চেষ্টা করেছেন। তবে যে ক্ষেত্রে আরবি শব্দের ব্যবহার ছাড়া বিকল্প নাই, শুধু সে ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।[২৫] *শাহনামা* এক বিশ্ববিশ্রুত মহাকাব্য। এর শব্দ ও ছন্দ অনুপম মাধুর্যপূর্ণ। *শাহনামা*র ভাষা প্রাচীন ফারসি। পরবর্তীতে পারস্য কবি রুমি, সা'দি, হাফিজ, জামি, নিযামি প্রমূখ কবি এ ভাষাতেই নিজ নিজ কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন। *শাহনামা*র কাহিনীসমূহ অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে উপস্থাপিত হয়েছে; যা চিত্তকে আকর্ষণ করে।

ফেরদৌসির *শাহনামা* ইরানের এমন একটি বীরত্বপূর্ণ কীর্তি, যা পৃথিবীর সকল জাতির কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের অধিকাংশ ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। এছাড়াও আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন ও ফ্রান্স এবং ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশে বাংলা একাডেমির সহযোগিতায়, মনির উদ্দীন ইউসুফ ফেরদৌসির *শাহনামা*র বঙ্গানুবাদ কাব্যাকারে করেছেন এবং ছয় খণ্ডে ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। তবে তার অনুবাদ করতে ১৭ বছর লেগেছে। *শাহানামা* আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনের প্রেক্ষিতে সর্বাধিক সফল মহাকাব্য।

উপসংহার

শাহনামা মানব ইতিহাসে বিবর্তনের ঐতিহ্যে ভরপুর। যতদিন সভ্যতা ও সমাজ টিকে থাকবে ততদিন পর্যন্ত ফেরদৌসির *শাহনামা* সাহিত্যানুরাগীদের নিকট একটি মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং

ফেরদৌসিও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ফেরদৌসির *শাহনামা* মহাকাব্যে যে পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে এবং তাতে ইরানী জাতীয়তাবাদ, বীরত্বগাঁথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, স্বদেশ প্রেম ও জাতীয়তাবোধের স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে; তা বাংলার যুব সমাজকে তাদের স্বদেশ-প্রেম, জাতীয়তাবাদ, ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান ও মমত্ববোধ জাগ্রত করে একজন সত্যিকারে দেশ প্রেমিক, সৎ, আদর্শবান ও নান্দনিক জীবন দান করতে সহায়তা করবে।

তথ্য নির্দেশ

১. ড. যবিহ উল্লাহ ছফা, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, ১ম খণ্ড (তেহরান: এনতেশারাতে ফেরদৌসী, ১২তম সংস্করণ, ১৩৭১ হি. শামসী), পৃ. ৪৫৯;

২. ড. তাওফিক হা. ছোবহানি, *তারিখে আদাবিয়াত*, ১ম খণ্ড (তেহরান: দানেশগাহে পায়ামে নূর, নবম সংস্করণ, ১৩৭৫ হি. শা.), পৃ. ১৫৩।

৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৩১; *তারিখে আদাবিয়াত এর ইরান*, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৮।

৪. *The New Encyclopaedia Britanica*, Vol-7 (Chicago: Willim Benton, 15th Edition, 1768), p. 233; মির্জা মকবুল বেগ বাদাখশানী, *আদাব নামেয়ে ইরান* (লাহোর: ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সী, ২য় সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ১৪১।

৫. Tanwir Ahmad, *A Short History of Persian Literature* (Calcutta: Naz Publishing Centre, 2nd edition, 1991), p. 74; *THe New Encyclopaedia Britanica*, Vol-7, *op.cit.*, p. 233; নিজামী আরুবী সামারকান্দী, *চাহার মাকালা* (লাইডেন: মুহাম্মদ কাযবীনী কর্তৃক প্রকাশিত, ১২৩১ হি., মা.), পৃ. ৭৪।

৬ দৌলতশাহ সামারকান্দি, *তাবকিরাতুশ শুয়ারা* (অধ্যাপক ব্রাউন কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯০০ খ্রি.), পৃ. ৫০; *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, ১ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫৯।

৭. মোহাম্মদ আলি ফারুগি (সম্পা.), *শাহনামায়ে ফেরদৌসি* (তেহরান: এনতেশারাতে ফেরদৌস, ৭ম সংস্করণ, ১৩৭২ হি. শা.), পৃ. ৮৩৮।

৮. ড. হাফিজুদ্দিন আহমদ কেরমানি (অনূ.), *ফারসি আদাব কি মুখতাছার তারিখ* (লক্ষণৌ: নেজামি প্রেস, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১০৩।

৯. ড. আব্দুল্লাহ আল রাযি, *তারিখে কামেলে ইরান* (তেহরান: চাপখানেয়ে ইকবাল, ১৩৭৩ হি. শা.), পৃ. ২৭৫; E.G. Browne, *A Literary History of Persia*, Vol-2 (Cambridge: At the University Press, 1969), p. 134.

১০. মাওলানা মো. ফজলুর রহমান আশরাফি, *বিশ্বের মুসলিম মণীষীদের কথা*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: আর.ই.এস. পাবলিকেশন্স, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৪১।

১১. *A Short History of Persian Literature, op.cit.,* p. 80.

১২. মোহাম্মদ আলি ফারুগি সম্পা., *শাহনামেয়ে ফেরদৌসি*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫।

১৩. *তদেব*, পৃ. ৮৩৮।

১৪. তদেব, পৃ. ৮৩৫।

১৫. আব্দুস সাত্তার, *ফারসি সাহিত্যের কালক্রম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭), পৃ. ১২।

১৬. মির্জা মকবুল বেগ বাদাখশানি, *আদাব নামেয়ে ইরান* (লাহোর: ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সী, ২য় সংস্করণ), পৃ. ১৪৫।

১৭. *আদাব নামেয়ে ইরান*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৫।

১৮. A J Arberry, *Classical Persian Literature* (London: George Allen and Unwin Ltd, 1958), p. 44.

১৯. *The New Encyclopaedia Britanica*, Vol. 7, *op.cit.*, p. 234.

২০. *আদাব নামেয়ে ইরান*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৬।

২১. *আদাব নামেয়ে ইরান*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৬।

২২. *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, ১ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬০

২৩. *আদাব নামেয়ে ইরান*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৭-১৪৮

২৪. মনির উদ্দিন ইউসুফ (অনূ.), *ফেরদৌসীর শাহনামা*, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ১।

২৫. ড. মুহাম্মদ মুঈন, *ফারহাঙ্গে ফারসি*, ২য় খণ্ড (তেহরান: আমীর কবির, ১৩৭৫ হি. শা.), পৃ. ২১০।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

নূতন ভাবনায় কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্
(Abhijňānaśakuntalam of Kalidāsa in New Concept)

ড.সেরিনা সুলতানা*

Abstract: Very high encomiums are showered upon Kalidasa both by ancient and modern critics. He is unanimously admitted to be the greatest Sanskrit poet and dramatist. Kalidasa can justifiably take his seat along with Shakespeare, Milton, Dante, Goethe, Schiller and other western classical poets. In this article we have tried show his keen appreciation and lofty thought. Kalidasa is the great, the supreme poet of the senses of aesthetic beauty of sensuous emotion. In this work Abhijňānaśakuntalam the king Duṣyanta is unsophisticated by town life or soveriegnty and is able to realize the superiority of true loveliness in sylvan scenes and without artificial aids to loveliness. his love for Śakuntala is not the mere animal possion of an Antony satiated with pleasure though poetic in soul. It dose not wreck family and state. It is at once a fulfilment of individual life, family life and racial life. Here in this article both Śakuntala and Duṣyanta have been portraited in a different sense and angle.

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের প্রারম্ভে ভাস, সৌমিল্ল, কবিপুত্র ইত্যাদি খ্যাতিমান নাট্যকারদের রচনা থাকতে নতুন নাট্যকার কালিদাসের নাটক প্রযোজনা করার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে সূত্রধার নতুন পুরাণের কথা বাদ দিয়ে নাটকের গুণাগুণ বিচারের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বস্তুত পুরাতন হলেই সব কিছু ভাল নয়, আবার নতুন কাব্য বলেই তা দোষের নয়- "পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম্।"[১] *রঘুবংশ* মহাকাব্যের সূচনায় কবি *রঘুবংশের* বিশাল ব্যাপ্তি এবং নিজের অল্পবিষয়া মতিঃ এই দুই পার্থক্যের কথা ভেবে আশঙ্কিত হয়েই বলেছেন- ভেলায় চড়ে দুস্তর সাগর পার হওয়ার ইচ্ছা কিংবা বামন হয়ে উঁচু ডালের ফলের দিকে হাত বাড়ানোর চিন্তা অবাস্তব। পরবর্তীতে কবি বলেছেন পূর্বসূরিদের দিগ্‌দর্শন তাঁর সহায়, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব তাঁকে উৎসাহিত করে তুলেছে-

রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্‌বিভবো'পি সন্।
তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ।[২]

(অল্পমাত্র বাক্‌সম্পত্তি নিয়ে আমি সেই রঘুবংশীয় রাজগণের বংশ কীর্তন করব। তাঁদের গুণরাশি কর্ণগোচর হয়েই আমাকে এরূপ চপলজনের কর্মে প্রবৃত্ত করছে।)

এভাবে ভালো-মন্দ বিচারের অগ্নিপরীক্ষায় দাঁড়াতে প্রস্তুত হয়েই তিনি বিচারশীল পাঠকের উদ্দেশ্যে তাঁর কাব্য নিবেদন করেছেন-

তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্‌ব্যক্তিহেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা ॥[৩]

(ভালমন্দবিচার জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতেরাই যেন আমার এই প্রবন্ধ শোনেন, কারণ, শোনার শুদ্ধি বা অশুদ্ধি আগুনেই পরীক্ষিত হয়।)

দেড় হাজার দু হাজার বছরের সাহিত্যের ইতিহাস প্রমাণ করেছে কালিদাস সাহিত্যের অগ্নিশুদ্ধ হিরণ্ময়ী দ্যুতি অদ্যাবধি অম্লান। প্রাচ্য পাশ্চাত্য সাহিত্যবিশারদ কবি মধুসূদন ঊনবিংশ শতাব্দীতে বলেছেন- কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুলপতি (চতুর্দশপদী কবিতাবলি-৯), কিংবা কালিদাস! ধন্য কবি, কবিকুলপতি (ঐ,

---

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৯৩)। রবীন্দ্রনাথের কালিদাসচর্চা সর্বজনবিদিত। রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় নয়, অন্তর্নিহিত কাব্যসম্পদের গুণে বহু শতাব্দী আগে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশিন এর যুগে আইহোল শিলালেখে (৬৩৪ খ্রিঃ) প্রস্তরনির্মিত জিনমন্দির অশ্মস্থিরম্ জিনবেশ্ম এর কথা বলতে গিয়ে রবিকীর্তির জয় ঘোষণা প্রসঙ্গে কালিদাস ও ভারবির কবিখ্যাতি আদর্শ হিসেবে প্রশংসিত হয়েছিল- "স বিজয়তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্তিঃ ॥" কালিদাসকে নিয়ে নানা গল্পকথা ও কিংবদন্তীর প্রচলন আছে। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন হিসেবে তাঁর নাম বহুল প্রচলিত-

ধন্বন্তরি-ক্ষপণক-অমরসিংহশঙ্কুর্বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥
(ধন্বন্তরি,ক্ষপণক,অমরসিংহ,শঙ্কু,বেতালভট্ট,ঘটকর্পর,কালিদাস,প্রসিদ্ধ বরাহমিহির এবং বররুচি
রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নয়জন রত্ন ছিলেন।)

জ্যোতির্বিদাভরণ(২২/২০) নামক জ্যোতিষগ্রন্থে এই তালিকার নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটির অভ্যন্তর প্রমাণ থেকে মনে হয় এটি সম্ভবত খ্রিঃ পঞ্চদশ শতকের রচনা। তাই কালিদাসের কাল নির্ণয়ে সন্দেহ বিদ্যমান। বৎসভট্টি রচিত মান্দাসোর শিলালেখ(খ্রিঃ ৪৭২-৭৩) কালনির্ণয়ের একটি নির্ভরযোগ্য দলিল। বারোটি ছন্দে চুয়াল্লিশটি শ্লোকে এখানে শীত ও বসন্ত ইত্যাদি ঋতু বর্ণনায় কালিদাসের প্রভাব সুস্পষ্ট, *ঋতুসংহারের* ৫/২ ও ৫/৩ নং শ্লোকের ছায়া মান্দাসোর লেখে পড়েছে। *মেঘদূতের* উত্তরমেঘের প্রথম শ্লোকের[৪] প্রভাব মান্দাসোর লেখের-

চলৎপতাকান্যবলাসনাথান্যত্যর্থশুক্লান্নধিকোন্নতানি।
তড়িল্লতাচিত্রসিতাভ্রকূটতুল্যোপমানানি গৃহাণি যন্ত্র ॥
(সুন্দরী পরিপূর্ণ অবলাকে সান্নিধ্যদান করে যে উড্ডীয়মান পতাকা এমন শুভ্র ও উন্নত সৌধসমূহ
বিদ্যুৎ লতার মত চিত্রিত স্বচ্ছ ও ভ্রূকুটির সঙ্গে তুলনীয়।)

ইত্যাদি শ্লোকে পড়েছে। তাই বলা যায় খ্রিঃ ৪৭২-৭৩ এর মোটামুটি পূর্বে প্রায় খ্রিঃ ৩০০ নাগাদ কালিদাসের আবির্ভাবকাল। *মালবিকাগ্নিমিত্রের* অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞের স্মারক হিসেবে গণ্য করা যায়। *রঘুবংশের* চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের ছায়াপাত সম্ভব। *কুমারসম্ভবের* নামকরণে যুবরাজ কুমারগুপ্ত ও *বিক্রমোর্বশীয়তে* বিক্রমাদিত্যের নামের ইঙ্গিত থাকা অসম্ভব মনে হয় না। বিক্রমাদিত্যের শাসনকাল খ্রিঃ ৩৭০-৪১৩ হলে কালিদাসের কালনির্ণয়ে অস্পষ্টতা থাকার কথা নয়। কালিদাসের প্রিয় নগরী উজ্জয়িনী এই চন্দ্রগুপ্তের আমলেই গুপ্তশাসনব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

মেঘদূতের "দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্"[৫] পঙ্ক্তিতে বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙ্নাগ সম্বন্ধে কবির তির্যক কটাক্ষ নিয়ে *মেঘদূতের* কবি তাঁর কাব্যে বৌদ্ধ দার্শনিকের প্রতি অসহিষ্ণুতাসূচক কটূক্তি সন্নিবেশ করবেন ভাবতে ভালো লাগে না। দিঙ্নাগ যে স্কন্দগুপ্তের সমকালীন তা প্রমাণিত হয় না। দিঙ্নাগকে ৪০০ খ্রিঃ পরবর্তী বলার পক্ষে যুক্তি নেই। অধ্যাপক কীথের মতে- "It is difficult to dissociate Kalidasa from the great moments of the Gupta power."

এলাহাবাদ অঞ্চলে ভিটা গ্রামে প্রাপ্ত একটি মৃত্তিকা ফলক কালিদাসের *শকুন্তলা* নাটকের উৎস অবলম্বনে রচিত বলে মনে করা হয়। কালিদাসের রচনার ভাষা, শৈলী, সমাজ, সংস্কৃতি, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রমাণ থেকে খ্রিঃ পূ. ১ম শতাব্দীতে তাঁর আবির্ভাব কাল ধরা হয়। কালিদাসে অ-পাণিনীয় প্রয়োগ অনেক আছে। বৈদিক শব্দ ব্যবহারও বিরল নয়। *শকুন্তলায়* "অমী বেদিং পরিতঃ ক্লৃপ্তধিষ্ণ্যাঃ সমিদ্বন্তঃ প্রান্তসংস্তীর্ণদর্ভাঃ"[৬] ইত্যাদি শ্লোকে কবি বৈদিক ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

অনেকে কালিদাসকে শুঙ্গযুগের কবি মনে করেন। খ্রিঃ পূ. প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত কয়েকশত বছরের কোন এক সময়ে কালিদাসের কাল। এ নিয়ে বিবাদের অন্ত নেই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর ক্ষণিকার 'সেকাল' কবিতায় বলেছেন-

"হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।
পণ্ডিতেরা তর্ক করে লয়ে তারিখ সাল।"

কালিদাসের কাল নির্ণয়ে এ.বি. কীথের অভিমত হচ্ছে- "Kalidasa then lived before A.D. 472 and probably at a considerable distance, so that to place him about A.D.400."[৭]

দেশ : কালিদাসের জন্মস্থান নির্ণয় করাও কঠিন। রঘুর দিগ্বিজয় ও *মেঘদূতের* মেঘের যাত্রাপথ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় আসমুদ্র হিমাচল ভারত উপমহাদেশের ভূগোল কবির পরিচিত। উজ্জয়িনীর প্রতি কবিমনে বিশেষ অনুরাগ ছিল। সেখানকার সমুন্নত সৌধগুলোর প্রশংসায়-

সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
বিদুৎদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতো'সি ॥[৮]

(উজ্জয়িনীর সৌধক্রোড়ের প্রণয়ে বিমুখ হয়ো না। সেখানকার পৌরাঙ্গনাদের বিদ্যুতের মতো প্রকাশিত চকিত চঞ্চল নয়ন কটাক্ষের দ্বারা যদি তোমার মনের আনন্দই না হয়,তাহলে তুমি বঞ্চিত হবে।)

অবন্তীরাজ্যের সমৃদ্ধ বিশাল এই নগরী স্বর্গসুখভোগের শেষ পর্যায়ে পুণ্যবানদের বাসভূমি-

স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাম্ ।
শেষৈঃ পূণ্যৈর্হৃতমিব মিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্ ॥[৯]

(বহু পূণ্যফলে যারা স্বর্গে গিয়েছিলেন তাঁরা সবটুকু পূণ্যক্ষয় হওয়ার আগেই ফিরে এসেছেন পৃথিবীতে এবং আসবার সময় স্বর্গের সৌন্দর্যময় এক অংশ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।)

এবং স্বর্গখণ্ড বিশেষ বলে কবির মনে হয়েছিল। বহুদিনের প্রিয় বাসস্থান নিয়েই এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সম্ভব।

ধর্মবিশ্বাস : কালিদাসের নামের মধ্যে কবির ধর্মবিশ্বাস সন্ধান করা বৃথা। বিভিন্ন কাব্যে পার্বতী পরমেশ্বর ও নীললোহিত শিবের বর্ণনা রয়েছে। রঘুবংশীয় রাজাদের *মনুস্মৃতির* অনুসরণের উল্লেখ থেকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাশীল কবিচিত্তের পরিচয় মেলে। কালিদাস সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত। ছোটবড় একচল্লিশটি রচনা কালিদাসের নামে প্রচলিত। তার মধ্যে *মালবিকাগ্নিমিত্র*, *বিক্রমোর্বশীয়* ও *অভিজ্ঞানশকুন্তল* এই তিনটি নাট্যগ্রন্থ, *রঘুবংশ* ও *কুমারসম্ভব* এই দুই মহাকাব্য এবং *মেঘদূত* নামে খণ্ডকাব্য কালিদাসের সৃষ্টি।

কালিদাস নামে তিনজন কবির নাম শোনা যায়। কালিদাস এক এবং অদ্বিতীয়। তার প্রমাণ রাজশেখর রচিত নিচের শ্লোকটি-

একো'পি জীয়তে হন্ত কালিদাসো ন কেনচিৎ।
শৃঙ্গারে ললিতোদ্গারে কালিদাসত্রয়ী কিমু ॥[১০]

(কোন ব্যক্তি কর্তৃক কালিদাস নিহত বা জীবিত হন না। শৃঙ্গার এবং ললিত বর্ণনায় তিনজন কালিদাস কিভাবে হন? কারণ কালিদাস এক ও অদ্বিতীয়।)

আমাদের আলোচ্য বিষয় *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকে কিছু নূতন দৃষ্টিভঙ্গি। এ নাটক কালিদাসের সর্বস্ব। তাঁর পরিণত প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে এ নাটক পরিগণিত। *মহাভারতের* আদিপর্বের ৭০-৭৪ সংখ্যক অধ্যায়ে বর্ণিত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যধর্মী কাহিনি কবির প্রতিভাস্পর্শে একটি ঘটনাবহুল নাটকীয় ইতিবৃত্তে পরিণত হয়েছে। *মহাভারতে* দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে তাঁর গর্ভজাত পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিবাহ করেন। মেনকার কুলটা চরিত্র, বিশ্বামিত্রের কামুক আচরণ ইত্যাদি কথা বলে শকুন্তলাকে কলঙ্ক দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেন রাজা দুষ্যন্ত। পরবর্তীতে দৈববাণী শুনে রাজা রাজসভায় জানান

শকুন্তলার সঙ্গে তিনি বিতণ্ডা করেছিলেন মাত্র। শেষে পত্নীর কাছে ক্ষমা চেয়ে তিনি তাঁকে সন্তুষ্ট করেন ও পুত্রকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করেন। জনমেজয়কে গল্প বলার ছলে বৈশম্পায়নের মুখে *মহাভারতের* এই কাহিনি কালিদাসের নাটকের উৎস।

অভিজ্ঞানশকুন্তলে রাজা দুষ্যন্ত যেসময় তপোবনে মৃগয়ায় এসেছিলেন, সেসময় কণ্বমুনি আশ্রমে অনুপস্থিত ছিলেন। তাই নাটকে দুষ্যন্ত শকুন্তলার অনুরাগ, প্রেম ও গান্ধর্ব বিবাহের পরিস্থিতির রচনা সম্ভব হয়েছে। কালিদাসে জনৈক বৈখানসের সঙ্গে দুষ্যন্তের প্রথম দেখা হয় এবং তাঁর কথা শুনে তাঁরই আহ্বানে তিনি আশ্রমে শকুন্তলার অতিথি হয়ে যান। শকুন্তলার মুখে জন্মবৃত্তান্তের কথা শুনে দুষ্যন্ত সেই বিবাহযোগ্যা সুন্দরীকে গান্ধর্ববিবাহের মাধ্যমে পত্নী হিসেবে পেতে চান। দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার কল্পনা করে কালিদাস তার মধ্যে ভীরু শকুন্তলাকে উপস্থাপন করেছেন। অতিথিসৎকারে অবহেলার অপরাধে কালিদাসের শকুন্তলার উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। সে এমন অভিশাপ যে দুষ্যন্ত ভাবনায় ভাবিত শকুন্তলাকে দুষ্যন্ত চিনতেই পারেনি।[১১] *মহাভারতের* বাক্‌পটু শাস্ত্রজ্ঞ তাপসী শকুন্তলার পাশে নাটকে সখিদের সঙ্গে লজ্জানম্র, নবযৌবনা আশ্রমকন্যার ভীরু প্রেমিকা মূর্তিটি সানন্দ অভিনন্দনের যোগ্য। সেখানে পুত্রকে যৌবরাজ্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করা কালিদাসের পক্ষে অসম্ভব এবং অসঙ্গত, অরুচিকরও বটে। শর্তসাপেক্ষ মিলন হলে সে প্রেম সপ্তম অঙ্কের স্বর্গীয় তপোবনে চূড়ান্ত সার্থকতায় পৌঁছাত না। কালিদাসের হাতে *মহাভারতের* শকুন্তলার নবজন্ম হয়েছে।

তপোবনে প্রবেশের সময় দুষ্যন্ত সুরম্য নিসর্গদৃশ্য দেখেছিলেন। কালিদাস প্রথম অঙ্কে গাছপালা, লতাপাতা ও আরণ্যক প্রাণিদের সঙ্গে আশ্রমবাসিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিয়েছেন। আশ্রমকন্যা শকুন্তলার সঙ্গে আশ্রমপ্রকৃতির মর্মস্পর্শী বিচ্ছেদের চিত্রাঙ্কণ করেছেন। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার পূর্বে সাজসজ্জার উপকরণ আশ্রমের গাছপালা থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। আশ্রম থেকে বিদায় নেয়ার সময় শকুন্তলার সামনে যেন আর পা সরে না, আশ্রম প্রকৃতি শোকে মুহ্যমান। হরিণী ঘাস মুখে নিয়ে উন্মনা হয়ে আছে, ময়ূরী নাঁচছে না, লতাগুলো পাতা ঝরার ছলে অশ্রু বিসর্জন করছে।[১২] প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের এমন আত্মিক পরিবেশের ছবি বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। চেতন সত্তা প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক পাতানো।

পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাতা। *মহাভারতে* শকুন্তলা বিচক্ষণ বাগ্‌ভঙ্গিতে নিজের দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবিচল। কালিদাসের শকুন্তলা লজ্জানম্র ও ভীরু কিন্তু এই অঙ্কে রাজার কটূক্তি ও অপমানে তার নারীসত্তা জাগ্রত হয়ে উঠেছে। প্রবল রাজশক্তিকে তিনি অনার্য বলে ধিক্কার দিয়েছেন। *মহাভারতে* দৈববাণী শকুন্তলাকে সাহায্য করেছিল। কালিদাসের শকুন্তলায় শার্ঙ্গরব ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে, শারদ্বত শান্তবচনে, গৌতমী মাতৃসুলভ ধৈর্যে রাজাকে সব কিছু জানিয়েও সুফল পাননি। *মহাভারতে* দুষ্যন্ত সব জেনেও শকুন্তলার সঙ্গে তর্কবিতর্ক চালিয়েছেন। কিন্তু কালিদাস দুর্বাসার অভিশাপের মধ্য দিয়ে দুষ্যন্তের মনে বিস্মৃতির প্রলেপ এনে দিয়েছেন। দুষ্যন্তের দেয়া আংটিটি ছিল বিস্মৃতি কাটানোর পথ। তীব্র কটূক্তি ও অপমানে ভীতসন্ত্রস্ত্রা শকুন্তলার দিশেহারা অবস্থা। শার্ঙ্গরব রাজসভাতেই তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। *মহাভারতে* দৈববাণী শোনার পর সপুত্রক শকুন্তলাকে রাজা দুষ্যন্ত বরণ করে নিয়েছিলেন। কালিদাসের নাটকে রাজসভার দৃশ্য শেষ হয়েছে অলৌকিকভাবে।

ষষ্ঠ অঙ্কের শুরুতে জেলের বৃত্তান্ত। মাছের পেট থেকে রাজার নামলেখা আংটি পেয়ে জেলেটি রক্ষিদের হাতে ধরা পড়ে। গর্ভভারালসা পত্নীকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন এই অপরাধবোধে রাজা দুঃখানলে দগ্ধ হয়েছেন। এর পর ইন্দ্রের পক্ষ থেকে অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার ডাক পেয়ে তাকে যেতে হয়। রাজ্যে ফেরার পথে মহামুনি মারীচের আশ্রমে পুত্র ও পত্নী উভয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্যন্তের মিলন যেন রাহুগ্রাসের অবসানে চাঁদ আর রোহিণীর মিলন।[১৩] পত্নী ও পুত্রসহ দুষ্যন্ত মারীচি ও অদিতির আশীর্বাদ নিয়ে রুক্ষ তপস্যাভূমি থেকে স্বদেশযাত্রা করেন। রাজধানী থেকে কণ্বতপোবন ও মারীচতপোবন হয়ে

রাজধানী এভাবে যে বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ হলো, তাতে মৃগয়াবিলাসী রমণীমোহন দুষ্যন্ত তাপসী শকুন্তলা ও পুত্রকে নিয়ে নবজীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

এভাবেই শকুন্তলার সঙ্গে প্রথম মিলনের মতো শকুন্তলা দুষ্যন্তের দ্বিতীয় মিলনও আরেক তপোবনে। প্রথম মিলনে ছিল যৌবনের প্রবল উন্মাদনা। শকুন্তলা তাঁর সমস্ত জীবন ও কর্তব্য প্রেমের কাছে সমর্পণ করেছিলেন। শুধু মিলন বিচ্ছেদ পুনরায় মিলন এ নাটকের একমাত্র বিষয় নয়- প্রেম ও বিরহ, কর্তব্য ও আত্মকেন্দ্রিকতা, স্মৃতি ও বিস্মৃতির তীব্র টানাপোড়েনের সঙ্গে প্রকৃতির ও মানবমনের আত্মিক যোগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এ নাটকে। প্রকৃতির মানবায়ন এক অখণ্ড বিশ্ববোধের নিশ্চিত প্রকাশ। পিতৃসম ঋষিকণ্ব, মাতৃসমা তাপসী গৌতমী, সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, তপোবন ও তরুরাজি এবং তপোবনের পশুপাখিদের ছেড়ে শকুন্তলাকে যেতে হয় এক অজানা ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে- এমন দৃশ্য ভারতীয় সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ। চিত্রকর কালিদাস। অতঃপর সেই নাটকীয় দৃশ্য - দুষ্যন্ত শকুন্তলার কথোপকথন। কাব্যে ও নাটকে, সংঘাতে, আবেগে ও আখ্যানে প্রণীত হয়েছে কালিদাসের শ্রেষ্ঠ রচনা *শকুন্তলা*। রাজধানীর সাধারণ মানুষ ধীবর, দৌবারিক, ঋষি, রাজা, বিদূষক সব মিলিয়ে *শকুন্তলায়* বৃহৎ মানবসমাজের বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। *মহাভারত* থেকে কালিদাসের নাটকে ইতিবৃত্তের এই উত্তরণ বিশেষভাবে সুধিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

নূতন আঙ্গিকে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ এর ভাবনা

অভিশপ্ত রাজা দুষ্যন্ত : দুর্বাসার শাপে অভিশপ্ত শকুন্তলা। প্রিয়তম রাজা দুষ্যন্ত তাঁকে চিরতরে ভুলে যাবেন। এ যেন নিদারুণ অভিশাপ। সখী প্রিয়ংবদার ভাষায় এ হচ্ছে ‘নব মল্লিকায় উষ্ণবারি সেচন’। ভারতীয় আদর্শ অনুসারে সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে পতির চিন্তায় ব্যাকুল থাকা পতিব্রতা নারীর সাধারণ গুণ। কিন্তু শকুন্তলা এ কারণেই দেবপূজায় অবহেলা করেছেন, সোদরোপম বৃক্ষদের জলদানে বঞ্চিত করেছেন, অতিথি অভ্যাগতদের আহ্বানে কর্ণপাত করেননি- এই যে উপেক্ষা অবহেলা এগুলোই হলো তাঁর কর্তব্যচ্যুতি। এছাড়াও পিতার আদেশ অবমাননা এবং ভারতীয় গার্হস্থ্য ধর্মের স্খলন। অতএব শাস্তি অবশ্যই প্রাপ্য। ঋষি দুর্বাসা এ কারণেই শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়েছেন।

রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার রূপমোহে আকৃষ্ট হয়েই শকুন্তলার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন- “সৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি মে”[১৪] এবং তাঁকে বিবাহ করে স্ত্রীর মর্যাদা দান করতেও চেয়েছিলেন। সখিদের কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন-

পরিগ্রহবহুত্বে’পি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্র-বসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্ ॥[১৫]

(আমার অনেক পত্নী থাকলেও দুটি জিনিস আমার বংশের গৌরবের হেতু। তার মধ্যে একটি হলো সমুদ্রবসনা এই পৃথিবী আর অন্যটি হল তোমাদের এই সখী।)

শকুন্তলা ক্ষত্রিয়ের বিবাহযোগ্যা। তাই তাঁকে বিয়ে করে জনসমাজে স্বীকৃতি দেবেন বলেই নিজ নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক শকুন্তলার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

রাজার উপরও অভিশাপের প্রভাব পড়েছিল। রাজা তো কর্তব্যবিস্মৃত ছিলেন না। ঋষিকুমারদের আহ্বানে সারথি দ্বিতীয় হয়ে ‘রাক্ষস বিতাড়ন’ করে যজ্ঞসমাধায় সাহায্য করেছেন। মাতৃকর্তব্য পালনে অনুজোপম বিদূষককে স্বীয় প্রতিনিধি করে রাজকীয় মর্যাদায় সসৈন্য রাজধানীতে প্রেরণ করেছেন। শকুন্তলাকে বিবাহ করে রাজকার্যহেতু স্বরাজ্যে ফিরে গিয়েছেন। তাঁর অপরাধ হলো গোপনীয়তা। শিকার করতে বেরিয়েছেন অথচ ভুলক্রমে হরিণের পশ্চাদ্ধাবন করেছেন। বিনা আড়ম্বরে বৈখানসের আমন্ত্রণে তপোবনে প্রবেশ করেছেন।

তপোবনে প্রবেশের মুখেই অন্তরাল থেকে শকুন্তলা ও দুই সখীর মধুর বিশ্রম্ভালাপ শুনে অন্তরাল থেকেই শকুন্তলার রূপযৌবনে আকৃষ্ট হলেন। আত্মগোপন করেছিলেন বলেই শকুন্তলার দেহসৌন্দর্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি এত গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। সরাসরি উপস্থিত হলে শকুন্তলা ও তাঁর দুই সখী অতিথিজনোচিত

সম্ভাষণ দ্বারা তাঁকে আপ্যায়িত করতেন। প্রিয় বন্ধু বিদূষককে শকুন্তলা সম্পর্কে সামান্য আভাস দিয়েই বিদূষকের রাজধানী প্রস্থানকালে বললেন- "ন খলু সত্যমেব তাপসকন্যকায়াং মমাভিলাষঃ"[১৬] এবং এটি "পরিহাসবিজল্পিতং সখে পরমার্থেণ ন গৃহ্যতাং বচঃ।"[১৭] অর্থাৎ বাস্তবিকই তাপসদুহিতার প্রতি আমার কোনো অভিলাষ নেই এবং পরিহাস করে যা বলেছি তা সত্য বলে মনে করো না- এমন কথাও বলে দিলেন। সরল বিদূষকও 'তাই বটে' বলে রাজাকে বিশ্বাস করলেন। রাজা যদি বিদূষককে কিছু গোপন না করতেন তাহলে রাজধানীতে দুষ্যন্তের প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শকুন্তলার সংবাদ নিতেন এবং নিজেই উদ্যোগ নিয়ে প্রিয়সখীকে আনতে যেতেন। তাহলে অনসূয়া এত চিন্তা করতেন না শকুন্তলাও এত বিহ্বলচিত্তে চিন্তাগ্রস্ত হতেন না এবং শাপপ্রাপ্তও হতেন না। শাপগ্রস্ত হলেও শকুন্তলার আংটি রাজার কাছে নিয়ে যাওয়ার লোকের অভাব হতো না। অনসূয়া এরকম লোকের কথাই চিন্তা করেছিলেন "তৎ ইতঃ অভিজ্ঞানমঙ্গুরীয়কম্ অস্মৈ বিসৃজামঃ। দুঃখশীলে তপস্বিজনে কঃ অভ্যর্থতাম্"[১৮] অর্থাৎ আচ্ছা এখান থেকে সেই নামাঙ্কিত অঙ্গুরীটি পাঠালে তো হয়, কিন্তু কষ্টময় তপস্বিদের কাকেই বা অনুরোধ করি। তখন বিদূষক যদি অঙ্গুরীটি বা শকুন্তলাকে রাজধানী নিয়ে যেতেন, রাজা তাহলে শকুন্তলাকে অস্বীকার করতে পারতেন না, মার কাছে শকুন্তলাকে গোপন না করলে হয়ত মা অন্তঃপুরে শকুন্তলাকে আনার ব্যবস্থা করতে পারতেন। রাজার গোপনীয়তার জন্য কোনো কিছুই সম্ভবপর হয়নি।

অন্তঃপুরবাসী রমণীদের কাছেও নৃপতি দুষ্যন্ত সব কিছু গোপন করেছেন। দেবী বসুমতী ও দেবী হংসপদিকা সম্পর্কে আগে থেকেই অবগত ছিলাম আমরা। তাই অন্তঃপুরে অন্য এক রাণীর আগমনে উদ্যানলতাস্বরূপ রাজধানীর শিক্ষিতা রমণীরা যে জানবেন এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সারারাজ্যে দুষ্যন্ত শকুন্তলা সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে। রাণীরা শকুন্তলা প্রসঙ্গ জানলে *মালবিকাগ্নিমিত্র* নাটকের ধারিণীর মতো রাজাকে নূতন নারীরত্ন লাভে সহায়তা করতে পারতেন প্রধানা মহিষী দেবী বসুমতী। দুর্বাসার শাপে রাজাও অভিশপ্ত। গোপন প্রেম, গোপন বিবাহ, আত্মবিস্মৃত রাজার অস্বীকারের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলেও গৌতমী শার্ঙ্গরবের বেশে দিয়েছেন ধিক্কার। সরলা শকুন্তলা মুখে মধু হৃদয়ে বিষ বলে তিরস্কার করেছেন। এরপর শকুন্তলার অন্তর্ধান। আংটি পাওয়ার পর রাজার শাপের অবসান। শকুন্তলা বিতাড়নজনিত কাজের জন্য রাজা এখন অনুতপ্ত। মানসিক অশান্তিতে বিচলিত, রাজার পাপের শাস্তি এইখানেই। এই পাপের মূলে ছিল গোপনীয়তা। কবির ভাষায় বলা যায়-

মনের গোপন কোণে লুকানো যে প্রেম
সে ত প্রেম নয়, সে যে পাপ-
এরই ফল হল নিয়তির অভিশাপ।

ভুলের স্বর্গ : সবটাই ভ্রান্তিতে ভরা। প্রথমেই দেখি সূত্রধার নটীকে বলছেন- আর্যে যদি আপনার বেশবিধান সমাপ্ত হয়ে থাকে তবে এদিকে আসুন। কারণ আজকের এই সভাতে কালিদাস বিরচিত *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* একখানি নতুন নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে সমাগত সভ্যবৃন্দকে সেবা করতে হবে। তারপর সূত্রধার সেই সভার কর্ণের পরিতৃপ্তির জন্য নটীকে আদেশ দিলেন- "তদিদমেব তাবদচিরপ্রবৃত্তমুপভোগক্ষমং গ্রীষ্মসময়মধিকৃত্য গীয়তাম্"[১৯] সঙ্গীতশেষে সঙ্গীতমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে সূত্রধার কোন নাটক অভিনীত হবে তাই বিস্মৃত হয়েছেন। এখানেও সেই বিস্মৃতি ও ভুল। তখন নটী বলেন *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নামে অপূর্ব নাটকের অভিনয় হবে "ননু আর্যমিশ্রৈঃ প্রথমমেব আজ্ঞপ্তম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলং নাম অপূর্বং নাটকং প্রয়োগে অধিক্রিয়তাম্" ইতি।[২০]

নাটকের প্রথমেই সূত্রধার যখন বিস্মরণ দিয়ে অভিনয়ের সূত্রপাত করেছেন তখন তাঁর নাটকের নায়ক নায়িকারা যে একে একে ভুলের পথে অগ্রসর হবেন এ আর বিচিত্র কি? নাটকের পরিসমাপ্তিতে অবশ্য ভুলের মাশুল দিয়েও পরম শুভসংবাদ- "প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ।"[২১]দেখা যাচ্ছে সূত্রধার তাঁর ভুল স্বীকার করেছেন কিন্তু নাটকের নায়কও ভুলক্রমে আশ্রমমৃগের পশ্চাৎ অনুসরণ করেছেন।

নায়ক দুষ্যন্ত বন্য পশু শিকারে রাজধানীর বাইরে এসেছেন। বনের বাঘ সিংহ বরাহ ইত্যাদি পশু স্বীকার করে দিনের পর দিন শূল্যপক্ব মাংস ভক্ষণ করেছেন। দ্বিতীয় অংকে বিদূষক বড়ই ক্ষোভের সঙ্গে একথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন- "অয়ং মৃগঃ অয়ং বরাহঃ অয়ং শার্দুল ইতি মধ্যাহ্নে অপি গ্রীষ্মবিরলপাদপচ্ছায়াসু বনরাজিষু আহিণ্ড্যতে। পত্রসংকরকষায়াণি গিরিনদী জলানি পীয়ন্তে। অনিয়তবেলং শূল্যমাংসভূয়িষ্ঠম্ আহারো ভুজ্যতে।"[২২] ('এইযে হরিণ', 'এইযে শুয়োর', 'এইযে বাঘ',- এই করে দুপুর-বেলাতেও গ্রীষ্মকালের ছায়াহীন বনের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুঠে বেড়াতে হচ্ছে। গাছের পাতা পচে লাল হওয়া তেতো পাহাড়ি নদীর জল খেতে হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ে খাবার জোটে না- আর যা জোটে অধিকাংশ সময়েই তা হয় শূলে ঝলসানো মাংস।) বিদূষকের মুখ থেকেই আমরা জেনেছি রাজা শিকারের পিছনে ছুটছেন। ভুল করেই আশ্রমমৃগের পিছনে ধাবিত হয়েছেন।

আশ্রমে প্রবেশের মুখেই বাধাপ্রাপ্ত হয়ে জেনেছেন কুলপতি কণ্ব বর্তমানে আশ্রমে নেই। রাজা কন্যার মাধ্যমেই কুলপতিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসবেন বলে শকুন্তলার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে কুলপতির কথা ভুলে গেলেন। পরিবর্তে শকুন্তলার প্রেমে পড়ে গেলেন। এভাবে রাজা দ্বিতীয় ভুলের পথে পা বাড়ালেন। শকুন্তলাও পরাধীন, রাজা দ্বিধাগ্রস্ত, এমন সময় ঋষি বালকেরা রাজাকে আশ্রমে থেকে কয়েকদিনের জন্য রাক্ষস বিতাড়ন করে যজ্ঞকার্য সম্পাদনের জন্য বললেন। রাজা আবার ভুলের ফাঁদে পা বাড়ালেন কার্যাবসরে শকুন্তলার খোঁজ নিতে গেলেন। এরপর রাজা স্বয়ং উপস্থিত হয়ে শকুন্তলার মদনপীড়িত অবস্থা দেখে সখিদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে গোপনে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করলেন। এই যে আশ্রমের কাউকে না জানিয়ে রাজার গোপন পরিণয় এবং তা থেকে উদ্ভূত সমস্যা-সন্তানের জন্মদান এ কার্যটি সম্পূর্ণই রাজার ভুলের পরিণাম।

শকুন্তলা নিজের অবিবেচক কাজের জন্যই হোক অথবা সদ্য বিরহের জন্যই হোক এতদূর অন্যমনস্ক ছিলেন যে, দুর্বাসা ঋষির আহ্বান শুনতে পেলেন না। ভুলের পরিণামই অভিশাপ। শকুন্তলা যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন সেই পরিবেশের কোন ব্যক্তিকেই শকুন্তলার পছন্দ করা উচিত ছিল। শকুন্তলার সখীরা কণ্বভগিনি গৌতমীকে শকুন্তলার মানসিক উদ্বেগজনিত অসুস্থতার কারণ জানালে তিনি স্নেহবশে তা সমর্থন করতেন। এখানেও সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি। কারণ গৌতমী পরে ক্ষোভের সঙ্গে রাজাকে রাজসভায় বলেছেন-

নাপেক্ষিতো গুরুজনঃ অনয়া, ন ত্বয়াপি পৃষ্টো বন্ধুঃ।
একৈকমেবং চরিতে ভণামি কিমেকৈকম্ ॥[২৩]

(এই শকুন্তলাও গুরুজনদের মতের অপেক্ষা রাখেনি আর আপনিও আপনার আত্মীয়স্বজনকে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি। আপনারা দুজনেই এরকম স্বাধীনভাবে সব করেছেন; সুতরাং এক্ষেত্রে একজনের জন্য আরেকজনকে কি আর বলব ?)

দুই সখী দুর্বাসার অভিশাপের কথা জেনেও বিদায়কালেও শাপ খণ্ডনের উপায় যে অঙ্গুরী সেটিকে সযত্নে রক্ষা করার জন্য শকুন্তলাকে সতর্ক করে দিলেন না। এটিও হলো সখিদের মারাত্মক ভুল। আংটি ও অভিশাপের বিষয়টি পিতা কণ্বকে জানালে কণ্বমুনিই কোনো শিষ্য মারফত আংটিটি রাজার কাছে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে পারতেন।

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময়ও মাতা গৌতমী, শাঙ্গরব বা শারদ্বতকেও দুর্বাসার শাপ ও তা খণ্ডনের উপায় স্বরূপ আংটিটির কথা জানাতেন তবে তারা সেটিকে সযত্নে রক্ষা করে দুষ্যন্তকে দিতে পারতেন। এইভাবে দেখা যায় সখীরা একের পর এক ভুল করেছেন আর তার মাশুল দিতে হয়েছে শকুন্তলাকে।

সমস্ত নদী যেমন সমুদ্রে এসে মেশে তেমনি সব ভুল-ত্রুটি এসে একত্রিত হলো শকুন্তলা নাটকের পঞ্চম অংকে। হংসপদিকার গান দিয়ে তার সূচনা। রাণীর অভিযোগ রাজা তাঁর সকৃৎ প্রণয়িনীকে ভুলে গিয়েছেন। এদিকে কণ্বমুনির শিষ্যদ্বয় এসে উপস্থিত। শাপগ্রস্ত রাজা শকুন্তলাকে যথারীতি ভুলে গিয়েছেন। সকল ভুলের সার হলো শকুন্তলা পরস্ত্রী বলে গণ্য হলেন। ভুলের শেকড়গুলো এখানে এসে জট পাকিয়ে গেল। মহাকবি

অবশ্য জট খুলতে শুরু করেছেন আংটির পুনরুদ্ধার দিয়ে। সবশেষে দেবপিতা মারীচ সকল ভুলের খণ্ডন করে শ্রদ্ধা, বিত্ত এবং বিধিস্বরূপ যথাক্রমে শকুন্তলা, ভরত ও দুষ্যন্তের মহামিলন সাধনা করেছেন।

কাব্যে অপেক্ষিতা : এই দৃশ্যকাব্যে অনসূয়া প্রিয়ংবদা হলেন উল্লেখযোগ্য দুই তপস্বিনী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষিতা এই দুই নারীর চরিত্রকে তাঁর প্রবন্ধে উপস্থাপিত করেছেন। এদের উপস্থিতি নাটকের প্রথম অঙ্কে এবং বিসর্জন চতুর্থ অঙ্কে। উভয় সখীই নায়িকা শকুন্তলার পার্শ্বচরিত্ররূপে উপস্থাপিত এবং মুখ্যচরিত্রকে ফুটিয়ে তোলাই ছিল তাদের প্রথম এবং একমাত্র কাজ। নাটকের মুখ্য চরিত্র বা নায়িকা হলেও শকুন্তলা কিন্তু ঘটনার মূল প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করেননি বরং তিনি সেই প্রবাহমান স্রোতে ভাসমান। ঘটনার প্রকৃত নিয়ামক হলেন তার দুই সখী অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা। তারা কাব্যের উপেক্ষিতা তো ননই বরং তাদের বিশেষিত করা উচিত কাব্যের অপেক্ষিতা বলে।

অনসূয়া যখন শকুন্তলাকে নবমল্লিকা লতাকে দেখিয়ে বলেন, দেখ বনজ্যোৎস্না কেমন সহকার বৃক্ষটিকে স্বয়ম্বর রূপে গ্রহণ করেছে, শকুন্তলা তা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকেন। তখন প্রিয়ংবদা রসিকতা করে বলে ওঠেন- অনসূয়া জানিস শকুন্তলা কেন এত আগ্রহ ভরে লতাটিকে দেখছে ? তার কারণ হল- "যথা বনজ্যোৎস্না অনুরূপেণ পাদপেন সঙ্গতা অপি নাম এবমহমপি আত্মনঃ অনুরূপং বরং লভেয় ইতি।" অর্থাৎ বনজ্যোৎস্না যেমন অনুরূপ বৃক্ষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে আমিও যেন সেরূপ নিজের অনুরূপ বর লাভ করি। এই যে প্রিয়ংবদার রসিকতা তা সম্পূর্ণই শকুন্তলাকে সমাগত যৌবন সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে এবং মনের গোপন কোণে বিবাহের ইচ্ছাকে জাগ্রত করেছে। শকুন্তলার যৌবনের প্রতি ইঙ্গিত, অনুরূপ বরলাভের জন্য কটাক্ষ, অধিকন্তু শকুন্তলার জগদ্দুর্লভ রূপ রাজার মন থেকে ঋষি কণ্বের প্রতি ভক্তিভাব ভুলিয়ে দিয়ে শকুন্তলাকে পাওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত করে তুলেছে। উভয়ের চারচক্ষুর মিলনে কিন্তু প্রিয়ংবদার রসিকতাই কাজ করেছে। দুই সখীই শকুন্তলাকে দুষ্যন্তের দিকে অগ্রসর করে দিয়েছে। তারা বলেছেন ওলো শকুন্তলে আজ যদি পিতা আশ্রমে উপস্থিত থাকতেন তাহলে তার জীবনের সর্বস্ব দিয়েও এই বিশিষ্ট অতিথিকে চরিতার্থ করতেন।

নাগরিক রাজা শকুন্তলার আচার আচরণে বুঝে নিয়েছেন শকুন্তলাও রাজার প্রতি আকৃষ্টা। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নায়ক নায়িকার মন দুটোকে উভয়ের প্রতি উন্মুখী করে তুলতে সাহায্য করেছে। এর ফলে ঘটনার স্রোত দ্রুত বাঁক নিতে শুরু করেছে। সখিদের রসালাপে রাজা নিজ কাজ বিস্মৃত হয়ে তপোবনকে উপবনে পরিণত করেছিলেন।

সুচতুর প্রিয়ংবদা রাজার প্রকৃত পরিচয় জেনে নিয়েছেন রাজাও যে প্রথম থেকেই শকুন্তলার প্রতি আকৃষ্ট তাও বুঝে নিয়েছেন। শকুন্তলার প্রকৃত অবস্থা জেনে তারা গোপনে রাজার কাছে প্রেমপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। রাজার কাছে অনসূয়া শকুন্তলার পত্নীত্বের স্বীকৃতি নিলে উভয় সখী তাদের গান্ধর্ব বিবাহের ব্যবস্থা করে নিজেরা অপসৃতা হন। এখানেও ঘটনার স্রোত সখীদ্বয়ই নিয়ন্ত্রণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন "সখীরা তাদের প্রিয়তম সখীর হৃদয়ের মধ্যে অবতরণ করিয়া" অর্থাৎ শকুন্তলার প্রেমের ঘটনা চাক্ষুষ করে "তাহারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছে, যাহা জানিত না তাহা জানিয়েছে" এ বাক্যটি কি সত্যই স্বীকার করে নেয়া যায় ? পক্ষান্তরে অন্য দিকটি অত্যন্ত রূঢ় সত্য ? প্রকৃতপক্ষে অনসূয়া প্রিয়ম্বদা ইতিহাস নিবন্ধাদি পাঠ করে নর নারীর প্রেম সম্পর্কিত বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা শকুন্তলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। সরলা শকুন্তলাকে প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে এবং দুষ্যন্তকে তার প্রতি প্রেমে সহায়তা করে উভয়ের মিলন সাধন করেছেন। এজন্যই মনে হয় অত্যধিক স্নেহ হেতু সখীদ্বয়কে নাবালিকা ভেবে অকারণ অশ্রুসলিলে তাঁরা দুনয়ন ভরিয়েছিলেন। শকুন্তলার প্রস্থানকালে সখীরা অভিশাপ বৃত্তান্ত গোপন করে শকুন্তলাকে বললেন ভয় পেও না অতিমাত্রায় স্নেহ পাপ আশঙ্কা করে। রাজা যদি তোমায় বিস্মৃত হন তবে আংটিটা দেখিও- "মা বিভীহি অতিস্নেহ পাপমাশঙ্কতে। যদি নাম স রাজর্ষি প্রত্যভিজ্ঞানমন্থরো ভবেৎ, তদা তস্মৈ ইদম্ আত্মনামধেয়ঙ্কিতম্ অঙ্গুলীয়কম্ দর্শয়।"[২৪] সখীরা যদি শকুন্তলাকে অভিশাপবৃত্তান্ত বলতেন তবে

শকুন্তলা অবশ্যই আংটিটা সাবধানে রাখতেন। অভিজ্ঞানস্বরূপ এই আংটিটির সঙ্গে ক্রোধী দুর্বাসার অভিশাপের যোগসম্পর্ক জানা না থাকায় আংটিটি জলে পড়ে যাওয়া সম্পর্কে শকুন্তলা সতর্ক ছিলেন না, সখীরাও সঙ্গে নেই যে আংটির কথা মনে করিয়ে দেবেন। অনসূয়া প্রিয়ংবদা সঙ্গে না থাকায় রাজা শকুন্তলাকে চিনতে পারলেন না।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় রাজসভায় সমাগতা শকুন্তলার দুই তৃতীয়াংশই অনুপস্থিত। নাটের গুরুদ্বয় অকুস্থলে না থাকায় ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল। শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাতা হলেন। অতএব কাব্যের উপেক্ষিতা বলে রবীন্দ্রনাথ যাদের জন্য অশ্রুবিসর্জন করেছেন দেখা গেল অভিন্নহৃদয় সখীদ্বয়ই কাব্যের প্রকৃত নিয়ন্ত্রিতা বা অপেক্ষিতা। প্রথম অঙ্ক থেকে চতুর্থ অঙ্ক হলো নাটকের মূল ঘটনা যা এই সখিদের দ্বারা পরিচালিত। পঞ্চম অঙ্ক থেকে সপ্তম অঙ্ক সেই ঘটনারই অবধারিত ফল। সুতরাং সখীদ্বয়ের নিমিত্ত কবি অশ্রুপাত করলেও এরাই নাটকের সকল চরিত্রের তথা পাঠকবর্গেরও অশ্রুপাতের মূল কারণ।

নাটকের কবি কালিদাসের ভাব ও ভাষা : কালিদাস স্বনামধন্য। কালীর দাস অর্থাৎ অসীম শক্তির অধিকারী। 'রসঃ বৈ সঃ'- রসসাধনায় পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন তিনি। কালিদাসের ভাব যেমন অতুলনীয়, ভাষাও তেমনি অনুকরণীয়। প্রথমে শব্দের পরিকল্পনা পরে তাতে প্রাণসংযোগ। বিশেষণের বিশেষণ প্রয়োগেও কালিদাসের একই শব্দ প্রয়োগের রীতি। দুর্বাসাকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে অনসূয়ার হাত থেকে পুষ্পপাত্র পড়ে গেল। অনসূয়া বললেন আবেগস্খলিত গতিহেতু আমার হাত থেকে পুষ্পপাত্র পড়ে গেল। একটি বিশেষণে অনসূয়ার মনের গতি বোঝানো যাবে না তাই কবি সবিশেষভাবে বললেন আবেগ স্খলিত গতি। কালিদাসের রচনাশৈলীর মধ্যে 'উপমা কালিদাসস্য' প্রয়োগটির উল্লেখ করতেই হয়। উপমা প্রয়োগে কবিকে অনেক কথা অনেক বাক্য দিয়ে পাঠকবর্গকে বোঝাতে হয় তেমনি বিশেষণপ্রয়োগে সংযত, সংহত শব্দ দিয়ে, উপস্থাপন করতে হয়। তাই তাঁর ভাষাশৈলীর অপর বৈশিষ্ট্য বলা যায় 'বিশেষণং কালিদাসস্য'।

***অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকে সমাজচেতনা :** এই নাটকে কবির চেতনা বাস্তবনিষ্ঠ ও সমাজসচেতনতা। পঞ্চম অংকে দুষ্যন্তের অস্বীকৃতিতে শকুন্তলার গোপন প্রেমের সমাপ্তি হলো। রাজ অঙ্গুরী হারিয়ে যাওয়ায় সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে শকুন্তলা হলেন প্রত্যাখ্যাতা। কামনার চরম শাস্তি শুরু হলো- প্রায়শ্চিত্ত করতে মা মেনকা নিয়ে গেলেন নিজের কাছে। স্ত্রী ও পুরষ সমাজের এই দুই অবিচ্ছেদ্য অথচ পরস্পর পরিপূরক অংশের যৌথ মঙ্গল ও উন্নতিতেই মানব জাতির সামগ্রিক মঙ্গল নির্ভরশীল। 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'। 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ' ইত্যাদি পুরাণবচন অভ্রান্তভাবে স্ত্রীজাতির সামগ্রিক কল্যাণ কামনার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। মহাকবি কালিদাসের অমর লেখনীতে তারই পূর্বাভাস মেলে।

উপসংহার : কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলির অন্তর্গত 'শকুন্তলা' শীর্ষক কবিতায় কালিদাসকে দিয়েছেন সানন্দ স্বীকৃতি-

মেনকা অপ্সরারূপী, ব্যাসের ভারতী
প্রসবি ত্যজিলা ব্যস্তে, ভারতকাননে,
কণ্বরূপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে
কালিদাস! ধন্য কবি, কবি-কুলপতি।
কে না ভালবাসে তারে............

মধুসূদন কালিদাসের মধ্যে তাঁর স্বপ্নের আদর্শ সৌন্দর্যমূর্তি প্রত্যক্ষ করেছেন-

নন্দনের পিকধ্বনি সুমধুর গলে;
পারিজাত কুসুমের পরিমল শ্বাসে
মানস কমল রুচি বদন কমলে
অধরে অমৃত সুধা সৌদামিনী হাসে।

জার্মান কবি গ্যেটে শকুন্তলা পড়ে জার্মান ভাষায় এর প্রশংসা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এর সার কথা- 'কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্রে দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে'।[২৫] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "গ্যেটের এই শ্লোকটি আনন্দের অত্যুক্তি, ইহা রসজ্ঞের নহে, বিচার।"[২৬] কবি বলেছেন শকুন্তলার মধ্যে একটি গম্ভীর পরিণতির ভাব আছে, সেই পরিণতি ফুল হইতে ফলে পরিণতি, মর্ত্য হইতে স্বর্গে পরিণতি, স্বভাব হইতে ধর্মে পরিণতি।[২৭] Heider শকুন্তলা প্রসঙ্গে বলেছেন-"It is here that the mind and character of a nation is brought to life before us." কালিদাসের বাক্‌শিল্প প্রবাদের বিষয় যে কোনো সাহিত্যস্রষ্টার আদর্শ।

এ.বি. কীথের ভাষায়- "The Kavya Style unquestionably attains in Kālidāsa its highest pitch, for in this the sentiment predominates over the ornaments- sentiment with him is the soul of poetry."[২৮] কালিদাস তাঁর কাব্যনির্মিতির উপকরণ সঙ্কলনে অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে নিয়েছেন বিস্তর। নবকলেবরে সে সবের প্রতিস্থাপনে অভিনব কাব্যলোক গড়ে উঠেছে। উপমান হিসেবে বস্তুজগতের ব্যাপক সমুল্লেখ তো আছেই। পদসন্নিবেশে কোথাও সচেতন চেষ্টাজনিত আড়ষ্টতা কিংবা কৃত্রিমতা কালিদাসের কাব্যে অনুপস্থিত। পার্বত্য নদীর স্বচ্ছন্দ ধারার মতো কলকলধ্বনি তুলে তাঁর কাব্যভাষা সামনে এগিয়ে চলে। এমনকি সমাসবদ্ধ পদগুচ্ছগুলো পর্যন্ত প্রসন্নসলিলা স্রোতস্বিনীর মতো গতিশীল। এই অব্যাজমনোহর কাব্যমূর্তিই কালিদাসের প্রেয়সী।

তথ্যনির্দেশ

১. কালিদাস, *মালবিকাগ্নিমিত্রম্*, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পা.(নবীপুর সিদ্ধান্তযন্ত্র,১৩২৯ বঙ্গাব্দ), ১.২, পৃ. ৯।
২. কালিদাস, *রঘুবংশ*, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পা.(কলিকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রা: লি: ৭ম সংস্করণ, ১৩৯৮
৩. বঙ্গাব্দ), ১.৯, পৃ.২।
৪. তদেব, ১.১০, পৃ.২।
৫. "বিদ্যুত্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
৬. সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।
৭. অন্তস্তোয়ং মনিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহগ্রাঃ
৮. প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ॥" কালিদাস, *মেঘদূতম্*, কানাই লাল রায় সম্পা.(ঢাকা: বাংলা একাডেমী,
৯. ১৯৯৪ খ্রিঃ), উত্তরমেঘ ১, পৃ. ১৩৮।
১০. পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, *মেঘদূত পরিচয়* (কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩ ৮৯ বঙ্গাব্দ), পূর্বমেঘ ১৪, পৃ. ৩৪।
১১. কালিদাস, *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পা. (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯২
১২. খ্রি.), ৪.৮, পৃ. ২৮২।
১৩. Berriedale keith, The *Sanskrit drama* (Delhi:Motilal Banarsidass Pablishers, 1992 A.D.) P.147.
১৪. কালিদাস, *মেঘদূতম্*, কানাইলাল রায় সম্পা.,*প্রাগুক্ত*, পূর্বমেঘ ২৭, পৃ. ৭৬।
১৫. *তদেব*, পূর্বমেঘ ৩০, পৃ. ৮১।
১৬. করুণাসিন্ধু দাস,সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (কলকাতা:পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি,দ্বিতীয় মুদ্রণ,১৪২২ বঙ্গাব্দ),পৃ. ৮৭।
১৭. "বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
১৮. তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
১৯. স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
২০. কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব ॥" কালিদাস, *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*,*প্রাগুক্ত*, ৪.১, পৃ. ২৪৮।
২১. "উদ্গলিতদর্ভকবলা মৃগ্যঃ পরিত্যক্তনর্তনা ময়ূরাঃ।
২২. অপসৃতপাণ্ডুপত্রা মুঞ্চন্ত্যশ্রূণীব লতাঃ॥"- *তদেব*, ৪.১২, পৃ. ২৯০।
২৩. "উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিনী যোগম্ ॥"- *তদেব*, ৭.২২, পৃ. ৫৪৭।
২৪. *তদেব*, ২.৯, পৃ. ১৫১।
২৫. *তদেব*, ৩.১৭, পৃ. ২২৫।
২৬. *তদেব*, দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃ. ১৭৭।
২৭. *তদেব*।
২৮. *তদেব*, চতুর্থ অঙ্ক, পৃ. ২৬১।

২৯. *তদেব*, প্রথম অঙ্ক, পৃ. ২২।
৩০. *তদেব*, পৃ. ২৭।
৩১. *তদেব*, ১.১, পৃ. ১।
৩২. *তদেব*, দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃ. ১২০।
৩৩. *তদেব*, ৫.১৬ পৃ. ৩৬০।
৩৪. *তদেব*, ৪.২৫, পৃ. ৩১০।
৩৫. রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড, প্রাচীন সাহিত্য (কলিকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭২৪।
৩৬. *তদেব*।
৩৭. *তদেব*।
৩৮. Berriedale keith, *The Sanskrit drama, Op. cit*. p.155.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

ভারবির কিরাতার্জুনীয়ম্ মহাকাব্যের বিষয়ভাবনা ও বিশিষ্টতা
(Reflection of Themes and The Uniqueness in Bharavi's Epic Kiratarjuniyam)

ড. বেবী বিশ্বাস*

Abstract: What is called 'Epic' in English means 'Mahakavya' in Bangla. The word 'Epic' is originated from the Greek word 'Epikos'. The word 'Epikos' stands for words or music. After elaborating, the word's implication has become 'tales of valour'. Epic or Mahakavya is an expression where tales of valor are represented in an eloquent way. Epic is divided into two parts: Epic of growth and epic of art or literary epic. The epic 'Kiratarjuniya' composed by the epic poet Bharavi is one of the renowned epics in Sanskrit literature. He has composed this epic in eighteen cantos basing on the 'Vana Parva' of 'Mahabharata'. He is existing at the apex of reputation by writing this sole epic. The definition of epic, the epic poet's life and the contemporary period, the layout of the story and its significance have been evaluated in this discussible essay.

ভূমিকা

ইংরেজি 'Epic' শব্দের অর্থ মহাকাব্য। 'Epic' শব্দটি এসেছে গ্রীক 'Epikos' থেকে। 'Epikos' শব্দের অর্থ শব্দ বা সঙ্গীত। শব্দটির অর্থ সম্প্রসারণের ফলে তার অর্থ হয়েছে বীর্যগাঁথা। বীর্যগাঁথার বাঙ্ময় প্রকাশ হল Epic বা মহাকাব্য। মহাকাব্য বলতে যে অতিকায় কবিকৃতি বোঝায় এক কথায় তার যথার্থ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা অসম্ভব। সুপ্রাচীন এই সাহিত্য সৃষ্টি প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে স্বাতন্ত্র্য বিকাশ লাভ করেছিল বলে এর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতা বিদ্যমান। সর্গ দ্বারা গঠিত পদ্যময় কাব্যবিশেষকে মহাকাব্য বলা হয়। চতুর্থ শতকের আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর *সাহিত্যদর্পণে* মহাকাব্যের সংজ্ঞায় বলেছেন, "মহাকাব্য হবে সর্গযুক্ত। এর নায়ক হবেন ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন কোনও দেবতা বা সদ্বংশজাত কোন ক্ষত্রিয় অথবা একই বংশে জাত বহু রাজা। মহাকাব্যের প্রধান রস হবে মাত্র একটি— শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত; বাকী সমস্ত রস হবে অঙ্গরস (গৌণরস)। এর বিষয়বস্তু হবে ঐতিহাসিক বা কোন সজ্জন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে রচিত কাহিনি। এতে চারটি বর্গের (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) কথাই থাকবে; তবে একটি বর্গই মুখ্য ফলরূপে বর্ণিত হবে। কাব্যের শুরুতে আশীর্বাদ, নমস্কার বা বস্তু নির্দেশ থাকবে। প্রতিটি সর্গে একই রকম ছন্দ থাকবে, কেবল সর্গের শেষে অন্য প্রকার ছন্দের পদ্য হবে। এতে আটের অধিক সর্গ থাকবে। সর্গগুলো আকারে খুব বড় বা ছোট হবে না। প্রত্যেক সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের বিষয়বস্তুর সূচনা থাকবে। মহাকাব্যে সন্ধ্যা, সূর্য, চন্দ্র, রাত্রি প্রভৃতির বর্ণনা যথাসম্ভব করতে হবে। কবি, কাব্যের বিষয়বস্তু, নায়ক অথবা অন্যকারো নামানুসারে মহাকাব্যের নামকরণ হবে।"[১] পাশ্চাত্য আদর্শের মতে, "ঐশী-প্রেরণা অনুপ্রাণিত নানা সর্গে বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত যে-কাব্য কোন সুমহান বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া এক বা বহু বীরোচিত চরিত্র অথবা অতিলৌকিক শক্তি-সম্পাদিত কোন নিয়তি-নির্দ্ধারিত-ঘটনা ওজস্বী ছন্দে বর্ণিত হয় তাকে মহাকাব্য বলে।"[২] মহাকাব্যকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে— জাত মহাকাব্য ও সাহিত্যিক মহাকাব্য। যুগে যুগে বিভিন্ন অজ্ঞাতনামা লেখকের হাত ধরে সর্বশেষ একজনের মাধ্যমে যে বৃহৎ কাব্যে একটি জাতির নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য শিল্পরূপ লাভ করে তা-ই জাত মহাকাব্য। *রামায়ণ, মহাভারত* ইত্যাদি এই শ্রেণির মহাকাব্য। আর একজন কবির দ্বারা লিখিত যে কাব্যে কোন মহান বিষয়বস্তুকে অবলম্বন

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

করে এক বা বহু সংখ্যক বীরের বীরত্বগাথা ওজস্বী ছন্দে বর্ণিত হয় তাকে সাহিত্যিক মহাকাব্য বলে। *রঘুবংশ*, *কুমারসম্ভব* ও *কিরাতার্জুনীয়ম্* মহাকাব্যটি সাহিত্যিক মহাকাব্য হিসেবে অভিহিত।

ভারবরি জীবন ও কাল

কালিদাসের পরবর্তীকালে সহজাত প্রতিভার সঙ্গে পাণ্ডিত্যের সমন্বয়ে সংস্কৃত মহাকাব্য রচনার যে নতুন রীতির প্রচলন ঘটে তার পথিকৃত হলেন মহাকবি ভারবি। তিনি একটিমাত্র মহাকাব্য *কিরাতার্জুনীয়ম্* রচনা করে মহাকবি হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য কবি সাহিত্যিকদের মত মহাকবি ভারবির জীবন ও কাল সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করা দুরুহ ব্যাপার। তবে দণ্ডীর *অবন্তিসুন্দরী কথা* ও *অবন্তিসুন্দরী কথসার* গ্রন্থ দুটি থেকে মহাকবি ভারবির জীবন ও কাল সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ভারবির অপর নাম ছিল দামোদর। তাঁরা কৌশিক গোত্রীয় নারায়ণ স্বামীর পুত্র। তাঁর পূর্বপুরুষেরা উত্তর পশ্চিম ভারতের আনন্দপুর (বর্তমানে গুজরাটের অন্তর্গত) নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। পরে তাঁরা দাক্ষিণাত্যের অচলপুরে বসতি স্থাপন করেন।[৩] ভারবি ছিলেন কাঞ্চীপুরের পলবরাজ সিংহবিষ্ণুর পুত্র মহেন্দ্রবিক্রম ও দুর্বিণীতের রাজসভার সভাকবি। আচার্য দণ্ডী হলেন ভারবির প্রপৌত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে কবি বা নাট্যকারদের কাল নির্ণয় করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কারণ কোন কবি বা নাট্যকার তাঁদের কাল সম্পর্কে কিছু বলে যান নি। ফলে পণ্ডিতদের গবেষণার অন্ত নেই। কিন্ত মহাকবি ভারবির কাল মোটামুটিভাবে একটা স্বীকৃতির মধ্যে এসেছে। ভারবির সম্পর্কে প্রাপ্ত নানাবিধ তথ্য থেকে তাঁকে ষষ্ঠ শতকের শেষ দিক কিংবা সপ্তম শতকের প্রথম দিকের কবি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের বিজাপুর জেলার আইহোল (আয়হোলী) নামে এক গ্রামে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে জৈন কবি রবিকীর্তি তৈরি মন্দিরে একটি শিলালেখ পাওয়া গেছে। এ শিলালেখের লেখক রবিকীর্তি চালুক্য রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আশ্রিত কবি শিলালেখে লেখা আছে— এই শিলালেখের প্রশস্তি রচয়িতা এবং ত্রিভুবনেশ্বর জৈনের এই মন্দির নির্মাতা রবিকীর্তি নিজে। এর নির্মাণ মহাভারতীয় যুগের ৩৭৭৫ বর্ষের শেষে এবং ৫৫৬ শকাব্দে (৫৫৬ শকাব্দে হয় ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ) হয়েছে।[৪] এই শিলালেখে রবিকীর্তি নিজের আশ্রয়দাতা দ্বিতীয় পুলকেশী এবং তাঁর বংশের প্রশস্তি— যে বিদ্বান এবং বিবেকবান এবং রবিকীর্তি এই জৈনমন্দির নির্মাণের আয়োজন করেছেন, তিনি কবিত্বের ক্ষেত্রে কালিদাস এবং ভারবির মতই খ্যাতিমান।[৫] দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকাল ৬৪২ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে বা কিছু পরে। শিলালেখে উল্লিখিত কালের সঙ্গে এর বিরোধ নেই। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, ভারবির সময় রবিকীর্তির সময়ের কিছু আগে। *কিরাতার্জুনীয়ম্* মহাকাব্যের উল্লেখ দক্ষিণ ভারতের পৃথ্বীকোঙ্গণি নামে এক রাজার দানপত্রে পাওয়া যায়। এই দানপত্র মান্যপুর নামক নগরে ৬৯৮ শকাব্দে বা ৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা। এই দানপত্রে প্রথমে পৃথ্বীকোঙ্গণির বংশাবলী দেওয়া হয়েছে, যে বংশে অগণিত নামের রাজার দুর্বিণীত নামে এক পুত্রের উল্লেখ আছে। এই দুর্বিণীত ছেলের পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ভারবির *কিরাতার্জুনীয়ম্* মহাকাব্যের পঞ্চদশ সর্গের টীকা লিখেছেন।[৬] এই দানপত্র লেখা থেকে দুর্বিণীতের রাজত্বকাল ৬০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

পাণিনি এর অষ্টাধ্যায়ী টীকাকার জয়াদিত্য বামনের কাশিকাবৃত্তিতে ভারবির উল্লেখ আছে।[৭] খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে কাশিকাবৃত্তি রচিত হয়েছে। ভারবির কবিকীর্তি ছড়িয়ে পড়তেও কিছুটা সময়তো লেগেছেই। তাই কাশিকাবৃত্তির উল্লেখও ভারবিকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ের কবি বলে নির্দেশ করেছেন। বামন, আনন্দবর্ধন, মহিমভট্ট প্রমুখ আলঙ্কারিকগণ ভারবির *কীরাতার্জুনীয়ম্* থেকে শ্লোক উদাহরণরূপে উদ্ধার করেছেন। সপ্তম শতকের প্রথম কবি বাণভট্ট তাঁর হর্ষচরিতাদি কাব্যে কালিদাস প্রমুখ কয়েকজন কবির নাম উল্লেখ করলেও ভারবির নাম করেন নি। ভারবি সম্পর্কে বাণের এই নিরবতার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক এ.বি.কীথ বলেছেন, "বাণ ভারবিকে উপেক্ষা ক ছেন এই কারণে যে, তাঁর কাল থেকে ভারবি খুব বেশি আগের নয় এবং ভারবির কবিকীর্তি কখনো ততটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। ভারবির

কাল তাই ৫০০ খ্রিস্টাব্দ অপেক্ষা ৫৫০ খ্রিস্টাব্দ ধরাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।"[৮] সুতরাং প্রায় নির্দ্বিধায় বলা যায়— ভারবি খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কবি।

কিরাতার্জুনীয়ম্ কাব্যের বিষয়ভাবনা

আঠারো সর্গে রচিত *কিরাতার্জুনীয়ম্* মহাকাব্যের প্রথম সর্গে দুর্যোধনের রাজ্যশাসন প্রণালী এবং যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর তিরস্কার বাণী বর্ণিত হয়েছে। কপট পাশাখেলায় পরাজিত হয়ে পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর সঙ্গে দ্বৈতবনে বাস করছেন। শর্তানুসারে তাঁদের বারো বছর বনে বাস করতে হবে, আর এক বছর অজ্ঞাতবাস করতে হবে। অজ্ঞাতবাসকালে যদি কৌরব পক্ষের কেউ তাঁদের সন্ধান পায় তবে পুনরায় বারো বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাস পালন করতে হবে। তারপর পাণ্ডবরা তাঁদের রাজ্য ফিরে পাবেন। কিন্তু দুর্যোধনের আচার-আচরণে তাঁদের সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে যে, রাজ্য তাঁরা সহজে ফিরে পাবে না। হয় দুর্যোধনের সাথে অন্যায়ভাবে আপোষ করতে হবে, নয়তো যুদ্ধ করতে হবে। এসব কথা চিন্তা করে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের রাজ্যশাসন প্রণালী জানার জন্য বনবাসী এক কিরাতকে ছদ্মবেশে হস্তিনায় প্রেরণ করেন। সেই বনচর ব্রহ্মচারীবেশে হস্তিনায় গিয়ে দুর্যোধনের রাজ্যশাসন প্রণালী অবগত হয়ে যুধিষ্ঠিরের নিকট ফিরে এলেন। বনচর যে তথ্য সংগ্রহ করে এনেছেন তা যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করার পূর্বে প্রভু এবং ভৃত্যের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চরগণ রাজাদের চক্ষুস্বরূপ। অতএব কার্যবিশেষে নিযুক্ত হয়ে প্রভুদের প্রতারিত করা তাঁদের উচিত নয়। আবার প্রিয় হোক অপ্রিয় হোক হিতকারী ভৃত্যের কথা প্রভুদের শোনা উচিত। কারণ হিতকর অথচ মনোহর বচন দুর্লভ।[৯] একথা বলে বনেচর যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্যোধনের সুষ্ঠু রাজ্যশাসন প্রণালী বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, দুর্যোধন এখন রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট। তথাপি তিনি বনবাসে আপনার নিকট থেকে পরাজয়ের ভয়ে সর্বদা ভীত। এজন্য কপটপাশার ছলে তিনি যে রাজ্য হরণ করেছেন তা এখন নীতির কৌশলে জয় করার চেষ্টা করছেন। প্রজাদের কল্যাণে তিনি সর্বদা তৎপর। আত্মীয়গণের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ নেই। বন্ধুদের তিনি আত্মীয়বর্গের মতই সমাদর করেন। অনুচরগণ তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। সামন্ত রাজগণ তাঁর বশীভূত। প্রজাগণ তাঁকে পিতৃতুল্য মনে করেন। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন না করলে কোনো রাজ্যে সুশাসন রাখা সম্ভব নয়। তাই দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন তাঁর বর্তমান রাজনীতির অঙ্গ। দুর্যোধনের ইচ্ছা তিনি মনুর মত প্রজাপালক রাজা হবেন। তাই তিনি জিতেন্দ্রিয় হয়ে নিরলসভাবে সর্বক্ষণ প্রজাদের কল্যাণ সাধনে তৎপর। অনুজ দুঃশাসনকে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছেন। কিন্তু এতকিছুর ব্যবস্থা গ্রহণ করেও দুর্যোধন ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরের কথা মনে করে নিশ্চিন্তে রাজ্য পরিচালনা করতে পারছেন না। অর্জুনের বিক্রমের কথা স্মরণ করে তিনি নতমুখে দুঃসহ বেদনা ভোগ করতে থাকেন। দুর্যোধন রাজ্য রক্ষার্থে এখন সর্বদাই কপটাচরণে রত। তাই তাঁর প্রতি যা কর্তব্য তা এখনই আপনাকে করতে হবে। একথা বলে এবং পুরস্কার লাভ করে বনেচর স্বস্থানে চলে গেলেন। তখন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে তাঁর সম্মুখে অনুজগণকে বনেচর বর্ণিত দুর্যোধনের রাজ্যশাসন সম্পর্কে জানালেন। শত্রুর অভ্যুদয়ের কথা শুনে দ্রৌপদী ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। তাঁর ধমনীতে ক্ষাত্রতেজ স্ফুলিঙ্গের মত প্রবাহিত হলো। দ্রৌপদী শত্রুর বিরুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে বললেন— স্ত্রীলোকের উপদেশ তাঁর মত ব্যক্তির পক্ষে নিন্দনীয়। তবুও স্বীয় মনোব্যথা স্ত্রীলোকোচিত আচার দূর করে আমাকে একথা বলতে বাধ্য করছে। কারণ যে বংশের ইন্দ্রতুল্য নৃপতিগণ এই পৃথিবী চিরকাল অখণ্ডভাবে শাসন করে এসেছেন, মদমত্ত হস্তী যেমন শুঁড়ে টেনে মাথা থেকে পুষ্পমাল্য ফেলে দেয় তেমনি আপনিও স্বেচ্ছায় এ পৃথিবী ত্যাগ করছেন।[১০] এরপর তিনি পাণ্ডবদের দুঃসহ বনবাসজীবনের বর্ণনা দিয়ে বলেন— যেহেতু তাঁদের এই দুর্দশা শত্রুকৃত তাই শত্রু বিনাশের জন্য পুনরায় আপনাকে আপনার সেই জগদ্বিখ্যাত তেজ ধারণ করতে হবে। কারণ নিষ্কাম মুনিরা কামাদি অন্তশত্রু জয় করে শমগুণের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করতে পারেন, কিন্তু রাজারা সেভাবে পারেন না। তাঁদের শত্রু রজো ও তমো গুণের মানুষ। তাঁদের জয় করতে হলে বিক্রমের প্রয়োজন। কীর্তিই যাঁর একমাত্র ধন এবং এরূপ অসহ্য অপমানকে যিনি সন্তোষের কারণ

হিসেবে গ্রহণ করেন তার উচিত রাজচিহ্নযুক্ত ধনু পরিত্যাগ করে মাথায় জটা ধারণপূর্বক বনে বসে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা।[১১] যে শত্রু সততার আশ্রয় নিয়ে অপরকে পরাজিত করে তার সঙ্গে সন্ধিপালন যুক্তিযুক্ত নয়। তাই যদি রাজ্য ফিরে পেতে চান তাহলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।

মহাকাব্যটির দ্বিতীয় সর্গে ভীম কর্তৃক দ্রৌপদীর সমর্থন এবং যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভাষণে অগ্রিম যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব; যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীমের প্রশংসা, কিন্তু অগ্রিম যুদ্ধঘোষণায় অনীহা প্রকাশ; ব্যাসের আগমন ও যুধিষ্ঠির কর্তৃক সংবর্ধনা ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ভীম দ্রৌপদীকে সমর্থন করে উত্তেজিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, দ্রৌপদী নারী হলেও ঠিক কথাই বলেছেন। কথার ক্ষেত্রে পণ্ডিতেরা গুণকেই বড় বলেই মনে করেন, কে বলেছেন সে বিষয়ে তাঁদের কোন আগ্রহ থাকে না। দুর্যোধন শঠতা করে আমাদের রাজ্য আত্মসাৎ করেছে। আপনি ধর্মরাজ। আপনার ধর্মরক্ষার কারণেই আজ আমাদের এত দুঃখ। যে ধর্ম দ্বারা কেবল দুঃখ পেতে হয়, তা ধর্ম নয়। শত্রুরা আপনার এই শোচনীয় অবস্থা করে তুলেছে। আপনার যে পৌরুষকে দেবতারাও অসম্মান করেন তা অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এর চেয়ে দুঃখের আর কী হতে পারে? [১২] যে-সব রাজা অনুদ্যমবশতঃ শত্রুর ক্রমবর্ধমান প্রভুশক্তিকে উপেক্ষা করেন, লোকপবাদভয়েই যেন তাঁদের রাজলক্ষ্মী অচিরেই বিদায় নেন। যে পৌরুষহীন তাকে বিপদে অভিভূত করে। ভবিষ্যৎ বিপন্নকে ত্যাগ করে। যার ক্ষয় আসন্ন, তার অগৌরব অবশ্যম্ভাবী। যার গৌরব নেই, রাজলক্ষ্মী তাকে আদর করে না। এর পরেও যদি আপনি 'সময় আসুক বলে' অপেক্ষাই করতে থাকেন, তবে কপোটচারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্র চৌদ্দ বছর রাজসম্পদ ভোগের স্বাদ পেয়ে সহজে তা ত্যাগ করবে কি করে? [১৩] আর যদি শর্তানুযায়ী শত্রু আপনাকে রাজ্য ফিরিয়েও দেয়, তাহলে আপনার অনুজেরা যে বাহুবলের জন্য জগদ্বিখ্যাত, সে বাহু দিয়েই বা কি হবে? ইন্দ্রের মত শক্তিমান আপনার যে চারটি ভাই দিকে দিকে খ্যাত, যাঁরা চারটি দিগ্হস্তী ও চারটি সমুদ্রের মত, তাঁদের যুদ্ধে সমাগত দেখে শত্রুদের মধ্যে কে তাঁদের সহ্য করতে পারবে, বলুন? শত্রুজনিত যে আগুন আপনার বুকে অহরহ জ্বলছে, শত্রুদের পরাজয়েই কেবল সে আগুন নিভতে পারে।[১৪] অতএব আপনি শত্রুবিনাশে তৎপর হোন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মনোযোগ দিয়ে দ্রৌপদী ও ভীমের কথা শুনলেন। তাঁদের যুক্তিপূর্ণ বাক্য তিনি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না, তবু বললেন, তোমরা যে যুক্তির অবতারণা করেছো সে যুক্তি শাস্ত্রবিরোধী হয়নি। তবু রাজনীতি অত্যন্ত জটিল বিষয়, তাই হঠাৎ কোন কাজ করা ঠিক নয়। হঠকারিতা গুরুতর বিপদের কারণ হয়ে ওঠে। সত্যভঙ্গ বীরত্বের পরিচায়ক হয় না। যিনি বিচার বিবেচনা করে কাজ করেন, গুণগ্রাহী লক্ষ্মী তাঁকেই বরণ করেন। যাঁরা জয়লাভ করতে চান, তাঁরা ক্রোধের আবেগকে জয় করে ফলসিদ্ধির এবং উত্তর কালে তাঁর স্থিরতা ভালভাবে বিচার করে পুরুষকারকে শ্রেষ্ঠ উপায়ের সঙ্গে যুক্ত করেন। যিনি অভ্যুদয় চান, তাঁর উচিত বুদ্ধি দিয়ে ক্রোধকে জয় করা। ক্রোধ মানুষকে সময় ও সহায় থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।[১৫] যুধিষ্ঠির ভীমকে আরো বলেন, যদি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমরা দুর্যোধনকে আক্রমণ করি, তাহলে মিত্ররাজারা যাঁরা আমাদের ধর্মপথানুসারী বলে জানেন, তাঁদের সহায্য আমরা পাব না। সূর্য যেমন পদ্মফুলগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তেমনি সেই আক্রমণ মিত্ররাজাদের বিচ্ছিন্ন করে দেবে। দুর্যোধন রাজ্যকে স্থায়ীভাবে অধিকার করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করেছেন তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কারণ অহংকারী ও গর্বোদ্ধত দুর্যোধন খুব বেশি দিন মিত্ররাজা বা প্রজাদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে পারবে না। তার দুর্ব্যবহারের দরুণ নিজ রাজ্য ও বহিরাজ্যের রাজারা যখন তাকে ত্যাগ করবে তখন সহজেই আমরা তাকে পরাজিত করতে পারব। তাই ধৈর্য ধারণ করে উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এভাবে যখন যুধিষ্ঠির উত্তেজিত ও ব্যাকুল ভীমকে শান্ত করার জন্য বিভিন্ন উপদেশ দিচ্ছিলেন এমন সময় আলোক বিকীর্ণ করে সেখানে উপস্থিত হলেন পরাশরতনয় মহর্ষি বেদব্যাস। তখন স্থিরচিত্ত যুধিষ্ঠির মহর্ষি বেদব্যাসকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর সংবর্ধনা দিলেন। প্রশান্ত আকৃতিতে ঋষিবর তাঁর অন্তঃকরণের পবিত্রভাব প্রকাশ করছিলেন এবং স্মিত দৃষ্টিতে তিনি যেন সকলকেই সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন।

ঋষিবর উপবেশন করলে যুধিষ্ঠির তাঁর আগমনের কারণ জানতে ইচ্ছুক হয়ে বললেন, আপনার দর্শনলাভ মঙ্গলাবহ এবং পুণ্যদায়ক। নির্মেঘ আকাশ থেকে বৃষ্টিপাতের মতো হঠাৎ আপনার এই দর্শনলাভ নিশ্চয় কোনো মঙ্গলের কারণ হবে। আজ আমার যজ্ঞানুষ্ঠান সফল হলো। ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ সফল হলো। আপনি এখানে এসেছেন বলে আমি জগতে আজীবন সম্মানপাত্র হলাম।[১৬] যুধিষ্ঠির মহর্ষি বেদব্যাসকে বললেন, আপনার কল্যাণকারিণী বাণী শোনবার জন্য অতিশয় উদগ্রীব হয়ে আছি। উত্তরে ব্যাসদেব বললেন, যাঁরা যশস্বী কীর্তিমান তাঁদের উচিত বন্ধুদের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করা। বেদব্যাস আরও বললেন, যুধিষ্ঠির, তোমরা পাঁচ ভাই আর দুর্যোধনেরা শতভাই উভয়েই আমার সমান আত্মীয়। কিন্তু মূলত তোমার গুণাবলির আকর্ষণেই আমি তোমাদের এখানে এসেছি। কারণ, বিষয়-বিরাগী মুক্তিকামী পুরুষেরাও সজ্জনদের প্রতি স্নেহপ্রবণ হয়ে থাকেন।[১৭] আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যাই। তোমরাও কি দুর্যোধনের মতো তাঁর পুত্রতুল্য নও? তবু সব জেনেশুনেও তিনি যে তোমাদের ত্যাগ করেছেন তার কারণ বিষয়-তৃষ্ণা। তবে নিশ্চিত জেনে রেখো, যিনি কর্ণ-শকুনির মতো অসাধুবর্গের পরামর্শ অনুসারে চলেন তাঁর পতন অবশ্যম্ভাবী। কৌরবসভা যখন ধর্মভ্রষ্ট হলো, দ্রৌপদীকে সর্বসমক্ষে লাঞ্ছিতা করা হলেও তোমাকে অবিচলিত দেখেছি। সেদিনই বুঝেছি তুমি অবশ্যই জয়ী হবে। তোমাকে আরো অনেক শক্তি অর্জন করতে হবে। তোমাদের মনে রাখতে হবে— তোমাদেরকে পরশুরাম-বিজয়ী ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও কর্ণের মতো অসাধারণ বীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আমি তোমাদের মধ্যে অর্জুনকেই সবচেয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করি তাই তাকেই দেবতাদেরও আরাধ্য মহাপ্রভাবশালিনী সেই বিদ্যা দান করতে চাই, তুমি অনুমতি দাও।[১৮] অতঃপর যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে অর্জুন মহাবিদ্যা লাভের জন্য মহর্ষির কাছে এলেন। মহর্ষি তপস্যাপ্রভাবে মুহূর্তের মধ্যে তাঁর ধ্যানবিধি অর্জুনের মধ্যে সংক্রমিত করলেন। সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উপলব্ধিতে অর্জুনের নয়ন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। অতঃপর ঋষিবর বিজয়লাভের জন্য অর্জুনকে দুশ্চর তপস্যায় নিযুক্ত করবার জন্য বললেন, পার্থ, তুমি মহান ব্রত গ্রহণ করেছো, এখন থেকে তোমাকে সংযমী হয়ে ঋষিকর্ম পালন করতে হবে। এই সময় সেখানে উপস্থিত হলেন এক যক্ষ অনুচর। মহর্ষি অর্জুনকে বললেন, বৎস তোমাকে ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভের জন্য ইন্দ্রকীল পর্বতে গিয়ে তপস্যা করতে হবে। এই যক্ষ অনুচর গুহ্যক তোমাকে মুহূর্তে সে স্থানে নিয়ে যাবে। এই বলে বেদব্যাস অন্তর্নিহিত হলেন। অর্জুন তপস্যার জন্য দীর্ঘপথ যাবেন। তাই তাঁর আসন্ন বিচ্ছেদে যুধিষ্ঠির ও অন্য তিন ভ্রাতা খুবই কাতর হয়ে পড়লেন। কিন্তু স্বাভাবিক ধৈর্য, মহর্ষির বাক্যে আস্থা, শত্রুজনিত ক্রোধ এবং অর্জুনের বীর্যবত্তা-সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণার দরুণ শোক তাঁদের হৃদয়ে ঠাঁই পেল না। দ্রৌপদীও অর্জুনের বিচ্ছেদ-বেদনাকে ধৈর্যের সংগে সংবরণ করে রইলেন। দ্রৌপদী অতিকষ্টে রোদন সংবরণ করে অর্জুনকে বলতে লাগলেন, যশ লাভের জন্য, সুখলিপ্সায় অথবা অমানুষিক কোন কাজ করতে সঙ্কল্পবদ্ধ পুরুষের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। যিনি তাঁর সর্বতোমুখী যোগ্যতাকে কাজের দ্বারা সফল করে তোলেন তিনিই অদ্বিতীয় পুরুষ। হে পার্থ, প্রিয়জনের বিঘ্ন আশঙ্কায় তোমার মন বিচলিত হচ্ছে, জয়ের জন্য যাত্রা করলে দেবরাজ ইন্দ্র সেইসব বিঘ্ন দূর করবেন। দূরদেশে বহুদিন তোমাকে একাকী বাস করতে হবে। তাই কখনো দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিও না।[১৯] তুমি মহর্ষির আদেশ অবিলম্বে পালন করে আমাদের মনোরথ সফল কর। সফল হয়ে প্রত্যাগত তোমাকে আমি নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করতে চাই। দ্রৌপদী অর্জুনকে এসব কথা বলায় তাঁর মনে স্বজনকৃত পরাভবের গ্লানি এবং সভামধ্যে দ্রৌপদীর অমার্জনীয় অপমান যেন আবার নতুন করে জেগে উঠল। তিনি শত্রুদের যেন সামনেই দেখতে পেলেন। তাঁর মন থেকে আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে যাওয়ার দুঃখাবেগ মুহূর্তে তিরোহিত হলো। অতঃপর অর্জুন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ধৌম্য পুরোহিতের আশীর্বাদ নিয়ে যক্ষ নির্দেশিত হিমালয়ের পথে অগ্রসর হলেন। সমগ্র দিঙ্মণ্ডল মাঙ্গলিক দুন্দুভি ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হল। পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগলো। অর্জুন ইন্দ্রকীল পর্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কুবের অনুচরকে অনুসরণ করে তিনি হিমালয়ের পথে দ্বৈতবন ত্যাগ করলেন। পথে শরৎপ্রকৃতির সৌন্দর্যে অর্জুন বিমুগ্ধ হলেন। তিনি পল্লীপ্রান্তে অবস্থিত ভূখণ্ডগুলো দেখে আনন্দিত হলেন। ঐ ভূখণ্ডগুলো কলমধানে

শোভিত, কাদা নেই কোথাও; যেখানেই জল আছে, তা পদ্মফুলে শোভিত। শুভ্রবর্ণ ভঙ্গিল নদীতট দেখে তিনি আনন্দিত হলেন। পথগুলো বর্ষার দুর্গমতা ত্যাগ করে এখন সুগম হয়েছে। অর্জুন সাগ্রহে গ্রামগুলোতে পুষ্পিত গৃহলতা দেখলেন।[২০] সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী, মধুরকণ্ঠী গোপরমণীদের গীত, সুপক্ক শালীধান, চিত্র-বিচিত্র হরিণের দল প্রভৃতি মনোরম শোভা দেখতে দেখতে অর্জুন পথ চলতে লাগলেন। কুবের অনুচর যক্ষ মনোরম বাচনভঙ্গিতে শরৎঋতুর মনোহর শোভা বর্ণনা করে চলেছেন। অর্জুন মুগ্ধ হয়ে তা শুনতে শুনতে যাচ্ছেন। এমন সময় অর্জুন অনতিদূরে অপূর্ব শোভামণ্ডিত হিমালয়কে দেখতে পেলেন; যাকে জলভারমুক্ত শুভ্র মেঘের মতোই মনোরম মনে হচ্ছিল। অর্জুন হিমালয় পর্বত অভিমুখে যাত্রা করলেন। কুবের অনুচর যক্ষ হিমালয় পর্বতের সৌন্দর্য ও সম্পদের বর্ণনা দিলেন। অর্জুন হিমালয়ের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। পর্বতদর্শনে বিমুগ্ধ অর্জুনকে যক্ষ অনুচর হরপার্বতীর সঙ্গে এ পর্বতের ঘনিষ্ঠতার কথাও জানালেন। তারপর অর্জুনকে জিতেন্দ্রিয় হয়ে তপস্যা করার উপদেশ দিয়ে যক্ষ অদৃশ্য হলেন। ষষ্ঠ সর্গে অর্জুনের তপস্যা দেখে ভীত হয়ে গুহ্যকেরা ইন্দ্রের শরণাপন্ন হলেন। ইন্দ্র অর্জুনের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটানোর জন্য গন্ধর্বদের সঙ্গে অপ্সরাদের পাঠালেন। অপ্সরাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। অবশেষে মুনিবেশধারী স্বয়ং ইন্দ্র এলেন অর্জুনের কাছে। তিনি অর্জুনের সাধু উদ্দেশ্যের কথা জেনে নিজরূপ ধারণ করলেন এবং তাঁকে মহাদেবের আরাধনার উপদেশ দিয়ে অন্তর্নিহিত হলেন। অর্জুনের প্রবল তপস্যায় ভীত হয়ে ঋষিরা শিবের কাছে গেলেন। শিব তাঁদের অর্জুনের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বললেন। যা ঘটতে যাচ্ছে সে সম্বন্ধেও তিনি আলোকপাত করলেন। মুকদানব বরাহবেশে অর্জুনবধে উদ্যত হলেন। এই বরাহবধকে কেন্দ্র করে কিরাতবেশ নিয়ে তিনি অর্জুনের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। এমন সময় একটি বরাহ তাঁর দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে দেখে অর্জুন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন বরাহটি যখন তাঁকে বধ করতে আসছে তখন আত্মরক্ষা অবশ্যই বিধেয়। অনেক চিন্তার পর বরাহটিকে বধের জন্য তিনি বাণ ছুড়লেন। কিরাতবেশী শিবের বাণও একইসঙ্গে বিদ্ধ করল বরাহটিকে। বরাহটি নিহত হলো। অর্জুন বাণ আহরণে উদ্যত হলে শিবের কিরাতদূত এসে বলল, এ তাঁর প্রভুর বাণ। দীর্ঘ ভাষণে অনেক ভাল ভাল কথা বললেও প্রকারান্তরে সে অর্জুনকে ভর্ৎসনা করল এবং ভয়ও দেখালো। অর্জুন যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে বাণ আহরণের সঙ্কল্পে অটল রইলেন। এবারে কিরাতবেশী শিব দলবল নিয়ে এলেন। তখন কিরাত সৈন্যরা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো। অর্জুনের শরবর্ষণে তারা বিধ্বস্ত হলো। পলায়মান কিরাত সৈন্যরা আবার সমবেত হলো। ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলো। এবারে শিবার্জুন দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগলেন। অর্জুন পরাস্ত হলেন। অস্ত্রপ্রয়োগ বিফল দেখে অর্জুন প্রকাণ্ড পাথর এবং তরুকাণ্ড ব্যবহার করলেন। কিন্তু সবই ব্যর্থ হলো। এখন শিবার্জুনের মধ্যে শুরু হলো মুষ্টিযুদ্ধ। পরবর্তীতে শুরু হলো মল্লযুদ্ধ। যুদ্ধরত শিব উপরে লাফিয়ে উঠলে অর্জুন তাঁর চরণ ধারণ করলেন। অবশেষে অর্জুনের বীরত্বে সন্তুষ্ট মহাদেব নিজরূপ ধারণ করলেন। তখন অর্জুন শিবের বন্দনা করলেন। শিব প্রসন্ন হয়ে তাঁকে পাশুপত অস্ত্র এবং ধনুর্বেদ দান করলেন। দেবতারা নানা অস্ত্র দিলেন অর্জুনকে। তারপর অর্জুন শিবের চরণে পুনরায় প্রণাম জানালেন। তিনি তাঁকে 'যাও, শত্রুলোক জয় করো' এই আশীর্বাদ করলেন। এরপর পূর্ণমনোরথ অর্জুন নিজ ভবনে ফিরে এসে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেন। এখানেই অষ্টাদশ সর্গে রচিত *কিরাতার্জুনীয়ম্* মহাকাব্যটির পরিসমাপ্তি।

কিরাতার্জুনীয়ম্ মহাকাব্যের বিশিষ্টতা

কাহিনি বর্ণনায় ভারবির সৃজনী শক্তি উল্লেখযোগ্য। বহু গ্রন্থ অধ্যয়নের ফল তাঁর এই মহাকাব্য। যেমন মূল কাহিনিকে সংক্ষিপ্ত করে তিনি চতুর্থ সর্গে শরৎকালের বর্ণনা ও পঞ্চম সর্গে হিমালয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা করেছেন। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সর্গে অর্জুনের বিরুদ্ধে স্কন্দের নেতৃত্বে সৈন্যগণের অবতারণা এবং ষোড়শ সর্গে ঐন্দ্রজালিক অস্ত্রাদির সাহায্যে যুদ্ধের ঘটনা কবির অভিনব সৃষ্টি। আবার দুর্যোধনের নীতির যে দোষ বর্ণনা করা হয়েছে তা কবির কল্পনা। দুর্যোধনের প্রজাপালনবৃত্তির মাধ্যমে সুদক্ষ প্রশাসক দুর্যোধনের

নীতিজ্ঞানও কবির কল্পনাপ্রসূত— যা মাহাভারতের ঘটনা থেকে স্বতন্ত্র। সুতরাং কাহিনি ও চরিত্র পরিকল্পনায় কবি ভারবি মহাভারতকে অনুসরণ করেও মৌলিকতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন।

মহাকবি ভারবি তাঁর কাব্যে ভাষার আদর্শের ব্যাপারে ছিলেন খুবই সচেতন। তাঁর শ্লোকসমূহে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট বোঝা যায়; অথচ তা গভীর অর্থ বহন করে। বাক্যগুলোও তেমনি পৃথক অর্থ বহন করলেও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। তাঁর কাব্যের দুই প্রধান চরিত্র যুধিষ্ঠির ও অর্জুন স্বয়ং সুভাষী ও ভাষানুগ্রাহী। অন্যের বক্তব্যের সঙ্গে তাঁদের মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু তাঁর ভাষা ও বক্তৃতার গুণ তাঁদের দৃষ্টি এড়ায় না। দ্বিতীয় সর্গে ভীমের উক্তির জবাবে যুধিষ্ঠির বললেন, ধূলিহীন স্বচ্ছ সুন্দর ও মঙ্গলকর দর্পণে যেমন কোন বস্তুর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি তোমার মার্জিত যুক্তিপূর্ণ শব্দ সৌন্দর্যময় মনোহরী ও শুভকর বাক্যে তোমার মনোভাব শুদ্ধ প্রতীয়মান হচ্ছে।[২১] তেমনি কাব্যের একাদশ সর্গে তাপসবেশী ইন্দ্র তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে অর্জুনকে নিরস্ত্র হবার উপদেশ দিলে অর্জুন প্রথমেই বিনয় মধুর বচনে তাঁর বাক্যের প্রশংসা করে বললেন, আপনার বাক্য সারার্থযুক্ত, সমাসবহুল, অর্থগৌরবে মহৎ, আতিশয্য বর্জিত, অধ্যাহারদোষরহিত, যথাযথ অর্থপ্রতিপাদক, সঙ্কীর্ণতামুক্ত, সমুদ্রের মত গম্ভীর, মহত্বে ও অর্থ সম্পদে ঋষিচিত্তের ন্যায় শান্ত সংযত।[২২] চতুর্দশ সর্গেও দেখা যায় অর্জুন কিরাতদূতের উদ্ধত বাক্যে সাতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েও উপযুক্ত প্রত্যুত্তরের আগে অকুণ্ঠচিত্তে তাঁর ভাষণের প্রশংসা করছেন— আপনার এ বাক্য শ্রুতি-সুখকর, প্রসাদগুণযুক্ত, অর্থগৌরবে হৃদ্ধ, সংক্ষিপ্ত অর্থভূয়িষ্ঠ, সারবান এবং পূর্ণার্থদ্যোতক।[২৩] শুধু যুধিষ্ঠির বা অর্জুনই নন, বৃকোদর ভীমও দেখছি যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর ভাষণের মধ্যে গরীয়সী রূপটি দেখতে পেয়েছেন এবং তিনি নিজেও যে বক্তব্য রেখেছেন তাও অর্থগৌরবযুক্ত ও ওজোগুণরম্য।

অলঙ্কার ও উপমার প্রয়োগ ভারবির রচনারীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অর্থান্তরন্যাস, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনায়। উপমাগর্ভ একটি শ্লোকের জন্যই তিনি 'ছত্রভারবি' নামে প্রসিদ্ধ। শ্লোকটি হলো—

উৎফুল্লস্থলনলিনীবনাদমুষ্মাদুধুতঃ সরসিজসম্ভবঃ পরাগঃ।
বাত্যাভির্বিয়তি নিবর্ত্তিতঃ সমন্তাদাধত্তে কনকময়াতপত্রলক্ষ্মীম্ ॥[২৪]

অর্থান্তরন্যাস ভারবির অত্যন্ত প্রিয় অলঙ্কার। তাঁর কাব্যে বহু শ্লোকে অত্যন্ত সার্থকভাবে অর্থান্তরন্যাস অলংকারের ব্যবহার করেছেন। মানবজীবনের নানাদিক তুলে ধরেছেন এইসব সারগর্ভ উক্তির মাধ্যমে। যেমন—

বৃণুতে হি বিমৃশ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ॥
প্রাপ্যতে গুণবতাপি গুণানাং বক্তব্যমাশ্রয়বশেন বিশেষঃ।
সুলভো হি দ্বিষাং ভঙ্গো দুর্লভা সৎস্ববাচ্যতা॥
সুলভা রম্যতা লোকে দুর্লভং হি গুণার্জনম॥
দুর্লক্ষ্যচিহ্না মহতাং হি বৃত্তিঃ॥[২৫]

প্রতিটি সর্গেই অর্থান্তরন্যাসের এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ মিলবে যা তাঁর কাব্যের অর্থগৌরবকে সুপ্রতিষ্ঠিতি করে।

ভারবি তাঁর কাব্যে যাকে বলেছেন 'গরীয়ঃ বাক্যম্' বা গরীয়সী গীঃ তাকে বলা যায় অর্থগৌরব, ভারবির কাব্য যে গুণের জন্য প্রসিদ্ধ 'ভারবেরর্থগৌরবম্'। গৌরব কথাটি মনে হয় এখানে 'গভীরতা' এবং 'সারবত্তা' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ভারবির কাব্যে বহু শ্লোকেই এই গভীরতা ও সারবত্তার সন্ধান পাওয়া যাবে। যেমন—

বিবিক্তবর্ণাভরণা সুখশ্রুতিঃ প্রসাদয়ন্তী হৃদয়ান্যপি দ্বিষাম্।
প্রবর্ততে নাকৃতপুণ্যকর্মণাং প্রসন্নগম্ভীরপদা সরস্বতী॥[২৬]

কিরাতদূতের বাক্যের প্রত্যুত্তরে অর্জুনের এই উক্তিটি ভাষা সম্পর্কে ভারবির অর্থ গৌরবের একটি সুন্দর নিদর্শন।

কৃত্রিম বন্ধের প্রয়োগ ভারবির কাব্যের অপর এক বৈশিষ্ট্য। কখনো একটিমাত্র বর্ণ দিয়ে শ্লোক রচনা করে তিনি চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন। যেমন—

ন নোননুন্নো নুন্নোনু নানা নানাননা ননু।
নুন্নোঽনুন্নো ননুন্নেনো নানেনা নুন্ননুন্ননুৎ ॥[২৭]

কখনো আবার তাঁর রচিত শ্লোক প্রথম এবং শেষ থেকে পড়লে একই রকম উচ্চারিত হয়। যেমন—

ননু হো মথনা রাঘো ঘোরা নাথমহো নুন।
তয়দাতবদা ভীমা মাভীদা বত দায়ত ॥[২৮]

মহৎ কবির আর একটি লক্ষণ হলো প্রকৃতির বর্ণনায় পারদর্শিতা। ভারবি এই পরীক্ষাতেও শতভাগ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ। ষড়ঋতু, বন, পর্বত, নদী, চন্দ্রোদয় ইত্যাদির বর্ণনায় তিনি যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। গ্রাম পরিবেশের নিরাভরণ বর্ণনায় কবি যে কতটা পারদর্শী চতুর্থ সর্গের একটি শ্লোক থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শেষ রাতের চারণভূমি থেকে গাভীরা ঘরে ফিরছে। বাছুরদের কথা মনে পড়ায় তারা সবেগে ছুটছে। স্নেহে দুধ ঝড়ছে তাদের বাঁট থেকে।[২৯] শরৎকালীন আকাশ বর্ণনা–
শরতের আকাশে বলাকারা উড়ছে না। ইন্দ্রধনু নিয়ে মেঘপুঞ্জও উঠছে না। তবু আকাশ আশ্চর্য মনোরম। যা স্বভাব সুন্দর তা আহার্যগুণের অপেক্ষা করে না।[৩০] প্রকৃতির বর্ণনা ছাড়াও যুদ্ধবর্ণনা, দেবাঙ্গনাদের বনবিহার ও বিলাসবিভ্রম বর্ণনা ইত্যাদি নানা ধরণের বর্ণনা আছে এ মহাকাব্যে।
মহাকাব্যের সংজ্ঞানুসারে এর প্রধান রস হবে শ্রীঙ্গার, বীর বা শান্ত রসের মধ্যে যে-কোন একটি এবং বাকী সব রস হবে অঙ্গরস (গৌণরস)। *কিরাতার্জুনীয়ম* বীররসপ্রধান মহাকাব্য। আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বীররসের শ্রেণিভেদ দেখানো হয়েছে—

দানবীরং ধর্মবীরং যুদ্ধবীরং তথৈব চ।
দয়াবীরমপি প্রাহ ব্রহ্মা ত্রিবিধসম্মতম্ ॥[৩১]

ভারবি তাঁর কাব্যে যুদ্ধবীর অর্জুনকে মূল চরিত্র হিসেবে নিয়েছেন। যুদ্ধবীর আবার দুই রকমের— শস্ত্রপ্রধান ও বুদ্ধিপ্রধান। অর্জুন অবশ্যই শস্ত্রপ্রধান যুদ্ধবীর। মহাকাব্যের চতুর্দশ সর্গের বেশ কয়েকটি শ্লোকেও অর্জুনের এই শস্ত্রপ্রধান যুদ্ধবীরের রূপটি সুপরিস্ফুট। তাঁর সৃষ্ট প্রায় প্রতিটি প্রধান চরিত্রই বীর রসের স্থায়ীভাব উৎসাহকেই অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত করে। যুধিষ্ঠির প্রেরিত দূত দুর্যোধনের রাজ্য পরিদর্শন করে এসে যা জানালো তা পাণ্ডবদের ঈর্ষাকে প্রোৎসাহিত করে। দূত নিজেকে উপদেশ দিতে অক্ষম এবং অতি বিনয় দেখিয়ে 'প্রবৃত্তিসারাঃ খলু মাদৃশাং গিরঃ' বললেও স্পষ্ট ভাষাতেই সে যুধিষ্ঠিরকে বলেছে, 'আপনার প্রতি আমার ক্রূর আচরণে উদ্যত দুর্যোধনকে যোগ্য উত্তর অবিলম্বে দিন।'[৩২] যুধিষ্ঠিরের কাছে দুর্যোধনের অভ্যুদয়-বার্তা শুনে দ্রৌপদী যা বললেন, তা নিশ্চিতভাবে যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ ও উৎসাহের উদ্দীপক। দ্রৌপদীর প্রতিটি বাক্য অত্যন্ত প্রখর ও বুদ্ধিদীপ্ত। তিনি যেন এখানে বুদ্ধিপ্রধান যুদ্ধবীরের ভূমিকা পালন করছেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের সরাসরি সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করতে বলেছেন। কপটচারী ক্রূর শত্রুকে পরাজিত করতে এটা কখনোই দুর্নীতি নয়, বরং এটাই উত্তম পন্থা— এটাই তাঁর দৃঢ় অভিমত। ভীমের ভাষণও উত্তেজক। তিনিও দৃঢ়কণ্ঠে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, শত্রুরাই আপনার এই শোচনীয় অবস্থা করে তুলেছে। আপনার যে পৌরুষকে দেবতারাও সম্মান করতেন, আজ তা অবসন্ন হতে বসেছে। ব্যাসদেবের উপদেশের মধ্যেও সেই একই সুর ধ্বনিত। তিনি অর্জুনকে শক্তিদানে উদ্দীপিত করে বলছেন— যাও, কঠোর তপস্যার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে অসাধ্য সাধন কর। অষ্টম, নবম ও দশম সর্গে যে শৃঙ্গার-কলার বর্ণনা আছে, তাও আলাদা করে দেখা যায় না; বরং তাও বীর রসের পরিপুষ্টি সাধনেই সহায়ক হয়েছে। যেমন, মহাবীর অর্জুনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই সুরাঙ্গনারা বাক্যহারা হয়ে গেল। অর্জুন জয়ী হলেন। মোহিনীদের প্রভাব ব্যর্থ হলো। শত্রুজয়ে যিনি কৃতসঙ্কল্প, মোহিনী মায়াকে অবহেলায় অগ্রাহ্য করা তাঁর পক্ষেই স্বাভাবিক। অর্জুন যে পঞ্চশরের প্রবল প্রভাব জয় করতে পারলেন এতে তাঁর উদ্দীপনাই বৃদ্ধি পেল; যে উদ্দীপনা বীররসের স্থায়িভাব। আর চতুর্দশ

সর্গ থেকে অষ্টাদশ সর্গ পর্যন্ত অর্জুন তো সম্পূর্ণরূপে বীরযোদ্ধারূপেই চিত্রিত। কাব্যের শেষের দিকে অর্জুন কর্তৃক শিবের স্তব-স্তুতিতে যে-শান্ত রসের প্রকাশ আছে, তার সঙ্গেও মিশে আছে জয়ী বীরের আনন্দ-বার্তা।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, মহাকবি ভারবি কাহিনি বিন্যাসে, ভাষা ও অলঙ্কার প্রয়োগে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। উপমা প্রয়োগেও ভারবি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর কাব্যে শব্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা লক্ষ করা যায়। মহাকবি ভারবির কাব্যের আরম্ভে 'শ্রী' ও 'প্রতি' সর্গের শেষে 'লক্ষ্মী' শব্দের প্রয়োগ তাঁর কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক। ভারবিকে শব্দকুশলী বা বৈদর্ভী রীতির কবি বলা হয়। তবে তাঁর বৈদর্ভী রীতি কালিদাসের বৈদর্ভী রীতি থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর রচনায় ওজোগুণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। তাই ভারবির রচনার মধ্যে চন্দ্রিকার স্নিগ্ধতা বিংবা কালিদাসের রচনার সুকুমারতা দুর্লভ। তাঁর কবিতা নিশীথিনির ন্যায় ভাবগম্ভীর, অর্থগৌরবের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ, বিবিধ শাস্ত্রীয় তত্ত্ব দ্বারা অলঙ্কৃত এবং স্থানে স্থানে দুরূহ শব্দ ও কৃত্রিম বন্ধ দ্বারা ক্লিষ্ট। ভারবির রচনাকে তাই টীকাকার মল্লিনাথ আপাতকঠিন নারিকেল ফলের সাথে তুলনা করেছেন— — "নারিকেলফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ।" নারিকেলের বহিরাবরণ অতীব কর্কশ। সেই কর্কশ ও কঠিন আবরণ ভেদ করতে পারলেই ভেতরে সুস্বাদু শাঁসের আস্বাদ পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে ভারবির কবিতার নীরস ও আপাতকঠিন আবরণ ভেদ করতে পারলেই পাঠকের পক্ষে কাব্যস্বাদের অনির্বচনীয় আনন্দলোকে উত্তীর্ন হওয়া সম্ভব। ভারবি বর্ণনানিপুণ কবি। কাহিনি উপস্থাপনার মত বিভিন্ন নিসর্গচিত্রের স্বরূপ বর্ণনায় কবি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এই মহাকাব্যে তাই একদিকে যেমন রাজনীতি, মন্ত্রণা, ক্ষাত্রধর্ম, যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয় বর্ণিত হয়েছে, তেমনি বর্ণিত হয়েছে বন, পর্বত, শরৎকাল, বনবিহার, সন্ধ্যা, প্রিয়মিলন প্রভৃতির উপভোগ্য চিত্র। আবার মহাকবি চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফণিনীর মতো দ্রৌপদীর তেজোদৃপ্ততা, ভীমসেনের আস্ফালন, দুর্যোধনের শঠতা ও রাজনীতিকুশলতা নিপুণ তুলিতে অঙ্কন করে তাঁর কৃতিত্বকে আরও উজ্জ্বল করেছেন। তিনি তাঁর কাব্যে ছন্দ ব্যবহারেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। একটি কাব্যেই তিনি ছেচল্লিশটির বেশি ছন্দ প্রয়োগ করেছেন। ভারবির কাব্যে শৃঙ্গার রসের বর্ণনায় ইন্দ্রিয়বিলাসিতা ও দেহবিলাসের প্রাধান্য রয়েছে। কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের স্পর্শে তথা কাব্যগুণের বিচারে মহাকবি কালিদাসের পরেই ভারবির স্থান। তিনি এমন এক যুগের প্রতিনিধি যে সময় বিদ্বজ্জন কাব্যের সৌন্দর্য নির্ণয় করতেন কবির পাণ্ডিত্যের নিরিখে। তাই পাঠকের রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে ভারবি তাঁর মহাকাব্যের সুরকে বেঁধেছেন চড়া সুরের উঁচু পর্দায়। তবুও মহাকাব্য রচনায় ভারবি অন্যতম কবি, নতুন রচনাশৈলীর পথিকৃত।

তথ্যনির্দেশ

১. বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণ*, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পা. (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ), ৬/৩১৫-৩২৪, পৃ. ৪৭৫।

২. শ্রীশচন্দ্র দাশ, *সাহিত্যসন্দর্শন* (ঢাকা: বর্ণবিচিত্রা, আগস্ট, ২০০৩), পৃ. ৬৭।

৩. দণ্ডী, *অবন্তীসুন্দরী কথাসার*, ১৯-২১ সংখ্যক শ্লোক।

৪. প্রশস্তের্বসতেশ্চপি জিনস্য ত্রিজগদ্গুরোঃ।
কর্তা কারয়িতা চাপি রবিকীর্তিঃ কৃতী স্বয়ম্ ॥
ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহ বাদিতঃ।
সপ্তাব্দশতযুক্তেযুগতেস্বব্দেষুপঞ্চসু ॥
পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষটসু পঞ্চাশতেষু চ।
সমাসু সমতীতাসুশকানামপি ভূজুজম্ ॥
— আইহোল শিলালেখ

৫. যেনাযোজি নবেংশ্ম স্থিরমর্তবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম।
স বিজয়তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিত-কালিদাসভারবিকীর্তিঃ ॥
— আইহোল শিলালেখ

৬. শ্রীমৎ কোঙ্গণ মহারাজাধিরাজস্য অবিনীতনাম্নঃ পুত্রেণ........কিরাতার্জুনীয়-পঞ্চদশসর্গটীকাকারেণ দুর্বিনীতনামধেয়েন।— পৃথ্বিকোঙ্গণি দানপত্রলেখ।

৭. পাণিনির "প্রকাশনস্থেয়াখ্যায়োশ্চ" (১.৩.২৩) সূত্রের কাশিকাবৃত্তিতে বলা হয়েছে— "সংযষ্য কর্ণদিষু তিষ্ঠতে যঃ ভারবিঃ।"

৮. A. Berriedale Keith, *A History of Sanskrit Literature* (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, First Indian Edition, 1992), p. 109.

৯. ভারবি, *কিরাতার্জুনীয়ম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, *৩য় খণ্ড*, গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), তারাপদ ভট্টাচার্য সম্পা. (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, জুলাই, ১৯৭৮), ১/৪।

১০. তদেব, ১/২৮-২৯।

১১. তদেব, ১/৪২, ১/৪৪।

১২. তদেব, ২/৭।

১৩. তদেব,২/১০, ২/১৬।

১৪. তদেব,২/২৩।

১৫. তদেব,২/৩০,২/২৫, ২/৩৬।

১৬. তদেব, ৩/৬।

১৭. তদেব,৩/১০-১২।

১৮. তদেব,৩/২২-২৩।

১৯. তদেব,৩/৫৩।

২০. তদেব,৪/১৯।

২১. তদেব,২/২৬।

২২. তদেব,১১/৩৮-৪১।

২৩. তদেব,১৪/৩।

২৪. তদেব,৫/৩৯।

২৫. তদেব,২/৩০, ৯/৫৮, ১১/৫৩, ১১/১১, ১৭/২৩।

২৬. তদেব, ১৪/৩।

২৭. তদেব,১৫/১৪।

২৮. তদেব,১৫/২০।

২৯. তদেব, ৪/১০।

৩০. তদেব, ৪/২৩।

৩১. "দানবীরং.......ত্রিবিধসম্মতম্।"— ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ১৪ই মার্চ, ১৯৮০)।

৩২. মহাকবি ভারবি প্রণীত *কিরাতার্জুনীয়ম্*,প্রথম সর্গ, কানাই লাল রায় সম্পা.(ঢাকা: বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯২), ১/২৫।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

সংস্কৃত সাহিত্যে শিশুর স্বরূপ
(Nature of Children in Sanskrit Literature)

ড. হোসনে আরা আরজু*

Abstract: Nature, Animals, different characters play roles in every branch of Sanskrit literature. Children also are mentioned in various fields for their contributions in the development of Sanskrit literature. Children are the sources of joy for family life. They are sinless, delightful and representatives of a clan. A childless lady is always considered as a curse of a family. In the whole Sanskrit literature Panchatantra, renowned in Sanskrit story literature is famous as this work was written for the development of learning for the illiterate sons of king Amarashakti, the king of Mahilaropya in the southern India. Vishnusharma, learned preceptor was called by the king and was requested to make the illiterate sons interested for learning. Here the teacher took the method of saying story and atlast the scholar came out successful. In the mythological work entitled the Bhagavatpurana the story of Lord Shrikrishna in his childhood has been depicted. In the Ramayana twin sons lava and kusha of Ramachandra were successful to re-unite their parents. In the drama Alhijnanashakuntalam the child Sarvadamana played a great role in the re-union of the hero and heroine. There are so many instances in the whole of Sanskrit literature of the importance of children in the development of this literature. No such satisfactory discussions have been mentioned so long we know. This is an humble effort to highlighten and to focuss on this part of Sanskrit literature.

প্রাণী ও মানব জগতের সর্বত্র বাৎসল্য অর্থাৎ অপত্য স্নেহ একটি সহজাত বৃত্তি। সন্তানের জন্য ব্যাকুলতা আমাদের সমাজে প্রবল। জন্মের অনেক আগে থেকেই সন্তানের শুভকামনায় নানা আচার অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়। বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে দিয়ে শিশুর জন্ম হবার পর ষষ্ঠী, অন্নপ্রাশন, হাতে খড়ি, উপনয়ন ইত্যাদি আনন্দানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশুকে সংসারের গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ভক্ত কিংবা ঈশ্বর বিমুখ ব্যক্তি প্রত্যেকের নিকটই শিশু অত্যন্ত প্রিয়। সন্তানকে ভালোবাসার মাধ্যমে মা-বাবা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরই ভালোবাসে এবং সন্তানের মধ্যে দেখতে পায় নিজেদেরই প্রতিফলন। তাছাড়া জীবনে ও সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই যে, মাতাপিতা ছাড়া অন্য গুরুজনরাও শিশুকে ভালোবাসে। অনেক ক্ষেত্রে সে ভালোবাসা মা বাবার স্নেহের মতোই গভীর।

পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যেই মানব মনের এই সুগভীর বৃত্তি অর্থাৎ অপত্যস্নেহ বা বাৎসল্যের অল্পবিস্তর প্রতিফলন দেখা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যেও অপত্য স্নেহের কথা বার বার এসেছে। কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী বাৎসল্যভাবের কারণ নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন। ওয়াটসন তাঁর ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখিয়েছেন যে, নবজাতক শিশুর মনে ভালোবাসার অঙ্কুর জাগ্রত হতে পারে তার শরীরের স্পর্শকাতর অংশগুলি কারো দ্বারা স্পৃষ্ট হলে। ভয়, ক্রোধ ও ভালোবাসা শিশুর মনে জেগে ওঠে যারা তাকে ঘিরে থাকে তাদের স্নেহস্পর্শে অথবা আচরণে। সন্তানকে পরিচর্যা করার ফলে এবং প্রতিনিয়ত তার স্পর্শ সুখ পাওয়ায় মায়ের মনে বাৎসল্যভাব জাগ্রত হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে অপত্য স্নেহের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত দেখতে পাই ঋগ্বেদে। দেবতাদের পুত্রের মতো অথবা শিশুর মতো সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখার উদাহরণ বেশ কয়েকটি পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই আছে —

---

* প্রফেসর, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

"পুত্রো ন জাতো রণ্বো দূরোণে বাজী ন প্রীতো বিশো বিতারীৎ।
বিশো যদহেব নৃভিঃ সনীলা অগ্নির্দেবত্বা বিশ্বান্যশ্যাঃ।"[১]

অর্থাৎ, অগ্নি পুত্রের ন্যায় জন্মগ্রহণ করে গৃহ আনন্দময় করেন এবং অশ্বের ন্যায় হর্ষযুক্ত হয়ে সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাস্ত করেন।

দশম মণ্ডলে (৮৫।১৮) মিত্র ও বরুণকে শিশু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই মণ্ডলেই (১২৩।১) দেখতে পাই পূজার্থী বৃষ্টিবর্ষণকারী দেবতাকে বালকের ন্যায় মিষ্ট কথায় তুষ্ট করেন।

জল আর সূর্যরশ্মির সঙ্গমস্থল হলো অন্তরিক্ষ। বায়ু সেখানে জলবর্ষণ ঘটায়। বিদ্যুত্ এর জরায়ু। সন্তানলাভের জন্য স্তুতিবাচকেরা এভাবেই প্রার্থনা জানায় —

"অয়ং বেনশ্চোদয়ৎপৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ুঃ রজসো বিমানে।
ইমমপাং সঙ্গমে সূর্যস্য শিশুং ন বিপ্রা মতিভিঃ রিহন্তি ॥"[২]

অর্থাৎ, বেন নামে যে দেবতা তিনি, জ্যোতিদ্বারা পরিবেষ্টিত, তিনি জল নির্মাণকারী আকাশমধ্যে সূর্য কিরণের সন্তানস্বরূপ জলদের পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। যখন সূর্যের সাথে জলের মিলন হয় তখন বুদ্ধিমান স্তবকারিগণ সে বেন দেবকে বালকের ন্যায় নানা মিষ্ট বচনে সন্তুষ্ট করেন।

ঋক্‌সংহিতার মন্ত্রে এমনিভাবে উপমাসূত্রে শিশুর কথা এসেছে। ঋগ্বেদে বারবার দেখা যায় পুত্রসন্তানের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা। দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট ভক্তের আবেদন :

"ইমাং ত্বমিন্দ্র মীঢ্বঃ সুপত্রাং সুভগ্যাং কৃণূ।
দশাস্যাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি ॥"[৩]

অর্থাৎ, হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র; এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী কর। এর গর্ভে দশ পুত্র সংস্থাপন কর, পতিকে নিয়ে একাদশ ব্যক্তি কর। পতিপ্রেমের সঙ্গে বাৎসল্যভাব যে অলক্ষ্যে মিশ্রিত থাকে এখানে তারই সুন্দর ইঙ্গিত।

শিশু শব্দটির অর্থপ্রসঙ্গে এখানে আচার্য যাস্ক (খৃস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে) তাঁর নিরুক্তে মন্তব্য করেছে — 'শিশুঃ শংসনীয়ো ভবতি'[৪] অর্থাৎ, শিশু বলতে বোঝায় আদরের পাত্র; দানার্থক শিশ্-ধাতু থেকে শব্দটি নিষ্পন্ন হওয়ায় এমনও বলা চলে যে শিশু মায়ের উদ্দেশ্যে পিতার দান, কেননা মাকে অনেক সাধ্যসাধনা করে সন্তান পেতে হয়। সৃষ্টির জৈবিক রহস্য, তা সে উদ্ভিদ বা প্রাণী যারই হোক, তা নিয়ে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আদিদৈবিক তত্ত্বকথা কিছু কম মেলে না শাস্ত্রে। তবে ক্ষেত্র আর বীজ একত্র হওয়া চাই। চাষির কাছে ফসল আর মা-বাবার কাছে সন্তান সমান আদরণীয় এই বস্তুসত্য অবশেষে কবি হালের প্রাকৃত গাথাসপ্তশতীতে একটি আশ্চর্য কবিতা হয়ে উঠেছে, যার সংস্কৃত রূপান্তর করলে দাঁড়ায় —

পঙ্কমলিনেন ক্ষীরৈকপায়িনা দত্তজানুপতনেন।
আনন্দ্যতে হালিকঃ পুত্রেণ ইব শালিক্ষেত্রেণ ॥ (৬।৬৭)

জমিতে হাঁটু গেড়ে বসে চাষি শালিধানের চারা যত্ন করছেন দেখে কবির মনে হয়েছে ধূলিমলিন দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তানকে বাবা বুঝি আদর করছেন।

সুতরাং দেবতাকে পুত্রের মতো করে দেখা এবং বাৎসল্য ভাবে ভাবিত হয়ে আরাধনা করার বীজ আমাদের দেশে বহু পূর্বে থেকেই ছিল, বালগোপালের আরাধনায় তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে।

ঋগ্বেদের পরে ব্রাহ্মণ ও ঔপনিষদিক সাহিত্যে বাৎসল্যের উল্লেখ পাওয়া গেলেও তা অধিকতর পরিস্ফূট হয়নি। রামায়ণে লৌকিক স্তরে বাৎসল্যের প্রথম প্রকাশ দেখা যায় রামায়ণে। দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে রামকে লাভ করেছিলেন। পুত্র শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হলো পিতাকে যে পবিত্র করে, পুৎ নামক নরক থেকে যে উদ্ধার করে। পুত্র মুখ দর্শনেই সুখ। নিজেকে নতুন করে জানা যায়। পুত্র পিতার জন্য সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকবে— এমনই প্রত্যাশা। সুতরাং পুত্রের ওপরই পিতার অগাধ বিশ্বাস। পুত্রকে সামনে রেখেই

জীবন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে পিতা। যথার্থ সন্তান পিতার ছায়া হয়ে ওঠে। সেখানেই পিতার সুখ আনন্দ। তাই দেবদেবীর কাছে পুত্রের জন্য প্রার্থনার অন্ত ছিল না।

বাৎসল্যভাব মহাভারতে বিশেষরূপে প্রাধান্য লাভ করেছে। পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ। তাঁর বিচারবুদ্ধি স্নেহ যদি আচ্ছন্ন না করত তাহলে হয়ত কৌরব বংশের ভাগ্য অন্য রকম হতো। দূর্যোধনের জন্মের পরমূহুর্তে বিদুর প্রভৃতি শুভার্থীরা ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন, এ পুত্র নিজ বংশ ধ্বংস করবে। এখনই একে ত্যাগ করলে ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। ধৃতরাষ্ট্র এ উপদেশ শুনলেন না : 'ন চকার তথা রাজা পুত্রস্নেহসমান্বিতঃ॥'[৫] পরে ধৃতরাষ্ট্র স্বীকার করেছেন, 'পুত্রস্নেহাভিভূতস্তু হিতমুক্তো মনীষিভিঃ ॥'[৬]

অর্থাৎ, পূত্রস্নেহাতুর আমার জন্যই কৌরবদের পতন ঘটেছে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে লৌকিক অপত্য স্নেহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এ। সর্বদমন তপোবনে সিংহশিশুর সঙ্গে খেলা করছে। প্রথম দর্শনেই বালক হস্তিনাপুররাজের মন কেড়ে নিল। দুষ্যন্ত বালকের দিকে চেয়ে স্বগতোক্তি করলেন :

"আলক্ষ্যদন্তমুকুলান্ অনিমিত্তহাসৈ
রব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃপ্রবৃত্তীন্।
অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো
ধন্যাস্তদঙ্গরজসা মলিনীভবন্তি ॥"[৭]

অর্থাৎ, তাঁরাই পুণ্যবান, অকারণে হাসায় যে শিশুর ফুলের কুঁড়ির মতো দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে, যার আধো বুলি শুনতে বড় ভালো লাগে, কোলে আসার জন্য যে সবসময় উন্মুখ—এমন সন্তানকে কোলে নিয়ে সেই শিশুর গায়ের ধূলায় নিজেরাও ধূসরিত হন।

তাপসীর অনুরোধে দূষ্যন্ত সিংহশিশুকে মুক্ত করতে গিয়ে সর্বদমনের স্পর্শ সুখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি মনে মনে বললেন–

"অনেন কস্যাপি কুলাঙ্কুরেণ
স্পৃষ্টস্য পাত্রেষূ সূখং মমৈবম্।
কাং নিবৃর্তিং চেতসি তস্য কুর্যা-
দ্যস্যায়মঙ্কাৎ কৃতিনঃ প্ররূঢ়ঃ ॥"[৮]

অর্থাৎ, এ সন্তান কোন ব্যক্তির বংশধর আমি জানি না। তথাপি এর গাত্রস্পর্শেই আমার এমন আনন্দ হচ্ছে। তাহলে যে ভাগ্যবানের কোলে থেকে এ সন্তান বেড়ে উঠেছে, তাঁর মনে কি অনির্বচনীয় আনন্দই না হয়ে থাকে।

বস্তুত অপত্যস্নেহের কথা সংস্কৃত সাহিত্যে বারবার এসেছে। এসেছে সন্তানের অঙ্গস্পর্শে পরমানন্দ অনুভবের আকাঙ্ক্ষা। কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকে দেখা যায় পরিচয় না জেনেও পুত্রকে দেখে পুরূরবার চোখে আনন্দাশ্রু; তাকে আদর করে জড়িয়ে ধরার জন্য তিনি অস্থির —

"বাষ্পায়তে নিপতিতা মম দৃষ্টিরস্মিন্
বাৎসল্যবন্ধি হৃদয়ং মনসঃ প্রসাদঃ।
সঞ্জাতবেপথুভিরুজ্ঝিতধৈর্যবৃত্তির্
ইচ্ছামি চৈনম্অদয়ং পরিরব্ধুম্ অঙ্গৈঃ ॥"[৯]

দম্পতীর দুটি পৃথক অন্তঃকরণের আনন্দময় একমাত্র বন্ধনগ্রন্থি হচ্ছে অপত্য। এই আনন্দগ্রন্থি প্রেমের প্রকর্ষের ফল। উত্তররামচরিতের চতুর্থ অংকে রাজর্ষি জনক সীতার বাল্যকালের স্মৃতিভারে পীড়িত হয়ে বলেছেন–

"অনিয়তরুদিতস্মিতং বিরাজৎকতিপয়কোমলদন্তকুড্মলাগ্রম্।
বদনকমলকং শিশোঃস্মরামি স্খলদসমঞ্জসমঞ্জু জল্পিতং তে ॥"[১০]

অর্থাৎ, শিশু সীতা কখনও কাঁদেন, কখনও হাঁসেন। কয়েকটি ছোট ছোট কোমল দাঁত সবে উঠতে শুরু করেছে। তিনি আধো আধো কথা বলতে শিখেছেন। তাই তাঁর সেই কথাগুলি শুনতে খুবই ভাল লাগতো। শিশুস্বভাবের সহজ ও স্বাভাবিক বর্ণনা কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলের দুষ্যন্তের একটি উক্তিতে অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে।

পুত্রের অঙ্গস্পর্শে পিতার হৃদয়ে অনুরূপ অনির্বচনীয় সুখানুভুতির কথা রঘুবংশেও আছে। রঘুবংশে রাজা দিলীপের অনুভবে পুত্রের স্পর্শ যেন অমৃতবর্ষী, দুচোখ বুজে সুগভীর আবেশেই সে আনন্দসংবিৎ অনুধাবন করা সম্ভব।

“তমঙ্কম্ আরোপ্য শরীযোগজৈঃ
সুখং নিষিঞ্চন্তম্ ইবামৃতং ত্বচি।
উপান্তসম্মীলিতলোচনো নৃপ–
শ্চিরাৎ সুতস্পর্শরসজ্ঞতাং যযৌ ॥”[১১]

পুত্রের চাঁদমুখ দেখার আনন্দকে তো কালিদাস সমুদ্রের উচ্ছ্বাস বলতেও পিছপা নন।

“নিবাতপদ্মস্তিমিতেন চক্ষুষা নৃপস্য কান্তং পিবতঃ সুতাননম্।
মহোদধেঃ পূর ইবেন্দুদর্শনাদ্‌গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি ॥”[১২]

অর্থাৎ, রাজা বায়ুশূন্য প্রদেশস্ত পদ্মের মতো নিশ্চলনেত্রে সেই পুত্রমুখ দর্শন করে চন্দ্রদর্শনে জলধির প্রবাহ যেরূপ কূল ছাপিয়ে যায়। তাঁর অসীম আনন্দও সেইরূপ হৃদয় ছাপিয়ে উঠল।

উমার প্রতি হিমালয়ের গভীর স্নেহের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কালিদাস কুমারসম্ভবে বলেছেন : পুত্র থাকা সত্ত্বেও এই কন্যার প্রতি হিমালয়ের স্নেহদৃষ্টি যেন কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করতো না। বসন্তকালে কত রকমের ফুল ফোটে, কিন্তু ভ্রমরকুল আম্রমুকুলের কাছেই যায়। পর্বতরাজ হিমালয়ও তেমনি অন্য সন্তান থাকা সত্ত্বেও উমার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট।

কুমারসম্ভবে শিশুকন্যা উমাকে দেখে বাবার যেন আর আশ মেটে না, এমন কথাও কবি বলেছেন

“মহীভূতঃ পুত্রবতোপি দৃষ্টিস্তস্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃপ্তিম্।
অনন্ত-পুষ্পস্য মধোর্হি চূতে দ্বিরেফ-মালা স-বিশেষ-সঙ্গ ॥”[১৩]

অর্থাৎ, বালিকা পার্ব্বতী মাতাপিতার পরম আদরের ধন। মৈনাক পুত্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হিমালয়ের স্নেহ কিন্তু কন্যা পার্ব্বতীর উপরই সমধিক। তিনি কন্যাকে সবসময় কাছে রাখেন; অতৃপ্ত-নয়নে ও স্নেহ-পূর্ণ মনে কন্যাকে যতো দেখেন ততো আরও দেখতে ইচ্ছা করে। বসন্তকালে নানা কুসুম প্রস্ফুটিত হলেও ভ্রমরশ্রেণি কিন্তু আম্রমুকুলেই সবিশেষ আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

ধাইমার কথা শুনে শুনে শিশুর প্রথম কথা বলতে শেখা, তাঁর আঙুল ধরে টালমাটাল পায়ে হাঁটতে শেখা সবই কবির নান্দনিক দৃষ্টিপথে এসেছে।

“উবাচ ধাত্র্যা প্রথমোদিতং বচো যযৌ তদীয়াম্ অবলম্ব্য চাঙ্গুলিম্।”[১৪]

পুত্র-কন্যার ভেদ নেই এখানে মা-বাবার কাছে। কুমারসম্ভবের উমাকে কবি দেখেছেন নীতি আর উৎসাহগুণের সমন্বয়ে উদ্ভূত সম্পদের তুলনীয় হিসেবে– “নীতাবিবোৎসাহগুণেন সম্পৎ”[১৫] ঠিক যেমন রঘুকে তিনি দেখেন উমা-মহেশ্বরের সন্তান কার্ত্তিকেয়, বা ইন্দ্র ও শচীর পুত্র জয়ন্তের তুলনীয় হিসেবে :

“উমাবৃষাঙ্কৌ শরজন্মনা যথা যথা জয়ন্তেন শচীপুরন্দরৌ।
তথা নৃপঃ সা চ সুতেন মাগধী ননন্দতুস্তৎসদৃশেন তৎসমৌ ॥”[১৬]

দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুত্র সর্বদমন প্রসঙ্গেও উপমাটি একইভবে এসেছে দেখা যায়। সূর্যের তেজ আত্মস্থ করে বেড়ে ওঠা চাঁদ-এর উপমাটিও রঘু সম্বন্ধে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

“পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতেরনুপ্রবেশাদ্ ইব বালচন্দ্রমাঃ।”[১৭]

উমার বেড়ে ওঠাও যেন চন্দ্রকলার বৃদ্ধি

"দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্ জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি ॥"[১৮]

শিখা যেমন প্রদীপকে, গঙ্গা যেমন স্বর্গকে মণ্ডিত করে, কন্যা উমাকে পেয়ে তেমনি তার পিতা পবিত্র ও মণ্ডিত হয়েছিলেন। "তয়া স পূতশ্চ বিভূষিতশ্চ।"[১৯]

সন্তানকে ঘিরে এই গৌরব ও আনন্দ অনুভবের চিত্রগুলি সংস্কৃতির একটি উজ্জ্বল দিক তুলে ধরে। পুত্রজন্মের আনন্দে রাজা দিলীপ বুঝি সবই বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন তাঁর রাজছত্র ছাড়া—

"অদেয়মসীত্ ত্রয়মেব ভূপতেঃ শশিপ্রভং ছত্রম্ উভে চ চামরে।"[২০]

কাদম্বরীতে চন্দ্রাপীড়ের জন্মপ্রসঙ্গেই হোক, কিংবা হর্ষচরিতে হর্ষবর্ধন বা রাজ্যশ্রীর জন্ম প্রসঙ্গেই হোক, রাজপরিবার ছাড়িয়ে আনন্দোৎসবের ঢেউ সাধারণের মধ্যে প্রসারিত হওয়ার কথা শুনিয়েছেন কবিরা। নবজাতক ও প্রসূতির শরীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিয়েও নানা তথ্যবিন্যাস করেছেন তাঁরা। তার শুরু গর্ভিণীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য-রক্ষা দিয়ে। রঘুর জন্মের আগে তাঁর মা সুদক্ষিণার জন্য নির্ভরযোগ্য নিপুণ চিকিৎসকরা গর্ভরক্ষা ও নিরাপদ প্রসবের সুব্যবস্থা করেছিলেন জানা যায়। এঁরা কুমারভৃত্যা-কুশল হিসেবে 'কৌমারভৃত্য' নামে চিহ্নিত।

"কুমারভৃত্যাকুশলৈরনুষ্ঠিতে ভিষগ্ভিরাপ্তৈরথ গর্ভভর্মণি।"[২১]

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এইমর্মে রাজাকে যথাকর্তব্য কাজ করার নির্দেশ মেলে—

"আপন্নসত্তায়াং কৌমারভৃত্যো গর্ভভর্মণি প্রজননে চ বিযতেত।"[২২]

শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ, নানাবিধ সংস্কার অনুষ্ঠান ও শিক্ষা আয়োজনের তথ্যও সাহিত্যে আছে। পুরূরবা ও উর্বশীর পুত্র দীর্ঘায়ু জন্মানোর পর পরই তাকে দেখভাল করার দায়িত্ব পড়েছিল চ্যবনের আশ্রমে জনৈকা তাপসীর হাতে। ঋষি চ্যবনই শ্রীমানের জাতকর্ম ইত্যাদি অনুষ্ঠান করেন। তার শাস্ত্র ও শস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়।

"এষ দীর্ঘায়ুঃ উর্ব্বশ্যা জাতমাত্র এব কিমপি নিমিত্তং প্রেক্ষ্য
মম হস্তে ন্যসীকৃতঃ। যথা ক্ষত্রিয়কুলীনস্য জাতকর্মাদিবিধানং
তদস্য তত্রভবতা চ্যবনেন সর্বমনুষ্ঠিতম্। ইদানীং গৃহীতবিদ্যো
ধনুর্বেদে চ বিনীতঃ।"[২৩]

রঘুবংশে আছে রঘুর জাতকর্ম অনুষ্ঠানের জন্য তপোবন থেকে পুরোহিত এসেছিলেন। কালিদাসের মন্তব্য—এই সংস্কারকর্ম খনি থেকে সংগৃহীত রত্নখণ্ডকে ঘসামাজা করে তোলার মতো "দিলীপসূনুর্মণিরাকরোদ্ভবঃ প্রযুক্তসংস্কার ইবাধিকং বভৌ ॥"[২৪] চূড়াকরণের পর সমবয়সী মন্ত্রিপুত্রের সঙ্গে একসঙ্গে রঘুর হাতেখড়ি হয়। এ যেন নদীর মোহনা ধরে বিদ্যার সমুদ্রে প্রবেশের সূচনা।

"স বৃত্তচূলশ্চলকাকপক্ষকৈরমাত্যপুত্রৈঃ সবয়োভিরন্বিতঃ।
লিপের্যথাবদ্গ্রহণেন বাঙ্ময়ং নদীমুখেনেব সমুদ্রমাবিশত্ ॥"[২৫]

উপনয়ন সংস্কারের পর শিক্ষকদের কাছে নিষ্ঠাবান্ ছাত্র হিসেবে চার সমুদ্রের তুল্য চারটি বিদ্যা দর্শন আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী (বেদ), বার্তা ও (রাজনীতি) দণ্ডনীতি শিখতে হয়েছিল রঘুকে তারপর রুরু হরিণের চামড়া পরিধান করে বাবার কাছে তার অস্ত্রশিক্ষা হয়।

"ত্বচং স মেধ্যাংপরিধায় রৌরবীমশিক্ষতাস্ত্রং পিতুরেব মন্ত্রবৎ।"[২৬]

এদিকে উমার বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে কালিদাসের সপ্রশংস উল্লেখ পাওয়া যায় এভাবে জন্মান্তরে অর্জিত বিদ্যারাশিও বুঝি এ জন্মে তার বিদ্যাচর্চার সঙ্গে একত্র হয়েছিল এ যেন শরতের গঙ্গাবক্ষে হংসমালার সমাগম, রাত্রিবেলায় ওষধিগর্ভে জ্যোতির সমাবেশ।

"তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ ॥"[২৭]

শিশুর নিরাপত্তার জন্য কত কি ব্যবস্থা লোকজীবনে প্রচলিত ছিল তার কিঞ্চিৎ হদিশ সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। শকুন্তলার পুত্র সর্বদমন মারীচের আশ্রমে বড় হচ্ছিল। তার জাতকর্ম অনুষ্ঠানের সময় ঋষি তার হাতে অপরাজিতা ওষধি বেঁধে দিয়েছিলেন। সেটা মাটিতে পড়ে গেলে সে নিজে বা তার মা-বাবা সেটা তুলে নিতে পারে বটে। অন্য কেউ হাত দিলেই তা কিন্তু সাপ হয়ে কামড়াবে। এমন ঘটনা নাকি তাপসীরা মাঝে মাঝে দেখেছেন। "মাতাপিতরৌ আত্মনং চ বর্জয়িত্বা অপরঃ ভূমিপতিতাং ন গৃহ্নাতি।...অথ গৃহ্নাতি...ততস্তং সর্পো ভূত্বা দংশতি।"[২৮]

এক্ষেত্রে ভাগবতপুরাণের দশম স্কন্ধের তথ্যও প্রচুর। যশোদা ও রোহিনী চামর ঘুরিয়ে সর্বতোভাবেও সম্যগরূপে বালকের রক্ষা করলেন। বালকে গোমূত্রে স্নান করিয়ে শরীরের বারোটি অঙ্গে গরুর ধুলোয় ও গোবর দিয়ে বিষ্ণুনাম লিখে শিশু কৃষ্ণের সুরক্ষাব্যবস্থার আয়োজন সেখানে বর্ণনা করতে দেখি।

"রক্ষাং বিদধিরে সম্যগ্ গোপুচ্ছভ্রমণাদিভিঃ।
গোমূত্রেণ স্নাপয়িত্বা পুনর্গোরজসার্ভকম্।
রক্ষাংচক্রুশ্চ শকৃতা দ্বাদশাঙ্গেষু নামভিঃ॥"[২৯]

এই শিশু এখন খেলছে, এখন গোবিন্দ তাকে রক্ষা করুক, সে এখন শুয়ে আছে এখন মাধব তাকে রক্ষা করুক।

পা, হাঁটু, উরু, কোমর, পেট, বুক, গলা, হাত, মুখ প্রতি অঙ্গের জন্য এক এক বিষ্ণুনাম স্মরণ করে প্রার্থনা এইভাবে আছে। একইভাবে ইন্দ্রিয়ের জন্য হৃষীকেশ, পঞ্চপ্রাণের জন্য নারায়ণ, মনের জন্য যোগেশ্বর, বুদ্ধির জন্য পৃশ্নিগর্ভ রক্ষাকর্তা বলে উল্লিখিত হয়েছে। যাওয়ার সময় বৈকুণ্ঠ, বসার সময় শ্রীপতি, খাওয়ার সময় যজ্ঞভোক্তা যেন রক্ষা করেন।

"ক্রীড়ন্তং পাতু গোবিন্দঃ শয়ানং পাতু মাধবঃ।
ব্রজন্তম্অব্যাদ্‌বৈকুণ্ঠ আসীনং ত্বাং শ্রিয়ঃ পতিঃ।
ভুঞ্জানং যজ্ঞভুক্ পাতু সর্বগ্রহভয়ঙ্করঃ॥"[৩০]

অর্থাৎ, ডাকিনী, রাক্ষসী, ছেলেধরা (বালগ্রহ), ভূত, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদি এবং উন্মাদ, অপস্মার ইত্যাদি দৈহিক পীড়া ও স্বপ্নদৃষ্ট উৎপাত ইত্যাদি মানসিক পীড়া থেকে রক্ষার জন্য, বিষ্ণুনামই উচ্চারণ করা হয়েছে।

"সর্বে নশ্যন্তু তে বিষ্ণোর্নামগ্রহণভীরবঃ।"[৩১]

ভাগবত এক পূতনা রাক্ষসীর গল্প শুনিয়েছে, যে বালঘাতিনী গ্রামে শহরে শিশুদের একে একে মেরে ফেলছিল—

"কংসেন প্রহিতা ঘোরা পূতনা বালঘাতিনী
শিশূংশ্চচার নিঘ্নন্তী পুরগ্রামব্রজাদিষু।"[৩২]

অলৌকিক কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত তার বিষদিগ্ধ স্তন্য পান করার ছলে তাকেই মেরে ফেলে। শকটাসুর, বকাসুর, সবাইকে জব্দ করে, কালিয়নাগকে দমন করে ভাগবতের শিশু কৃষ্ণ অনেক অসম্ভব ঘটনাই ঘটিয়েছে।

তবে শিশুর একান্ত পরিচয় তার ক্রীড়ায়। কৃষ্ণবর্ণনারত এক কবি হাত দিয়ে পা ধরে তা মুখে পুরতে দেখেছিলেন শিশুকে। হাত, পা, মুখ সবই তার পদ্মের মত সুন্দর। (করারবিন্দেন পদারবিন্দং মুখারবিন্দে বিনিবেশয়ন্তম্।) বটপাতায় শুয়ে থাকা এই বটকৃষ্ণে তাঁর অবিচল নিষ্ঠা। মন্দাকিনী নদীর তীরে বালুকারাশির মধ্যে সখীদের সঙ্গে কখনও বল কখনও পুতুল খেলে উমা— কুমারসম্ভবের এ দৃশ্যও সবার চেনা।

"মন্দাকিনীসৈকতবেদিকাভিঃ সা কন্দুকৈঃ কৃত্রিমপুত্রকৈশ্চ।
রেমে মুহুর্মধ্যগতা সখীনাং ক্রীড়াবসং নির্বিশতীব বাল্যে॥"[৩৩]

শকুন্তলাতনয় সর্বদমনের খেলা অবশ্য অন্যরকম। একটি সিংহশাবক তার সিংহীমায়ের স্তন্যপান করছে তার ঝুঁটি ধরে টেনে এনে শাবকটির দাঁত গুণতে চায় সে—

"জৃম্ভস্ব সিংহ, দন্তান্ তে গণয়িষ্যামি!
অর্ধপীতস্তনং মাতুরামর্দক্লিষ্টকেসরম্।
প্রক্রীড়িতুং সিংহশিশুং বলাত্কারেণ কর্ষতি ॥"[৩৪]

'সিংহীর বাচ্চাকে ছেড়ে না দিলে ওর মা তোমায় আক্রমণ করবে, বলতেই দুষ্টু হাসি হেসে মিছিমিছি ভয় পাওয়ার ভাব দেখিয়ে তার মন্তব্য— অহো বলীয়ঃ খলু ভীতোস্মি! অতঃপর মুখভঙ্গি করে নীচের ঠোঁট বেঁকিয়ে সে অবজ্ঞার ভাব বুঝিয়েছে। ঋষিকুমার মার্কণ্ডেয়ের রং দেওয়া মাটির ময়ূর দেখিয়ে তাপসী তার মনোযোগ আকর্ষণ করছিলেন। শকুন্তলাবণ্যং নিশাময় (পাখিটা কি সুন্দর, দেখ) বলতেই পাখির কথা ভুলে তার মা শকুন্তলার কথা মনে পড়ে যায়। মৃচ্ছকটিকে চারুদত্তের শিশুপুত্রের মাটির খেলনা গাড়ি (মৃৎ-শকটিকা) প্রসঙ্গ আমরা জানি। পাশের বাড়িতে বড়লোকের শিশুসন্তান সোনার খেলনা গাড়ি নিয়ে খেলে বলে তার দাবি ঐরকম গাড়ি তারও চায়! নায়িকা বসন্তসেনা ৬ষ্ঠ অঙ্কে ঐরকম গাড়ি দিয়েই শিশুটির সঙ্গে ভাব জমান। তাঁর গা ভর্তি গয়না দেখে শিশুটির অবাক বিস্ময় চাপা থাকেনি। "অশ্রুনি প্রভৃজ্য, (অলঙ্কারৈর্মৃচ্ছকটিকং পুরয়িত্বা) নরোদষ্যামি, গচ্ছ ক্রীড়। জাত, কারয় সৌবর্ণশকটিকাম্।"[৩৫]

বাল্যক্রীড়ার বর্ণনায় ভাগবতপুরাণ অনন্য। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ও বলরাম কোথাও বাঁশি (ভেঁপু) বাজায়, কোথাও গাছের ফল নিয়ে ঢিল ছোঁড়ে কিংবা লাট্টু ঘোরায়, কোথাও পায়ের মল বাজিয়ে ঝুমঝুম শব্দ করে।

"কৃচিদ্বাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ কৃচিৎ।
কৃচিৎ পাদৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ কৃচিৎ কৃত্রিমগোবৃষৈঃ ॥"[৩৬]

তবে সবচেয়ে মজার খেলা রাখাল বালকদের সঙ্গে মিলে গরুগরু খেলা। কেউ গরু কেউ ষাঁড় সেজে গোসুলভ আওয়াজ, চালচলন, গুঁতোগুঁতিতে তখন তারা মেতে ওঠে। অন্য জীবজন্তুর মত আওয়াজ করাও ছিল বৈকি

"বৃষায়মাণৌ নর্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তুংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥"[৩৭]

লুকোচুরি খেলে, সাঁকো নির্মাণ করে, বানরলাফ লাফিয়ে মহা আনন্দে কেটেছে সেসব দিন–

"এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে।
নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ ॥"[৩৮]

মিছিমিছি উপকরণ জড়ো করে খেলার চড়ুইভাতি আয়োজন। বন্য ফুল, পাতা, ফল, শেকড়বাকড় নুড়িপাথর দিয়েই বনভোজনের অন্নব্যঞ্জন সাজায় এই বালকের দল। যেন কত তৃপ্তি করে এক একটি পদ খাচ্ছে, এখন ভাব দেখিয়ে এই মানবশিশুরা পরমানন্দ আস্বাদ করেছে।

"কেচিৎ পুষ্পদলৈঃ কেচিৎ পল্লবৈরঙ্কুরৈঃ ফলৈঃ।
শিগ্‌ভিস্ত্বগ্‌ভির্দৃষদ্‌ভিশ্চ বুভূজুঃ কৃতভাজনাঃ।
সর্বে মিথো দর্শয়ন্তঃ স্বস্বভোজ্যরুচিং পৃথক্। হসন্তো হাসয়ন্তশ্চ ॥"[৩৯]

অশিক্ষায় কুশিক্ষায় এই পবিত্র শিশুচিত্তেও আবিলতা আসা সম্ভব, জানতেন শাস্ত্রকারেরা। সুশিক্ষার অভাবে রাজপুত্রদের কি হাল হতে পারে, পঞ্চতন্ত্রের শুরুতে বিষ্ণুশর্মা তা স্পষ্ট লিখেছেন। অজাতমৃতমূর্খেভ্যো মৃতাজাতৌ সুতৌ বরম্। যে জন্মায়নি বা জন্মেই মরেছে, তার চাইতে দীর্ঘজীবী মূর্খপুত্র অনেক বেশি পীড়াদায়ক। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পুত্র থেকে রক্ষণ বিষয়ে বলা হয়েছে– "রাজপুত্ররা তো কর্কটকের সগোত্র, পিতৃদ্রোহই নাকি তাদের স্বভাবধর্ম। কর্কটকসধর্মাণো হি জনকভক্ষা রাজপুত্রাঃ।"[৪০] সুতরাং জন্ম থেকেই তাদের সুরক্ষা চাই। আচার্যদের কেউ বলেছেন– মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দাও, কেউ বলেছেন প্রমোদ-উপকরণে ডুবিয়ে রাখ যাতে পিতৃদ্রোহের চিন্তা মাথায় না আসে– "তস্মাদ্ গ্রাম্যধর্মেষ্বনমবসৃজেয়ুঃ।

সুখোপরুদ্ধাঃ হি পুত্রাঃ পিতরং নাভিদ্রুহ্যন্তীতি।"[৪১] পূর্বাচার্য অর্থশাস্ত্রীদের এই সর্বনাশা দুর্বুদ্ধির নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে নিন্দা করে কৌটিল্য জানাচ্ছেন, নতুন জিনিসে যা যা মিশিয়ে দেওয়া হবে তাই তাতে যুক্ত হয়ে পড়বে। নতুন শিক্ষার্থীকে যা শেখাবে তাকেই সে যথার্থ বলে জানবে। "নবং হি দ্রব্যং যেন যেনার্থজাতেনোপদিহ্যতে তত্তদাচূষতি, এবময়ং নববুদ্ধির্যদ্যদুচ্যত তত্ত শাস্ত্রোপদেশমিবাভিজানাতি।"[৪২] ধর্ম ও অর্থ শব্দের তাৎপর্য যাঁরা জানেন, তাঁরা বুঝবেন, বস্তুবাদী কৌটিল্য এখানে শিশুর জন্য নির্মল আকাশ, সুস্থ পৃথিবীর আশ্বাসই দিতে চেয়েছিলেন।

বিশ্বনাথ কবিরাজ রচিত অলংকারগ্রন্থ সাহিত্যদর্পণই সুস্পষ্টরূপে বাৎসল্যকে দশম রস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেখানে বলা হয়েছে–

"অথ মুনীন্দ্রসংমতো বৎসলঃ —
স্ফূটং চমৎকারিতয়া বৎসলং চ রসং বিদুঃ।
স্থায়ী বৎসলতা- স্নেহঃ পুত্রাদ্যালম্বনং মতম্ ॥"[৪৩]

অর্থাৎ, এর পরে উল্লেখ করতে হয় মুনীন্দ্র (ভরত) সম্মত বাৎসল্যরস। চমৎকারিত্ব থাকার রস হিসাবে পরিগণিত। বাৎসল্যের স্থায়ীভাব স্নেহ এবং অবলম্বন পুত্রাদি।

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে দেবদেবী ও বীর বীরাঙ্গনাদের আধিপত্য ছিল বেশি। সমাজে শিশুদের স্থান ছিল অন্তরালে, সাহিত্যেও তারা যথাযোগ্য স্থানলাভ করেনি। সাহিত্যে অপত্য স্নেহ বা বাৎসল্যের পূর্ণ পরিচয় উপস্থিত করা সম্ভব নয়। তবে ক্রমবিবর্তনের আংশিক পরিচিতি থেকে জানা যায়। প্রাক ষোড়শ শতকের সাহিত্যে বাৎসল্যের দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত এই যুগের সাহিত্য ধর্মকেন্দ্রিক এবং পাত্র-পাত্রীরা দেব-দেবী অথবা বালগোপাল বা রামের মতো অবতার কিংবা দেবোপম ব্যক্তিত্ব। বেদে বাৎসল্যের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে দেবতাদের অবলম্বন করে। রামায়ণ মহাভারতে সেটা মানব হৃদয়ের নিকটতর হয়েছে। ভাগবত পুরাণের বালগোপাল অনেকটা আমাদের ঘরের ছেলে। দ্বিতীয়ত, বেদ, রামায়ণ, মহাভারতের যুগে বাৎসল্যানুভূতিতে যে সংযম ও গাম্ভীর্য দেখা যায় ক্রমশঃ তা শিথিল হয়ে ভাগবত পুরাণে আবেগে পরিণত হয়েছে। আবেগ যে গাম্ভীর্য ও সংযমকে অতিক্রম করেছে তার দৃষ্টান্ত দেখা যায় সংস্কৃত আঞ্চলিক ভাষার কাব্য নাটক সমূহে।

সংস্কৃত সাহিত্যে শিশুজীবনের বিভিন্ন স্তর যেমন–শিশুর জন্ম, প্রথম কথা বলা ও হাঁটতে শেখা, শিশুর স্পর্শে সুখ অনুভব করা, রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার অনুষ্ঠান ও শিক্ষার আয়োজন, শিশুর ক্রীড়া, শিশুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এইসব কিছুই এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১ রমেশচন্দ্র দত্ত (অনু.), *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (১ম খণ্ড), (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৬), ১।৬৯।৩, পৃ. ১৬৯।

২ রমেশচন্দ্র দত্ত (অনু.), *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (২য় খণ্ড), (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৮), ১০।১২৩।১, পৃ. ৬১৮।

৩ *তদেব*, ১০।৮৪।৪৫, পৃ. ৫৫৬।

৪ মহির্ষ যাস্ক, *নিরুক্তম্*, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য সম্পাদিত, (কলিকাতা : শ্রীকমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ১৯৮৭), ১।৩।৫, পৃ. ১৯০।

৫ বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত (১ম খণ্ড), (কলকাতা : বঙ্গবাসী মুদ্রণযন্ত্রে প্রকাশিত, ১৮৩০ শক-১৯০৮), আদিপর্ব ১১৮।৪০, পৃ. ১২১।

৬ বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত (২য় খণ্ড), (কলকাতা : বঙ্গবাসী মুদ্রণযন্ত্রে প্রকাশিত, ১৮৩০ শক-১৯০৮), আশ্রমবাসিকপর্ব ৩।১৯, পৃ. ২১০৫।

৭ কালিদাস, *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, শ্রী সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ, (কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৬) ৭।১৭, পৃ. ৫৩০।

৮ *তদেব*, ৭।১৯, পৃ. ৫৩৪।

[৯] কালিদাস, *বিক্রমোর্বশীয়ম্*, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, কালিদাসের গ্রন্থাবলী-৩য় ভাগ, (কলিকাতা : বসুমতি কর্পোরেশন লি. ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ), ৫।৯, পৃ. ৩০৫।

[১০] ভবভূতি, *উত্তরামচরিত*, ড. সীতানাথ আচার্য ও ড. দেবকুমার দাস সম্পাদিত, (কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৮), ৪।৪, পৃ. ১০৭।

[১১] কালিদাস, *রঘুবংশম্*, অশোককুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, (কলকাতা : সদেশ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ), ৩।২৬, পৃ. ১২৭।

[১২] কালিদাস, *রঘুবংশম্*, ৩।১৭, পৃ. ১২৩।

[১৩] কালিদাস, *কুমারসম্ভবম্*, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, কলিদাসের গ্রন্থাবলী-২য় ভাগ, (কলিকাতা : বসুমতি কর্পোরেশন ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ), ১।২৭, পৃ. ১৬।

[১৪] কালিদাস, *রঘুবংশম্*, ৩।২৫, পৃ. ১২৭।

[১৫] কালিদাস, *কুমারসম্ভবম্*, ১।২২, পৃ. ১৫।

[১৬] কালিদাস, *রঘুবংশম্*, ৩।২৩, পৃ. ১২৬।

[১৭] *তদেব*, ৩।২২, পৃ. ১২৫।

[১৮] কালিদাস, *কুমারসম্ভব*, ১।২৫, পৃ. ১৫।

[১৯] তদেব, ১।২৮, পৃ. ১৬।

[২০] কালিদাস, *রঘুবংশম্*, ৩।১৬, পৃ. ১২২।

[২১] *তদেব*, ৩।১২, পৃ. ১২০।

[২২] কৌটিল্য, *অর্থশাস্ত্রম্*, ড. মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত (১ম খণ্ড), (কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৪), ১। ১৭, পৃ. ৬৫।

[২৩] কালিদাস, বিক্রমোর্বশীয়ম্, ৫।৪৯, পৃ. ৩০৬।

[২৪] কালিদাস, *রঘুবংশম্*, ৩।১৮, পৃ. ১২৩।

[২৫] *তদেব*, ৩।২৮, পৃ. ১২৮।

[২৬] *তদেব*, ৩।৩১, পৃ. ১৩০।

[২৭] কালিদাস, *কুমারসম্ভবম্*, ১।৩০, পৃ. ১৭।

[২৮] কালিদাস, *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, ৭ম অঙ্ক, পৃ. ৫৪২।

[২৯] বেদব্যাস, *শ্রীমদ্ভাগবতম্*, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সংকলিত, ১০ স্কন্ধ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ (কলিকাতা : মহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ১৪০১ বঙ্গাব্দ), ১০।৬।১৯-২০, পৃ. ১০৬।

[৩০] *তদেব*, ১০।৬।২৫-২৬, পৃ. ১১০।

[৩১] *তদেব*, ১০।৬।২৯, পৃ. ১১০

[৩২] *তদেব*, ১০।৬।২, পৃ. ১০১

[৩৩] কালিদাস, *কুমারসম্ভব*, ১।২৯, পৃ. ১৬।

[৩৪] কালিদাস, *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, ৭।১৪, পৃ. ৫২৪।

[৩৫] শূদ্রক, *মৃচ্ছকটিকম্*, অবিনাশ চন্দ্র দে ও শুভেন্দু কুমার সিদ্ধান্ত সম্পাদিত (কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৭), পৃ. ৩১৩।

[৩৬] বেদব্যাস, *শ্রীমদ্ভাগবতম্*, ১০।১১।৩৯, পৃ. ২০৩।

[৩৭] *তদেব*, ১০।১১।৪০, পৃ. ২০৩।

[৩৮] *তদেব*, ১০।১১।৫৯, পৃ. ২০৮।

[৩৯] *তদেব*, ১০।১৩।৯-১০, পৃ. ২৩৭।

[৪০] কৌটিল্য, *অর্থশাস্ত্রম্*, ১।১৭/১, পৃ. ৬২।

[৪১] *তদেব*, ১।১৭/২, পৃ. ৬৩।

[৪২] *তদেব*, ১।১৭, পৃ. ৬৫।

[৪৩] বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণঃ*, শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও অনুবাদ, ২য় সংস্করণ, (কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ), ৩।২১৩, পৃ. ২৪২।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

উর্দু ভাষার উন্নয়নে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের অবদান (Contribution of Maulana Abul Kalam Azad in the development of Urdu language)

মোহা. আমিনুল ইসলাম*

Abstract: Maulana Abul Kalam Azad was one of the leading politicians, Islamic theologians and thinkers of the Indian subcontinent. He was a writer, dedicated independence activist of India and a doyen leader of the Indian National Congress of the time. At the special request of Mahatma Gandhi, he became the first Minister of Education in Independent India. He wanted to present education in a lively and enjoyable way. He intellectually resolves all the linguistic complexities that have arisen during his tenure. Despite working for a united India in whole life, it was ultimately not possible to avert the partition of India. He focused on the development and spread of Urdu language from an early age. He made great strides in the promotion and dissemination of Urdu language by publishing journals called *Lissan-us-Sidq*, *Al-Hilal* and *Al-Balagh* an Urdu weekly newspaper and by establishing organization for the progress of Urdu such as *Anjumane Taraqqi Urdu* and write the Article *Taraqqi Urdu aur tarazum uloom wa funun ka silsila*. Despite his great weakness for the language, he has always made neutral decisions. Although there was a conflict between Urdu and Hindi in India, He handled those situations efficiently. This article discusses short the Contribution of Maulana Abul Kalam Azad in the development of urdu language.

ভূমিকা

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ভারতীয় উপমহাদেশের নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদ, ইসলামি ধর্মতত্ত্ববিদ, চিন্তাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি একজন লেখক, ভারতের নিবেদিত প্রাণ স্বাধীনতা কর্মী এবং তৎকালীন ভারতীয় কংগ্রেসের একজন শীর্ষ নেতা। মহাত্মা গান্ধীর বিশেষ অনুরোধে তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষাকে প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য করে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। দায়িত্ব পালনকালে ভাষাগত যে সমস্ত জটিলতা তৈরি হয়েছিল তা বুদ্ধিমত্তার সাথে সমাধান দেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন অখণ্ড ভারতবর্ষের লক্ষ্যে কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। উর্দু ভাষার উন্নয়ন ও বিস্তারের লক্ষ্যে তিনি বাল্যকাল থেকেই মনোযোগী ছিলেন। *লিসানুস সিদক*, *আল-হিলাল*, *আল-বালাগ* পত্রিকা প্রকাশ করে এবং *আঞ্জুমানে তারাক্কি-ই উর্দু* প্রতিষ্ঠান ও *তারাক্কি উর্দু আওর তারাজ্জুম উলুম ওয়া ফুনুন কা সিলসিলা* প্রবন্ধ লিখে তিনি উর্দু ভাষার ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেন। এ ভাষার প্রতি ব্যাপক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ভারতবর্ষে উর্দু ও হিন্দি ভাষার মধ্যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল। মাওলানা আযাদ তাঁর অসামান্য দক্ষতার সাথে এ দ্বন্দ্ব নিরসনে চেষ্টা করেছেন এবং তিনি বহুলাংশে সফল হন। আলোচ্য প্রবন্ধে উর্দু ভাষার উন্নয়নে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের অবদান সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ পবিত্র মক্কা নগরীর কাদওয়া নামক মহল্লায় ১১ নভেম্বর ১৮৮৮ খ্রি. এক সুফি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতা মাওলানা খায়রুদ্দিন নাম রাখেন ‘ফিরোজ বখ্‌ত’ বা

* পিএইচ.ডি গবেষক, উর্দু বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

'সৌভাগ্যে মহীয়ান' (Exsalted destiny)। তাঁর নাম ছিল গোলাম মহিউদ্দিন আহমদ এবং দ্বিতীয় নাম ছিল আবুল কালাম আযাদ।[২] তিনি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিজ নাম ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে লিখেছেন। কখনও গোলাম মহিউদ্দিন আযাদ, কখনও ফকির আবুল কালাম, আবার কখনও আবুল কালাম আযাদ দেহলবী লিখেছেন। তবে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ নামেই পরিচিতি লাভ করেন।[৩] তিনি আব্দুল ওয়াহেদ খান সাহশরামীর সান্নিধ্যে এসে মাওলানা আযাদও কবিতার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। উপনাম হিসেবে গ্রহণ করেন 'আযাদ' এ কারণে যে আযাদ নামের প্রথম অক্ষর 'আলিফ' সুতরাং সবার প্রথমেই উচ্চারিত হবে।[৪]

মৌলানা খায়রুদ্দিন সিপাহি বিদ্রোহের কারণে ১৮৫৭ খ্রি. পবিত্র মক্কায় চলে যান। সেখানে তিনি আরবের বিখ্যাত হাদিস বিশারদ ও মদিনা মুনওয়ারার মুফতি শায়খ আহমদ জাহের ওয়া তুরির কন্যা আলিয়া বেগমকে বিয়ে করেন। ১৮৯৫ খ্রি. তাঁর পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেলে ১৯৯৮ খ্রি. উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসেন এবং মুরিদদের অনুরোধে স্বপরিবারে স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন।[৫] আযাদকে বাল্যকালে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম-কানুনের মধ্যে অতিবাহিত করতে হয়। তাঁর পীর পিতার ধারণা ছিল, প্রচলিত সামাজিক পরিবেশের কারণে আমার সন্তানরা প্রভাবিত হলে বাড়ির নিয়মানুবর্তিতা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে না। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা করার সুযোগ দেওয়া হয়নি, এমনকি বাইরে ইচ্ছে মতো খেলাধুলা করা বা ঘুরাঘুরি করারও কোনো সুযোগ ছিল না। প্রথম দিকে মৌলানা খায়রুদ্দিন সন্তানদের নিজেই তিন বেলা পড়াতেন পরবর্তী সময়ে পিতার অসুস্থতার কারণে বিষয় ভিত্তিক নির্বাচিত গৃহ শিক্ষকদের নিকট পড়াশোনা করেন।[৬] অত্যন্ত মেধাবী মাওলানা আযাদ মাত্র ১৫ বছর বয়সে 'দারসে নিজামী'র মতো কঠিন পাঠগ্রহণ শেষ করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের প্রবন্ধ পড়ে নতুন জ্ঞানের সন্ধান পান। তিনি অনুভব করেন কোন মানুষের পক্ষে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ব্যতীত প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব নয়। আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা অর্জন করতে হলে ইংরেজি শিক্ষা অর্জন করা অতীব জরুরি। মাওলানা আযাদ মাওলানা ইউসুফ জাফরীর নিকট ইংরেজি শিক্ষার প্রাথমিক পাঠগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষার্জন করেন। ইঞ্জিল গ্রন্থ পড়ার সময় উর্দু, ফারসি ও ইংরেজির তিনটি কিতাব সামনে নিয়ে পড়তেন। অভিধানের সহায়তা নিয়ে ইংরেজি পত্রিকা পাঠ করতেন।[৭] সঙ্গীত প্রিয় মাওলানা আযাদ পিতার এক মুরিদ মুসিতা খানের বাড়িতে সঙ্গীত চর্চা ও সেতারা বাজানো শিখেন। আযাদ বলেন-

> "আমি সমস্ত কিছুর অনুপস্থিতি মানতে পারব, কিন্তু সঙ্গীত-এর অনুপস্থিতি আমি মানতে পারব না। সঙ্গীত আনন্দের উৎস, মনের খোরাক, স্বাস্থ্য ও হৃদয়ের পাথেও।"[৮]

সুফি পরিবারে বেড়ে উঠা আযাদ পিতার মৃত্যুর পর নিজেকে শৃঙ্খলমুক্ত মনে করেন। নিজেকে প্রশ্ন করেন, ধর্মের লক্ষ্য যদি এক হয় তাহলে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এত ভেদাভেদ কেন? দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণে কিছুদিন ধর্ম পালন ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়লেও দ্রুতই কলুষিত পথ পরিত্যাগ করেন।[৯] শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মাওলানা আযাদকে বরোদার অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। অরবিন্দ ঘোষের পাশ্চাত্য জ্ঞান ও দার্শনিক বক্তব্য আযাদকে প্রভাবিত করে। সেখান থেকেই স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক হয়ে উঠেন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ। দেশপ্রেমিক আযাদ হিসেব করে দেখেন মুসলমানরা স্বাধীনতা নিয়ে পাকিস্তান চলে যেতে চাইলেও ভারতের সকল মুসলমান পাকিস্তান চলে যেতে পারবে না। তাহলে তাঁদের কী হবে? এছাড়া ভারতে পিতৃ পুরুষের যে ইতিহাস, ঐতিহ্য মুসলমানরা হাজার বছর ধরে তৈরি করেছে তা কীভাবে ছেড়ে দিতে পারি? বরং সকল ধর্মের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে উন্নত ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে পারে। এই মূলমন্ত্রকে বুকে ধারণ করেই ১৮৯৯ খ্রি. থেকে রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন।[১০]

১৯১২ খ্রি. *আল-হিলাল* পত্রিকার মাধ্যমে তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতবর্ষ স্বাধীন করার জন্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানান। এই পত্রিকার জনপ্রিয়তা এতোটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, মাত্র তিন মাস পরেই এর পুনর্মূদ্রণ ছাপাতে হয়। ব্রিটিশ সরকার পত্রিকার গতি-প্রকৃতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। পত্রিকার গতি থামিয়ে দেওয়ার জন্য প্রথমে দুই হাজার টাকা পরবর্তীতে আবার দশ হাজার টাকা জামানত চায়। মাওলানা আযাদ সে টাকা জমাও দেন। সর্বশেষ প্রেস বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে প্রকাশনা বন্ধ করে দেন। এরপর তিনি *আল-বালাগ* নামে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ সরকার বাংলা ছাড়ার আদেশ জারি করলে তিনি রাঁচিতে অবস্থান গ্রহণ করেন। ফলে পত্রিকা প্রকাশ অব্যাহত রাখতে চাইলেও অন্তরিন থাকার কারণে সম্ভব হয়ে উঠেনি।[১১] মাওলানা আবুল কালাম আযাদ জীবনের প্রথম ৩৫ বছর পত্রিকা সম্পাদনা, সাহিত্য চর্চা, তাফসির গ্রন্থ প্রণয়নসহ নানা কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকেন। পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে দেশ সেবাই নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।[১২] ১৯১৯ খ্রি. অন্তরিন থেকে মুক্তি লাভ করেন। ১৯২০ খ্রি. মহাত্মা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দেশ স্বাধীন করার জন্য কংগ্রেস রাজনৈতিক দলের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২৩ খ্রি. মাত্র ৩৫ বছর বয়সে সবচেয়ে কম বয়সী কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। মাওলানা আযাদ ১৯৩৯-১৯৪৬ খ্রি. ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় সাত বছর কংগ্রেস দলের সভাপতির দায়িত্ব পালন এবং অখণ্ড স্বাধীন ভারতের দাবিতে বহুবার কারাবরণ করেন। দেশের ক্রান্তিলগ্নে তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করে দেশ স্বাধীন করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় ২৬ এপ্রিল ১৯৪৬ খ্রি. দলের সিদ্ধান্তে সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ান। '*ভারত স্বাধীন হলো*' গ্রন্থে মাওলানা আযাদ রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলগুলো উল্লেখ করেন। ১. কংগ্রেস দলের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া এবং অনেক বাঘা বাঘা নেতার অনুরোধেও নিজের নাম পদ প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা না করা। এটা ছিল আমার রাজনৈতিক জীবনের মারাত্মক ভুল। ২. কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সর্দার প্যাটেলের নাম ঘোষণা না করে জহওর লাল নেহরুর নাম ঘোষণা করা। ৩. অন্তর্বর্তী সরকারে নিজেকে মন্ত্রীপরিষদ থেকে নিজেকে বাইরে রাখা। এ জন্য আমাকে জীবনের সর্বোচ্চ খেসারত দিতে হয়েছে এবং অখণ্ড ভারতবর্ষ রক্ষা করা যায়নি।[১৩] সর্বশেষ একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধেই খণ্ডিত স্বাধীন ভারতের শিক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ভারতের শিক্ষার ভিত গড়ে দেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করেন এবং ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ খ্রি. এই মহান ব্যক্তি পরলোক গমন করেন।[১৪]

উর্দু ভাষার উন্নয়নে মাওলানা আযাদের অবদান

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ পিতা ও গৃহ শিক্ষকের নিকট উর্দু ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করে উর্দু ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর নেতৃত্বে *লিসানুস সিদক*, *আল-হিলাল* ও *আল-বালাগ* পত্রিকা প্রকাশিত হতো। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ আজও তাঁর পাণ্ডিত্যের দৃষ্টান্ত বহন করে।

১৯০৩ খ্রি. 'All india Muhamadan Educational Conference' এর বাৎসরিক সভায় তিনটি শাখা সংগঠনের উৎপত্তি ঘটে। তন্মধ্যে উর্দু ভাষার উন্নয়নের জন্য যে সংগঠনটির জন্ম হয় তা হলো *আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু।* উক্ত সংগঠনের অন্যতম সদস্য ছিলেন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ। তাঁর সম্পর্কে মোস্তাক হোসাইন *বাকিয়াতে শিবলী* পত্রিকায় লিখেন-

> "مولانا ابول الکلام صاحب کی شرکت سے .بنگل میں انجمن کی اشاعت کی قومی امید ہے کیوں کہ آپ نہایت ہمدردی سے انجمن کی اعانت فرما رہے ہیں اور ہر کام میں بہت سر گرمی سے حصہ لیتے ہیں"[15]
>
> "মাওলানা আবুল কালাম আযাদ *আঞ্জুমানে তারাক্কি-ই উর্দু* প্রতিষ্ঠানে যোগদানের ফলে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁর তত্ত্বাবধানে ও আন্তরিক কর্ম তৎপরতায় *আঞ্জুমানে তারাক্কি-ই উর্দু* প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপক সফলতা অর্জন করে।"

আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু সংগঠনের কর্মপন্থা বিস্তৃতির লক্ষ্যে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তন্মধ্যে অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনুবাদের মাধ্যমে অন্যান্য ভাষার মূল্যবান পুস্তকসমূহ উর্দু ভাষীদের নিকট তুলে ধরে দেশ ও জাতিকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার চেষ্টা করেন। ইংরেজি, আরবি, ফারসি ভাষায় রচিত সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের পুস্তকসমূহ সহজ-সরল ও সাবলীল উর্দুতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। তিনি অনুবাদ গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করে তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি, পাঠক বৃদ্ধির জন্য প্রণোদনা প্যাকেজও চালু করেন। প্যাকেজ হিসেবে ছিল এ প্রতিষ্ঠান থেকে বছরে পাঁচ টাকার পুস্তক ক্রয় করলে তিন/চার দফা অন্যান্য বই পাঠের সুযোগ পাবে। এভাবে তিনি পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধিসহ সাধারণ পাঠককেও নিয়মিত ও মনোযোগী পাঠক হিসেবে গড়ে তোলেন। মাওলানা আযাদ তাঁর নিজ তত্ত্বাবধানে ১৯০৪ খ্রি. কলকাতায় *আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু* এর শাখা স্থাপন করে উর্দু ভাষার উন্নয়নে কাজ করেন। *আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু* সংগঠনের সাথে মাওলানা আযাদের নিবীড় সম্পর্ক তৈরি হয়। তিনি ১৯০৩-১৯৫৮ খ্রি. আমৃত্যু এ সংগঠনের মাধ্যমে উর্দু ভাষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। ১৯৪৮ খ্রি. বাবায়ে উর্দু মৌলবী আব্দুল হক পাকিস্তানের করাচিতে *আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু*র দপ্তর স্থানান্তরের জন্য মাওলানাকে পত্র লিখেন কিন্তু মাওলানা আযাদ এতে সম্মতি দেননি। *আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু*র কার্যালয় দিল্লী থেকে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তর করে তিনি প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সচল রাখেন।[১৬] মাওলানা আযাদ ছাত্র বান্ধব এবং প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ ড. জাকিরকে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ দেন। বৈজ্ঞানিক, তথ্য প্রযুক্তি, অনুবাদ গ্রন্থ, সাহিত্যসহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পর্যাপ্ত মান সম্পন্ন গ্রন্থরাজি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের মাধ্যমে একটি ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই পদ্ধতিটি মূলত কোনো ভাষার উন্নয়ন রেখা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধানতম মাপকাঠি। এই সূচককে সামনে রেখেই মাওলানা আবুল কালাম আযাদ উর্দু ভাষার সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও পরামর্শ প্রদান করেন।[১৭]

মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সুখ্যাতি 'লিসানুস সিদক' পত্রিকার মাধ্যমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন তাঁর বয়স পনেরো বছর। এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্যই ছিল উর্দু ভাষার উন্নয়নে কাজ করা। মাওলানা আযাদ বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী এবং ছোটকাল থেকেই পড়াশোনাই বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। অতি অল্প বয়সে তিনি ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, ভাষা ও সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। *লিসানুস সিদক* পত্রিকাটির মাধ্যমে তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'Redemption through truth and death through falsehood' 'সত্যের মুক্তি এবং মিথ্যার পরাজয়' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ২০ নভেম্বর ১৯০৩ খ্রি. প্রকাশিত *লিসানুস সিদক* পত্রিকায় নিম্নোক্ত বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেন:

1. Social reform i.e. reform in Muslim society and customs.
2. Promotion of Urdu, i.e. extending the scope of scholarly literature in the Urdu language.
3. Propagation of literary taste. Particularly in Bengal.
4. Criticism, i.e. objective reviews of Urdu publications.[18]

পনেরো বছর বয়সে মাওলানা আযাদ *লিসানুস সিদক* পত্রিকায় যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা চরম সাহসিকতার বহি:প্রকাশ। পত্রিকার বিষয়বস্তু নির্ধারণ সকলের নিকট সমভাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। মানসম্পন্ন সুন্দর লেখা পাঠকের হৃদয়কে আন্দোলিত করে। ফলে *লিসানুস সিদক* অতি দ্রুত অন্যান্য স্বনামধন্য পত্রিকার ন্যায় সুনাম অর্জন করে। নব নক্ষত্রের আবির্ভাবে সমসাময়িক স্বনামধন্য কবি, সাহিত্যিক ও সাধারণ পাঠক তাঁর নতুন আঙ্গিকের লেখা পড়ে মনে করতেন, এই লেখক ও সম্পাদক অত্যন্ত মেধাবী, প্রবীণ এবং বুদ্ধিমান। পত্রিকার প্রচার ও প্রসার সর্বোপরি প্রশংসা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। '*আঞ্জুমানে হেমায়েত ইসলাম*' লাহোরে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশাল সাহিত্য সংগঠন। উক্ত সংগঠনের উদ্যোগে প্রতি বছর জাঁকজমকের সাথে কয়েক দিন ব্যাপী সমাবেশের আয়োজন করা হতো। এই সভায়

দেশবিদেশের স্বনামধন্য কবি সাহিত্যিকদের আহ্বান করতেন। ১৯০৪ খ্রি. সভায় মাওলানা আযাদকে নয় *লিসানুস সিদক* এর সম্পাদক আযাদকে আহ্বান করা হয়। যার ক্ষুরধার লেখনিতে ইতঃপূর্বেই সবাই মুগ্ধ ও বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন।[১৯] *লিসানুস সিদক* পত্রিকাটি নভেম্বর ১৯০৩ খ্রি. থেকে মে ১৯০৫ খ্রি. পর্যন্ত চালু ছিল। উল্লেখ্য যে, পত্রিকাটি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হতো। অধিকাংশ লিখাতে উর্দু ভাষার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধান দেওয়া হয়।[২০] মাওলানা আযাদ উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য *লিসানুস সিদক* পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরতেন। এ পত্রিকার এক সংখ্যায় তিনি নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের আহ্বান জানান এবং বাস্তবায়নের সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

১)اردو شارٹ ہینڈ رائیٹنگ (উর্দু শর্ট হ্যান্ড রাইটিং)

২)ملکی زبان سے غفلت (জাতীয় ভাষার প্রতি অবহেলা)

৩)دار السلطنت ہند میں ایک عمدہ پریش کی ضرورت (রাজধানীতে উন্নতমানের প্রেসের প্রয়োজনীয়তা)

৪)اردو انسائیکلوپیڈیا (উর্দু বিশ্বকোষ)

৫)دیسی اور ولایتی الفاظ (দেশি এবং বিদেশি শব্দ)

৬)ترقی اردو اور تراجم علوم وفنون (উর্দু ভাষা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক পুস্তকাদির অনুবাদ)

মাওলানা গোলাম রসুল (মুম্বাই) উর্দু শর্ট হ্যান্ড রাইটিং এর আবিষ্কারক । দ্রুত নোট লিখার ক্ষেত্রে শর্ট হ্যান্ড রাইটিং বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মাওলানা আযাদ এই পদ্ধতিটিকে সাদরে গ্রহণ করেন। কেননা একটি ভাষার সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, মাওলানা আযাদ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে উর্দু শর্ট হ্যান্ড রাইটিং পদ্ধতি অবলম্বনে *কাউলে ফায়সাল* বা *চূড়ান্ত জবানবন্দি* লিখেন এবং তা আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থাপন করেন। এটি একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃত ও সমাদৃত। তিনি মনে করতেন, অফিস-আদালত, সাংবাদিকতা, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উর্দু শর্ট হ্যান্ড রাইটিং-এর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। মাওলানা আযাদ উর্দু ভাষা শিক্ষা ও উন্নয়নের গুরুত্ব আরোপ করে যুবকদের প্রতি অভিযোগ করে বলেন-

> "ہمارے نوجوان کی علمی زبانوں میں عبور حاصل کرتے ہیں لیکن اپنی ملکی زبان سے غفلت برتتے ہیں- حالانکہ مہذَب دراصل وہی شخص ہے، جو اپنی قومی اور مذہبی لٹریچر کے ساتھ واقف ہو- مولانا نے توقع ظاہر کی ہے کہ جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اپنی ملکی اور قومی زبان کی تحصیل کی بھی سعی کرنی چاہئے-"[২১]
>
> "আমাদের তরুণরা অ্যাকাডেমিক ভাষা আয়ত্ত করছে কিন্তু স্বদেশি ভাষা শিক্ষার প্রতি অবহেলা রয়েছে। জাতীয় ব্যক্তিত্ব হলো যিনি জাতীয়তা ও জাতীয় সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞাত। মাওলানা আযাদ আশা করেন যে, তারা যেন স্বদেশি ভাষা ও এ ভাষায় সৃষ্ট সাহিত্যে জ্ঞান অর্জন করে এবং বিদেশি ভাষা শিখে নিজেকে দক্ষ করে।"

একটি ভাষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নত মানের প্রেসের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ বিষয়টি মাওলানা আযাদ গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। ১৯০৪ খ্রি. *লিসানুস সিদক* পত্রিকায় عمدہ پریس کی ضرورت শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করে প্রেসের গুরুত্ব বিশদভাবে তুলে ধরেন।

বিশ্বকোষ এমন একটি জ্ঞান সমৃদ্ধ তথ্য ভান্ডার যার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করে কোনো ভাষার সাহিত্য, জাতি গোষ্ঠীর প্রকৃতি ও জীবন ধারা, ইত্যাদি বিষয় প্রকাশের এক অন্যতম মাধ্যম। মাওলানা আযাদ বিশ্বকোষ এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে উর্দু ভাষায় একটি বিশ্বকোষ সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং সফলও হন। মাওলানা আযাদ বিশ্বকোষ সংকলনের উদ্দেশ্যে যে উপদেশ প্রদান করেছিলেন তা হলো-

"فی الحقیقت اردو میں انسائیکلوپیڈیا کی اشد ضرورت ہے ارو انجمن ترقی اردو کو ضرور اس پر توجہ کرنی چاہیے۔
اس کی ترتیب کے متعلق ایک اور آسان تجویز ہے، جو پیش کر دی جائے گی۔"[22]

"প্রকৃতপক্ষে, উর্দুতে বিশ্বকোষের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। উর্দু বিশ্বকোষ লিখতে *আঞ্জুমানে তারাক্কিয়ে* উর্দু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, বিশ্বকোষ লিখার জন্য সুসংবাদ রয়েছে।"

উর্দু ভাষায় অন্যান্য ভাষার শব্দ ব্যবহৃত হয়। উর্দু ভাষার সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বিদেশি শব্দ ব্যবহারে সতর্ক ছিলেন। তিনি প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্র ব্যতীত বিদেশি শব্দ ব্যবহার করতেন না এবং অন্যদেরকেও ব্যবহার না করার পরামর্শ দিতেন। যেমন- بیوگرافی اور لائف এর পরিবর্তে سیرات، سوانح عمری اور حیات আবার گورنمنٹ এর পরিবর্তে حکومت و دولت এবং لٹریچر এর পরিবর্তে ادب وادبی دنیا এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত মনে করেছেন। কিন্তু যে সমস্ত অপ্রচলিত শব্দাবলি পাঠক ও শ্রোতাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে, এ সমস্ত ক্ষেত্রে সরাসরি বিদেশি শব্দ ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন-کیمیا এর পরিবর্তে کیمسٹری ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন। মাওলানা আযাদ অনুবাদের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। উর্দু একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত ভাষা। উর্দু ভাষার সমৃদ্ধি বিস্তারে অন্যান্য ভাষার সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ব্যবসা বিষয়ক পুস্তকাবলি উর্দুতে অনুবাদের জন্য তিনি আহ্বান জানান।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ খ্রি. এবং এপ্রিল ১৯০৫ খ্রি. *তারাক্কি উর্দু আওর তারাজ্জুম উলুম ওয়া ফুনুন কা সিলসিলা* শিরোনামে প্রবন্ধটি দুটি অংশে প্রকাশ করেন। প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেন যে, উর্দু ভাষী জনগণ কীভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জন করবে? উর্দু ভাষাকে জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষা হিসেবে পরিগণিত করার জন্য বিভিন্ন কলাকৌশল ব্যাখ্যা করে অনুবাদকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি বিভিন্ন ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ তৈরি করেন। ইউরোপিয়ান ভাষায় রচিত আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয় ধারাবাহিকভাবে অনুবাদ করার ব্যবস্থা করেন।[২৩]

মাওলানা আবুল কালাম আযাদের মতে, উর্দু ভাষা এমন এক সময় সৃষ্টি হয়েছে যখন মুসলিম বিশ্বে জ্ঞান চর্চার গতিধারা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। তিনি একজন বিজ্ঞ ভাষাবিদ। উর্দু, আরবি ও ফারসি ভাষায় তাঁর বিশেষ দখল থাকার কারণে প্রত্যেকটি শব্দ কোন অবস্থায় কী হিসেবে ব্যবহার হবে তা জানতেন। উর্দু ভাষায় স্ত্রী-পুরুষ শব্দের ব্যবহার, کو এর ব্যবহার, শব্দ চয়ন ও যুক্তিপূর্ণভাবে বাক্য গঠনে কৌশলী ছিলেন। ফারসি শব্দ ব্যবহারেও সমভাবে কৌশল ব্যবহার করেছেন। মুহাবেরা, সাহেব-সাহেবাহ্‌, বিবি ও বেগম, বেগম ও খানম এ সকল শব্দের পার্থক্য এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকল খুঁটিনাটি বিষয়ও বাদ দিতেন না।[২৪]

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ উর্দু লিপি ও বানানের বিষয়েও সতর্ক থাকতেন। কারণ অনেকে *উর্দু রেসমুল খত আওর উর্দু আমলা* অর্থাৎ উর্দু শব্দ ও বানান দু'টি আলাদা বিষয় হলেও একত্রিত করে ফারসির সাথে জড়িয়ে ফেলেন। তিনি উর্দু হরফ এবং শব্দের ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত থাকার জন্য আহ্বান জানান। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেন-

"یہ عجیب بات ہے کہ چلتی ریل میں انگریزی لکھیے تو کوئ وقت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن اردو لیکھے تو لکھا نہیں جاتا اور حرکت قلم چلنے نہیں دیتی۔ جو لوگ سامی رسم الخط کے مخالف ہیں، وہ اگر چاہیں تو اپنے دلائل میں اس نئ دلیل کا بھی اضافہ کرلیں۔ بات یہ ہے کہ عربی'فارسی'رسم الخط میں دوائر بنتے ہیں، مجض اوپر نیچے ہونے والی لکیریں نہیں ہوتیں جیسی

> کہ لاطینی ہینڈ رائٹنگ میں ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اول الذکر بغیر کامل سکون کے لکھا نہیں جاسکتا حرکت سے دوائر کے زاویے بگڑ جاتے ہیں، مگر لاطینی خط پر اس کا اثر نہیں پڑتا۔ ہاتھ کتنا ہی ہلے، لکیریں کھنچتی ہی چلی جائیں گی[25]۔"
>
> "আশ্চর্য হলেও সত্য যে, চলন্ত ট্রেনে ইংরেজি লিখার সময় কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু উর্দু লিখা যায় না, কারণ উর্দু লিখার সময় যেন কলমও নড়ে না। যারা সেমিটিক লিপির বিরোধী তারা ইচ্ছা করলে তাদের যুক্তির সাথে নতুন যুক্তি সংযুক্ত করতে পারে। প্রকৃত পক্ষে, আরবি ও ফারসি ভাষার লিপিতে লিখতে সমস্যা হয়। ল্যাটিন ভাষার লিপিতে উপরে নিচে লাইন নেই, এ কারণে লিখতে সমস্যা হয় না। কিন্তু উর্দু লিখতে হলে নিখুঁত প্রশান্তি প্রয়োজন।"

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে (املا اور علامتِ تحریر) *বিরাম চিহ্ন* শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এ প্রবন্ধ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মৃত্যুর পরে তিনি বিশদভাবে সংশোধনমূলক প্রবন্ধ লিখে উর্দু পাঠক মহলে গতির সঞ্চার করেন যা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।[২৬] মাওলানা আযাদ জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক। তাই ভারতের জাতীয়তাবাদ যেন আন্তর্জাতিক ও উদার মানবতাবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে এ বিষয়ে তাঁর প্রচেষ্টা আজীবন অব্যাহত ছিল। এ ক্ষেত্রে ২৯ মার্চ ১৯৫৪ খ্রি. লোকসভায় প্রদত্ত তাঁর বক্তব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তামিল ভাষায় একটি এনসাইক্লোপিডিয়া প্রকাশনার জন্য আশি হাজার টাকা এবং উর্দু গ্রন্থের বিশিষ্ট প্রকাশক শিবলী অ্যাকাডেমির জন্য ষাট হাজার টাকা এককালীন অনুদান প্রদান করার জন্য দুইজন হিন্দি প্রেমী সাংসদ বিরোধিতা করে প্রশ্ন করেন– এই অনুদান ভারতের সরকারি ভাষা হিন্দির প্রচার ও প্রসারে সরকারের অনীহা অন্যদিকে ইসলামি সংস্কৃতি প্রচারে সরকারের আগ্রহের প্রমাণ বহন করে। সে সময় শিক্ষা মন্ত্রকের বাৎসরিক বাজেট চৌদ্দ কোটি টাকা। সংবিধানে স্বীকৃত ভাষা তামিল ও উর্দু, তা সত্ত্বেও টাকা বরাদ্দ নিয়ে আপত্তি উঠলে শিক্ষা মন্ত্রী মাওলানা আযাদ ক্ষোভ প্রকাশ করে।[২৭] লোকসভায় তিনি যে বক্তব্য রাখেন তার সারাংশ নিম্নরূপ:

> "উর্দু কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভাষা নয়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টানসহ আরও অনেক জাতিগোষ্ঠী এ ভাষার সঙ্গে সমান ভাবে পরিচিত। যদি প্রশ্ন করেন কেবল মুসলমানরাই উর্দু বলে, তা অবশ্যই সত্য নয়। এ ছাড়াও ভারতে সাড়ে চার কোটি মুসলমান তো রয়েছেন। যে অ্যাকাডেমি উর্দু ভাষার উল্লেখযোগ্য সেবা করছেন, উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ষাট হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। এ কারণে আপনারা মুসলিম সংস্কৃতির প্রসারের প্রয়াস আখ্যা দিয়ে কি এর বিরোধিতা ও বিরূপ সমালোচনা করবেন? যারা বিরোধিতা করে সমালোচনার ঝড় তুলছেন, তারা কি হিন্দি প্রেমী? তা কিন্তু নয়। আমাদের এ নীতির সমালোচনাকারীরা তাঁদের হিন্দি প্রেমের কারণে এমন করছেন না। অপর কোনো ভাষার উন্নতি তাঁদের পছন্দ নয় বলেই এই প্রতিবাদ। আপনারা সুউচ্চ শিখরে ওঠার অভিলাষী হলে অবশ্যই উঠবে কিন্তু অপর কাউকে পদদলিত করে নয়। এটা সঠিক পন্থা নয়। এর অর্থ হলো আপনারা হিন্দির উন্নতি চান না, অপরাপর ভাষার অবনতি প্রয়াসী। এই দৃষ্টিভঙ্গি খারাপ। এই মনোভাবের জন্য হিন্দির যতটা প্রসার হওয়া উচিত, তা হচ্ছে না। দক্ষিণ ভারতে হিন্দির বিরোধিতার মূলে কি কারণ? আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমরা ভারতের অপর কোনো ভাষার বিরোধিতা না করি। স্পষ্ট কথা হলো এই যে, দ্বিজাতিতত্ত্ব ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কারণে এ দেশের উপর যে দুর্ভোগের কাল ছায়া নেমে এসেছে তা এ জাতীয় মানসিকতার পরিণতি। দেশ বিভাজনের জন্য ভুল পথে পরিচালিত মুসলমান সম্প্রদায় ও মুসলিম লীগও এই মানসিকতার জন্য দায়ী। আপনারা জানেন যে আমি বরাবরই এ সব বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তির বিরোধিতা করে এসেছি। আমি বলেছি যে এ জাতীয় মানসিকতা ভারতের প্রগতিশীল হিন্দু

> জনমানসের প্রতিনিধিত্ব করে না। হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হচ্ছেন গান্ধীজি ও তাঁর সহযাত্রীরা। মুসলমানদের দৃষ্টি বার বার আমি এই তথ্যের প্রতি আকর্ষণ করেছি। আবার আমি আপনাদের বলব যে যত দিন আপনারা এই সঙ্কীর্ণ চিত্তের পরিচয় দিতে চান, আপনাদের উদ্দেশ্য পূরণ হবে না।"[২৮]

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টভাষী, নিরপেক্ষ, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একজন উদার রাজনীতিবিদ। দেশ ও জাতির স্বার্থে তাঁর যৌক্তিক ও বাস্তব সম্মত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে তিনি কখনই কুণ্ঠিত হতেন না। দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি ও ভাষার উন্নয়নে সংখ্যাগত বিষয়কে মুখ্য না করে বরং প্রয়োজনের তাগিদেই গুরুত্ব আরোপ করছেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করে মাওলানা আযাদ, প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, গবেষণা সংস্থা স্থাপন, আইআইটি স্থাপন, ললিত কলা অ্যাকাডেমি স্থাপন, জাতীয় সংগ্রহশালা ও জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপন, সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি স্থাপন, সাহিত্য অ্যাকাডেমি স্থাপনসহ আরও অনেক বিষয়ের সূচনা করে যান। প্রচুর বাজেট সংকট থাকা সত্ত্বেও থেমে থাকেনি। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর যে গভীর দৃষ্টি ভঙ্গির বাস্তবায়ন ঘটেছে তা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) ভাষা নিয়ে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের প্রতি লক্ষ্য করলেই প্রমাণিত হয়।[২৯] 'নিজ দেশে নিজেদের মধ্যে নানা মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সংহত করতে না পারলে, সে দেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ঐক্যবদ্ধভাবে একসুরে কথা বলতে পারবে না।' মাওলানা আযাদ এই মৌল চিন্তাকে গভীরভাবে অনুধাবন করতেন এবং প্রতিটি কর্মকাণ্ডে ধর্মনিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থভাবে তাঁর চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। অশিক্ষা কুশিক্ষা মানুষের প্রাণের স্বত:স্ফূর্ত আনন্দ প্রকাশের উৎসমুখ বন্ধ করে দেয়। মাওলানা আযাদ শিক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্বে তখন সেন্ট্রাল অ্যাডভাইজারী বোর্ড অব এডুকেশন এবং ভারত সরকার সুপারিশ করে যে, প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু ভারতের এত ভাষা ও জাতি গোষ্ঠীর মাঝে কিছু প্রদেশে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। কারণ প্রদেশের ভাষা ও মাতৃভাষা এক নয়। আবার কখন পাঠদান মাতৃভাষা থেকে প্রাদেশিক ভাষায় পরিবর্তিত হবে তা স্পষ্ট নয়? মাওলানা আযাদের নিকট এ রকম নানাবিধ জটিল সমস্যার সমাধান চেয়েছেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তার সমাধান দেন। শুধু এই কারণেই ভাষা সমস্যার মতো জটিল বিষয় লাগাম ছাড়া আন্দোলনের রূপ ধারণ করেনি। মাওলানা আযাদ অন্যান্য রাষ্ট্র নেতাদের ন্যায় হিন্দিকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি করেন নাই। কারণ হিন্দিকে যতই গুরুত্ব দেওয়া হোক, দক্ষিণ ভারতে হিন্দির গুরুত্ব ততটাই কম। সুতরাং শেষ অবধি সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়-এর সিদ্ধান্তে হিন্দিকে ভারতের সরকারি ভাষা করা হয়, রাষ্ট্রভাষা নয়। মাওলানা আযাদ শিক্ষা মন্ত্রী হিসেবে ভাষাবিদদের অভিমতকেই মর্যাদা দেন।[৩০]

মাওলানা আযাদ পবিত্র মক্কা নগরীর কাবা শরীফের নিকটবর্তী কাদওয়া নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মাতৃভাষা আরবি, পরবর্তীতে কলকাতায় এসে উর্দু, ফারসি ও ইংরেজি শিখেন। তাঁর অধিকাংশ লেখা উর্দু ভাষায়, নিত্য দিনের কথা ও বক্তব্যে তিনি উর্দু ব্যবহার করতেন। এ ছাড়া ভারতবর্ষের ওলামায়ে কেরাম উর্দু ও ফারসি ভাষা নিত্যদিনের কথাবার্তায় ও পাঠদানে ব্যবহার করতেন। এক্ষেত্রে উর্দু যখন ভারতবর্ষে আম জনতার ভাষা তখন উর্দুকে সরকারি ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা করার ক্ষেত্রে মত প্রকাশ করাই যেত, কিন্তু তিনি তা করেননি। মাওলানা আযাদ যখনই কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন নি:স্বার্থ এবং নিরপেক্ষভাবেই করেছেন। ফলে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে সর্বদা অটল থেকেছেন।[৩১] ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ খ্রি. ওলামায়ে কেরামের আহ্বানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার ভাষণই তাঁর জীবনের সর্বশেষ ভাষণ। এ ভাষণে যা বলেন তা নিম্নরূপ:

جناب صدر اردو دوستو!

میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ نے مجلس اسی لئے منعقد کیا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی زندگی میں اردو کی جو واقعی جگہ ہے وہ اسے دی جائے۔ آپ یہ نہیں چاہتے کہ کسی زبان کی جگہ خالی کی جائے اور وہ اردو کو مل جائے، آپ اردو کے حامی ہیں لیکن ہندوستان کی کسی دوسری زبان کے مخالف نہیں ہیں جیسا کہ ابھی میرے دوست پنڈت سندرلال

جی نے کہا یہاں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو ہندی کا مخالف ہو۔یہی اسپرٹ ہے اسی اسپرٹ سے مسئلہ کے حل کا راستہ صاف ہوتا ہے۔

مجھے یاد ہے کہ تیس چالیس سال پہلے زبان کے بارے میں یہ جھگڑا تھا کہ ملک کی زبان کیا ہو، جو لوگ اردو کے حامی تھے وہ چاہتے تھے کہ اردو ملک کی زبان ہو اور جو لوگ ہندی کے ہامی تھے ان کی خواہش تھی کہ ہندی ہو۔ یہ معاملہ اس وقت گہرائی تک پہنچا تھا۔ کیونکہ دونوں زبانیں ایک دوسرے کی رقیب بن کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ اردو والے کہتے تھے کہ اگر ہندی کو ملک کی زبان تسلیم کر لیا گیا تو اردو ختم ہو جائے گی اور ہندی والے کہتے تھے کہ اگر اردو کو ملک کی زبان مان لیا گیا تو ہندی ختم ہو جائے گی، لوگ اس سوال کو ہر وقت اسی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اسی کے عادی ہو گئے تھے چنانچہ جب یہ سوال سامنے آتا تو اسی ترازو میں تولا جاتا۔ اسی حالت میں ملک آزاد ہوا اور دستور بننے کا وقت آیا، دستور ساز اسمبلی نے کافی بحث کے بعد اکثریت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ "اس ملک کی زبان ہندی ہو گی"، جس کے نتیجے میں اردو کی حیثیت میں ایک بنیادی انقلاب آگیا اور اردو کی ایک رقیب کی حیثیت ختم ہو گئی۔ اب جب اس پر ہمارے کانسٹی ٹیوشن کی مہر ثبت کی جا چکی ہے تو ہر ہندوستانی کا جو آئین کا وفادار ہے فرض ہو جاتا ہے کہ اسے مانے وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتا، تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ارود کی ملک میں کیا جگہ ہے؟ اب اس کی وہی حیثیت ہے جو دستور کی دوسری چودہ زبانوں کی ہے۔ بہت سے لوگ اسے اب بھی رقیب کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ پچھلے دینوں کی تلخی ابھی تک چلی آرہی ہے حالانکہ اب یہ بات نہیں ہے۔ اب یہ سوال تو اٹھتا ہی نہیں کہ پورے ملک کی زبان کیا ہو گی۔ ہندی کو جو جگہ ملتی تھی وہ مل چکی اور ہم نے اس پر دستور کی چھاپ لگا دی، اب ہر ہندستانی کا فرض ہے کہ اس کے آگے سر جھکائے لیکن اس کے ساتھ ہی اردو کا جو جائز مقام ہے وہ بھی اسے ملنا باقی ہے۔ اس کا یہ حق اسے ملنا چاہیئے، کسی زبان کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اسے گورنمنٹ سبھی مانے اور لوگ بھی مانیں۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جو ملک میں عام طور پر بولی جاتی ہے، نہ صرف شمال میں بلکہ جنوب میں بھی اس کے بولنے والے خاصی تعداد میں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حیدر آباد اور تلنگانہ کے علاقے میں اردو بولی جاتی ہے۔ میسور میں لاکھوں آدمی اردو بولتے ہیں، اسی طرح آندھرا اور مدراس میں متعدد جگہ اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ یوپی۔ بہار۔ دلی اور پنجاب میں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، یہاں لاکھوں ہزاروں آدمی اردو بولتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جس مقصد کے لئے یہ کانفرنس بلائی گئی ہے اس میں اسے کامیابی ہو گی اور اب جب وزیر اعظم نے اس کا افتتاح کیا ہے تو یقیناوہ اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہے گی۔[32]

সম্মানিত উর্দু প্রেমিক বন্ধুরা!

“আমি ভালো করেই বুঝতে পারছি কেন এই সভার আয়োজন করা হয়েছে? আপনারা সকলেই উর্দু ভাষার একান্ত পৃষ্ঠপোষক, তবে অন্য ভাষার শত্রু নন। আপনাদের ইচ্ছা এই যে, ভারতবর্ষে উর্দু ভাষার বর্তমান অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্থান করে দিই। আবার অন্য কোনো ভাষার মর্যাদা নষ্ট হোক তা কামনা করেন না। আমার বন্ধু পণ্ডিত সুন্দর লালজি বলেন–‘‘এখানে একটি লোকও নেই যিনি হিন্দি ভাষার বিরোধী।” আর এই অনুভূতিই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। আমার মনে আছে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে এ নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল। যারা উর্দু পছন্দ করেন তারা উর্দু জাতীয় ভাষা হোক অন্য দিকে যারা হিন্দি পছন্দ করেন তারা হিন্দি জাতীয় ভাষা হোক এবং মনে করা হয়েছিল উর্দু বা হিন্দিকে সরকারি ভাষা করা হলে ভারতবর্ষের উর্দু ভাষা ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে যাবে। সাংবিধানিকভাবে কোনো ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হলে উক্ত ভাষা সকলকে মানতে হবে।

> প্রশ্ন হলো উর্দু ভাষায় আমজনতা কথা বলে, তা হলে উর্দুসহ সাংবিধানিক অন্যান্য চৌদ্দটি ভাষার কী হবে? উত্তর ভারতেই হোক আর দক্ষিণ ভারতেই হোক উর্দু সমভাবে গৃহীত ভাষা। হায়দ্রাবাদ ও তেলেঙ্গানাতে উর্দু ভাষা প্রচলিত। মহিষুর, অন্ধ্রপ্রদেশ, মাদ্রাজসহ আরও অনেক জায়গায় লক্ষ লক্ষ মানুষ উর্দু ভাষায় কথা বলে। সুতরাং আশা করি এই সভার সর্বোত্তম লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।"

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের লেখনী মাওলানা আযাদকে অনুপ্রাণিত করলেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন ছিল না। শিক্ষা মন্ত্রী হিসেবে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তনে যে সমস্ত বিষয় তুলে ধরেছেন তা সত্যিই অভাবনীয়। প্রথমেই তিনি ছাত্র-শিক্ষককে উদার মানসিকতা পোষণ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন–

> "প্লেটো তাঁর অ্যাকাডেমির সামনে লিখে রেখেছেন ''যাঁরা জ্যামিতি জানে না তাঁদের এখানে ঠাঁই হবে না।" কিন্তু আমি বলছি ''যাঁরা জ্যামিতি জানেন তাঁরা যেমন এই বিদ্যায়তনে স্বাগতম, তেমনি যাঁরা জ্যামিতি জানেন না তাঁরাও এখানে স্বাগতম।" এই প্রতিষ্ঠান হিন্দু-মুসলিম সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিলো তা এখনও থাকবে। উর্দু-হিন্দি সাহিত্যের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। উর্দু-হিন্দি সাহিত্য উন্নয়নে হিন্দু-মুসলিম উভয়ের কৃতিত্ব সমান। এমনকি মুঘল আমলে ব্রজ ভাষা সাহিত্যে অবদান রাখা কয়েকজন প্রতিভাবান মুসলমান লেখক মহম্মদ জয়সি, খান খান্নান এবং আব্দুল জলিল বিলগ্রামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একথা ঠিক হিন্দি ও উর্দুর অক্ষর আলাদা হিন্দির দেবনাগরী উর্দুর নয়। তাই গান্ধীজি চেয়েছিলেন প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক উর্দু ও দেবনাগরী অক্ষর শিখবে। আমিও একই মত পোষণ করি। ভাষা শিক্ষার জন্য আমাদের তো অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকার দরকার নেই। অন্যদের দিকে তাকিয়ে তারা কী শিখছে সেটা বুঝে তবে আমরা আমাদের ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করবো এমন হতে পারে না। অন্যরা একটি ভাষা শিখলেও আমাদের দুটি ভাষা শিখে নিতে কোনো বাধা থাকা উচিত নয়। মুসলমানদের নিকট আমার আবেদন যাতে তাঁরা দুটি ভাষার অক্ষরই শিখে নেন। এতে তাঁরা সমস্ত দেশবাসীর সামনে একটা সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য দৃষ্টান্ত রাখতে পারবেন।"[৩৩]

উপসংহার

মাওলানা আযাদ শুধু রাজনীতিতেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন এমনটি নয় তিনি শিক্ষা, উর্দু ভাষার উন্নয়ন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, জাতিসত্তা রক্ষাসহ বিভিন্ন অঙ্গনে ভূমিকা রেখেছেন। উর্দু ভাষা, সাহিত্য ও উর্দু ভাষার ক্ষেত্র বিস্তারে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন আমি একজন মুসলমান, আমি এ বিষয়ে গভীরভাবে সচেতন যে ইসলামের বিগত তেরশ বছরের গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্য সমূহের উত্তরাধিকারী। সেই উত্তরাধিকারের কণামাত্র আমি হারাতে চাই না। এ চেতনা বোধই মাওলানা আযাদকে আরও বেশি দেশপ্রেমিক করেছে। ৪ জুন ১৯৪৭ খ্রি. যখন তাঁর দল দেশভাগ মেনে নিল তখনও তিনি বলেছেন-'ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।' দেশভাগ হলে হিন্দুদেরও ভালো হবে না, মুসলমানদেরও ভালো হবে না। তার জ্বলন্ত প্রমাণ কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে চিরবৈরী মনোভাব। মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য করেন-'মৌলানার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের গভীরতা গ্রিক দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিষ্টটল এবং পিথাগোরাসের সমকক্ষ।' তিনি শিক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করলে অনেকে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তখন সরোজিনী নাইডু বলেন- 'আযাদের কথা বাদ দাও তো। ওর সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হয়, ও জন্মেছিল পঞ্চাশ বছর বয়স নিয়ে।' পরিশেষে বলতে হয়, বাল্যকাল থেকে শিক্ষার প্রতি চরম আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের ফলে উর্দু ভাষার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীকরণে তাঁর অবদান সর্বজন প্রশংসিত।

তথ্যনির্দেশ

১ জাফর আহমদ নিজামী, *আবুল কালাম আযাদ কি কাহানী*, (নয়াদিল্লী: মাকতুবাহ জামিয়াহ লিমিটেড), পৃ.১০।
২ ড. শ্যামাপ্রসাদ বসু, *মৌলানা আজাদ সমন্বয়ীর জীবন সংগ্রাম*, (কলকাতা: এন.ই পাবলিশার্স, ২০২০ খ্রি.), পৃ.১৯।
৩ গোলাম রসুল মেহেরে, *তাব্বারুকাতে আযাদ*, (লাহোর: কিতাব মঞ্জিল, প্রকাশকাল, ১৯৫৮ খ্রি.), পৃ.১৪০।
৪ সম্পাদনা, আলকুমাহ্ শিবলী, আব্দুল কাভি দেসনাবি, *আবুল কালাম আযাদ ওয়াদায়ি শায়িরি মে 'মাকা আফকার ওয়া কিরদার'*, (কলকাতা: মাগরেবি বাঙ্গাল উর্দু একা., ২০০২ খ্রি.) পৃ.৯৭।
৫ শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়, *মৌলানা আবুল কালাম আজাদ(জাতীয়তাবাতের সন্ধানে)*, (কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জৈষ্ঠ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ.২৮।
৬ স্বপন মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বপথিক মৌলানা আবুল কালাম আজাদ*, (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০১৫ খ্রি.), পৃ.২৯।
৭ সম্পাদনা, খালেক আন্জুম, *মৌলানা আবুল কালাম আজাদ*,(দিল্লী: উর্দু একাকোডেমি, ২০১৩ খ্রি.), পৃ.৩৯।
৮ স্বপন মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বপথিক মৌলানা আবুল কালাম আজাদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৪।
৯ *তদেব*, পৃ.৩৮।
১০ *তদেব*, পৃ.০১।
১১ শৈলেশকুমার বন্দোপাধ্যায়, *মৌলানা আবুল কালাম আজাদ(জাতীয়তাবাদের সন্ধানে)* প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭।
১২ রশীদ উদ্দীন খান, *মাওলানা আবুল কালাম আযাদ: শখসিয়ত, সিয়াসত, পয়গাম*, (দিল্লী-কাউমি কাউন্সিল বারায়ে ফুরুগ উর্দু জবান, ২০১৬ খ্রি.), পৃ.২০।
১৩ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, *ভারত স্বাধীন হল*, (অনুবাদ: সুভাষ মুখোপ্যাধ্যায়), (হায়দ্রাবাদ: ওরিয়েন্ট লংম্যান লিঃ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ.১৪৮।
১৪ শুরেশ কাশমিরী, *আবুল কালাম আজাদ(সনেহ উমরি)*, (নয়াল্লী: এম.আর. পাবলিকেশন, ২০১৩ খ্রি.), পৃ.১০৫।
১৫ আইওয়ানে-ই-উর্দু, (দিল্লী: উর্দু অ্যাকাডেমির মাসিক পত্রিকা, ডিসেম্বর, ১৯৮৮, দ্বিতীয় সংখ্যা), পৃ.৯২।
১৬ *তদেব*, পৃ.৯৩ ও ৯৬।
১৭ ডক্টর ওয়াহাব কায়সার, *মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ফিকির ওয়া আমল কে চান্দ জাবিয়ে*, (পাটনা: খোদা বক্স ওয়রিয়েন্টাল লাইব্রেরী, ২০০৯ খ্রি.) পৃ.২৯ ও ৩০।
১৮ Edited by Syeda Saiyidain Hameed, Idia's Maulana Abul Kalam Azad,(New Delhi: Vikas Pub. House Pvt. Ltd.) P.22.
১৯ মালেক রাম, *কুছ আবুল কালাম আযাদ কে বারে মে*, (জামিয়া নগর: মাকতুবাহ জামিয়াহ লিমিটেড, ২০১১ খ্রি.), পৃ.৫৪।
২০ ডক্টর সুলায়মান শাহ্জাহানপুরী, *উর্দু কি তারাক্কি মে মাওলানা আযাদ কি হিস্সা*, (নয়া দিল্লী: আঞ্জুমান তারাক্কি উর্দু (হিন্দ), ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ.৬০।
২১ *তদেব*, পৃ.৬১।
২২ *তদেব*, পৃ.৬২।
২৩ *তদেব*, পৃ.৬৪ ও ৬৬।
২৪ *তদেব*, পৃ.৪৫-৫০।
২৫ গোলাম রসুল মেহের, *নক্শে আযাদ*, (লাহোর: কিতাব মঞ্জিল, ১৯৫৮ খ্রি.), পৃ.৩৩৫।
২৬ ড. আবু সোলায়মান শাহজাহানপুরী, *উর্দু কি তারাক্কি মে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ কা হিস্বা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯৮।
২৭ শৈলেশকুমার বন্দোপাধ্যায়, *মৌলানা আবুল কালাম আজাদ(জাতীয়তাবাদের সন্ধানে)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪৯।
২৮ *তদেব*, পৃ.২৪৯ ও ২৫০।
২৯ স্বপন মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বপথিক মৌলানা আবুল কালাম আজাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ.০১।
৩০ *তদেব*, পৃ.১৮।
৩১ ড. জাফর আহমদ নিজামী, *মাওলানা আযাদ কি কাহানী*, (জামিয়া নগর: নয়া দিল্লী: মাকতাবিয়াহ জামিয়া লিঃ, ১৯৯৯ খ্রি.) পৃ.১০।
৩২ আলকিমাহ শিবলী সম্পাদিত, *মাওলানা আবুল কালাম আযাদ আফকার ওয়া কিরদার*, (কলকাতা: মাগরিবি বাঙ্গাল উর্দু একাডেমি, ২০০২ খ্রি.), পৃ.২১৪।
৩৩ স্বপন মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বপথিক মৌলানা আবুল কালাম আজাদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯৭।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২২, ISSN 1813-0402

মুসলিম দর্শন ও ইকবাল
(Muslim Philosophy and Iqbal)

রুহুল আমীন*

Abstract: Allama Iqbal is the representative of glorious Islamic ideology and the preacher of enlightenment of his countrymen. Iqbal is a well-recognized poet, whole over the world a liberal reformist. The teachings inside his creative works have incited aspiration and hope in human heart beyond the limitation to time and place. He held the hands of men trapped in darkness and moved them near to the horizon of awakening and painted hopeful dream on the gloomy of inert earth. Great poet Allama Iqbal dreamt the dream of an enlightened world beyond the sickening chaos and procession of darkness. As a great humanitarian Islamic philosopher and poet, he has international recognition is well renowned as a modern interpreter of Islam. He is born in the transition period of tyranny and oppression. The heart wrenching cry of people trapped in restrain perturbed him. He came forward with his poetry's unfailing whip to the distressed and agonized mass in order to add new meaning and significance. The nation that is enslaved for years has got the forgotten sensibility back through his writing. He is acclaimed as a poet of mass people from Turkheim to Arakan. The expansive field of The Al-Quranul Karim, Hadith Sharif, Islamic history and tradition is the enriched canvas of Iqbal's poetry. Islam is the symbol of vibrant, robust life to him. He studied The Al-Quranul Karim with great dedication and he realized that only following and practicing the ideology of The Quran properly can invigorate new aspiration to the distressed Muslim souls. Iqbal's sentiment is poetic, view is philosophical and doctrine is completely based on Islamic ideology. Despite having Islamic essence in Iqbal's poetry, it is enriched with humanitarian relevance. Iqbal is an ideal human being; not only for the Muslim world but also for the entire humanity he is an honorable personality.

ভূমিকা

মহাকবি আল্লামা ইকবাল পাঞ্জাবের সিয়ালকোট শহরে ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ৯ই নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষরা ছিলেন কাশ্মিরি ব্রাহ্মণ। প্রায় তিনশত বছর পূর্বে তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন। সিয়ালকোটে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে ইকবাল ১৮৯৫ সনে লাহোর গমন করেন।

শৈশব হতে ইকবাল কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। শিক্ষক শামসুল উলামা মীর হাসান[১] "তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে সর্বপ্রকারে তাঁকে উৎসাহিত করতে থাকেন।

সিয়ালকোট পরিত্যাগ করার সময় ইকবাল যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা মাত্র উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তবুও প্রাচ্য জ্ঞান বিজ্ঞানে তিনি ইতিমধ্যেই গভীর বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। লাহোরে তিনি বিভিন্ন কবি সম্মেলনে যোগ দিয়ে কবিতা পাঠ করতেন। ক্রমেই তাঁর কবি খ্যাতি প্রসার লাভ করতে থাকে।

যে সব মহামানব ও মহামনীষি এদেশে জন্মগ্রহণ করে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই মানব জীবনের একটা বিশিষ্ট দিক নিয়ে আলোচনা, গবেষণা ও প্রচার করেছেন। ইসলামি জীবন ধারায় অতি মাত্রায় প্রত্যয়শীল আল্লামা ইকবাল জীবনের সকল দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সে আলোচনার ফল তার বিভিন্ন রচনায় রেখে গেছেন।

তিনি ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ এবং মরমীবাদি। তাঁর চিন্তার ক্ষেত্র ব্যাপক গভীরতর ছিল বলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর জীবনাদর্শের ফল রেখে গেছেন।[২]

---

* এম.ফিল গবেষক, উর্দু বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯১৫ সনে আসরার-ই-খূদি প্রকাশনা ইকবালের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা গতানুগতিক নিষ্ক্রীয় মরমীবাদের ভক্তদের মনে এ পুস্তক প্রবল ধাক্কা দেয়; কাজেই প্রথমদিকে তাঁকে প্রবল বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল, সুখের বিষয় ইকবালের জীবন কালেই তাঁর এ কাব্য বিশ্বব্যাপি সমাদর লাভে সমর্থ হয়েছিল। 'আসরার-ই-খূদি'[৩] এর পরিপূরক 'রমূয-ই-বেখূদী' প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সনে। ফলে, কবি ও দার্শনিক রূপে ইকবালের খ্যাতি বিশ্বের সুধি সমাজে স্থায়ীভাবে প্রসার লাভ করে।

আধুনিক বিশ্বে মানুষের জন্য সঠিক ও কল্যাণমূলক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কবি মর্দে মুমিন ও মর্দে মুসলিমকে আহ্বান জানিয়েছেন। ইকবালের মর্দে মুমিন ও মর্দে মুসলিম কোন গতানুগতিক বা নিছক বংশনানুক্রমিক মুসলমান নয়। তাহা কার্যত সংকীর্ণ ও গোষ্ঠীগত মুসলিম জাতীয়তার ধারক তিনি নন।

দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল ছিলেন গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারি এক অসাধারণ মানুষ। তার জ্ঞানের উৎস ধারা ছিল এমন একটি মৃত্যুহীন উৎস ধারার সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যা মানুষকে আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে পৃথক ধারণা আত্মস্থ করতে সাহায্য করে।

মুসলিম দর্শন ও আল্লামা ইকবাল সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে দর্শন সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি। ধর্মের লক্ষ্য যেমন উন্নত ও মহান মানবজীবন তথা ব্যাপক মানব কল্যাণ, তেমনি যথার্থ দর্শনের লক্ষ্য জীবন-ন্যায়, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণপুষ্ট মহৎ মানব-জীবন। জগতের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য এবং জীবনের সম্ভাবনাকে যুক্তির আলোকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করা হয় দর্শনে। এই জন্য বলা হয় জীবনের বিভিন্ন দিক তলিয়ে দেখা এবং জীবনকে পরীক্ষা ও সমীক্ষা করার মানসিকতাই দর্শন। প্লেটো[৪] মতে, 'চিরন্তন এবং বস্তুর মূল প্রকৃতির জ্ঞানার্জন করাই দর্শনের লক্ষ্য।'[৫]

'অ্যারিস্টটলের মতে, আদি সত্ত্বার স্বরূপ এবং এ স্বরূপের অঙ্গীভূত যে সব বৈশিষ্ট্য তার অনুসন্ধান করে যে বিজ্ঞান তাই হলো দর্শন।

আর.জে.হার্স্ট এর মতে, জগৎ ও মানব প্রকৃতি সম্পর্কে যে সব নির্দিষ্ট মৌলিক সমস্যা আছে তার যৌক্তিক উত্তর অনুসন্ধানই হচ্ছে দর্শন। অর্ন্তদৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গির অভ্রান্ততা, বিচার বিশ্লেষণের ভারসাম্য ও সামাঞ্জস্য দার্শনিক মানসিকতার পূর্বশর্ত। যথার্থ দার্শনিক তিনিই যিনি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মনোভাবের অধিকারী; যিনি জ্ঞান ও সত্যের সন্ধানে সমাজ, সংস্কার, ধর্ম এগুলোর কোনটি দ্বারা পরিচালিত না হয়ে পরিচালিত হন যুক্তি, বিচার ও মুক্তবুদ্ধি দ্বারা।[৬]

দার্শনিক জগৎ ও জীবন নিয়ে ভাবেন, এদের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও পরিণতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। জগতের উদ্ভব হলো কীভাবে? আমি কে? আমার উৎপত্তি হলো কোথা থেকে? জীবনের লক্ষ্য মূল্য ও তাৎপর্য কী? জ্ঞান ও সত্যের অর্থ কী? এসব প্রশ্ন তো জগতেরই প্রশ্ন, মানব জীবনেরই প্রশ্ন। আর দর্শন বলতে বোঝায় এ জাতীয় প্রশ্নের সদুত্তর অনুসন্ধানের যৌক্তিক প্রয়াসকে। এসব বিষয়ে দার্শনিকের অভিমত কখনো শূন্য থেকে আসেনা, বরং রচিত হয় সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ। দার্শনিক তাঁর সমসাময়িক কাল ও পরিবেশকে গ্রহণ করেন তাঁর আলোচ্য বিষয় হিসেবে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চিত্রিত করেন সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থাকে। একারণেই শ্রেষ্ঠ দার্শনিকরা স্বীকৃতি পান গণচেতনার ধারক বাহক ও সংরক্ষক হিসেবে। শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীর মতো শ্রেষ্ঠ দার্শনিকও মানুষকে নিয়ে ভাবেন, মানবতার সামনে মানব-পরিস্থিতি পরিস্ফুট করে তোলার প্রয়াস পান। দার্শনিকের এ প্রচেষ্টার ফলে সম্ভব হয় মানবীয় প্রগতি, নিশ্চিত হয় চিন্তা ভাবনা ও ব্যবহারিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মানুষের ভারসাম্য। দার্শনিক যে জ্ঞান ও সত্যের সুবিচার অনুসন্ধানে নিয়োজিত তা-ই সমর্থন ও সংরক্ষণ করে বিজ্ঞান, শিল্পকলা তথা মানুষের সেসব কৃতি, কীর্তি ও সম্পদকে যেগুলোর অভাবে খন্ডিত হয়ে যেত আমাদের মার্জিত ও অসভ্য জীবন।[৭]

একথা অবশ্য ঠিক যে, বিশ্বতত্ত্ব (Cosmology), তত্ত্ববিদ্যা (Ontology), জ্ঞান বিদ্যা (epistemology), যুক্তিবিদ্যা (Logic), নীতিবিদ্যা (ethics), মূল্যবিদ্যা (axiology), দর্শনের এসব শাখায় যে সব প্রশ্নের

সদুত্তর অনুসন্ধান করা হয়, সেগুলো জীবনের প্রাত্যহিক বাস্তব সমস্যার সঙ্গে যুক্ত নয়। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে না হলেও জীবনকে বোঝা জীবনের মূল্যাবধারন করা এবং জীবনের ব্যাপক ও স্থায়ী কল্যাণ নিশ্চিত করাই তাদের অভিষ্ট লক্ষ্য। কারণ, দর্শন যদি এভাবে জীবনের মূল্যাবধারণ না করে সব কিছুকে আবেগের বশবর্তী হয়ে গ্রহণ বা বর্জন করে, তাহলে মানব জীবনের অনন্যতা, উৎকৃষ্টতা, মহিমা ও তাৎপর্য অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। বলা বাহুল্য, যুক্তিবিচারের পরিবর্তে নিছক ভাবাবেগ বা অন্ধবিশ্বাসের উপর ভর করে যে জীবন যাপন করা হয়, অর্থ্যাৎ যে জীবনে কোন চেতনা ও স্বাধীনতার সন্ধি নেই সে জীবন নিম্নমানের জীবন। আমরা কখন কি করছি এবং কেনই বা তা করছি তা জানতে হলে প্রয়োজন বিচারের যথার্থ উপলব্ধির। আমাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বাঞ্চনীয় কেন? এবং এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি যথার্থ বলে বিবেচিত হলো কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই আমাদের গভীরভাবে অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। আর এ ধরনের উত্তর অনুসন্ধানেই নিয়োজিত ও নিবেদিত রয়েছে দর্শন। সুতরাং, দর্শন জীবন বিমূখ কিংবা জীবন বিচ্ছিন্ন নয় বরং জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যথার্থ মানবোচিত জীবনের সন্ধানে, ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী মানব কল্যাণের লক্ষ্যে নিয়োজিত।[৮]

দর্শন তার অনুসন্ধানের বাহন বুদ্ধি ও যুক্তিকে প্রয়োগ করে প্রকৃতিতে, মানব মনে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদিতে, মানবেতিহাসে, এক কথায় জগতের ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়ায়। দর্শনের এ অনুসন্ধান কোন ব্যক্তি বিশেষ, কোন জাতি বিশেষ, কিংবা স্থান-কালের গন্ডিতে সীমিত নয়। দার্শনিক যুক্তি অগ্রসর হয় সসীম থেকে অসীমের, আপেক্ষিক থেকে অনপেক্ষের এবং বিকাশমান থেকে নির্বিকার সত্তার দিকে। এভাবে অগ্রসর হয়েই দর্শন অসুন্ধান করে বস্তুর চূড়ান্ত স্বরূপ, নির্যাস ও নিহিতার্থকে। দর্শন সব বস্তু ও ঘটনাকে অনিবার্য চিন্তার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়, আবিষ্কার করতে চায় তাদের মূল ভিত্তি ও চূড়ান্ত হেতু।

দার্শনিক সত্তার[৯] এই ভিত্তি ও হেতুকেই চিহ্নিত করেন পরম একক সত্তা বলে। একেই ধর্মে অভিহিত করা হয় আল্লাহ, গড বা ঈশ্বর বলে। এরিস্টটল[১০] এই ঈশ্বরের নাম দিয়ে ছিলেন আদি কারণও অচালিত চালক। মুসলিম চিন্তাবিদরা জীবন ও জগতের সমস্যাবলি আলোচনা করে মানব জীবনের অভিষ্ট লক্ষ্যের নির্দেশ দান করেছেন। জীবন জগতের সমস্যা সমূহের সামগ্রিক আলোচনায় তারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তুলে ধরেছেন। মানব জাতির চলমান জীবনের বিভিন্নমুখী ক্রমবর্ধমান জটিলতাই মানব চেতনাকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করে তুলেছে। মানব গোষ্ঠির ক্ষেত্রে ধর্মীয় চেতনা যেমন তাদের চিন্তা ধারাকে প্রভাবিত করেছে, মুসলিম জাতির জীবনেও ধর্মীয় চেতনা তেমনভাবে তাদের চিন্তাভাবনাকে নিবিড়ভাবে প্রভাবিত করে এক বলিষ্ট জীবন দর্শন গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে।

ইতিহাসের অন্যান্য জাতির মত ইসলাম ধর্মের অনুসারীরাও যুগ যুগ ধরে এক বিশেষ পদ্ধতিতে তাদের নিজস্ব জীবনদর্শন প্রণয়নের চেষ্টায় নিয়োজিত ছিল। এই প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত থাকার ফলে সত্যের স্বরূপ নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে যে কোন মত পার্থক্যই দেখা দিক না কেন, একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, তাদের মূল বিশ্বাস ও নীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল আল কুরআনুল কারীম ও হাদিস শরিফের দৃঢ় ভিত্তির উপর। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলমানদের চিন্তা ও কর্মের পরম অবলম্বন হিসেবে সবসময় কার্যকর ছিল আল কুরআনুল কারীম। তাই ড. আমিনুল ইসলাম (১৯৪৩ খ্রি.- বর্তমান) মনে করেন মুসলিম দর্শন বলতে বুঝায় এমন এক মূল্যবোধ ও জীবন দর্শনকে যার উৎপত্তি কুরআন ও হাদিস থেকে এবং যা ক্রমবিকশিত হয়েছে পরবর্তীকালে আবির্ভূত বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের জগৎ জীবন জিজ্ঞাসার ফলশ্রুতিতে। তবে পরবর্তীতে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এবং জীবনের নতুন নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে মুসলমানরা তাদের ধর্মকে বুঝার যে বিচারশীল আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছিলেন তার ভিত্তিতে ক্রমশ গড়ে উঠেছে মুসলিম দর্শন।[১১]

ফালসাফায়ে ইসলামী বা ইসলামী দর্শন বলতে সেই বিজ্ঞানকে বোঝানো হয় যা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান বা উলূমে আকলী হিসেবে প্রসিদ্ধ। বিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে দর্শন, তর্কশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা ইরফান বা আধ্যাত্মিকতা এবং তাসাউফ বা অধ্যাত্ম বিদ্যা।

ইসলামী দর্শন সম্পর্কে আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গি তার পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ হিসেবে লিখিত গ্রন্থ পড়ে বুঝা যায়। অভিসন্দর্ভটি তিনি একটি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পন্ন করেন। শিরোনাম ছিল "ইরানে দর্শন শাস্ত্রের ক্রমবিবর্তন"। বইটি ফার্সীতেও অনূদিত হয়েছে। তাতে আল্লামা ইকবাল দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রীয় বিভিন্ন মতবাদের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। কাজেই প্রথম সংক্ষেপে জানতে হবে যে অতীতে ইরানে বিদ্যমান যুক্তিশাস্ত্র ও দার্শনিক মতবাদগুলোর ধরন কিরূপ ছিল এবং এসব মতবাদের অধিকাংশ প্রবক্তা যারা ইরাকী ছিলেন তাদের চিন্তাগত বৈশিষ্ট বা কি ছিল?

ইরানীরা সেই প্রাচীনকাল থেকেই যুক্তিকে কাজে লাগানোর উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিতো। এজন্যই তাদের কাছে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান বা মানুষের চিন্তা যুক্তির সাথে সম্পর্কিত ও জ্ঞানের বড় কদর ছিল। বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের বিকল্প হচ্ছে উলুমে নাকলী বা বর্ণনা ভিত্তিক জ্ঞান।[১২]

আমরা যা কিছু বলছি বা আমাদের মনের মধ্যে যা কিছু আছে তার উৎস হয় নাক্বাল বা বর্ণনা অথবা আকল বা বুদ্ধি। বুদ্ধি থেকে উৎসারিত জ্ঞান এবং বর্ণনা নির্ভর জ্ঞানের সাথে পার্থক্য হলো বুদ্ধি বৃত্তিক বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক নেই।

বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের ব্যাপারে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন লোকদের ঐক্যমত্য থাকে। কিন্তু বর্ণনা ভিত্তিক অনেক বিষয় নিয়ে বিভিন্ন স্থানে মত পার্থক্য থাকে। বর্ণনা ভিত্তিক বিষয়সমূহ শুধু যে স্থান ও সম্প্রদায়ের বিভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন হয় তা-ই নয়, বরং সময়ের ব্যবধানেও বর্ণনা ভিত্তিক জ্ঞান ও বিষয়ের বিবর্তন ঘটে।

যেমন কোন একটি কাজকে একশত বছর পূর্বে খারাপ মনে করা হতো; অথচ একশো বছর পর তা এখন আর খারাপ মনে করা হয়না। এখন হয়তো কোন কাজকে মন্দ মনে করা হয়, কিন্তু এমন সময় হয়তো আসবে যখন এ কাজকে মোটেও মন্দ মনে করা হবে না। শেখ সাদী বলেন-

معشوق من است آ نکہ بہ نزدیک تو زشت است[১৩]

অর্থাৎ তোমার কাছে যে ঘৃণিত সে তো আমার প্রেমাস্পদ

উদাহরণস্বরূপ সুলতান মাহমুদ গজনবী (২ নভেম্বর ৯৭১-৩০ এপ্রিল ১০৩০) সাবুকতা গণের পুত্র ছিলেন। এটি একটি নাক্বাল বা বর্ণনা ভিত্তিক জ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তিক নয়। কেননা এ বিষয়টির জ্ঞান মানুষ হয়ত কোন বইতে পড়ে অথবা কারো কাছ থেকে শুনে অর্জন করেছে কিন্তু মানুষ যে জানে ২×২ = ৪ (দুই-এ-দুই-এ চার) তার উৎস হলো আক্বল বা বুদ্ধি। 'আক্বল' ও 'নাক্বল' বা 'বুদ্ধি' ও বর্ণনা' সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের পর এখন আমরা বলব যে উলূমে আক্বলী বা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান হলো সেই জ্ঞান যার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে মানুষের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির উপর। যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে বুদ্ধি শক্তি দান করেছেন সেহেতু আমাদের এ বুদ্ধিকে কাজে লাগানো অবশ্য কর্তব্য। যেমন আল্লাহ পাক আমাদেরকে হাত দিয়েছেন, আমরা সে হাতকে কাজে লাগাই হাত দিয়ে আমাদের প্রয়োজন পূরণ করি, অনুরূপভাবে আল্লাহর দেওয়া আক্বল বা বুদ্ধিকেও তার উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করতে হবে। তার প্রতি যেন উদাসীন না হই। অবশ্য আমাদের মাঝে এ প্রশ্ন সব সময় আছে যে যদি আমরা আক্বল বা বুদ্ধির উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল হই তাহলে দ্বীন বা ধর্মের মাধ্যমে যেসব বর্ণনা হাদীস ও রীতিনীতি আমরা লাভ করছি তার কি অবস্থা হবে? ইসলামের দৃষ্টিতে এ প্রশ্নটির জবাব এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, আক্বল বা বুদ্ধি আমাদেরকে যে নির্দেশ দেয় প্রকৃতপক্ষে শরিয়তও তারই হুকুম দেয় অথবা বলবো শরিয়ত যে ফায়সালা দেয় আসলে বুদ্ধির ফায়সালাও তা-ই। এর ফাঁকে যে বিষয়টি থেকে যায় তা হলো আমরা অনুভব করি যে, কোন কোন বিষয় 'নক্বলের' থেকে 'আক্বলের' বা 'বর্ণনার' সাথে বুদ্ধির বিরোধ ও মত পার্থক্য আছে। এমন পরিস্থিতিতে আমরা কোনটি গ্রহণ করব? আমরা কি বর্ণনা বা 'নক্বল'কেই গ্রহণ করব, যেহেতু তার সাথে আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস

জড়িত। তখন কি বুদ্ধিকে আমরা প্রত্যাখ্যান করব? যদি তাই করি তাহলে প্রশ্ন আসে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে 'আক্ল' কি জন্য দিয়েছেন? আর যদি 'আক্ল'কে গ্রহণ করি 'নক্ল' বা বর্ণনাকে বর্জন করি তাহলে আমারা তো ঈমানদার থাকতে পারি না। অবশ্য এ দু'য়ের মাঝে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা আছে, যা অধিকাংশ মুতাযিলা এবং শিয়াদের জন্য গ্রহণযোগ্য। সে মতটি হলো আক্ল ও নক্লের মধ্যে যদি সংঘাত দেখা দেয় তাহলে আক্লকেই আঁকড়ে ধরবো এবং নক্লকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে বুদ্ধিসিদ্ধ করার চেষ্টা করবো। আমরা আক্লকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। কারণ আক্ল প্রত্যাখ্যান করা হলে শরিয়তকে ও বর্জন করা হবে। কেননা আমরা শরিয়ত আক্লের ফায়সালা মোতাবেক গ্রহণ করেছি। আল্লামা 'হিল্লীর'[১৪] গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় ফাযেল মিকদাদ উল্লেখিত বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, কোন কোন বাহ্যিক বর্ণনা ভিত্তিক জ্ঞান বুদ্ধি-বিবেচনার বরখেলাফ হলে তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে যুক্তিসহই করতে হবে।[১৫]

ইরানের যে সব দার্শনিক মতবাদ বিদ্যমান ছিল তন্মধ্যে একটি হলো ফালসাফায়ে মশ্শা অপরটি ফালসাফায়ে এশারক্ব বা আলোর দর্শন। এছাড়া, আরো কিছু দর্শন বিদ্যমান ছিল যেগুলো পন্ডিতগণের অমনোযোগিতার কারণে কালের প্রবাহে হারিয়ে গেছে এবং তার চর্চা ও বিকাশ ঘটেনি। ইসলাম পরবর্তী যুগে আল-কুরআন মাজিদের নির্দেশের আলোকে মুসলমানরা খোদা, বিশ্ব ও মানবজীবন সম্পর্কে অন্যরা কি লিখেছে তা শিখতে উদ্যোগী হন।

আল-কুরআন মাজীদের হুকুম ছিল:

"আমার ঐসব বান্দাদের সুসংবাদ দিন যারা কথা শোনে এবং তন্মোধ্যে ভাল দিকগুলোকে গ্রহণ করে নেয়"।

এটির আসল রহস্য এখানেই নিহিত। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই মুসলমানরা গ্রীক, সিরিয়া, হিন্দী পহ:লভী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহ অনুবাদে তৎপর হন। পাহলভী ভাষা বলতে ইসলাম পূর্ব যুগের ইরানের ভাষার কথাই বোঝানো হয়েছে। এই ভাবেই ইসলামী সমাজ ও সভ্যতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ও বিস্তার ঘটে।

মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম হলো সে অনুকরণের বশবর্তী হয়ে কোন কিছু গ্রহণ করবে না। বরং কিভাবে হলো, কেন হলো এসব বিষয় সে অনুসন্ধান করবেই। কাজেই অন্ধভাবে কোন কিছু মেনে নেওয়ার অর্থ হলো মনুষ্যত্বকে ত্যাগ করে জীব-জন্তুর জীবন ধারাকেই গ্রহণ করে নেওয়া। কারণ জীব-জন্তু কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বা কিভাবে হলো, কেন হলো এসব বিষয় জানতে চায়না। একজন ইরানী মনীষী মনে করেন যে, মানুষের আত্মা দেহের সাথে সংমিশ্রিতি থেকে নিরাজ হয়ে পড়েছে। কারণ এ দেহ তাকে ক্ষণস্থায়ী কামনা-বাসনার দিকে টেনে নিয়েছে। এই অন্ধকার দেহ তাকে এতখানি বেষ্টন করে ফেলেছে যে এর থেকে মুক্তির কোন পথ সামনে নেই। তবে অপবিত্র ও অন্ধকার দেহ থেকে উদ্ধার করার একটি মাত্র রাস্তা আছে যা দিয়ে সে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করতে পারে; আর তা হলো জ্ঞান ও বুদ্ধিকে কাজে লাগানো। দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাই আত্মার মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারে। দেহের বন্ধন থেকে ছিনিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দিতে সক্ষম। মাওলানা রুমী বলেন-

جان نهاده سوی بالا بالهاتن زده اندر زمین چنالها[১৬]

অর্থাৎ প্রাণ উর্ধ্বলোকপানে ডানা মেলেছে, আর দেহ মাটিকে আঁকড়ে ধরেছে হাতের পাঞ্জা দিয়ে।

মাশশা দর্শনের মূলভিত্তি হলো জ্ঞান ও বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিসমূহ দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। দর্শনের এই পদ্ধতিটি অ্যারিস্টোটল থেকে পাওয়া উত্তরাধিকার। ইবনে সিনা, ফারাবী, ইবনে মাসকূয়া প্রমূখ মনীষী এর ব্যাপক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। ইকবাল তাঁর *ইরান দর্শনের ক্রমবিকাশ* নামক গ্রন্থে ইবনে সীনা[১৭] ও ফারাবীর[১৮] চিন্তাধারার বিচার বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু তিনি 'মাশশায়ী' দর্শনের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখান নি। স্বভাবজাতভাবেই ইকবাল ছিলেন কাব্যিক ও আধ্যাত্মিকতার অধিকারী। তাই

তিনি অন্তর্জ্ঞান বিষয়ক দর্শনের প্রতি বেশী মনোযোগী ছিলেন। মাশশা[১৯] দর্শনের ভিত্তি ছিল যুক্তি নির্ভরতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক নিয়ম-বিধি।

পক্ষান্তরে, আলোক দর্শন বা ফালসাফায়ে এশরক্বীর মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রেম ও অন্তর্জ্ঞান। কবি বলেছেন-

عشق تھا فتنہ گر و سرکش وچالاک مرا
آسماں چیرگیا نالہ بیباک مرا [২০]

"প্রেম ছিল মোর বেয়াড়া ভীষণ কোঁদ পাকানো স্বাভাব তার
বাগ মানিলনা তীব্র গতিতে চলিল ছুটিয়া আকাশ পার।"

যাদের ঝোঁক প্রবণতা অন্তর্জ্ঞানের প্রতি প্রবল এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি যারা অধিক গুরুত্ব দেন, তারা চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়গুলোর প্রতি তেমন আগ্রহ দেখান না। এই জন্যই ইকবাল মাশশা দর্শনের প্রতি তেমন মনোযোগ দেননি। তবে তিনি তার গ্রন্থে 'মাশশা' দর্শনের দার্শনিক চিন্তা-ধারা ও মতবাদের যথেষ্ট পর্যালোচনা করেছেন।

ইকবাল যে দর্শনটি নিয়ে খুব গুরুত্বসহকারে আলোচনা করেছেন তা হলো ফালসাফায়ে "এশরাচ" বা আলোঞ্চন দর্শন। ইসলামে এই দর্শনের মুখপাত্র হলেন শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী[২১]। সোহরাওয়ার্দী বিশ্বাস করতেন যে, আমরা দেহ ও দৈহিক বিষয়াদি এবং দেহগত বাহ্যিক নিয়ম-কানুনকে বিবেচনায় রাখার সাথে সাথে আমাদেরকে আত্মা ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের দিকেও মনোযোগ রাখতে হবে।[২২] আমরা দৈহিক ও বস্তুগত বিষয়াদির ক্রিয়াকর্ম নিয়ে যেমন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং বিজ্ঞানের সূত্রসমূহ আবিস্কার করি তেমনি আত্মিক ক্রিয়াকর্মের দ্বারাও আমাদেরকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে এবং তা থেকে আধ্যাত্মিক নিয়ম বিধি ও সূত্র আবিষ্কার করতে হবে। আমরা যখন বস্তু জগতের বা বস্তুগত পর্যবেক্ষণগুলো প্রামাণ্য এবং বিজ্ঞানভিত্তিক বলে বিশ্বাস করি তাকে মূল্যবান বলে ধরে নিই তখন আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ এবং আত্মিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনালোকে যেন প্রামাণ্য ও বিজ্ঞান ভিত্তিক বলে বিশ্বাস করবো না এবং তার মূল্যায়ন কেন স্বীকার করবো না?

আমাদের কেবল বাহ্যিক জগতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত নয়; বরং আত্মার জগতের দিকেও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে, বাহিরের জগতে আমরা যেমন কারণ ও কার্যকারণ অনুসন্ধান করি তেমনি আত্মিক জগতেও আমাদেরকে কারণ ও কার্যকারণ সন্ধান করতে হবে। মন-মন্দিরসমূহে যেমন গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এগুলোর নিয়ম বিধি আবিষ্কার করা হয় তেমনি আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণের মন-মন্দিরের উদ্ভাবনা ও আবিষ্কারের ভিত্তিতে নিয়ম ও বিধিমালা প্রণীত হওয়া উচিত। এ ভিত্তিতে এশরাক্বী দর্শনের মূল ভিত্তি হলো আত্মাকে পর্যবেক্ষণ, কাশফ এবং অন্তর্জ্ঞান আর 'মাশশা' দর্শনের সাথে এর বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান। সাধকদের ভাষ্য অনুযায়ী 'মাশশা' দর্শনের ভিত্তি হলো আক্বল বা বুদ্ধি এবং 'এশরাকী' দর্শনের ভিত্তি হলো প্রেম। এই প্রেম নিয়ে ইকবাল প্রভূর কাছে প্রার্থনা করতেন মুসলমানদের অন্তরে ঈমানী আলো বৃদ্ধির জন্যে। তিনি বলেছেন-

یارب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنّا دے
جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے [২৩]

"জাগ্রত আলো অন্তরে দাও হে খোদা মুসলমানের
আত্মা তাদের কাঁপিয়া উঠুক চঞ্চল হোক ফের।"

আলোক দর্শনের প্রতি ইকবালের মনোযোগ ছিল প্রবল। বিশেষত, ইকবালের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা (আসরার-ই-খুদী) বা (আত্মাসত্তার রহস্য)। এই গ্রন্থে ইকবাল মানুষের মনোযোগকে তার নিজের দিকে নিবদ্ধ করেছেন অর্থ্যাৎ নিজেকে নিয়ে চিন্তা, নিজের মাঝে তন্ময় হওয়া। মানুষ যেন তার আত্মিক জগতকে বাহিরের জগতের মোকাবেলায় নিয়ে আসে এবং আত্মার জগতকে বাহিরের জগতের সাথে সঙ্গতশীল করে। (খোদ ও খেশ) (আত্মা ও নিজ পরিভাষা) নিয়ে আলোচনা অনেক দীর্ঘ ও বিস্তারিত। এর একটি হলো

আমরা যখন বলি যে আমি নিজের সাথে; তখন ‘ আমি’ বলতে কি বোঝায়? এর অর্থ কি আমার দেহ নাকি ‘ রূহ ’ বা ‘ আত্মা ’? অনরূপভাবে যখন বলি যে ‘ আমার দেহ আমার রূহ ’ তখন আমি বলতে আমার আত্মা বা দেহ মনে করা অসম্ভব। তাহলে এই আমি কি এ’দুটির বাহিরের কিছু নাকি আমার নিছক কল্পনা, বিষয়টি নিয়ে আনেক আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছে। কেউ কেই বিশ্বাস করতেন যে, আমরা যখন বলি যে, ‘আমি’ তখন এর উদ্দেশ্য ‘রূহ’[২৪] বা ‘ আত্মা’। কবি বলেছেন-

خودی کو کر بلند ا تنا کہ ہر تقدیر سے پہلئے
خدا بندئے سے خود پوچھئے بتا تیری رضا کیا ہے [২৫]

“তুমি তোমার আত্মাকে এতো উন্নত করে নাও যে,
প্রতিবিধান লেখার পূর্বেই খোদা তোমায় জিজ্ঞেস
করবেন, তোমার ভাগ্য কিরূপ হওয়া দারকার”।

দেহ হলো সেই রূহের মাধ্যম ও বাহন। এই রূহই দেহকে কাজে খাটায়। কেননা রূহ যখন দেহ থেকে পৃথক হয়ে যায় তখন অন্যান্য পদার্থের প্রাণী দেহের কোন তফাৎ থাকেনা। কিন্তু আরেক শ্রেণীর বক্তব্য হলো যখন বলি যে ‘আমি’ তখন দেহ ও আত্মা উভয়কেই বোঝানো হয়। উভয়েরই মৌলিকতা আছে। এরা উভয়ই পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া হয়, তা হলো সওয়ার বলতে আমরা কেবল আরোহী কিংবা বাহনকে বুঝি না। বরং সওয়ার বলতে আরোহী এবং বাহনকে একত্রেই বুঝে থাকি। অর্থ্যাৎ যে লোকটি ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়েছেন তিনি এবং স্বয়ং ঘোড়াটি। লোকটি স্বতন্ত্রভাবে সওয়ার বা আরোহী নয় বরং তার অধীনে একটি ঘোড়া আছে এবং তিনি যেখানে ইচ্ছে সে ঘোড়াটিকে নিয়ে যান। অনুরূপভাবে মানবাত্মার অধীন হয়ে রয়েছে মানুষের দেহ। রূহ যেখানে ইচ্ছে সেখানে এই দেহকে নিয়ে যায়। অধিকাংশ আধ্যাত্মিক সাধক মনে করেন যে, দেহ ও আত্মা উভয়ই পরস্পরের সমকক্ষ ও পরিপূরক। আমরা এ কথা বলতে পারি যে, শান্তি কেবল রূহই ভোগ করবে এবং রূহই দেহকে কাজে খাটিয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেহ হাতিয়ার ছাড়া অন্য কিছু নয়। বরং দেহের মানুষ যেমন কাজ ও আমল সম্পাদন করে তাতে দেহের অংশীদারীত্ব ও মৌলিকতা অনস্বীকার্য।[২৬]

ইকবাল খোদ স্বয়ং ও খোশ (নিজে) বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করেছেন। মানবত্মার তাজাল্লিয়াত বা আলোকচ্ছটার বিষয়টিকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ইকবাল আলোক দর্শনের পতি অতিশয় আকৃষ্টি ছিলেন এটি তার অন্যতম প্রমাণ। ইকবাল তাঁর গ্রন্থে যেসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো তাসাউফ[২৭] বা আধ্যাত্মিকতা। গ্রন্থের শুরুতে তিনি বলেছেন যে পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি লেখার পেছনে তাঁর দুটি উদ্দেশ্য ছিল। একটি উদ্দেশ্য হলো তিনি তাসাউফ বা আধ্যাত্মিকতার একটি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দেবেন আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারা ইরানে আবহমান কাল থেকে ছিল এবং মৌলিক ভাবেই ছিল। এই জন্য ইকবাল তাসাউফের বিষয়কে বিশদভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। মানবতার উন্নতির চূড়ান্তস্তর ইনসানে কামেল এর ধারণা উত্থাপন করে আধ্যাত্মিক আঙ্গিকে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। ইবনুল আরাবীর[২৮] পর থেকেই ইনসানে কামেল ধারণাটি তাসাউফ পন্থীদের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। তারা ইনসানে কামেল বলতে হাকিকতে মুহাম্মাদীয়া বা মুহাম্মদ (সা:) এর মুলসত্তা বলে বর্ণনা করেন।

তাওহীদের ভিত্তিতে বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য প্রতিষ্ঠা ছিল ইকবালের লক্ষ্য। সংকীর্ণ জাতীয়তার প্রতি তার মোহ ছিল না। কিন্তু আন্তর্জাতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার আগে দেশের মুসলমানের পক্ষে ইসলামের আদর্শানুসারে শক্তিও প্রতিষ্ঠা লাভ এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রনের অধিকার অর্জন প্রয়োজন। তাই তিনি বলেছেন-

چین و عرب ہمارا، ہند وستاں ہمارا
مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے
آساں نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا [২৯]

"আরব আমার চিনও আমার পর নহে সেও হিন্দুস্থান
মুসলিম আমি বিশ্ব-প্রেমিক দেশ আমার সারাজাহান।
আমার বুকে লুকানো রয়েছে পাক আমানত তৌহিদের
সাহস কার দুনিয়া হইতে মিটায় আমার নাম নিশান।"

তিনি গোটা বিশ্বের মুসলমানকে এক ছায়াতলে একত্রিত করতে চেয়েছেন। ব্রিটিশ সরকারের অধীনে বাস করে মুসলমানদের পক্ষে আত্মবিকাশ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কাজেই তাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন ছিল এমন স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের যেখানে মুসলমান তার স্বীয় ধর্মীয় আদর্শানুসারে জীবন গঠন ও জীবন যাপন করতে পারবে।

উপসংহার

আমরা বলতে পারি আধ্যাত্মিকতা সাহিত্য ও দার্শনিক জ্ঞানচর্চাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ইকবাল বিরাট অবদান রেখেছেন। কাজেই আজকে ইকবালের প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় তাতে আশ্চার্য হওয়ার কিছু নেই। শুধু আজকেই যে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে তা নয়; বরং সব সময়ই তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে মুসলিম বিশ্ব। তাঁর নাম অমর হয়ে থাকবে মুসলমানদের মাঝে। মুসলিম বিশ্বে আল্লামা ইকবালের চিন্তা-ধারার প্রভাব সূদূর প্রসারী তিনি সবসময় মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মুসলিম বিশ্বকে আল-কোরআন থেকে শিক্ষা নিতে তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন মুসলমানরা যতদিন আল কুরআনুল কারীমের তথা ইসলাম ধর্মের ছায়া তলে ছিল ততদিন অর্জন করেছিল সম্মানের শ্রেষ্ঠত্ব আসন। আর যখন তারা ইসলামী ভাবধারা হতে দূরে সরে গিয়েছে অর্থ্যাৎ আল কুরআনুল কারীমের শিক্ষা বর্জন করেছে তখন থেকেই শুরু হয়েছে তাদের অধঃপতন। আল্লাহ যেমন একমাত্র সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা তিনি আমাদের লালন ও পালন কর্তা তেমন ইসলাম কোন ভৌগোলিক সীমারেখা বা কোন দেশ জাতি বা বর্ণের জন্য সীমাবদ্ধ নয় বরং ইসলাম সমগ্র বিশ্বের।

তথ্য নির্দেশ

১ মীর হাসান মহাকবি আল্লামা ইকবালের বাবা শেখ নূর মোহাম্মদের বাল্য বন্ধু এবং তিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রখ্যাত আলেম। তিনি শিয়ালকোটের স্কচ মিশন কলেজে আরবী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কুরআন শরিফ, হাদিস শরিফ ও সুফিবাদে বেশ পারদর্শী ছিলেন। মীর হাসান দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবালের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষক এবং ফয়েজ আহমদ ফয়েজেরও শিক্ষক হিসাবে বেশি পরিচিত। যখন ১৯২২ সালে পাঞ্জাবের ব্রিটিশ গভর্ণর ব্রিটিশ ক্রাউনের নিকট ইকবালকে তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ নাইট উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব করেন তখন ইকবাল মীর হাসানকে একটি উপাধিতে ভূষিত করতে বলেন। গভর্ণর তখন মন্তব্য করেন যে, মীর হাসানতো কোন বই লেখেনি, তখন ইকবাল উত্তর করেন 'ইকবাল' মীর হাসানের প্রণীত বই। পরে তাঁকে শামস-উল-উলামা (আলেমদের সূর্য) উপাধি দেওয়া হয়েছিল। মীর হাসান ১৮ এপ্রিল ১৮৪৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

২ ড. মোহাম্মাদ মাহমুদুল হাসান ও অধ্যাপিকা নূরজাহান বেগম, *মহাকবি আল্লামা ইকবাল*, (ঢাকা: কালিকলম প্রকাশনি, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৭৭।

৩ আসরারে খুদি (اسرارخودی বা ব্যক্তিত্বের রহস্য) এ কাব্যে তিনি তাঁর আদর্শের ও দর্শনের কথা প্রকাশ করেন আসরারে খুদি বলতে আত্মার গূঢ় কথাকেও বোঝানো হয়। ১৯১৫ সালে লাহোরে প্রকাশিত আল্লামা ইকবালের একটি অনন্য সাধারণ কাব্যগ্রন্থ 'আসরারে খুদি' এটি মূলত বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক আল্লামা জালাল উদ্দীন রূমী (র.) এর 'মসনবি শরিফের' ছন্দে ফারসি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ। এটি কবির প্রকাশিত প্রথম কাব্য। ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, লন্ডন এর প্রফেসর ড. আর. এ. নিকলসন আসরারে খুদিতে ইকবালের বিশ্বজনীন মতাদর্শের প্রতি মুগ্ধ হয়ে 'The Secrets of the Self' নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ১৯২০ সালে লন্ডনে অনূদিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

৪ প্লেটো (Plato) প্লেটো ছিলেন একজন বিশ্ববিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক। তিনি দার্শনিক সক্রেটিসের ছাত্র ছিলেন এবং দার্শনিক অ্যারিস্টটল তার ছাত্র ছিলেন। এ হিসেবে প্রাচীন গ্রিসের সবচেয়ে প্রভাবশালী তিনজন দার্শনিকের মধ্যে প্লেটো দ্বিতীয়। দার্শনিক প্লেটোর জন্ম হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৭ সালে গ্রীসের এক অভিজাত পরিবারে। প্লেটো বাল্যকালে সারাদিন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া ঘুরে বেড়ানোই ছিলো তার কাজ। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার জীবনের গতিধারা পাল্টে

যায়। তিনি সক্রেটিসের সাহচর্যে এসে তার একান্ত অনুরাগী ভক্ত ও ভাবশিষ্য হয়ে যান শুরু করেন জ্ঞানচর্চা। প্লেটো প্রাচীন দর্শন যুগের দার্শনিক। প্লেটোর সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ "রিপারলিক"। প্লেটো খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

৫ CF.W. Kaufmann, *Critique of Religion and Philosophy*, (New York, 1959), P. 92।

৬ আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্থান, ৪র্থ প্রকাশ, ২০০১), পৃ.১০।

৭ *তদেব*, পৃ. ১৫।

৮ আমিনুল ইসলাম, *ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম দর্শন*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৪), পৃ. ২০।

৯ দর্শনের আলোচনায় সত্তাতত্ত্ব (ontology) বলতে বাস্তব বিশ্বের সব কিছুর "থাকা" 'হওয়া" বা "অস্তিত্ব" বিষয়ক সাধারণ ধারনা সমূহকে নিরপেক্ষভাবে অধ্যায়নকারী বিদ্যাকে বোঝায়। বিশেষত অস্তিত্ব, বাস্তবতা এবং এদের সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনাই দার্শনিক সত্তাতত্ত্বে মূখ্য আলোচনার বিষয়।

১০ অ্যারিস্টটল (Aristotle) ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক। তাকে প্রাণি বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। এছাড়াও প্লেটোর সাথে যৌথভাবে তাকে 'পশ্চিমা দর্শনের জনক' বলে অভিহিত করা হয়। অ্যারিস্টটল সক্রেটিস ও প্লেটোর দর্শনসহ তার পূর্বের সময়ের বিদ্যমান বিভিন্ন দর্শনের জটিল ও সদৃশ সমন্বয় দেখান। অ্যারিস্টটল খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে এথেন্স থেকে প্রায় দুইশত মাইল উত্তরে মেসিডোনিয়ার অন্তর্গত স্টোগিরা নগররে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে বিজ্ঞান, জ্যোতিবির্জ্ঞান ও দর্শনের গুরু বেলা হয়। অ্যারিস্টটল এর পিতার নাম নিকোম্যাকস ও মাতার নাম ফয়েস্তিসও। তার আরো একটি পরিচয় হলো তিনি দ্বিগ্বীজয়ী বীর 'আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট' এর শিক্ষক ছিলেন এবং বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটোর ছাত্র ছিলেন। এই বহুমুখী প্রতীভার অধিকারি ব্যক্তিত্ব ৩২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ৬২ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১১ তদেব, পৃ. ২৫।

১২ হেলাল উদ্দীন, ড. *আল্লামা ইকবাল: জীবন ও সাহিত্য কর্ম*, (ঢাকা: মম প্রকাশনি, বাংলা বাজার ২০১৮ খ্রিঃ), পৃ. ৪৭-৪৯।

১৩ মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী, *ইকবালে কামেল*, (আজমগড়ঃ ১৯৮৭ খ্রিঃ), পৃ. ১০; কাজী মুহাম্মাদ যারীফ, *ইকবাল*, (লাহোরঃ কিতাব মনযিল, ১৯৫৮ খ্রিঃ), পৃ. ২৫২-২৫৪।

১৪ আল্লামা হিল্লীর পুরোনাম জামাল উদ্দীন আল-হাসান বিন ইউসুফ বিন আলী বিন আল-মুনতাহার আল হিল্লী। তিনি ১৫ ডিসেম্বর ১২৫০ সালে ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার সময়কার অন্যতম প্রসিদ্ধ ধর্মীয় পণ্ডিত ছিলেন। তার পিতার নাম সাদিক উদ্দীন ইউসুফ বিন আলী বিন আল মুনতাহার আল হিল্লী। তিনি কুরআন, হাদিস, তাফসীর, রিজাল শাস্ত্র, ফিকাহ, উসূল আল-ফিকাহ এর প্রতি আগ্রহী ছিলেন। ১৮ ডিসেম্বর ১৩২৫ সালে ৭৫ বছর বয়সে এই ধর্মীয় মুসলিম নেতা ইন্তিকাল করেন। তার লিখিত কমপক্ষে একশোও বইয়ের অীস্তত্ব পাওয়া গেছে যা আজও পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান।

১৫ হেলাল উদ্দীন, ড. *আল্লামা ইকবাল: জীবনও সাহিত্যকর্ম*, (ঢাকা: মম প্রকাশনি, বাংলা বাজার, ২০১৮ খ্রিঃ), পৃ. ৫০-৫৩ ; আব্দুল্লা কুরাইশী, *বাকিয়াতে ইকবাল*, (করাচিঃ ইকবাল একাডেমি) পৃ. ১৩০।

১৬ ড. জাভিদ ইকবাল, *যিন্দারুদ, প্রথম খন্ড* (লাহোরঃ ইকবাল একাডেমি, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৫৫।

১৭ মুসলিম জাহানে যার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে তিনি হলেন ইবনে সিনা। তিনি দার্শনিক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসেবেই বেশি পরিচিত। প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও মৌলিক চিন্তাবিদ ইবনে সিনার পূর্ণ নাম আবু আলী আল হোসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা। তার পিতার নাম আব্দুল্লাহ, মাতার নাম সিতারা দুজনই ইরানী ছিলেন। এ বহুমুখী প্রতীভার অধিকারি ব্যক্তি প্রাচ্যে ইবনে সিনা নামে খ্যাত হলেও পাশ্চাত্যে তিনি (Avicena) নামে পরিচিত। তিনি উজবেকিস্তানের অন্তর্গত আফসানা নামক স্থানে ৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে, জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১০ ডিসেম্বর ১০৩৭ খ্রিঃ হামদানে মৃত্যুবরণ করেন।

তার লেখা চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ 'আল কানুন ফিত থিব' পৃথিবীর সকল দেশের চিকিৎসকরা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে অনুসরণ করেছিলেন। ২১ বছর বয়সে আল মুজমুয়া নামক একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। গণিত ছাড়া যেখানে সববিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

১৮ আবু নসর মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল ফারাবী একজন প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। তাঁর জন্ম- ৮৭২ মতান্তরে ৮৭০ সালে তুর্কিস্থানের অন্তর্গত ফারাব নামক শহরের নিকটবর্তী আল ওয়াসিজ নামক গ্রামে। তিনি একজন মহাবিশ্বতত্ত্ববিদ, যুক্তিবিদ এবং সুরকার ছিলেন। পদার্থ বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তিশাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। পদার্থ বিজ্ঞানে তিনি 'শূন্যতা'র অবস্থান প্রমাণ করে ছিলেন। ৯৫৬ খ্রি. এই প্রতিভার চিরবিদায় হয়।

১৯ মাশশা দর্শন বলতে অ্যারিস্টটলীয় দর্শনকে বুঝানো হয়।

২০ মুহাম্মাদ আল্লামা ইকবাল, *কুল্লিয়াত ইকবাল উর্দু বাঙ্গেদারা* (লাহোরঃ শায়খ গোলাম আলী এণ্ড মন্সি পাবলিশার্স ২য় সংস্করণ ১৯৭৫ খ্রি.), পৃ. ১৯৯।

[২১] শেখ শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী একজন সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার প্রসিদ্ধ সুফী সাধক এবং আবু নজীব আব্দুল কাহের সোহরাওয়ার্দীর ভাতিজা ছিলেন। হযরত শেখ শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী ৫৩৬ হিজরীর রজব মাসের শেষ দিকে অথবা শাবান মাসের প্রথম দিকে ইরানের সোহরাওয়ার্দী নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। শেখ শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী আরবী ও ফারসী উভয় ভাষায় কবিতা বলতেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আওয়ারিফুল মআরিফ'। এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব যাকে তাসাউফের মৌলিক কিতাব হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। হযরত শেখ শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (র.) হিজরী ৬৩২, ১ মহররম বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

[২২] ড. জাভিদ ইকবাল, *যিন্দারুদ, তৃতীয় খন্ড* (লাহোরঃ ইকবাল একাডেমি-২০০৮), পৃ. ৭৫।

[২৩] ইকবাল, *বাঙ্গেদারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২।

[২৪] রূহ (روح বা আত্মা) রূহের পরিচয় আল্লাহ তায়লা আল কুরআনুল কারীমে বলেছেন। কাফেরেরা যখন নবীজীকে প্রশ্ন করছিল যে, রূহ' কি? আল্লাহ পাক সূরা বনী ইসরাইল এর ৮৫ নং আয়াতে এর উত্তর দিয়েছেন, 'হে বন্ধু তারা (কাফেরেরা) আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাস করবে আপনি তাদের বলেদেন রূহ আমার রবের পক্ষ থেকে হুকুম।'

[২৫] মোস্তাক আহমদ, *মুসলিম জাগরণের মহাকবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবালের খুদিতত্ত্ব ও ঐশি জ্ঞান রহস্য* (রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৬ খ্রিঃ), পৃ. ২০।

[২৬] মুহাম্মাদ আব্দুল্লা, *ইকবালের কাব্যে ইসলামি ভাবধারা,* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ২০০৬ খ্রিঃ), পৃ. ৫৫।

[২৭] তাসাউফ (تصوف) আরবী শব্দ আভিধানিক অর্থ সুফিবাদ, আধ্যাত্মিকতা, অধ্যাত্মবাদ। মুসলিম দর্শনে তাসাউফ সুফিবাদ নামে খ্যাত, পারিভাষিক বর্ণনায়, শাইখুল ইসলাম জাকারিয়া আল আনসারী (রঃ) বলেন, ইসলাম দ্বারা অনন্ত সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যে আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের প্রক্রিয়া এবং মানুষের জাহির ও বাতিন গঠন করা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, তাকে ইলমে তাসাউফ (تصوف) বলে।

[২৮] ইবনুল আরবী (ابن العربی) মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (৫৫৮-৬৩৮ হিজরী) একজন প্রসিদ্ধ সূফী সাধক ও দার্শনিক ছিলেন। যিনি স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন এবং দামেশকে মৃত্যু বরণ করেন। সূফীদের নিকট তিনি 'আশ-শায়খুল আকবার' নামে খ্যাত। ইয়ামেনের বিখ্যাত দানবীর হাতেম তাঈ তাঁর পূর্বপুরুষ হওয়ায় আত-তাঈ' উপনামেও তার প্রসিদ্ধি ছিল।

[২৯] ইকবাল, *বাঙ্গেদারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯।